নেয়ামুল
কোরআন
মৌলবী মোহাম্মদ শামছুল হুদা
বি. এ. বি. এল
রহমানিয়া লাইব্রেরী
ঢাকা - ১১০০

অভিমত

বাংলাদেশ সরকারের রেজিষ্ট্রার অব পাবলিকেশনস্ জনাব আবদুল মজিদ এম. এ. তাঁহার ১২-১২-৫৪ ইং তারিখের ৪৪৮ আর. পি. নং ডি. ও. চিঠিতে বলিয়াছেন ঃ —

"এই মূল্যবান কেতাবখানা যে কেবল রোগে-শোকে ও বিপদ-আপদে দিশাহারা দরিদ্র ও নিঃস্ব জনসাধারণের উপকারে আসিবে তাহা নয়, এই কেতাবে মুসলিম জনসাধারণের ইহ-পরকালের মুক্তির বিস্তারিত বিবরণও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই কেতাবখানি ইসলামী আদর্শ ও মাহাত্ম্যের প্রতি অনাসক্ত ব্যক্তিদেরও বিশেষ উপকারে আসিবে। ইহাতে ইসলামের আদর্শ ও কোর্‌আনের ফযীলতের তত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর, তিনি সপ্তম সংস্করণের নেয়ামুল-কোর্‌আন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "এই সংস্করণে লেখক নামাযের ফযীলত, পর্দা তত্ব ও ভালবাসা সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াছেন তাহা অভূতপূর্ব ও অচিন্তনীয়। এই অমূল্য অবদান তাঁহাকে ইসলামী সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে।

গ্রন্থকার বাংলাদেশ সরকারের একজিকিউটিভ সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহাকে অভিনন্দন জানাই।"

ভূমিকা

কোর্‌আন মজিদ আল্লাহতায়ালার পাক কালাম, মুসলমানদের মাথার তাজ ও ইহ-পরকালের সম্বল। এই কালামের মর্ম ও ফযীলত জ্ঞাত হইয়া ইহ-পরকালের ফায়েদা হাসিল করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। অন্যান্য দেশের মুসলমানগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ভাষায় কোর্‌আনের ফযীলত ও তফসীর প্রণয়ন করিয়া নানাভাবে উপকৃত হইতেছেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলার ৭ কোটি মুসলমান এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। বাংলার মুসলমানেরা কোর্‌আন জুযদানেই আবদ্ধ করিয়াছেন। এই মহাগ্রন্থে যে সকল বিধি-নিষেধ এবং অমূল্য উপদেশবাণী রহিয়াছে, তাঁহারা তাহার সন্ধান পান নাই, এমন কি দৈনিক নামাযে যে সকল সূরাগুলি পড়িয়া থাকেন ও আল্লাহ পাকের নিকট যে সকল মোনাজাত (প্রার্থনা) করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাহাদের অর্থগুলি পর্যন্ত জ্ঞাত নহেন। কিসের জন্য মোনাজাত করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিতে পারেন না ; এহেন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। বাংলা ভাষায় কোর্‌আনের উৎকৃষ্ট তরজমা ও তফসীরের অভাব ও কোর্‌আনের ফযীলতের প্রচারের স্বল্পতাই সমাজের এই দুরবস্থার প্রধান কারণ। আসমানী কিতাব ব্যতীত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ন্যায় কোর্‌আন মজিদ জড় পদার্থের মত অচেতন কিতাব নহে, ইহা আল্লাহতায়ালার শক্তিসম্পন্ন কালামপূর্ণ সর্বজ্ঞানময় পূর্ণাঙ্গ মহাগ্রন্থ ; জগতে ইহার তুলনা নাই। এই পাক কালামে মানবের ইহ-পরকালের নিগূঢ় তত্ব সকল নিহিত রহিয়াছে। ঠিকভাবে এই কালামের অর্থ বুঝিতে পারিলে উহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত আপনা হইতেই প্রতীয়মান হইতে থাকে। অর্থ না বুঝিয়া পড়িলে শাব্দিক অনুভূতি ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান অথবা ভাবের উদয় হইতে পারে না ও কোর্‌আন পাকের কোন গবেষণা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না ; আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় গবেষণামূলক তফসীর থাকিলেও বাঙ্গালী মুসলমান জনসাধারণের নিকট দুর্বোধ্য বলিয়া তাহা দ্বারা তাঁহাদের মোটেই কোন প্রকার উপকার হইতেছে না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ গবেষণা দ্বারা কোর্‌আনের বৈজ্ঞানিক তত্বগুলি আবিষ্কার করিয়া প্রতিদিন জগতকে চমৎকৃত করিতেছে। আল্লাহপাক সূরা ইয়াসীনের প্রথম ভাগে বলিয়াছেন যে, "ইহা মহা বিজ্ঞানময় কোর্‌আন"। বৈজ্ঞানিক তত্বগুলি কোর্‌আনে কিভাবে লিখিত আছে তাহা আয়াতুল কুরসীর তফসীরে (১২৭পৃঃ) বর্ণিত হইয়াছে। মানুষের

ইহ-পরকালের ব্যাপারে যাহা আবশ্যক তাহার প্রত্যেক বিষয়ই এই মহা গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে। কোর্‌আন পাকের আদেশ নিষেধ আমলে আনিয়া চলিলে মানুষের কোন কিছুর অভাব ঘটিতে পারে না। প্রথম যুগের মুসলিমগণের দ্রুত উন্নতি লাভের মূলে যে মহান কোর্‌আনের নির্দেশ ও আমল রহিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আজ পৃথিবীর প্রত্যেক অগ্রগতিশীল জাতিই কোর্‌আন পাকের মূল নীতিগুলি অবলম্বন করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ; আর আমরা বাংলার মুসলমান কোর্‌আন হইতে দূরে সরিয়া আংটিহারা সোলায়মান ও কোর্‌আন ছাড়া মুসলমান সাজিয়া পথের ভিখারী হইয়াছি। বাংলার মুসলমানকে পৃথিবীর বুকে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কোর্‌আন পাকের পথে আসিতে হইবে এবং ইহাকে আকড়াইয়া থাকিতে হইবে। পূর্ব জমানার নবী, রসূল, বুযর্গান ও আমাদের হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনের ঘটনা ও অবস্থা অবলম্বন করিয়া বিশ্বমানবের মঙ্গলামঙ্গলের আদেশ নিষেধবাণী লইয়াই এই পাক কোর্‌আন নাযিল হইয়াছে, যে সূরা বা যে আয়াত যে অবস্থা ও ভাবের বর্ণনা লইয়া নাযিল হইয়াছে, ঐ সূরা বা আয়াতের আমল দ্বারা তদ্রূপ ফযীলত লাভ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'কুলিল্লাহুম্মা' আয়াতের ফযীলতের বর্ণনা ধরা যাইতে পারে। এই আয়াতটি আমাদের হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দরিদ্রতা ও তাঁহার শত্রুগণের বিদ্রূপ উপলক্ষ করিয়া নাযিল হইয়াছিল ; সে জন্য এই আয়াতের আমল দ্বারা আর্থিক উন্নতি ও শত্রু দমন হয়। পাক কোর্‌আনের প্রত্যেক সূরা ও আয়াতের এক বা একাধিক ফযীলত আছে, উহাদের দ্বারা ইহ-পরকালের কল্যাণ লাভ হয় ও অমঙ্গল হইতে নিরাপদ থাকা যায়। আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় কোর্‌আনের আমলের অনেক উৎকৃষ্ট কিতাব রহিয়াছে কিন্তু বাংলা ভাষায় সেরূপ উৎকৃষ্ট কোন কিতাব নাই। বন্ধু-বান্ধবগণের উৎসাহে আমি এই কিতাব প্রণয়নের চেষ্টা করিয়াছি। যতটুকু সম্ভব কোর্‌আনের সূরা, আয়াত ও দরূদ শরীফের অর্থসহ ফযীলতের গবেষণামূলক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ও অযীফার সুবিধার জন্য তফসীরসহ এই কিতাবের শেষভাগে পাঞ্জ-সূরা যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমরা প্রত্যহ নামাযে আমপারার যে সকল ছোট ছোট সূরাগুলি পড়িয়া থাকি তাহাদের অর্থ ও ফযীলত কিতাবের প্রথম ভাগে দেওয়া হইয়াছে। কোর্‌আনের সূরা ও আয়াতগুলির বর্ণনা সম্পূর্ণভাবে লিখিত না হইলে মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না ; বরং এরূপ অসম্পূর্ণ বর্ণনায় পাক কোর্‌আনের গৌরব নষ্ট হইয়া যায়। মহাগ্রন্থ কোর্‌আনের মাহাত্ম্য ও

ফযীলতের বর্ণনা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখিত হওয়াই সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। কোর্‌আনের আমল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ফযীলত লাভ করিতে হইলে বা-ওযু কেবলামুখী হইয়া আমল করিবে ও আমলের পূর্বে ও পরে দরূদ শরীফ পড়িয়া লইবে, ইহাতে আমল সত্বর কার্যকরী হয়।

হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের জগদ্বিখ্যাত গোনিয়াতুত্তালেবীন নামক সুবিখ্যাত অমরগ্রন্থ, ভারতের শ্রেষ্ঠ আলেম হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) সাহেবের আমলে কোর্‌আনী, নাফেউল খালায়েক্ব, পবিত্র হাদীস শরীফ ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য কিতাব হইতে পরীক্ষিত আমলগুলি বাছাই করিয়া এই কিতাব লিখিত হইয়াছে ; প্রত্যেক আয়াতের যথাসম্ভব বাংলা উচ্চারণ দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু বাংলা ভাষায় আরবী শব্দের সঠিক বাংলা উচ্চারণ হইতে পারে না। অতএব পাঠকগণ উচ্চারণের জন্য সম্পূর্ণরূপে এই কিতাবের উপর নির্ভর করিবেন না। ছাপার ভুলে হয়ত দুই একস্থানে ভুল-ত্রুটি থাকিতে পারে, আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ মার্জনা করিবেন। বাংলার মুসলমান সমাজ এই কিতাব দ্বারা উপকৃত হইলে পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব। ইতি—

বিনীত—

করিমপুর (ঢাকা)

১লা রজব ; ১৩৫৮ হিজরী — গ্রন্থকার —

বাংলা ১৩৪৬ সাল।

একাদশ সংস্করণের ভূমিকা

কোন কিতাবে একাদশ সংস্করণের ভূমিকা লিখিতে পারা লেখকের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় ঃ সে জন্য আল্লাহ পাকের নিকট শুকরিয়া আদায় করিতেছি। বর্তমান সংস্করণে অনেক নূতন ও জরুরী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়া কিতাবের গুরুত্ব বহু গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাঠকগণ উপকৃত হইলে পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

মাজার শরীফ, ফকীর বাড়ী। — খাদেমুল ইসলাম

নজরপুর, ঢাকা। — গ্রন্থকার —

নেয়ামুল-কোরআন জনপ্রিয় হওয়ার কারণ

নেয়ামুল-কোরআন জনপ্রিয় হওয়ার কারণ সম্বন্ধে ঢাকা জেলার করিমপুর নিবাসী প্রবীণ আলেম জনাব মৌলবী কিতাব আলী মোল্লা মন্তব্য করিয়াছেন যে, "নেয়ামুল কোরআন" কিতাবখানা বাংলাদেশের সর্বত্র বিপুল প্রসার লাভ করিয়াছে এবং ইহা বাংলাদেশের মুসলিম সমাজকে কোরআন ও ইসলামের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, অগণিত নর-নারী ইহাদ্বারা উপকৃত হইতেছে, বর্তমানে ইহা মুসলিম সমাজের পারিবারিক কিতাবরূপে গণ্য হইয়াছে।

নেয়ামুল-কোরআন জনপ্রিয় হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, ইহার প্রতিটি তদবীর ও আমল দীর্ঘকাল যাবত অসংখ্য লোক দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া যথার্থ ফলপ্রদ বলিয়া প্রবাদে পরিণত হইয়াছে।

আমল দ্বারা ফায়েদা লাভ করার প্রধান শর্ত এই যে, আমলটির উপর আমলকারীর দৃঢ় বিশ্বাস (আকিদা) থাকিতে হইবে, এই বিশ্বাসই আমলকারীর রূহানী শক্তিকে বৃদ্ধি করিয়া ফায়েদা লাভে সাহায্য করে। এই বিশ্বাস না থাকিলে আমল করিয়া বিশেষ ফায়দা লাভ হয় না। নেয়ামুল-কোরআনে লিখিত আমলগুলির আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, রূহানী ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বর্ণনা থাকায় পাঠ করা মাত্র আমলের প্রতি আমলকারীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক বিষয়ে পাক কোরআনে এক বা একাধিক সূরা ও ইসিমগুলি আমলের বিষয়বস্তুর সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধযুক্ত, সে জন্যই এই কিতাবে লিখিত আমলগুলি বিশেষ ফলপ্রদ হইতেছে ; ইহাই এই কিতাবের বিশেষত্ব।

বিজ্ঞানে ও দর্শনে অজ্ঞ অর্ধশিক্ষিত লেখক দ্বারা নেয়ামুল-কোরআনের অনুকরণে লিখিত ২/১ খানা কিতাব দেখার সুযোগ হইয়াছে, ঐ সকল কিতাব কোন বিশেষত্ব দাবী করিতে পারে না। নকল বা অনুকরণ কোন দিন আসলের তুল্য হয় না ও আসলের ফযীলত এবং বিশেষত্ব লাভ করিতে পারে না।

বাংলাদেশ সরকার নেয়ামুল কোরআনের লেখককে অভিনন্দিত করিয়া প্রকৃত যোগ্যতার স্বীকৃতি দেওয়ায় আমরা খুশী হইলাম।

স্বাক্ষর— কিতাব আলী মোল্লা

করিমপুর, ঢাকা। ১লা রমযান, হিঃ ১৩৮১ সন

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সপ্তম অধ্যায়	
মানব জীবনে আয়াতে কোর্‌আনের ফযীলত	১২৭
আয়াতুল কুরসীর ফযীলত	১২৭
কোর্‌আনের সাতটি আয়াতের ফযীলত	১৩৩
দোযখের দরজা বন্ধ হওয়ার আমল	১৩৭
ফেরেস্তাগণের দোয়া লাভের আমল	১৩৯
অষ্টম অধ্যায়	
আয়াতে কোর্‌আনে বিবিধ অভাব পূরণের আমল	১৪১
ইস্তেগফারের ফযীলত	১৪১
প্রবাসকালে মান-ইজ্জতের সহিত থাকার আমল	১৪২
চাকর চাকরানী বাধ্য থাকার তদবীর	১৪৩
চাকরী লাভের তদবীর	১৪৪
চাকুরীতে ও জীবনের অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি লাভ করার আমল	১৪৫
নষ্ট চাকুরী উদ্ধারের উপায়	১৪৫
অত্যাচারী কর্মচারীর চাকুরী নষ্ট করার তদবীর	১৪৫
মনের বাসনা ও অভাব পূরণের তদবীর	১৪৬
কঠিন কাজ সহজসাধ্য হওয়ার তদবীর	১৪৭
কেয়ামতের দিনে মুখ উজ্জ্বল হওয়ার আমল	১৪৮
যাদু নষ্ট করার তদবীর	১৪৮
স্বামী বশীভূত করার আমল	১৪৯
বন্ধুত স্থাপন করার আমল	১৫০
শত্রুতা সৃষ্টি করার তদবীর	১৫১
ঝগড়া বিবাদ রহিত করার তদবীর	১৫২
সর্প দংশন হইতে নিরাপদ থাকার তদবীর	১৫৩
সর্পবিষ নষ্টের পরীক্ষিত তদবীর	১৫৪
সাপ ও কুকুরের বিষ নষ্ট করার তদবীর	১৫৫
বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের তদবীর	১৫৬
কলেরা রোগের তদবীর	১৫৬
বসন্ত রোগের তদবীর	১৫৮
প্লীহা বৃদ্ধি নিবারণের তদবীর	১৫৯
হযরত আলীর (কার্রাঃ) একটি ঔষধ	১৬১
মাথা ধরার তদবীর	১৬৩
আধ-কপালে মাথা ব্যথার তদবীর	১৬৩
পেট বেদনার তদবীর	১৬৪
দূষিত বেদনার তদবীর	১৬৫
নির্দিষ্ট সময় ঘুম হইতে উঠিবার তদবীর	১৬৫
মানুষ ও জন্তুর অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার তদবীর	১৬৬
ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধির আমল	১৬৭
শরীর বন্ধ করার অদ্বিতীয় তদবীর	১৬৯
বাড়ী বন্ধ করার তদবীর	১৭০
ঘর হইতে জ্বিন ভূত তাড়াইবার উপায়	১৭১
জ্বিন ও ভূতে ধরা রোগীর তদবীর	১৭২
বৃষ্টি আনয়ন করার তদবীর	১৭৩
বৃষ্টি বন্ধ করার তদবীর	১৭৪
মেঘ আসিতে থাকিলে তাহা দূর করার তদবীর	১৭৫
উত্তম বস্তু ক্রয় করিতে পারার তদবীর	১৭৬
নিদ্রিত লোকের নিকট হইতে গোপন কথা জানিবার উপায়	১৭৭
ধ্বজভঙ্গ ও প্রমেহ রোগের তদবীর	১৭৮
স্ত্রীলোকের প্রসব কষ্ট দূর করার তদবীর	১৭৯
গর্ভপাত নিবারণের তদবীর	১৮২
বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের তদবীর	১৮৫
পুত্র-কন্যা লাভের উপায়	১৮৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
কোন জিনিস হারাইয়া গেলে তাহা পাওয়ার তদবীর	১৮৯
পলাতক ব্যক্তি ফিরিয়া আসার তদবীর	১৯০
পলায়ন নিবারণের তদবী.	১৯১
কোর্‌আন ও মানব চরিত্র	১৯১
নবম অধ্যায়	
আয়াতে কোর্‌আনে বিবিধ তদবীর ও আমল	১৯২
শত্রুর উপর জয়লাভ ও সম্মান বৃদ্ধির অব্যর্থ আমল	১৯২
লোক তাবেদার করার তদবীর	১৯৭
খতমে তাহলীল	১৯৮
খতমে জালাল	১৯৮
খতমে খাজেগান	১৯৯
শীঘ্র বিবাহ হওয়ার তদবীর	২০০
গলার কাঁটা নামাইবার তদবীর	২০২
এস্তেখারার নিয়ম	২০২
ন্যায্য মোকদ্দমায় জয়লাভের তদবীর	২০৪
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বন্ধ করার তদবীর	২০৪
জেল হইতে বাঁচিবার তদবীর	২০৫
বান দফার তদবীর	২০৫
আগুন নিভাইবার তদবীর	২০৬
স্বপ্নদোষ বন্ধের তদবীর	২০৭
শিশুর কান্না নিবারণের তদবীর	২০৮
বজ্রপাত হইতে রক্ষা পাওয়ার তদবীর	২০৮
পরীক্ষা পাসের তদবীর	২০৯
বিচারক সদয় হওয়ার তদবীর	২১০
বিচারকের দয়া আকর্ষণ করার তদবীর	২১১
নৌকা, জাহাজ ইত্যাদিতে নিরাপদ থাকার তদবীর	২১৩
আরোহণ করার জন্তু বশীভূত করার তদবীর	২১৪
ঝড় তুফান হইতে রক্ষা পাওয়ার তদবীর	২১৪
সূরা বাক্বারাহ্-এর শেষ দুইটি আয়াতের ফযীলত	২১৬
হযরত রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) নিজের আমল	২১৮
স্বপ্নে হযরত রসূল (সাঃ) এর জিয়ারত লাভের আমল	২২৪
শত্রুর উপদ্রব দূর করার তদবীর	২২৬
শত্রু দমন করার পরীক্ষিত তদবীর	২২৬
শত্রুর মুখ বন্ধ করার তদবীর	২২৬
মসীবত হইতে রক্ষা পাওয়ার দোয়া	২২৭
চোরের ভয় ইত্যাদি নিবারণ করার তদবীর	২২৮
নিরুদ্দেশ ব্যক্তির অবস্থা জানিবার তদবীর	২২৮
মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখার তদবীর	২২৯
কুষ্ঠ রোগের তদবীর	২৩০
পাথরী রোগের তদবীর	২৩০
প্রস্রাব খোলাসা হওয়ার তদবীর	২৩১
পক্ষাঘাত (অর্ধাঙ্গ) রোগের তদবীর	২৩২
অত্যাচারী ও জালেম লোকদিগকে জব্দ ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার তদবীর	২৩২
মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার আমল	২৩৩
ঈমান ঠিক রাখার আমল	২৩৫
জাহেরী ও বাতেনী তত্ত্বলাভের দোয়া	২৩৫
কাজায়ে হাজাতের নামায	২৩৬
ঈমানের সহিত মৃত্যু হওয়ার তদবীর	২৩৭
স্ত্রী-পুত্র দীনদার হওয়ার আমল	২৩৮
অবাধ্য সন্তান বাধ্য করার তদবীর	২৩৮
মনের চঞ্চলতা দূর করার তদবীর	২৩৯

নেয়ামুল কোর্‌আন

প্রথম অধ্যায়

-ঃঃ০ঃঃ-

আল্লাহ্‌র নাম ও মহিমা

اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

পাক কোরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালার অনেকগুলি পবিত্রতম গৌরবান্বিত নামের উল্লেখ রহিয়াছে। হাদীস শরীফে আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি অতি উত্তম নাম বর্ণিত হইয়াছে। তিনি সমস্ত বিশ্বজগত সৃষ্টি করিয়াছেন ও পালন করিতেছেন। তিনিই আমাদের একমাত্র উপাস্য। 'আল্লাহ' اَللّٰهُ তাঁহার খাস্‌ নাম। আল্লাহ তায়ালার ৪ হাজার সিফতি (গুণবাচক) নাম আছে, তন্মধ্যে তিনশত নাম তৌরাতে, তিনশত নাম যাবুরে, তিনশত নাম ইঞ্জীলে ও শত শত অতি উত্তম নাম পাক কোর্‌আন মজীদে বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে একটি নাম গুপ্তভাবে রহিয়াছে; ইহাই ইস্‌মে আযম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নাম বলিয়া ইসলাম জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। "পরশ পাথরের" ন্যায় এই নামটি সাধারণ জ্ঞানের অগোচর রহিয়াছে। নবী, ফেরেশ্‌তা ও অলীআল্লাহগণ ব্যতীত অপর কেহ এই নামের সন্ধান পান নাই। আল্লাহ তায়ালার এই সকল পবিত্র নামের অলৌকিক গুণ ও অসাধারণ শক্তি রহিয়াছে। পীর, ফকীর ও আলেমগণ এই সকল পবিত্র নামের আমল দ্বারা বহু কঠিন বিপদাপদ ও ব্যাধি আরোগ্য করিয়া থাকেন। প্রত্যেকটি

নামের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও গুণ আছে; আবার দুই বা ততোধিক নাম একত্র করিয়া আমল করিলে ভিন্ন ভিন্ন ফযীলত লাভ হয়। ঐ সকল যুক্ত নামসমূহের ফযীলত যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকটি নাম দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার এক একটি শক্তি ও মহিমা বর্ণিত হয়। যে নামের যে অর্থ ও গুণ, ঐ নামের যিকির দ্বারা ঐরূপ ফযীলত লাভ হয়। কামেল ব্যক্তিগণ তাঁহাদের জীবনে এই নামগুলির আমল দ্বারা যে যে ফযীলত লাভ করিয়াছেন, তাহাই এই কিতাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তায়ালা পাক কোর্‌আনে সূরা বাকারায় বলিতেছেন যে, "তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব।" বাংলাভাষায় আল্লাহ্ তায়ালার এই সকল পবিত্র নামের সঠিক বর্ণনা না থাকায় এই কিতাবের প্রথম ভাগেই তাহা বর্ণনা করা হইল। পড়ার সুবিধার জন্য এই নামগুলি আরবী ভাষায় একত্রে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং নীচে বাংলা উচ্চারণ, পৃথকভাবে প্রত্যেকটি নামের অর্থ ও ফযীলত বর্ণনা করা হইয়াছে।

আরবী

يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا مَالِكُ يَا قُدُّوْسُ

يَا سَلَامُ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا عَزِيْزُ يَا جَبَّارُ

يَا مُتَكَبِّرُ يَا خَالِقُ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا غَفَّارُ

يَا قَهَّارُ يَا وَهَّابُ يَا رَزَّاقُ يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيْمُ

يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ يَا خَافِضُ يَا رَافِعُ يَا مُعِزُّ

يَا مُذِلُّ يَا سَمِيْعُ يَا بَصِيْرُ يَا حَكَمُ يَا عَدْلُ

يَا لَطِيْفُ يَا خَبِيْرُ يَا حَلِيْمُ يَا عَظِيْمُ يَا غَفُوْرُ

يَا شَكُوْرُ يَا عَلِيُّ يَا كَبِيْرُ يَا حَفِيْظُ يَا مُقِيْتُ

يَا حَسِيْبُ يَا جَلِيْلُ يَا كَرِيْمُ يَا رَقِيْبُ يَا مُجِيْبُ

يَا وَاسِعُ يَا حَكِيْمُ يَا وَدُوْدُ يَا مَجِيْدُ يَا بَاعِثُ

يَا شَهِيْدُ يَا حَقُّ يَا وَكِيْلُ يَا قَوِيُّ يَا مَتِيْنُ

يَا وَلِيُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُحْصِيُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ

يَا مُحْيِيُ يَا مُمِيْتُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا وَاجِدُ

يَا مَاجِدُ يَا وَاحِدُ يَا اَحَدُ يَا صَمَدُ يَا قَادِرُ

يَا مُقْتَدِرُ يَا مُقَدِّمُ يَا مُؤَخِّرُ يَا اَوَّلُ يَا اٰخِرُ

يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا وَالِيُّ يَا مُتَعَالِيْ يَا بَرُّ

يَا تَوَّابُ يَا مُنْعِمُ يَا مُنْتَقِمُ يَا عَفُوُّ يَا رَؤُوْفُ

يَا مَالِكَ الْمُلْكِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا رَبُّ

يَا مُقْسِطُ يَا جَامِعُ يَا غَنِيُّ يَا مُغْنِيْ يَا مُعْطِيْ

يَا مَانِعُ يَا ضَارُّ يَا نَافِعُ يَا نُوْرُ يَا هَادِيْ

يَا بَدِيْعُ يَا بَاقِيْ يَا وَارِثُ يَا رَشِيْدُ يَا صَبُوْرُ

يَا صَادِقُ يَا سَتَّارُ ০

উচ্চারণ ঃ— ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহীমু, ইয়া মালিকু, ইয়া কুদ্দুসু, ইয়া সালামু, ইয়া মো'মিনু, ইয়া মোহাইমিনু, ইয়া আযীযু, ইয়া জাব্বারু, ইয়া মোতাকাব্বেরু, ইয়া খালিকু, ইয়া বারিউ, ইয়া মুসাব্বিরু, ইয়া গাফ্ফারু, ইয়া ক্বাহ্হারু, ইয়া ওয়াহ্হাবু, ইয়া রায্যাকু, ইয়া ফাত্তাহু, ইয়া আলীমু, ইয়া ক্বাবিদু, ইয়া বাসিতু, ইয়া খাফিদু, ইয়া রাফিউ, ইয়া মুইয্যু, ইয়া মুযিল্লু, ইয়া সামীউ, ইয়া বাসীরু, ইয়া হাকামু, ইয়া আদলু, ইয়া লাতিফু, ইয়া খাবীরু, ইয়া হালীমু, ইয়া আযীমু, ইয়া গাফুরু, ইয়া শাকুরু, ইয়া আ'লিইউ, ইয়া কাবীরু, ইয়া হাফীযু, ইয়া মুকীতু, ইয়া হাসীবু, ইয়া জালীলু, ইয়া কারীমু, ইয়া রাক্বীবু, ইয়া মোজীবু, ইয়া ওয়াসিউ, ইয়া হাকীমু, ইয়া ওয়াদুদু, ইয়া মাজীদু, ইয়া বায়েসু, ইয়া শাহীদু, ইয়া হাক্কু, ইয়া ওয়াকীলু, ইয়া কাবীইউ, ইয়া মাতীনু, ইয়া ওয়ালিইউ, ইয়া হামীদু, ইয়া মোহসীইউ, ইয়া মুবদিইউ, ইয়া মুয়ীদু, ইয়া মুহ্য়ী, ইয়া মুমীতু, ইয়া হাইউ, ইয়া ক্বাইয়্যুমু, ইয়া ওয়াজিদু, ইয়া মাজিদু, ইয়া ওয়াহিদু, ইয়া আহাদু, ইয়া সামাদু, ইয়া ক্বাদীরু, ইয়া মোক্তাদিরু, ইয়া মোক্বাদ্দিমু, ইয়া মুয়াখ্খিরু, ইয়া আউয়ালু, ইয়া আখিরু, ইয়া যাহিরু, ইয়া বাতিনু, ইয়া ওয়ালীউ, ইয়া মুতাআলী, ইয়া বার্‌রু, ইয়া তাওয়াবু, ইয়া মুন্‌য়েমু, ইয়া মুন্তাক্বিমু, ইয়া আফুব্বু, ইয়া রাউফু, ইয়া মালিকাল মুলকি, ইয়া যাল্‌জালালে ওয়াল ইকরাম, ইয়া রাব্বু, ইয়া মুক্বসিতু, ইয়া জামিউ, ইয়া গানিইউ, ইয়া মুগ্‌নিইউ, ইয়া মু'তিইউ, ইয়া মানিউ, ইয়া দার্‌রু, ইয়া নাফিউ, ইয়া নূরু, ইয়া হাদীউ, ইয়া বাদীউ, ইয়া বাক্বিউ, ইয়া ওয়ারিসু, ইয়া রাশীদু, ইয়া সাবুরু, ইয়া সাদিকু, ইয়া সাত্তারু।

ফযীলত

১। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই পবিত্র নামগুলি পড়িবে, নিশ্চয় সে বেহেশ্‌তে দাখিল হইবে।

২। হেসনে হাসীন নামক কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রত্যহ এই নামগুলি পড়িলে তাহার কখনও অন্নকষ্ট হইবে না, কিংবা অনাহারে থাকিবে না।

৩। স্ত্রীলোকের হামেল পুনঃ পুনঃ নষ্ট হইয়া গেলে উক্ত নামগুলি পড়িয়া পানি ফুঁকিয়া খাইলে ঐ দোষ দূর হইয়া যাইবে।

৪। পীড়িত ব্যক্তি এই নাম পড়িয়া পানি ফুঁকিয়া খাইলে রোগ আরোগ্য হইবে।

৫। প্রত্যহ এই নামগুলি পড়িলে স্বপ্নে হযরত রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) যেয়ারত লাভ হইবে।

৬। সেদ্‌ক দেলে ও নেক নিয়তে এই নামগুলি সর্বদা পড়িলে অসীম নেকী (পুণ্য) হাসিল হয় ও মনের বাসনা পূর্ণ হয়।

يَا اَللّٰهُ —ইয়া আল্লাহু (ইস্‌মে যাত, হে আল্লাহ্‌)

'আল্লাহু' শব্দটি বিশ্বজগতের মালিক ও সৃষ্টিকর্তার খাস্ নাম। এই নামটি লিঙ্গ ও বচনভেদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইহা বিশেষ কোন ধাতু হইতে উৎপন্ন হয় নাই। দুনিয়ার কোন ভাষায় বা শব্দে ইহার অনুবাদ হইতে পারে না। আল্লাহ বলিতে একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌কেই বুঝায়। এইজন্য এই নামকে "ইস্‌মে যাত" বলা হয়।

ফযীলত

১। হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) নিজের আমল হইতে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে, —'ইয়া আল্লাহু' (يَا اَللّٰهُ) এই পবিত্র নামটি দৈনিক ৪৩৫৬ বার করিয়া ৪০ দিন পর্যন্ত যিকির করিলে আল্লাহ তায়ালা মনের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন, কিন্তু শর্ত এই যে, আমল দ্বারা ফল লাভ হইলে সর্বদা ফকীরমিসকীনদিগকে দান-খয়রাত করিতে হয়, নতুবা এই আমলের ফযীলত বহাল থাকে না।

২। প্রত্যহ ১০০ বার এই নামের যিকির করিলে ঈমান দৃঢ় হয়।

৩। চিকিৎসকগণ যে রোগীর আশা ছাড়িয়া দেয়, তাহার শেষ ঔষধ এই নামের যিকির করা।

৪। জুময়ার দিন জুময়ার নামাযের পূর্বে নির্জন স্থানে বসিয়া ২০০ বার এই নাম যিকির করিলে মনের বাসনা পূর্ণ হয়।

৫। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন— اَفْضَلُ الذِّكْرِ ذِكْرُ اللّٰهِ

(আফযালুয্‌যিক্‌রে যিক্‌রুল্লাহে) অর্থাৎ, সকল যিকির হইতে আল্লাহ নামের যিকিরই উত্তম। হযরত (সাঃ) আরও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রিতে আল্লাহ্‌র নাম যিকির করে তাহার অন্তরে এবং মৃত্যু হইলে তাহার কবরে নূর চমকাইতে থাকিবে।

৬। পাক পেয়ালায় ৬৬ বার এই নাম লিখিয়া পানিতে ধুইয়া পীড়িত ব্যক্তিকে খাওয়াইলে পীড়া আরোগ্য হয়।

يَا رَحْمٰنُ — ইয়া রাহ্‌মানু (হে অতীব অনুগ্রহকারী!)

বিসমিল্লাহ যোগে আল্লাহ তায়ালার এই পবিত্র নামটি জগতে সর্বপ্রথম প্রচারিত হয়। (তফসীরে কাশ্‌শাফ) প্রত্যেক নামাযের পর এই নাম ১০০ বার

পড়িলে মনের অলসতা, গ্লানি ও ভ্রম দূর হয়, মাকরূহ কাজ হইতে বিরত থাকা যায়। মেশকজাফরানে এই নাম লিখিয়া মন্দ লোকের বাড়ীতে পুঁতিয়া রাখিলে তাহার মন্দ স্বভাব দূর হয়।

يَا رَحِيْمُ — ইয়া রাহীমু (হে পরম দয়াময়!)

১। প্রত্যহ এই নাম ১০০ বার যিকির করিলে মন দয়ালু হয়।

২। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ বা ঘটনা ঘটিবার আশঙ্কা থাকিলে "আর্-রাহ্মানুর্ রাহীম" এই নাম দুইটি সর্বদা পড়িতে থাকিবে, কিংবা কাগজে লিখিয়া সঙ্গে রাখিবে, ইন্শাআল্লাহ বিপদ হইতে মুক্ত থাকিবে।

৩। এই নাম লিখিয়া পানিতে ধুইয়া সেই পানি গাছের গোড়ায় ঢালিয়া দিলে সে গাছে বেশী ফল ধরিবে।

৪। প্রেমিক-প্রেমিকা এই নাম লিখিয়া তাহার নীচে উভয়ের মাতার নাম লিখিয়া পানিতে ধুইয়া সেই পানি খাইলে উভয়ে প্রেমে মত্ত থাকিবে (অবৈধ প্রেমে এই আমল করা নিষিদ্ধ)।

يَا مَالِكُ —ইয়া মালিকু (হে প্রভু!)

সূর্যাস্তের সময় এই নাম ৩০৩ বার পড়িলে আল্লাহ তায়ালা মনের মলিনতা দূর করিয়া দেন এবং প্রকাশ্য গোনাহ মাফ করিয়া দেন।

يَا قُدُّوْسُ —ইয়া কুদ্দুসু (হে পবিত্র!)

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ ٥

সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা অরাব্বুল মালায়িকাতি ওয়াররূহ্।

অর্থঃ— হে আমাদের, ফেরেশতাগণের ও জিব্রাঈল (আঃ)-এর প্রতিপালক! তুমি পবিত্র।

ফযীলত

জুময়ার নামাযান্তে ১২৫ বার এই আয়াত পড়িয়া এবং একটি রুটির উপর লিখিয়া খাইলে সমস্ত বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় ও এবাদতে মন আকৃষ্ট হয়।

يَا سَلَامُ — ইয়া সালামু (হে শান্তিদাতা!)

পীড়িত ব্যক্তির মাথার নিকট বসিয়া হাত উঠাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ১৩৬ বার এই নাম পড়িলে কিংবা পীড়িত ব্যক্তি প্রত্যহ ১০০ বার পড়িলে আল্লাহ্র ফজলে আরোগ্য লাভ করিবে।

يَا مُهَيْمِنُ — ইয়া মুহাইমিনু (হে সত্য সাক্ষী!)

গোসল করিয়া দুই রাকাত নফল নামায পড়িয়া নির্জন স্থানে বসিয়া এই নাম ১০০ বার যিকির করিলে সাহস বৃদ্ধি পায়।

يَا عَزِيْزُ — ইয়া আযীযু (হে পরাক্রমশালী!)

৪০ দিন পর্যন্ত ৩১ বার করিয়া এই নাম পড়িলে মনের চিন্তা দূর হয়, সম্মান লাভ হয় এবং কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হয় না।

يَا جَبَّارُ —ইয়া জাব্বারু (হে ক্ষমতাশালী!)

এই নাম প্রভাতে ও সন্ধ্যায় ২১৬ বার করিয়া পড়িলে অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে নিরাপদ থাকা যায়।

يَا مُتَكَبِّرُ—ইয়া মুতাকাব্বেরু (হে গৌরবান্বিত!)

এই নাম সর্বদা যিকির করিলে সম্মান ও উন্নতি লাভ হয়। স্ত্রীর সহিত প্রথম মিলনের রাত্রে ১০০ বার এই নাম পড়িয়া সঙ্গম করিলে ভাগ্যবান ও চরিত্রবান সন্তান লাভ হয়।

يَا خَالِقُ— ইয়া খালিকু (হে সৃজনকারী!)

এই নাম সাত দিন পর্যন্ত অনবরত প্রত্যহ যিকির করিলে সমুদয় বিপদাপদ হইতে নিরাপদ থাকা যায়। মধ্য রাত্রে অনেকবার যিকির করিলে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশ্তাগণকে এবাদত করার আদেশ করেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত ফেরেশ্তাগণের এবাদত আমলকারীর আমলনামায় লিখা হইতে থাকে।

يَا بَارِئُ — ইয়া বারিউ (হে মুক্তিদাতা।)

এই নাম প্রত্যহ ৭ বার পড়িলে কবরের আযাব হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

يَا مُصَوِّرُ — ইয়া মুসাব্বিরু (হে আকৃতি গঠনকর্তা!)

যে স্ত্রীলোকের সন্তান হয় না কিংবা গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়, সে স্ত্রীলোক ৬ দিন রোযা রাখিয়া প্রত্যেক ইফ্তারের সময় এই নাম একুশবার পড়িয়া পানির উপর ফুঁক দিয়া ঐ পানি দ্বারা ইফ্তার করিবে এবং ইফ্তারের পর পুনরায় এই নাম ২১ বার পড়িলে ইন্শাআল্লাহ তাহার হামল হইবে ও হামল রক্ষা হইবে।

يَا غَفَّارُ — ইয়া গাফ্ফারু (হে অপরাধ ক্ষমাকারী!)

নিম্নলিখিতরূপে এই নাম জুময়ার নামাযের পর ১০০ বার পড়িলে গোনাহ মাফ হয়, যাবতীয় অভাব দূর হয় ও সুখে বাস করা যায়, যথা ঃ—

يَا غَفَّارُ اِغْفِرْلِي ذُنُوْبِي — ইয়া গাফ্ফারু ইগফির্লী যুনুবী। (হে অপরাধ ক্ষমাকারী! আমার অপরাধ ক্ষমা কর!)

يَا قَهَّارُ — ইয়া কাহ্হারু (হে মহাশাস্তিদাতা!)

সর্বদা এই নাম যিকির করিলে সংসারের মায়া-মমতা দূর হয় এবং আল্লাহ ব্যতীত কাহারও খেয়াল মনের মধ্যে থাকে না ও শত্রুর উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। জাদুঘটিত কারণে ধ্বজভঙ্গ হইলে এই নাম চীনা মাটির পেয়ালায় লিখিয়া ধুইয়া পানি খাওয়াইলে ধ্বজভঙ্গ দূর হয়।

يَا وَهَّابُ — ইয়া ওয়াহ্হাবু (হে সৎকার্যে পুরস্কারদাতা!)

চাশ্ত নামাযের পর সেজদায় যাইয়া এই নাম ১০০ বার পড়িলে ধন ও প্রতাপের অধিকারী হওয়া যায়। মধ্য রাত্রে নির্জন ঘরে কিংবা মস্জিদে খালি মাথায় বসিয়া হাত উঠাইয়া এই নাম ১০০ বার পড়িলে মনের বাসনা পূর্ণ হয়।

يَا رَزَّاقُ — ইয়া রায্যাকু (হে অন্নদাতা!)

ফজরের নামাযের পূর্বে এই নাম ঘরের প্রত্যেক কোণে ১০ বার করিয়া পড়িলে অভাব দূর হয়; (ঘরের উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে আরম্ভ করিতে হয়)।

يَا فَتَّاحُ — ইয়া ফাত্তাহু (হে প্রশস্তকারী!)

ফজরের নামাযের পর বুকের উপর দুই হাত রাখিয়া ৭ বার এই নাম পড়িলে মনের কালিমা দূর হয়, সকল কার্য সহজসাধ্য হয়, অভাব দূর হয় ও কিসমত বৃদ্ধি পায়।

يَا عَلِيْمُ — ইয়া আলীমু (হে মহাজ্ঞানী!)

এই নাম সর্বদা যিকির করিলে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, গোনাহ মাফ হয় ও মনের কপাট খুলিয়া যায়।

يَا قَابِضُ — ইয়া কাবিদু (হে আয়ত্তকারী!)

চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই নাম রুটির প্রথম লোকমায় লিখিয়া খাইলে জীবনে কখনও ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে না।

يَا بَاسِطُ — ইয়া বাসিতু (হে প্রসারকারী!)

ফজরের নামাযের পর হাত উঠাইয়া এই নাম ১০ বার পড়িয়া হাত মুখের উপর মালিশ করিলে কখনও অন্যের মুখাপেক্ষী হইবে না ও রুযীতে বরকত হইতে থাকিবে।

يَا خَافِضُ — ইয়া খাফিযু (হে রোধকারী!)

৫০০ বার এই নাম যিকির করিলে মনের বাসনা পূর্ণ হয় ও ৭০০ বার পড়িলে শত্রুর অপকার হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

يَا رَافِعُ — ইয়া রাফিউ (হে উন্নতি প্রদানকারী!)

দিনে ও রাত্রে শুইবার সময় এই নাম ১০০ বার পড়িলে সকল বিপদাপদ হইতে নিরাপদ থাকা যায় ও সম্মান লাভ হয়। ৬০০ বার পড়িলে অত্যাচারীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

يَا مُعِزُّ — ইয়া মুয়িয্যু (হে সম্মানদাতা!)

সোমবার ও শুক্রবারে নামাযের পর এই নাম ৪১ বার পড়িলে সংসারে প্রতাপশালী হওয়া যায় ও সকলের নিকট সম্মান লাভ করা যায়।

يَا مُذِلُّ — ইয়া মুযিল্লু (হে হীনকারী!)

নামাযের পর সেজ্দায় গিয়া ৭৫ বার এই নাম পড়িয়া আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিলে শত্রুতা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কাহারও কোন হক্ কেহ আত্মসাৎ করিবার মতলব করিলে সর্বদা এই নাম যিকির করিলে হক্ নষ্ট করিতে পারিবে না।

يَا سَمِيْعُ — ইয়া সামীউ (হে শ্রবণকারী!)

বৃহস্পতিবার চাশ্ত নামাযের পর কাহারও সহিত কথা না বলিয়া এই নাম ৫০০ বার পড়িয়া যে দোয়া করা যায় তাহা কবুল হয়।

يَا بَصِيْرُ — ইয়া বাসীরু (হে প্রদর্শনকারী!)

জুময়ার নামাযের সুন্নত ও ফরজের মধ্যে এই নাম ১০০ বার পড়িলে আল্লাহ্র নিকট আদরণীয় হইবে, দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হইবে, সৎকাজ করিবার সাহস, শক্তি ও ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে।

يَا حَكَمُ — ইয়া হাকামু (হে আদেশ প্রদানকারী!)

কোন কঠিন কাজ উপস্থিত হইলে এই নাম যিকির করিবে, কাজ সহজসাধ্য হইবে। রাত্রে এই নাম যিকির করিলে মনের পবিত্রতা লাভ হয়।

يَا عَدْلُ — ইয়া আ'দলু (হে ন্যায়বিচারক!)

শুক্রবার রাত্রে বিশ টুক্রা রুটির উপর এই নাম লিখিয়া খাইলে মানুষ বাধ্য থাকিবে ও মনের পরিবর্তন হইবে।

يَا لَطِيْفُ — ইয়া লাতীফু (হে কোমলান্তঃকরণময়!)

অযু করিয়া এই নাম ১০০ বার পড়িলে মনের বাসনা পূর্ণ হয়, সকল কাজ শান্তিতে সুসম্পন্ন হয়। অবিবাহিত মেয়ে এই নাম যিকির করিলে বিবাহের বন্দোবস্ত হয়। দৈনিক ১৩১ বার পড়িলে রুযীতে বরকত হয় ও রোগের উপশম হয়।

يَا خَبِيْرُ — ইয়া খাবীরু (হে সর্বজ্ঞানময়!)

এই নাম সর্বদা পড়িলে খারাপ ভাব ও খারাপ চিন্তা দূর হয়; সাত দিন পর্যন্ত অনবরত এই নাম পড়িলে অনেক বাতেনী তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। কোন খারাপ লোকের চক্রান্তে পড়িলে কিংবা হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিলে এই নাম অনেকবার যিকির দ্বারা পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

يَا حَلِيْمُ —ইয়া হালীমু (হে ধৈর্যশীল!-স্থিতিশীল, অচঞ্চল)

ধনবান সরদার ব্যক্তি এই নাম অনেকবার পড়িলে ধন-দৌলত ও সরদারী স্থায়ী থাকে এবং শান্তিতে থাকা যায়। এই নাম কাগজে লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া সেই পানি তেজারতী মাল ও দাঁড়ি-পাল্লায় ছিটাইয়া দিলে ব্যবসায়ে উন্নতি ও বরকত হয়, এই পানি নৌকায় মালিশ করিলে কোন প্রকার বিপদে পড়িয়া নৌকা ডুবিয়া নষ্ট হয় না; গৃহপালিত পশুর গায়ে মালিশ করিলে সকল বিপদাপদ হইতে নিরাপদ থাকে; ক্ষেত-খামারে ছিটাইয়া দিলে ভাল ফসল হয় ও কীট-পতঙ্গ হইতে নিরাপদ থাকে।

يَا عَظِيْمُ —ইয়া আযীমু (হে মহান উন্নত!)

এই নাম অনেকবার যিকির করিলে মান-সম্মান বৃদ্ধি হয় ও সকল রোগ হইতে নিরাপদ থাকা যায়।

يَا غَفُوْرُ — ইয়া গাফুরু (হে ক্ষমাশীল!)

এই পাক নাম ৩ বার কাগজে লিখিয়া ধুইয়া পানি খাইলে রোগের উপশম হয় ও ৩ বার লিখিয়া তাবিজ করিয়া গলায় বাঁধিলে জ্বর আরোগ্য হয়।

يَا شَكُوْرُ — ইয়া শাকুরু (হে কৃতজ্ঞতা পছন্দকারী!)

নিরুপায় ব্যক্তি প্রত্যহ ৪১ বার এই নাম পড়িয়া পানি ফুঁক দিয়া ঐ পানি ঘাড়ে ও বুকে মালিশ করিলে অবস্থা সচ্ছল হইবে এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাইবে ও শরীরের বেদনা দূর হইবে।

يَا عَلِيُّ — ইয়া আ'লিইউ (হে উন্নত!)

এই নাম সর্বদা পড়িলে কিংবা লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে সম্মান লাভ হয় ও দরিদ্রতা দূর হয়। প্রবাসী ব্যক্তি এই নাম লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে শীঘ্রই পরিজনের সহিত মিলন হয়। ছেলে-মেয়ের গলায় এই নাম লিখিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বলিষ্ঠ ও সবল হইতে থাকে।

يَا كَبِيْرُ —ইয়া কাবীরু (হে গৌরবান্বিত!)

এই নাম পড়িলে বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই নাম পড়িয়া খাদ্য-দ্রব্যের উপর ফুঁকিয়া স্বামী স্ত্রীতে খাইলে উভয়ের মাঝে প্রগাঢ় প্রণয় স্থাপিত হয়।

يَا حَفِيْظُ — ইয়া হাফীযু (হে রক্ষাকর্তা!)

এই নাম লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে পানিতে ডুবিয়া মরে না, আগুনে পুড়িবে না, বাঘ, ভালুক, জ্বিন, ভূত-প্রেত কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। ছোট ছেলে-মেয়েদের গলায় এই নাম লেখা তাবিজ বাঁধিয়া রাখিলে অনেক ফল পাওয়া যায়। (ইহা বহু পরীক্ষিত)

يَا مُقِيْتُ — ইয়া মুক্বীতু (হে শক্তিদাতা!)

রোযাদার ব্যক্তি এই নাম পড়িয়া মাটিতে বা মাটির উপর ফুঁকিয়া অনবরত শুঁকিতে থাকিলে মনের বল বৃদ্ধি পায়। প্রবাসী অবস্থায় এই নাম ৭ বার পড়িলে, তৎপর মাটির পেয়ালায় এই নাম লিখিয়া ঐ পেয়ালা ধোয়া পানি খাইলে প্রবাসের যাবতীয় ভয় হইতে নিরাপদে থাকা যায়।

يَا جَلِيْلُ — ইয়া জালীলু (হে মহিমান্বিত!)

এই নাম অনেকবার যিকির করিলে বা লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে সম্মান বৃদ্ধি পায়।

يَا كَرِيْمُ — ইয়া কারীমু (হে অনুগ্রহকারী!)

শুইবার সময় এই নাম বহুবার পড়িলে সকলের নিকট সম্মানের পাত্র হওয়া যায়।

يَا رَقِيْبُ — ইয়া রাক্বীবু (হে প্রহরী!)

স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইবার ভয় হইলে এই নাম প্রত্যহ ৭ বার পড়িলে গর্ভপাত নিবারণ হয়। প্রবাসে যাইবার সময় ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত রাখিয়া এই নাম ৭ বার পড়িলে তাহারা নিরাপদে থাকে। কোন বস্তু হারাইয়া গেলে এই নাম অনেকবার পড়িলে ঐ বস্তু চুরি না হইয়া থাকিলে পাওয়া যায়।

يَا مُجِيْبُ — ইয়া মুজীবু (হে প্রার্থনা গ্রহণকারী!)

কোন দোয়া করার পূর্বে এই নাম পড়িয়া লইলে দোয়া সহজে কবুল হয়।

يَا وَاسِعُ — ইয়া ওয়াসিউ (হে বিস্তারকারী!)

এই নাম যিকির করিলে ধনবান ও সমৃদ্ধিশালী হওয়া যায় এবং মনের চিন্তা দূর হয়।

يَا حَكِيْمُ — ইয়া হাকীমু (হে মহাজ্ঞানী!)

এই নাম মধ্য রাত্রে পড়িলে আল্লাহ তায়ালা গোপনীয় বিষয় অপ্রকাশ্য রাখিবেন এবং এলেম বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

يَا وَدُوْدُ — ইয়া ওয়াদুদু (হে শ্রেষ্ঠ বন্ধু!)

এই পাক নাম ১০০১ বার পড়িয়া খাদ্য-দ্রব্যের উপর ফুঁকিয়া স্বামী-স্ত্রীতে খাইলে অবাধ্য স্ত্রী স্বামীর প্রেমে মত্ত হয় ও অত্যন্ত তাবেদার হয়।

يَا مَجِيْدُ — ইয়া মাজীদু (হে মহিমান্বিত!)

ধবল-কুষ্ঠ রোগী প্রত্যেক চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখিয়া ইফতারের সময় এই নাম বহুবার যিকির করিলে ইন্‌শাআল্লাহ তায়ালা ঐ রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবে।

يَا بَاعِثُ — ইয়া বায়িসু [হে পুনরুত্থানকারী! (কিয়ামতের দিন)]

শয়নকালে বুকের উপর হাত রাখিয়া এই নাম ১০০০ বার পড়িলে এলেম ও হিকমতের শক্তি বৃদ্ধি হয়।

يَا شَهِيْدُ — ইয়া শাহীদু [হে সাক্ষী! (প্রত্যেক কার্যের)]

প্রাতে অবাধ্য স্ত্রী-পুত্রের কপাল ধরিয়া এই নাম ২১ বার পড়িয়া আকাশের দিকে চাহিলে তাহারা বাধ্য ও অনুগত হয় কিংবা ১০০০ বার পড়িয়া তাহাদের উপর ফুঁক দিলে তাহারা বাধ্য হয়।

يَا حَقُّ — ইয়া হাক্কু (হে সত্য স্বরূপ!)

কাগজের চারি কোণে এই নাম লিখিয়া ঐ কাগজ হাতের তালুর উপর রাখিয়া শেষ রাত্রে আকাশের দিকে হাত লম্বা করিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে বিপদ দূর হয়। কোন বস্তু হারাইয়া গেলে কাগজের চারি কোণে লিখিয়া নামগুলির নীচে হারানো জিনিসের নাম লিখিয়া ঐরূপভাবে ধরিলে তাহা পাওয়া যায়।

يَا وَكِيْلُ — ইয়া ওয়াকীলু (হে কার্যকারক!)

নাবিকগণ সর্বদা এই নাম পড়িলে ঝড়-তুফান হইতে নিরাপদ থাকে এবং প্রত্যেক বাসনা পূর্ণ হয়।

يَا قَوِىُّ — ইয়া ক্বাবীইউ (হে শক্তিশালী!)

কোন ব্যক্তির শত্রুর ভয় হইলে ১০০১টি আটার গুলি তৈয়ার করিয়া

يَا وَلِىُّ — ইয়া ওয়ালিইউ (হে বন্ধু, সাহায্যকারী!)

এই পাক নাম সর্বদা অনেকবার পড়িলে সকলে তাহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিবে। কঠিন বিপদের সময় শুক্রবার রাত্রে ১০০০ বার পড়িলে বিপদ দূর হইবে। যিনাকার ব্যক্তি প্রথমে ও শেষে দুরূদ শরীফ পড়িয়া এই নাম পড়িলে ঐ স্বভাব দূর হইবে।

يَا حَمِيْدُ — ইয়া হামীদু (হে প্রশংসিত!)

বহুবার এই নাম পড়িলে চরিত্র ও আচার ব্যবহার উন্নত হয়।

يَا مُحْصِىُ — ইয়া মোহ্সিইউ (হে সর্বজ্ঞানী!)

আল্লাহ্‌র এবাদতে অলসতা আসিলে শুইবার সময় বুকের উপর হাত রাখিয়া ৭ বার এই নাম পড়িয়া শুইলে অলসতা দূর হয়। জুম্‌য়ার রাত্রে ১০০০ বার পড়িলে কিয়ামতের দিন আযাব হইতে রক্ষা পাইবে ও হিসাব-নিকাশ সহজ হইবে। এই নাম ২০ বার পড়িয়া ২০টি রুটীর টুকরার উপর ফুঁকিয়া খাইলে মানুষ বাধ্য ও বশীভূত হইবে।

يَا مُبْدِئُ — ইয়া মুবদিইউ (হে প্রথম সৃজনকারী!)

ফিরিয়া আসিবে কিংবা খবর পাওয়া যাইবে।

يَا مُحْيِ — ইয়া মুহ্য়ী (হে জীবনদাতা!)

মনের মধ্যে আযাবের ভয় হইলে ৭ দিন পর্যন্ত এই নাম পড়িয়া শরীরে ফুঁক দিবে, মন নিজের বশে আসিবে ও আল্লাহ্‌র পথে চালিত হইবে। কেহ দূরে চলিয়া যাইবার আশঙ্কা হইলে অথবা কাহারও জেল হইবার ভয় হইলে এই নাম পড়িতে থাকিবে। খোদার ফজলে সে আশঙ্কা দূর হইবে।

يَا مُمِيْتُ — ইয়া মুমীতু (হে মৃত্যুদাতা!)

মনের মধ্যে ভয় উপস্থিত হইলে ৭ দিন পর্যন্ত শুইবার সময় কাঁধের উপর হাত রাখিয়া ৭ বার এই নাম পড়িলে ভয় দূর হয়। সর্বদা এই নাম পড়িলে বাহুল্য ব্যয়ের অভ্যাস দূর হয় ও আল্লাহ্‌র এবাদতে মন আকৃষ্ট হয়।

يَا حَيُّ — ইয়া হাইউ (হে চিরজীবন্ত!)

এই নাম পড়িয়া রোগীর উপর ফুঁক দিলে অথবা পানির উপর ফুঁকিয়া পানি খাওয়াইলে রোগ আরোগ্য হয়। ফেরেশ্‌তাগণ সর্বদা এই নাম যিকির করিয়া থাকেন এবং ইহার বরকতে তাঁহাদের আহার-নিদ্রার প্রয়োজন হয় না। সর্বদা এই নামের যিকির করিলে সকল প্রকার রোগ হইতে বাঁচিয়া থাকা যায়।

يَا قَيُّوْمُ — ইয়া ক্বাইয়্যুমু (হে চিরস্থায়ী!)

প্রত্যহ সকাল বেলা এই নাম পড়িলে অতি নিদ্রা দূর হইবে।

يَا وَاجِدُ — ইয়া ওয়াজিদু (হে সর্ববিষয় ইচ্ছা করা মাত্র হওয়ার অধিকারী!)

খাইবার সময় প্রথম লোকমায় এই নাম পড়িলে মনের বল বৃদ্ধি পায়।

يَا مَاجِدُ — ইয়া মাজিদু (হে গৌরবময়!)

এই নাম সর্বদা পড়িলে হৃদয়ে আল্লাহ্‌র নূর প্রকাশিত হয়।

يَا وَاحِدُ — ইয়া ওয়াহিদু (হে অদ্বিতীয়!)

এই নাম ১০০০ বার পড়িলে মন হইতে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের মায়া দূর হয়। একাকী চলিবার সময় মনে ভয় হইলে পুনঃ পুনঃ এই নাম পাঠ দ্বারা মনে সাহসের উদয় হয়।

يَا اَحَدُ — ইয়া আহাদু (হে একমাত্র আল্লাহ!)

একাকী অবস্থায় এই নাম এক হাযার বার পড়িলে মনের ভয় দূর হয়।

يَا صَمَدُ — ইয়া সামাদু (হে অপ্রত্যাশী ও অভাবহীন!)

অর্ধেক রাত্রে কিংবা প্রাতে এই নাম ১১১ বার পড়িলে সত্যবাদী ও ঈমানদার হওয়া যায়। শেষ রাত্রে ১০০০ বার পড়িলে ক্ষুধার কষ্ট দূর হয়।

يَا قَادِرُ — ইয়া ক্বাদিরু (হে সর্বশক্তিমান!)

শত্রুকে পরাস্ত করিবার জন্য এই নাম অত্যন্ত কার্যকরী। শত্রুকে দমন করিবার জন্য অযু করিবার সময় প্রত্যেক অঙ্গ ধুইতে এই নাম পড়িলে ইন্‌শাআল্লাহ শত্রু দমন হইবে। দুই রাকাত নফল নামায পড়িয়া এই নাম ১০০ বার পড়িলে ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

يَا مُقْتَدِرُ — ইয়া মুক্তাদিরু (হে শক্তির আধার!)

নিদ্রা হইতে উঠিয়া চক্ষু বুজিয়া এই নাম কয়েকবার পড়িলে ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও আল্লাহ তায়ালা উদ্দেশ্য সাধনের পথ অবলম্বন করাইয়া দেন।

يَا مُقَدِّمُ — ইয়া মুক্বাদ্দিমু (হে অগ্রসরকারী!)

যুদ্ধে কিংবা কোন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বে এই নাম পড়িলে সাহস ও বল-বিক্রম বৃদ্ধি পায়।

يَا مُؤَخِّرُ — ইয়া মুয়াখ্‌খিরু (হে পশ্চাদ্বর্তীকারী।)

এই নাম প্রত্যহ ১০০০ বার পড়িলে আল্লাহ্‌র স্মরণ ব্যতীত অন্য কিছু মনের মধ্যে থাকিবে না ও মন্দ কার্য হইতে বিরত থাকিবে।

يَا اَوَّلُ — ইয়া আউয়্যালু (হে আদি!)

প্রবাস অবস্থায় প্রত্যেক জুময়ার রাত্রে এই নাম ১০০০ বার পড়িলে শীঘ্রই ফিরিতে পারা যায়।

يَا اٰخِرُ —ইয়া আখিরু (হে অনন্ত!)

যে ব্যক্তির আয়ু শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়, অথচ তাহার জীবনে কোন সৎ কাজ করে নাই, তাহার পক্ষে এই নাম ১০০০ বার পড়া উচিত। এই আমল দ্বারা পরকালের পথ পরিষ্কার হয়। প্রত্যহ ১০০০ বার বার পড়িলে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন খেয়াল থাকিবে না, কিন্তু প্রথমে দৃঢ় চিত্তে তওবা করিয়া লইতে হইবে।

يَا ظَاهِرُ — ইয়া জাহিরু [হে প্রকাশ্য! (অনন্ত কুদরতের ভিতর দিয়া)]

এশার নামাযের পর ১০০০ বার এই নাম পড়িলে মনের মধ্যে আল্লাহ্‌র নূর প্রকাশিত হইবে ও মনের বাসনা পূর্ণ হইবে।

يَا بَاطِنُ — ইয়া বাতিনু [হে অপ্রকাশ্য! (চর্মচক্ষুর অন্তরালে)]

প্রত্যহ এই নাম ১০৩০ বার পড়িলে আল্লাহ্‌ তায়ালার কুদরতের রহস্য এবং মানব জীবনের গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইবে।

يَا وَالِىُ — ইয়া ওয়ালীউ (হে বন্ধু!)

এই নাম পড়িলে বজ্রপাত হইতে নিরাপদ থাকিবে। ঝড়-তুফানের ভয় হইলে এই নাম কাগজে লিখিয়া পানিপূর্ণ কলসীর মধ্যে ডুবাইয়া ঐ পানি ঘরের কোণে ও দেওয়ালে ছিটাইয়া দিলে ভয় দূর হয়।

يَا مُتَعَالِى — ইয়া মুতাআলী (হে সর্ব প্রধান, মহাউন্নত!)

স্ত্রীলোকের ঋতুর কষ্ট হইলে এই নাম পড়িতে থাকিলে তাহা দূর হয়। এই নাম সর্বদা পড়িলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়।

يَا بَرُّ — ইয়া বার্‌রু (হে শান্তি ও মঙ্গলদাতা!)

শিশু বালক-বালিকার উপর এই নাম ৭ বার পড়িয়া ফুঁকিলে তাহারা নিরাপদ থাকিবে ও নেকবখ্‌ত হইবে। যাহার সন্তান অকালে মরিয়া যায়, তাহার সন্তানের উপর এই নাম ৭ বার পড়িয়া ফুঁকিবে ও আল্লাহ্‌র দয়ার উপর সমর্পণ করিবে।

يَا تَوَّابُ — ইয়া তাওয়াবু (হে ক্ষমা-প্রার্থনা মঞ্জুরকারী!)

চাশ্‌ত নামাযের পর এই নাম ৩৬০ বার পড়িলে তাওবা করিবার ক্ষমতা লাভ করা যায়। অত্যাচারী যালেমকে লক্ষ্য করিয়া ১০ বার পড়িলে তাহার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

يَا مُنْعِمُ — ইয়া মুনয়েমু (হে নেয়ামতদাতা, সম্পদদাতা!)

এই নাম সর্বদা পড়িলে সুখে থাকা যায় ও ধন লাভ হয়।

يَا مُنْتَقِمُ — ইয়া মুন্তাক্বিমু (হে প্রতিফলদাতা!)

শত্রুর শত্রুতা অসহ্য হইলে জুময়ার রাত্রে এই নাম অধিক সংখ্যায় পড়িবে। ইন্‌শাআল্লাহ তিন রাত্রি গত না হইতেই শত্রু বাধ্য হইয়া যাইবে; সর্বদা এই নামের যিকির করিলে শত্রুতার প্রতিশোধ লওয়া যায়।

يَا عَفُوُّ — ইয়া আফুব্বু (হে ক্ষমাকারী!)

গোনাহগার ব্যক্তি নিরাশ হইয়া পড়িলে সর্বদা এই নামের যিকির দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া যায়।

يَا رَءُوْفُ — ইয়া রাউফু (হে অত্যন্ত কৃপাশীল, আন্তরিক বন্ধু!)

নিজের কিংবা অন্যের ক্রোধ উপস্থিত হইলে এই নাম ১০ বার ও দরূদ শরীফ ১০ বার পড়িলে ক্রোধ থামিয়া যায়।

يَا مَالِكَ الْمُلْكِ — ইয়া মালিকাল মুলকে (হে জগতপতি!)

দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া এই নাম যিকির করিলে ধনবান হওয়া যায় ও অবস্থা সচ্ছল হয়।

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ —ইয়া যালজালালি ওয়াল ইক্‌রাম

(হে সর্বমহত্ত্ব ও গৌরবের অধিকারী)

এই নাম যিকির করিলে মান-সম্মান লাভ হয়। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে এই নাম যিকির করা আবশ্যক। এই নামটি 'ইসমে আযম' বলিয়া অনেকের ধারণা।

يَا رَبّ — ইয়া রাব্বু (হে প্রতিপালক!)

সর্বদা এই নামের যিকির করিলে রিযিকের জন্য কোন চিন্তা থাকে না।

يَا مُقْسِطُ — ইয়া মুক্বসিতু (হে ন্যায়পরায়ণ!)

সর্বদা এই নামের যিকির করিলে এবাদতে কোন সন্দেহ থাকে না।

يَا جَامِعُ—ইয়া জামিউ [হে একত্রকারী! (কিয়ামতের দিন)]

এই নাম যিকির করিলে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সহিত সখ্যভাবে থাকা যায়। কাহারও কিছু হারাইয়া গেলে এই নামের যিকির দ্বারা তাহা ফেরত অথবা সন্ধান পাওয়া যায়।

يَا غَنِيّ — ইয়া গানিইউ (হে সম্পদশালী, ভ্রূক্ষেপহীন)

বিপদকালে এই নাম যিকির করিলে বিপদমুক্ত হওয়া যায়।

يَا مُغْنِي —ইয়া মুগনিইউ (হে অভাব মোচনকারী।)

এই নাম এক হাজার বার পড়িলে দারিদ্র্য দূর হয়। স্ত্রীসহবাসের সময় এই নাম পড়িলে স্ত্রীর অকৃত্রিম ভালবাসা পাওয়া যায়। 'বাকিয়াতুস্ সালেহাত' নামক কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে — যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাত্রে এই নাম ১৩৬ বার পড়িবে (কিন্তু প্রথম ও শেষে দরূদ শরীফ পড়িয়া লইতে হইবে), আল্লাহ্ তায়ালা তাহার অবস্থা সচ্ছল করিবেন, সে কখনও অভাবে পড়িবে না, তাহার ঋণ থাকিলে পরিশোধ হইয়া যাইবে।

يَا مُعْطِي — ইয়া মু'তিইউ (হে দাতা।)

যাহার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, সে সকালে ও বৈকালে এই নামের যিকির করিলে বিশেষ ফল লাভ করে।

يَا مَانِعُ— ইয়া মানিউ (হে নিষেধকারী, নিবারক!)

উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই নামের যিকির বিশেষ ফলপ্রদ।

يَا ضَارّ —ইয়া যা'ররু (হে বিপদদাতা!)

শুক্রবার রাত্রে এই নাম ১০০ বার পড়িলে সর্বপ্রকার বিপদ ও কষ্ট দূর হইয়া যায়।

يَا نَافِعُ —ইয়া নাফিউ (হে সুফলদাতা!)

কোন বস্তু দ্বারা কিছু লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহা ধারণা করিয়া এই নাম মনে মনে পড়িলে সিদ্ধি লাভ হয়।

يَا نُوْرُ —ইয়া নূরু (হে জ্যোতিঃ!)

এই নামের যিকির দ্বারা অন্তঃকরণ নূরানী হয়।

يَا هَادِيُ —ইয়া হাদিউ (হে সৎপথ প্রদর্শক!)

এই নামের যিকির দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি হইতে মুক্ত থাকা যায়। জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি ও দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পায়। হাকিম, ডাক্তার, মুন্সেফ, উকিল, মোক্তার ও ব্যবসায়ীগণের এই নাম যিকির করা আবশ্যক।

يَا بَدِيْعُ—ইয়া বাদিউ [হে সর্বপ্রথম সৃষ্টিকর্তা! (বিনা অনুকরণে)]

উদ্দেশ্য সাধিনের জন্য ও দুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্য এই নাম ১০০০ বার পড়িবে।

يَا بَاقِيُ — ইয়া বাক্বিউ (হে অনন্ত ! সর্বদা বিরাজমান!)

দুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্য এই নাম ১০০০ বার পড়িবে।

يَا وَارِثُ — ইয়া ওয়ারিসু (হে স্বত্বাধিকারী!)

মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যে এই নাম এক হাজার বার পড়িলে ভয় ও কষ্ট দূর হইয়া যায়।

يَا رَشِيْدُ — ইয়া রাশীদু (হে সৎপথ প্রদর্শক!)

এশার নামায বাদ এই নাম ১০০০ বার পড়িলে সকল আমল কবুল হয়।

يَا صَبُوْرُ — ইয়া সাবুরু (হে ধৈর্যশীল!)

সূর্যোদয়ের পূর্বে এই নাম ১০০০ বার পড়িলে দুঃখ-কষ্ট দূর হয়।

يَاصَادِقُ — ইয়া সাদিকু (হে সত্যবাদী!)

এই নামের যিকির করিলে ঈমান বৃদ্ধি পায়।

يَاسَتَّارُ — ইয়া সাত্তারু (হে দোষ গোপনকারী!)

দৈনিক ১০০ বার এই যিকির করিলে সসম্মানে থাকা যায়।

যুক্ত নামসমূহের ফযীলত

[১]

هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمِ — হুয়ার রাহ্‌মানুর রাহীম,

অর্থ ঃ— তিনিই (আল্লাহ)-পরম করুণাময়, দয়াবান।

এই পবিত্র নামের একটি ফযীলত এই যে, প্রত্যহ ইহা ১০০ বার পড়িলে লোক পাঠকের প্রতি দয়ালু ও বাধ্য হয়।

[২]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ - يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ - يَا حَلِيْمُ - يَاقَدِيْمُ - يَادَائِمُ - يَافَرْدُ - يَاوِتْرُ - يَااَحَدُ - يَاصَمَدُ - يَاوَدُوْدُ - يَاذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ○

উচ্চারণ ঃ— বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম, ইয়া হাইয়্যু, ইয়া ক্বাইয়্যুমু, ইয়া হালীমু, ইয়া ক্বাদীমু, ইয়া দায়েমু, ইয়া ফারদু, ইয়া বিতরু, ইয়া আহাদু, ইয়া সামাদু, ইয়া ওয়াদুদু, ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকরাম।

অর্থ ঃ— করুণাময় কৃপাশীল আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করিতেছি), আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কোনই শক্তি-সামর্থ্য নাই। হে চিরজীবী! হে চিরস্থায়ী! হে ধৈর্যশীল ! হে আদি! হে অটুট! হে অদ্বিতীয়! হে অংশহীন ! হে একক! হে অন্যের সাহায্যের অপ্রত্যাশী। হে বন্ধু! হে প্রতাপশালী ও গৌরবময়!

ফযীলত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র নিকট কোন বাসনা পূরণের জন্য প্রত্যহ ফজরের নামাযান্তে কাহারও সহিত কোন কথাবার্তা না বলিয়া এই দোয়া পড়িলে ইন্‌শাআল্লাহু তায়ালা তাহা পূর্ণ হইবে। শেখ আবুল আব্বাস মারসি (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, এই দোয়ার মধ্যে 'ইসমে আযম' গুপ্তভাবে রহিয়াছে।

[৩]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ لَاتَكِلْنَا اِلٰى اَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّاَصْلِحْ شَاْنَنَا كُلَّهٗ بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ.

অর্থ ঃ— পরম করুণাময়, দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করিতেছি)। হে চিরজীবী হে চিরস্থায়ী আল্লাহ! আমি তোমার অকৃত্রিম করুণাযোগে প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমার শক্তির বাহিরে বিন্দুমাত্র কাজের ভারও অর্পণ করিও না এবং লা ইলাহা ইল্লা আন্তা (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই) এই পবিত্র নামের বরকতে আমার সকল অবস্থায় মঙ্গল কর।

ফযীলত

হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) আসহাবগণকে বলিয়াছেন যে, তোমরা প্রত্যহ সকালে এই দোয়া পড়িবে, ইহার বরকতে দীন-দুনিয়ার বাসনা পূর্ণ হইবে ও অমঙ্গল হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

[৪]

اسم اعظم — ইসমে আযম

"ইস্‌মে আযম" সম্বন্ধে আলেমগণের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। বুযর্গানে দ্বীন যিনি যে নামের বরকতে মুক্তি বা সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছেন, সেই নামকেই তিনি ইস্‌মে আযম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; ইহাই মতভেদের কারণ। ইমাম আযম (রহঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহ" এই নামই ইস্‌মে আযম। এরশাদুত তালেবীন কিতাবে লিখিত আছে,

হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের সময় "আল্লাহ" নামটি ১০০ বার যিকির করিয়া নিম্নোক্ত ৬টি নাম একবার করিয়া পড়িবে, সে ব্যক্তি গোনাহ হইতে এমনভাবে মুক্ত হইবে যেন সে এইমাত্র মাতৃগর্ভ হইতে জন্মলাভ করিল। তাহার আমলনামা পরিষ্কার থাকিবে এবং সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বেহেশ্‌তে দাখিল হইবে।

৬টি নাম

১। جَلَّ جَلَالُهُ — জাল্লা জালালুহু — আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব সর্বোপরি।

২। وَعَمَّ نَوَالُهُ — ওয়া আম্মা নাওয়ালুহু — আল্লাহ্‌র দানই সীমাহীন।

৩। وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ — ওয়া জাল্লা সানাউহু — তাঁহারই প্রশংসা সর্বোপরি।

৪। وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ — ওয়া তাক্বাদ্দাসাত আস্‌মাউহু — তাঁহার নাম সমূহই পবিত্র।

৫। وَأَعْظَمَ شَانُهُ — ওয়া আ'যামা শানুহু — তাঁহার গৌরবই সর্বোচ্চ।

৬। وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ — ওয়া লা ইলাহা গাইরুহু — তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই।

আল্লাহ্‌র গুণ ও শক্তি ঃ— আল্লাহ্‌র এক একটি গুণবাচক নাম তাঁহার এক একটি গুণ ও শক্তির প্রতীক বা লক্ষণ। প্রত্যেক জীবের এমন কতকগুলি বস্তুর প্রয়োজন, যাহা ব্যতীত সে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। বায়ু, আলো, সূর্যের তাপ প্রভৃতি এই শ্রেণীর বস্তু; কিন্তু এইগুলি জীবনের জন্য অপরিহার্য হইলেও কোন জীবই নিজের চেষ্টা বা কর্ম দ্বারা ইহা উৎপন্ন করিতে পারে না, এইগুলিকে প্রকৃতির দান বলে। এই দান বিনা চেষ্টায় সকলেরই লব্ধ, এইগুলিকে জীবনের মূলধন বলা যাইতে পারে। আল্লাহ পাক যে প্রকৃতি বা স্বভাব দ্বারা এই মূলধন সরবরাহ করেন, সেই প্রকৃতির নামই রহমান (দয়াময়)। সুতরাং শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তাহার মাতৃস্তন্যের প্রয়োজন। কিন্তু শিশু চেষ্টা দ্বারা সেই প্রয়োজন মিটাইতে পারে না, এইজন্য শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির দানস্বরূপ সে তাহার মাতৃস্তন্য পাইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দরূদ শরীফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের ২২ পারায় সূরা আহ্‌যাবের ৫৬ আয়াতে ফরমাইয়াছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

উচ্চারণঃ ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়িকাতাহু ইউসাল্লূনা আলান্নাবিয়্যি ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানূ সাল্লূ আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাস্‌লীমা।

অর্থাৎ— "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণ সকলে হযরত রসূল (সাঃ) এর প্রতি দরূদ পড়িয়া থাকেন। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরাও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে আশীর্বাদ ও সালাম (দঃ) প্রেরণ কর।" এই আয়াতটির প্রধান গুণ এই যে, ইহা পড়িয়া শুইলে সুনিদ্রা হয়। কারণ, ইহাতে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর শান্তি নাযিল হওয়ার কথা রহিয়াছে। এই আয়াত শরীফে আল্লাহ বলিতেছেন যে, তিনি নিজে ও তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণ হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি সালাম (দঃ) প্রেরণ করিয়া থাকেন। আল্লাহ স্বয়ং যে কাজ করিয়া থাকেন এবং যাহা করিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন উহার চেয়ে উত্তম কাজ আর কি হইতে পারে?

হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁহার আসহাবগণের প্রতি রহমত (খোদার অনুগ্রহ, শান্তি) নাযিল হওয়ার প্রার্থনা করার নাম দরূদ শরীফ। পবিত্র কোর্‌আনে, হাদীস শরীফে ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহে দরূদ শরীফের ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। বুযর্গ ব্যক্তিগণ যে সকল অযীফা পড়িয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশ দরূদ শরীফে পূর্ণ। পাক কোর্‌আনের বিশেষ সূরা বা আয়াতের সহিত দরূদ শরীফ যোগ করিয়া অযীফা পড়া হইয়া থাকে। দরূদ শরীফ ইবাদতের একটি প্রধান অঙ্গ। দরূদ শরীফ যোগে ইবাদত না করিলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। প্রত্যেক মুনাজাত ও দোয়ার পূর্বে দরূদ শরীফ পড়িয়া লওয়া উচিত। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শাফায়াত পাইতে হইলে সর্বদা দরূদ শরীফ পড়া আবশ্যক। দরূদ শরীফ অনেক প্রকারের ও প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন শক্তি এবং ফযীলত আছে। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, দরূদ শরীফ পড়া মাত্র উহা হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট পৌঁছাইবার নিমিত্ত আল্লাহ তায়ালা একজন ফেরেশ্‌তা পাঠাইয়া দেন। ফেরেশ্‌তা হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া আরয করেন যে, অমুকের পুত্র অমুক ব্যক্তি আপনার প্রতি এই দরূদ শরীফ প্রেরণ করিয়াছেন। হযরত (সাঃ) ইহা শুনামাত্র দরূদ শরীফের উত্তরস্বরূপ পাঠকারীর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করিয়া থাকেন। তৎপর ঐ ফেরেশ্‌তা আরশের নিকট উপস্থিত হন এবং বলেন যে, অমুক ব্যক্তি আপনার রসূলের উপর দরূদ পাঠ করিয়াছেন। তখন আল্লাহ বলেন যে, ঐ ব্যক্তির জন্য আমার পক্ষ হইতে ১০টি নেকী পাঠাইয়া দাও এবং তাহার ১০টি গোনাহ মাফ করিয়া দাও। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুময়ার দিন আমার উপর ৪০ বার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার ৪০ বৎসরের গোনাহ মাফ করিয়া দিয়া থাকেন (ফাযায়েলে দরূদ)। বাংলা ও ইংরেজী ভাষাবিদ বাংলাদেশে অনেকেই দরূদ শরীফ পড়িয়া থাকেন, কিন্তু দরূদ শরীফের অর্থ ও ফযীলত তাহাদের অনেকেই অবগত নহেন। বাংলাভাষায় আজ পর্যন্ত দরূদ শরীফের সঠিক বর্ণনা প্রকাশিত না হওয়াই ইহার কারণ, সে অভাব লক্ষ্য করিয়া এই কিতাবে কয়েকটি দরূদ শরীফের বিস্তারিত বর্ণনা ও ফযীলতের কারণ দেওয়া হইয়াছে।

ফযীলতের বর্ণনা

১। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সৃষ্টি না করিলে আল্লাহ তায়ালা আঠার হাজার আলমই সৃষ্টি করিতেন না। তিনি আল্লাহ তায়ালার অতি প্রিয় বন্ধু।

অতএব আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে তাঁহার অতি প্রিয় বন্ধু হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর রহমতের জন্য দোয়া অত্যাবশ্যক।

২। আমরা সাধারণতঃ আল্লাহ্‌র নিকট যে দোয়া বা প্রার্থনা করিয়া থাকি, তাহা হয়ত আমাদের কর্মফলের দোষে আল্লাহ্‌র দরগাহে পৌঁছিতে না-ও পারে কিংবা কবুল না-ও হইতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বন্ধু হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর রহম নাযিল হওয়ার দোয়া নিশ্চয়ই তাঁহার নিকটে সাদরে গৃহীত হয়; সেই জন্যই দরূদ শরীফযোগে কোন দোয়া বা প্রার্থনা করিলে তাহা নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দরগাহে পৌঁছিয়া থাকে ও বিবেচিত হয়। আদালতের কাচারীতে কোর্টফি যুক্ত দরখাস্ত দাখিল করিলে যেরূপ তাহা বিবেচিত না হইয়া পারে না, সেইরূপ দরূদ শরীফযোগে কোন দোয়া বা প্রার্থনা করিলে তাহা বিবেচিত না হইয়া পারে না। ফলে দরূদ শরীফের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকারীর দোয়াও কবুল হইয়া যায়।

৩। পাক কোর্‌আনের সূরা তাওবার শেষভাগে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ ۝

অর্থ ঃ— "নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট একজন রসূল আসিয়াছেন। তিনি তোমাদের জন্য স্নেহশীল ও দয়াময় এবং তোমরা বিপদে পতিত হও তিনি ইহা সহ্য করিতে পারেন না।"

এই আয়াত হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বদা আমাদের মঙ্গল কামনা করেন। তিনি আমাদের দরদী বন্ধু। আমাদের এমন পরম হিতৈষী অভিভাবকের প্রতি রহমতের প্রার্থনা না করিলে তাঁহার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। তিনি আমাদের এরূপ দোয়ার জন্য অভাবগ্রস্ত নহেন, কিন্তু আমাদেরই মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পড়িতে হয়। দরূদ শরীফ পাঠ করিলে তাঁহার করুণা-দৃষ্টি পাঠকারীর উপর পতিত হয় ও তাঁহার দোয়ার বরকতে পাঠকারীর ইহ-পরকালের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। আমাদের হযরত (সাঃ) যে কেবল পরকালে আমাদের জন্য শাফায়াত করিবেন তাহা নহে, তিনি আমাদের সাংসারিক জীবনেও দোয়া করিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন।

দরূদ শরীফ পাঠ করার প্রধান ফযীলত এই যে, সর্বদা দরূদ শরীফ পড়িলে সাংসারিক কাজ সহজসাধ্য হয়, পাঠকারী উন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং ইহাতে হযরত (সাঃ) এর শাফায়াত লাভ হওয়ার উপায় হয়।

[১]

دروود تاج — দরূদে তাজ

বিখ্যাত দরূদ শরীফ "দরূদে তাজ" নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহাতে হযরত রসূল (সাঃ) এর কয়েকটি বিশেষ সিফাত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার ফযীলত অত্যন্ত বেশী। ইহার সম্পূর্ণ ফযীলত বর্ণনা করা অসম্ভব। এই কিতাবে মাত্র কয়েকটি ফযীলতের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

ফযীলত

কেহ স্বপ্নে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর যিয়ারত কামনা করিলে জুমুয়ার রাত্রে এশার নামাযান্তে শরীরে সুগন্ধি দ্রব্য মাখিয়া পাক-সাফ কাপড় পরিধান পূর্বক ১৮০ বার এই দরূদ শরীফ পড়িয়া শুইয়া থাকিবে। ১১ দিন এই আমল করিলে ইনশাআল্লাহ মনের বাসনা পূর্ণ হইবে। মনের পবিত্রতা লাভের জন্য প্রত্যেক ফজরের নামাযের পর ৭ বার, আসরের নামাযের পর ৩ বার ও এশার নামাযের পর ৩ বার পড়িতে হয়। বসন্ত, কলেরা, জ্বিন-পরী, ভূত-প্রেত হইতে নিরাপদে থাকার জন্য ১১ বার পড়িয়া শরীরে ফুঁকিবে। অত্যধিক রুযী পাইতে হইলে প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর ৭ বার পড়িবে। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের সন্তান হওয়ার জন্য ২১টি শুকনা খুরমা লইয়া ৭ বার করিয়া প্রত্যেকটির উপর ফুঁকিবে; এইরূপে ২১টি খুরমা পড়িয়া প্রত্যহ একটি করিয়া ২১ দিন পর্যন্ত ঐ খুরমা উক্ত স্ত্রীলোকটিকে খাইতে দিবে। খোদার ফজলে সন্তান হইবে। দৃঢ় বিশ্বাসে এই দরূদ শরীফ সর্বদা পড়িলে মনের বাসনা পূর্ণ হয়। অনেক বুযর্গান ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ পড়িয়া থাকেন। ইহা পদ্য ও গদ্যময় ছন্দে গঠিত; সুতরাং বেশ সুন্দর শুনা যায়।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ
التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمْ - دَافِعِ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ

وَالْمَرَضِ وَالْاَلَمْ - اِسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ مَّرْفُوْعٌ مَّنْقُوْشٌ فِي اللَّوْحِ
وَالْقَلَمِ - سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ - جِسْمُهٗ مُقَدَّسٌ مُعَطَّرٌ مُطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ
فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ - شَمْسِ الضُّحٰى بَدْرِ الدُّجٰى صَدْرِ الْعُلٰى
نُوْرِ الْهُدٰى كَهْفِ الْوَرٰى مِصْبَاحِ الظُّلَمِ - جَمِيْلِ الشِّيَمِ شَفِيْعِ الْاُمَمِ
صَاحِبِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ - وَاللهُ عَاصِمُهٗ وَجِبْرَائِيْلُ خَادِمُهٗ وَالْبُرَاقُ
مَرْكَبُهٗ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهٗ وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى مَقَامُهٗ - وَقَابَ قَوْسَيْنِ
مَطْلُوْبُهٗ وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهٗ وَالْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهٗ - سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ اَنِيْسِ الْغَرِيْبِيْنَ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -
رَاحَتِ الْعَاشِقِيْنَ مُرَادِ الْمُشْتَاقِيْنَ شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ سِرَاجِ
السَّالِكِيْنَ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ مُحِبِّ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ
سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ وَسِيْلَتِنَا فِي
الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ -
جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ اَبِي الْقَاسِمِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ نُوْرٍ مِّنْ نُّوْرِ اللهِ - يَا اَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِهٖ
صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

বাংলা উচ্চারণ ঃ— আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মোহাম্মাদিওঁ অ-আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাহিবিত্তাজে ওয়াল মি'রাজে ওয়াল বুরাক্বি ওয়াল আ'লাম। দাফিইল বালায়ি ওয়াল ওবায়ি ওয়াল ক্বাহতি ওয়াল মারযি ওয়াল আলাম। ইসমুহু মাকতুবুম মারফুউম মানক্বুশুন ফিল্লাওহি ওয়াল ক্বালাম। সাইয়্যিদিল আরাবি ওয়াল আজাম। জিসমুহু মুক্বাদ্দাসুম মুয়াত্তারুম্ মুতাহ্হারুম্ মুনাওঁওয়ারুন ফিল বাইতি ওয়াল হারাম। শামসিদ্দুযোহা বাদরিদ্দোজা, সাদরিল উলা, নুরিল হুদা ক্বাহ্ফিল ওয়ারা, মিসবাহিয্ যোলাম। জামিলিশ্ শিয়ামি, শাফীয়িল উমামি সাহিবিল জুদি ওয়াল কারাম; ওয়াল্লাহু আসিমুহু ওয়া জিবরাঈলু খাদিমুহু ওয়াল বুরাক্ব মারকাবুহু ওয়াল মি'রাজু সাফারুহু ওয়া সিদরাতুল মুন্তাহা মাক্বামুহু ওয়া ক্বাবা ক্বাওসাইনি মাতলুবুহু ওয়াল মাতলুবু মাক্বসুদুহু ওয়াল মাক্বসুদু মাওজুদুহু। সাইয়্যিদিল মুরছালীনা খাতিমিন্নাবিয়্যীনা শাফীয়িল মুযনিবীনা আনীসিল গারীবীনা রাহ্মাতাল্লিল আলামীন রাহাতিল আশিক্বীনা মুরাদিল মুশ্তাক্বীনা। শাম্সিল আরেফীনা সিরাজিস্ সালিক্বীনা মিসবাহিল মুক্বাররাবীনা মুহিব্বিল ফুক্বারায়ে ওয়াল মাসাকীন। সাইয়্যিদিস্ সাক্বালাইনি, নাবিয়্যিল হারামাইনি ইমামিল ক্বিবলাতাইনি অসীলাতানা ফিদ্দারাইনি সাহিবি ক্বাবা ক্বাওসাইনি মাহবুবি রাব্বিল মাশ্‌রিক্বাইনি ওয়াল মাগরিবাইনি জাদ্দিল হাসানি ওয়াল হুসাইন। মাওলানা ওয়া মাওলাস্ সাক্বালাইনি আবিল ক্বাসিমি মুহাম্মাদিব্‌নি আবদিল্লাহি নূরিম্ মিন নূরিল্লাহ্। ইয়া আইয়্যুহাল মুশতাক্বুনা বিনুরী জামালিহী সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলীমা।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! আমাদের ধর্মনেতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর তোমার রহমত (অনুগ্রহ) অবতীর্ণ কর। যিনি ইসলামী তাজ, মে'রাজ শরীফ, বোরাক ও ইসলামী ঝাণ্ডার একমাত্র অধিকারী এবং যিনি (তোমারই অনুগ্রহে) সমুদয় বিপদাপদ, কলেরা, দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ধ্বংসকারী। তাঁহারই পবিত্র নাম তোমার গৌরবান্বিত আরশে সযত্নে অঙ্কিত ও লিখিত রহিয়াছে। তিনি আরব, আরবের বাহিরের দেশসমূহ ও ইসলাম জগতের বাদশাহ। তাঁহার সুকোমল দেহখানি অতি পবিত্র, সুরভিত; বিশেষতঃ তিনি কা'বা শরীফ রওশনকারী, তিনি প্রাতঃকালীন উজ্জ্বল কিরণময় সূর্যতুল্য এবং অন্ধকার রাত্রে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। সর্বশ্রেষ্ঠ সৎপথ প্রদর্শক, অধর্ম ও অত্যাচার-রূপ অন্ধকারে জ্বলন্ত প্রদীপ, অতি সচ্চরিত্র— গোনাহগারগণের একমাত্র সাহায্যকারী। আল্লাহ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তাঁহার অনুচর, বোরাক তাঁহার বাহন, মে'রাজ শরীফ

তাঁহার ভ্রমণস্থল, সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা (১) তাঁহার বিশ্রামস্থল। হে আল্লাহ! তিনি তোমার অতি নিকটবর্তী, তাঁহার সমুদয় আশা ও বাসনা তোমার নিকট সমাদরে গৃহীত হয়। তিনি রসূলগণের প্রতিনিধি, সর্বশেষ নবী, গোনাহগারগণের সাহায্যকারী, গরীবগণের বন্ধু, সৃষ্টি জগতের পরম শান্তি, তাঁহার উম্মত ও বন্ধুগণের শান্তি, আল্লাহ তায়ালার প্রেমসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তিগণের জন্য আলোময় ঝক্‌ঝকে সূর্যতুল্য। তাঁহার তত্ত্বাবধানাধীন ও নিকটবর্তীগণের জন্য আলোকময় প্রদীপ। নিঃসহায় দরিদ্র ও ভিক্ষুকগণের বন্ধু ও আমাদের ইহ-পরকালের সুযোগ্য প্রতিনিধি, পবিত্র কা'বা শরীফ ও বায়তুল মুকাদ্দাস শরীফের ইমাম (অগ্রণী), আমাদের ইহ-পরকালের উদ্ধারের উপায়, বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তায়ালার অতি নিকটবর্তী বন্ধু, উভয়-পূর্ব ও উভয়-পশ্চিমের প্রভুর প্রিয়জন, তিনি ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর নানা এবং তিনিই আমাদের ও জ্বিন-পরীগণের একমাত্র সুপারিশকারী। তিনি কাসেমের পিতা, আবদুল্লাহ্‌র পুত্র এবং আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্ট সৃজিত নূরের জ্যোতিঃ। হে তাঁহার সৌন্দর্য দর্শনপ্রার্থী! তোমরা একবাক্যে সকলে তাঁহার পবিত্র রূহ্ মোবারকের উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর।

[২]

দরূদে মাহি درود ماهى

ঘটনা— হযরত রসূল (সাঃ) এর সময় একজন কামেল ব্যক্তি নদীর তীরে বসিয়া সর্বদা এই দরূদ শরীফ পড়িতেন। ঐ নদীর একটি রুগ্ন মৎস্য ইহা সর্বদা শুনিতে শুনিতে শিখিয়া ফেলিল ও পড়িতে লাগিল। ক্রমে মৎস্যটির রোগ আরোগ্য হইতে লাগিল ও তাহার শরীরের রং বদলাইয়া সোনার বর্ণ ধারণ করিল। দৈবাৎ একদিন এক ইহুদী জেলের জালে মৎস্যটি ধরা পড়িল। ইহুদীর স্ত্রী অনেক চেষ্টা করিয়াও মৎস্যটিকে কাটিতে পারিল না। অবশেষে উহাকে ফুটন্ত তৈলের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কিন্তু মৎস্যটি নির্বিঘ্নে ফুটন্ত তৈলের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই দরূদ শরীফ পড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ইহুদী অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া পড়িল ও মৎস্যটিকে লইয়া হযরত রসূল (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইল। হযরত (সাঃ) এর দোয়ায়

(১) সিদরাতুল মুন্তাহাঃ— ৭ম আসমানের উপর অবস্থিত একটি বৃক্ষের নাম। শবে মে'রাজের সময় হযরত রসূল (সাঃ) এই বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ইহার উপরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) এরও যাওয়ার অধিকার নাই।

মৎস্যটি বাক্শক্তি লাভ করিল ও সমস্ত বিষয় হযরত (সাঃ) এর নিকট বর্ণনা করিল। ইহা শুনামাত্র সেখানে উপস্থিত ৭০ জন ইহুদী তৎক্ষণাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন ও রসূল (সাঃ) এর নবুয়তের উপর ঈমান আনিলেন। তৎপর মৎস্যটিকে নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। উপরোক্ত কারণে এই দরূদ শরীফ 'দরূদে মাহি' অর্থাৎ, মাছের দরূদ বলিয়া খাতি লাভ করিয়াছে। ইহা পড়িলে অতি মধুর শুনা যায়।

ফযীলত

১। খুব কঠিন বিপদে কিংবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইলে ক্রমবৃদ্ধি করিয়া ২১ দিনে বা ৪২ দিনে সোয়া লক্ষবার এই দরূদ শরীফ পড়িলে হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। অযু সহকারে নদীর তীরে বসিয়া পড়িলে আরও সত্বর ফল পাওয়া যায়; (ইহা পরীক্ষিত)।

২। প্রত্যহ ফজরের নামাযান্তে অন্ততঃ ৭ বার করিয়া পড়িলে স্বাস্থ্য অটুট থাকে ও বিপদাপদ হইতে নিরাপদ থাকা যায়।

درود ماهى — দরূদে মাহি

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْخَلَائِقِ اَفْضَلِ الْبَشَرِ شَفِيْعِ الْاُمَّةِ

يَوْمَ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ وَصَلِّ عَلٰى

جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلٰئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ

الصَّالِحِيْنَ وَارْحَمْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝

উচ্চারণঃ— আল্লাহুমা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন খাইরুল খালায়িক্বে আফযালুল বাশারি শাফীয়িল উম্মাতি ইয়াওমাল হাশরি ওয়ান্নাশরি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিম্ বিআদাদি কুল্লি মা'লুমিল্লাকা ওয়া সাল্লি আলা জামীয়িল আম্বিয়ায়ি ওয়াল মুরসালীনা ওয়াল মালায়িকাতিল মুক্বার্‌রাবীনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীনা ওয়ারহাম্না মাআহুম বিরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থঃ— হে আল্লাহ! তুমি তোমার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব, হাশরে স্বীয় উম্মতগণের সুপারিশকারী, যাঁহার পবিত্র নাম মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁহার উপর তোমার সৃষ্ট রাজ্যে সৃষ্ট বস্তুর সংখ্যা পরিমাণ রহমত (অনুগ্রহ) প্রেরণ কর

এবং তোমার প্রেরিত নবী, রসূল ও তোমার প্রিয় ফেরেশ্‌তাগণের ও ঈমানদার ব্যক্তিগণের উপর তোমার আশীর্বাদ (রহমত) প্রেরণ কর।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই দরূদ শরীফ দ্বারা সমস্ত নবী, রসূল, ফেরেশ্‌তা ও মু'মিন ব্যক্তিগণের জন্য রহমতের প্রার্থনা করা হয় বলিয়া এই দরূদ শরীফ পাঠকারী তাঁহাদের দোয়া লাভ করিয়া থাকে। এই দরূদ শরীফ দ্বারা রহমতের সংখ্যা এই পরিমাণে নির্দিষ্ট করা হয় যে, মানুষের চিন্তা-শক্তি ইহা হইতে বেশী পরিমাণে কল্পনা করিতে পারে না, সেইজন্য ইহার ফযীলত ও শক্তি অসীম।

[৩]

درود تنجينا — দরূদে তুনাজ্জিনা (বিপদ মুক্তির দরূদ)

বিপদাপদ উদ্ধারের পক্ষে এই দরূদ শরীফের ফযীলত ও শক্তি সর্ববাদিসম্মত। এইরূপ ফযীলত লাভ করিয়াছে বলিয়াই এই দরূদ শরীফের এই নাম হইয়াছে। ইহা একাধারে দরূদ শরীফ, অপরদিকে মুনাজাত; (প্রার্থনা)। আমাদের হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি রহমত নাযিল হওয়ার প্রার্থনার সহিত বিপদাপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার প্রার্থনা আছে বলিয়া, বিপদাপদ উদ্ধারকল্পে ইহা অব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। পাক কোরআনের একটি বিশিষ্ট আয়াত, যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার অসীম শক্তির বর্ণনা হইয়াছে, তাহা ইহার শেষভাগে থাকায় ইহার ফযীলত ও শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ফযীলত

১। কঠিন বিপদাপদ বা চাকুরী নষ্ট হওয়ার আশংকা কিংবা গুরুতর মামলা-মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে নির্জন স্থানে বসিয়া (না উঠিয়া) ইহা এক হাজার বার পড়িলে আশ্চর্যরূপ ফল পাওয়া যায়। ইহার ফযীলত ও শক্তি দোয়ায়ে ইউনুসের অনুরূপ; (ইহা বহু পরীক্ষিত)।

২। ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর সর্বদা ১০ বার করিয়া পড়িলে সহজে কোন বিপদাপদ আসিতে পারে না।

৩। এই দরূদ শরীফ ৩ বার পড়িয়া মাটিতে ফুঁকিয়া ঐ মাটি কবরের উপর ছিটাইয়া দিলে কোন প্রাণী কবরের লাশ নষ্ট করিতে পারে না।

দরূদে তুনাজ্জিনা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً
تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ
الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّاٰتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ
اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ
فِى الْحَيٰوةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ ـ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ٥

উচ্চারণঃ— আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ সালাতান তুনাজ্জিনা বিহা মিন্ জামীয়িল আহ্‌ওয়ালি ওয়াল আফাত, ওয়া তাক্‌দি লানা বিহা জামীয়িল হাজাত। ওয়া তুতাহ্‌হিরুনা বিহা মিন্ জামীয়িস্ সাইয়্যিআত। ওয়া তারফাউনা বিহা ইন্দাকা আ'লাদ্দারাজাত। ওয়া তুবাল্লিগুনা বিহা আকসাল গায়াত মিন জামীয়িল খাইরাতি ফিল হায়াতি ওয়া বা'দাল মামাত। ইন্নাকা আল কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর ; বিরাহ্‌মাতিকা ইয়া আরহামার্ রাহিমীন।

অর্থঃ— হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নেতা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর নানাভাবে রহমত অবতীর্ণ কর এবং এই দরূদ শরীফের বরকতে আমাদিগকে সমুদয় বিপদাপদ হইতে মুক্তি দাও এবং আমাদের সমুদয় বাসনা পূর্ণ কর, সমস্ত পাপকার্য হইতে আমাদিগকে পবিত্র রাখ এবং আমাদিগকে তোমার নিকট সম্মানের উচ্চস্তরে স্থান দান কর এবং আমাদিগকে ইহ-পরকালের সর্বপ্রকার মঙ্গলের শেষ সোপানে পৌছাইয়া দাও। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান ও সর্বোচ্চ অনুগ্রহকারী; তোমার নিজ অনুগ্রহে (আমার উপরোক্ত) বাসনাগুলি পূর্ণ কর।

[৪]

درود فتوحات — দরূদে ফুতুহাত (উন্নতি লাভ করার দরূদ)

এই দরূদ শরীফ সবদা নিয়মিতভাবে পড়িলে সাংসারিক জীবনে উন্নতি লাভ হয়। এই জন্যই এই দরূদ শরীফকে দরূদে ফুতুহাত অর্থাৎ উন্নতি লাভ করার দরূদ বলা হয়। এই দরূদ শরীফ পাঠ দ্বারা মানুষের সকল প্রকার রিযিকের ও জয়ের সংখ্যা পরিমাণ রহমত হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ও তাঁহার বংশধরগণের উপর নাযিল হওয়ার প্রার্থনা করা হয় বলিয়া ইহার আমল দ্বারা রিযিক বৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ হয়।

ফযীলত

প্রত্যহ এই দরূদ শরীফ ৩ বার পড়িলে জীবনে কখনও অবনতি ঘটিবে না ও ধনে-জনে সমৃদ্ধিশালী থাকিবে।

দরূদে ফুতুহাত

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَعَلٰى اٰلِهٖ بِعَدَدِ اَنْوَاعِ
الرِّزْقِ وَالْفُتُوْحَاتِ يَا بَاسِطُ الَّذِىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥ اُبْسُطْ عَلَيْنَا رِزْقًا وَّاسِعًا مِّنْ كُلِّ جِهَةٍ مِّنْ خَزَائِنِ
غَيْبِكَ بِغَيْرِ مِنَّةِ مَخْلُوْقٍ بِمَحْضِ فَضْلِكَ وَكَرَمِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

উচ্চারণ ঃ— বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম অ আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া আলা আলিহী বিআদাদি আন্‌ওয়াইর রিয্‌ক্বি ওয়াল-ফুতুহাতে ইয়া বাসিতাল্লাযী ইয়াবসুতুর রিয্‌কা লিমাই ইয়াশাউ বিগাইরি হিসাব। উব্‌সুত্ আলাইনা রিয্‌কাওঁ ওয়াসিআম্ মিন্ কুল্লি জিহাতিম মিন খাযায়িনি গাইবিকা বিগাইরি মান্নাতিম মাখলুক্বিম বিমাহ্‌দি ফাদলিকা ওয়া কারামিকা বিগাইরি হিসাব।

অর্থ ঃ— আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করিতেছি), হে আল্লাহ! আমাদের ধর্মনেতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর মানুষের সকল প্রকার রিযিক ও জয়ের সংখ্যা পরিমাণ রহমত (অনুগ্রহ) অবতীর্ণ কর। হে প্রসারকারী! তুমি যাহাকে ইচ্ছা অসীম রিযিক দান করিয়া থাক। তোমার গোপন ধনভাণ্ডার হইতে প্রচুর রিযিক দান কর, যে দান আমাদের সীমাবদ্ধ ধারণানুযায়ী নহে বরং তোমার দয়া ও কৃপানুযায়ী অসীম।

[৫]

درود رويت نبى (صلم) — দরূদে রু'ইয়াতে নবী (সাঃ)

[হযরত রসূল (সাঃ) এর যিয়ারত লাভের দরূদ]

হযরত শেখ আবদুল কাদির জীলানী (রহঃ) বড় পীর সাহেব 'গুনিয়াতুত্তালিবীন' নামক কিতাবে লিখিয়াছেন যে, হযরত রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুময়ার রাত্রে দুই রাকয়াত নফল নামায এই নিয়মে পড়ে যে, প্রত্যেক রাকয়াতে আলহামদুর পর আয়াতুল কুরসী ১ বার ও সূরা ইখ্‌লাস ১৫ বার এবং নামায শেষ করিয়া নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ একহাজার বার পড়িবে, অবশ্যই সে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইবে। যদি ঐ রাত্রে না দেখে তবে দ্বিতীয় শুক্রবার আসিবার পূর্বে দেখিতে পাইবে এবং তাহার গোনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে।

দরূদ

اللهم صل على سيدنا محمدن النبى الامى *

উচ্চারণ ঃ— আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন্নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নবী ধর্মনেতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যিনি সাধারণের ন্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত নহেন, তাঁহার উপর রহমত অবতীর্ণ কর।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— হযরত রসূল (সাঃ) লেখাপড়া জানিতেন না বলিয়া ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথা রটনা করিয়া বেড়াইত। লেখাপড়া না জানিলেও তিনি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে বিপুল জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন। অমূল্য হাদীসগুলি তাঁহার অতুল জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি লেখাপড়া না জানিয়াও অমূল্য জ্ঞানের অধিকারী হইয়া জগতের শ্রেষ্ঠ মানব ও শ্রেষ্ঠ নবীরূপে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার নবুয়তের বিশেষত্ব। এই দরূদ শরীফ পাঠ দ্বারা তাঁহার ঐ মাহাত্ম্যের বর্ণনা করা হয় বলিয়া ইহা দ্বারা তাঁহার বিশেষ দোয়া ও অনুগ্রহ লাভ হয়।

[৬]

درود شفاء — দরূদে শিফা (রোগমুক্তির দরূদ)

যদি দীর্ঘ জীবনের আশা করেন, তবে সকালে ও সন্ধ্যায় ৩ বার করিয়া এই দরূদ শরীফ পড়িবেন। কলেরা, বসন্ত ও মহামারীর সময় কেহ এই দরূদ শরীফ সকালে ও বিকালে ৩ বার করিয়া পড়িলে আল্লাহ্‌র ফজলে এই সকল রোগে আক্রান্ত হইবে না। যদি কেহ আক্রান্ত হইয়া পড়ে তবে প্রত্যহ সে ব্যক্তি সেই নিয়মে পড়িবে, যদি সে নিজে পড়িতে না পারে, তবে অন্য কেহ তাহাকে পড়িয়া শুনাইবে। সর্বদা নিয়মিতভাবে এই দরূদ শরীফ পড়িলে মৃত্যুর সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় রোগে আক্রান্ত হইবে না। এই দরূদ শরীফ পাঠ দ্বারা আমাদের হযরত রসূল (সাঃ) ও তাঁহার বন্ধুগণের প্রতি যাবতীয় রোগ, ঔষধ ও আরোগ্যের সংখ্যা পরিমাণ রহমত অবতীর্ণের জন্য দোয়া করা হয় বলিয়া পাঠকারী উপরোক্ত ফযীলত লাভ করিয়া থাকে। এই দরূদ শরীফের ঐরূপ ফযীলত আছে বলিয়া ইহাকে দরূদে 'শিফা' বলা হয়।

দরূদে শিফা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَّبِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَّشِفَاءٍ ۝

উচ্চারণঃ— আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিম বিআদাদি কুল্লি দায়িওঁ ওয়া বিআদাদি কুল্লি ইল্লাতিওঁ ওয়া শিফাইন্।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ধর্মনেতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর মানুষের সকল প্রকার রোগ, ঔষধ ও আরোগ্যের সংখ্যা পরিমাণ রহমত ও শান্তি অবতীর্ণ কর।

[৭]

درود خير — দরূদে খায়ের (কল্যাণ লাভের দরূদ)

সর্বদা পড়ার জন্য এই দরূদ শরীফটি অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিবি সাহেবাগণের প্রতিও রহমত অবতীর্ণের প্রার্থনা রহিয়াছে। ইহা সর্বদা পড়িলে ইহ-পরকালের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়।

দরূদে খায়ের

اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولنا محمد صلى الله
عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وبارك وسلم ۝

উচ্চারণ ঃ— আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা ওয়া শাফীয়িনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম্।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! তুমি আমাদের একমাত্র নেতা, নবী, সুপারিশকারী ও মনিব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর রহমত অবতীর্ণ কর এবং তাঁহার বংশধর, আসহাবগণ ও তাঁহার বিবি সাহেবাগণের উপর তোমার রহমত ও শান্তি অবতীর্ণ কর।

হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ (রহঃ) হযরতের রওজা শরীফে উপস্থিত হইয়া "আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ" বলিয়া সালাম করেন। রওজা শরীফ হইতে তৎক্ষণাৎ গম্ভীর আওয়াজে উত্তর আসিয়াছিল, "ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম ইয়া কুতুবে মাশায়েখে হিন্দ" (হিন্দুস্থানের সর্দারগণের কুতুব আপনার প্রতিও আমার সালাম)।

দরূদ শরীফ পড়ার নিয়ম ঃ— দরূদ পড়ার সময় মনে মনে ধ্যান করিবেন যে, হযরতের রওজার নিকট উপস্থিত হইয়া দরূদ পড়িতেছেন। এই ধ্যান মানুষকে দুনিয়ার চিন্তা হইতে মুক্ত করিয়া রসূলমুখী করে।

দরূদ শরীফ বিভিন্ন হওয়ার কারণ ঃ— দরূদ শরীফের অর্থ ও মর্ম হইতে আঁ হযরত (সাঃ) বুঝিয়া লন, দরূদ পাঠকারী কি উদ্দেশ্যে দরূদ পড়িয়াছেন। যেমন দরূদে শিফা, এই দরূদ পাঠকারী দুনিয়ার যাবতীয় ব্যাধি ও ঔষধের সংখ্যা দ্বারা হযরতের প্রতি রহমত নাযিল হওয়ার প্রার্থনা করিয়া থাকেন। রোগমুক্তিই এই দরূদ পাঠের উদ্দেশ্য। ফলে আঁ হযরত (সাঃ) পাঠকারীর রোগমুক্তির প্রার্থনা করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

পার্থিব উন্নতি ও অবনতির কারণ

بسم الله الرحمن الرحيم ۝

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে এবং স্বভাবতঃ বুঝা যায় যে, জগতের প্রত্যেক কাজ ও অভ্যাসের ভালমন্দ এক বা একাধিক তাসীর (ক্রিয়া) আছে। যে ব্যক্তি যে কাজ বা অভ্যাস অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সে কাজ ও অভ্যাসে ভালমন্দ কোন না কোন ফল লাভ করে। এমন কতগুলি কাজ ও অভ্যাস আছে, যাহা করা না-জায়েয ও না-পছন্দ এবং ইহাদের আচরণ দ্বারা মানুষ দৈন্যদশায় পতিত হয়। আবার এমন কতগুলি কাজ ও অভ্যাস আছে, যাহা করা পুণ্যজনক ও পছন্দনীয় এবং ইহাদের আচরণ দ্বারা মানুষ সৌভাগ্যশালী ও সম্পদশালী হইতে পারে। বুযর্গ ব্যক্তিগণ ঐ সকল কাজ ও অভ্যাসগুলির ভালমন্দ খাসিয়ত নিজ নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়া কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কোরআনের আয়াত ও দরূদ শরীফের আমল দ্বারা ফযীলত লাভ করিতে হইলে সকল কাজ ও অভ্যাসগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলা উচিত।

নিম্নলিখিত কাজ ও অভ্যাসগুলি মানুষের দরিদ্রতা আনয়ন করেঃ—

১। হাঁটিতে হাঁটিতে ও অযু ব্যতীত দরূদ শরীফ পাঠ করা। ২। যিনা বা ব্যভিচার করা। ৩। মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা কসম খাওয়া। ৪। নামাযে আলস্য করা। ৫। মাতাপিতাকে কষ্ট দেওয়া। ৬। ওস্তাদকে অমান্য ও অবহেলা করা। ৭। গান বাজনার মজলিসে যাওয়া ও শুনা। ৮। মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্য সময়ে শয়ন করা ও নিদ্রা যাওয়া। ৯। সন্তান-সন্ততির প্রতি বদদোয়া করা। ১০। মৃত ব্যক্তির নিকট বসিয়া আহার করা। ১১। বসিয়া মাথায় পাগড়ি পরিধান করা। দাঁড়াইয়া পায়জামা পরা। ৩। কাপড়ের আস্তিন ও আঁচল দ্বারা মুখ পরিষ্কার করা। ১৪। ভাঙ্গা বাসনে বা গ্লাসে পানাহার করা। ১৫। প্রভাতে শুইয়া থাকা ও অসময়ে ঘুম হইতে উঠা। ১৬। শরীরের গুপ্তস্থানের লোম কাঁচি দ্বারা কাটা ও ৪০ দিনের মধ্যে পরিষ্কার না করা। ১৭। ঘরে মাকড়সার জাল থাকিতে দেওয়া। ১৮। ঘর ঝাড় দিয়া আবর্জনা ঘরের মধ্যে জমা করিয়া রাখা। ১৯। ঘরের দরজায় হাত-মুখ

ধোয়া। ২০। খাইবার বাসন ও হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি খাইবার পর না ধুইয়া রাখিয়া দেওয়া। ২১। রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে কোন জিনিস খাওয়া। ২২। খালি শরীরে থাকা। ২৩। হাত না ধুইয়া খাওয়া। ২৪। অযু করিবার সময় সাংসারিক কথা বলা। ২৫। প্রস্রাব করার সময় কথা বলা। ২৬। ধনবান ও সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও আপন সন্তান-সন্ততির খোরপোষে কৃপণতা করা। ২৭। বিনা অযুতে কোরআন শরীফ কিংবা কোরআনের কোন আয়াত পড়া। ২৮। খালি মাথায় পায়খানায় যাওয়া। ২৯। ফজরের নামাযের পর তাড়াতাড়ি মসজিদ হইতে বাহির হইয়া আসা। ৩০। মাতা-পিতা ও ওস্তাদের নাম ধরিয়া ডাকা। ৩১। পরিধানে রাখিয়া কাপড় সেলাই করা। ৩২। ফুঁক দিয়া প্রদীপ নিভাইয়া দেওয়া। ৩৩। সকলের আগে বাজারে যাওয়া ও সকলের শেষে বাজার হইতে আসা। ৩৪। ভাঙ্গা চিরুনি চুলে কিংবা দাড়িতে ব্যবহার করা ও অন্যের চিরুনি ব্যবহার করা। ৩৫। ভাঙ্গা বা ঘাইটযুক্ত কলম দ্বারা লেখা। ৩৬। দাঁত দ্বারা নখ কাটা। ৩৭। রাস্তায় চলিবার সময় মুরব্বি বা মাননীয় ব্যক্তির আগে হাঁটা। ৩৮। কোরআন তেলাওয়াতের সেজদায় বিলম্ব করা। ৩৯। রাত্রিকালে ঘর ঝাড়ু দেওয়া ("সালাতে মাসউদী" নামক কিতাবে লিখিত হইয়াছে)। ৪০। কাপড় দ্বারা ঘর ঝাড়ু দেওয়া; (হযরত "আবুল লাইস" 'বোস্তান' নামক কিতাবে লিখিয়াছেন)। ৪১। রাত্রে আয়নায় মুখ দেখা। ৪২। সন্ধ্যায় ঘরে আলো (বাতি) না দেওয়া। ৪৩। অপব্যয় করা। ৪৭। স্ত্রী-সহবাসের পর গোসল না করিয়া খাওয়া ও ক্ষৌরকর্ম করা। ৪৮। সর্বদা পুত্রকন্যা অথবা পরিবারের লোকের সহিত ঝগড়া করা। ৪৯। হাঁটিতে হাঁটিতে দাঁত খেলাল করা। ৫০। আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করা। ৫১। বাড়ীতে সর্বদা মেয়েলোকের ঝগড়া ও গালাগালি হওয়া। ৫২। আমানত খিয়ানত করা। ৫৩। যাকাত, ফেতরা কিংবা কাফ্ফারার উপযুক্ত হইলে দিতে বিলম্ব করা। ৫৪। অন্ধকার ঘর বা স্থানে আহার করা। ৫৫। বুধবার ও রবিবার রাত্রে স্ত্রীসহবাস করা। ৫৬। মূল্য বৃদ্ধির আশায় শস্যাদি, গোলাজাত করিয়া রাখা (৪০ দিনের বেশী গোলাজাত করিয়া রাখিলে আল্লাহ, ফেরেশ্তা জ্বিন ও মানুষের লা'নত [অভিশাপ] বর্ষিত হয়)।

৫৭। পুষ্করিণী কিংবা হাউজে প্রস্রাব করা। ৫৮। উলঙ্গ হইয়া গোসল করা। ৫৯। উলঙ্গ মাথায় আহার করা। ৬০। ইঁদুরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করা। ৬১। মসজিদের ভিতর বসিয়া সাংসারিক কথাবার্তা বলা। ৬২। বিনা দাওয়াতে কাহারও বাড়ীতে আহার করা। ৬৩। কাপড় দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা। ৬৪। কোরআন শরীফ ঘরে থাক সত্ত্বেও পাঠ না করা। ৬৫। মা-বাপ, পীর ও ওস্তাদের নাফরমানী করা। ৬৬। সর্বদা জীবজন্তু জবেহ্ করা। ৬৭। মানুষ বিক্রয়ের ব্যবসা করা। ৬৮। শরাব পান করা। ৬৯। মুসল্লি হইয়া কিতাবের কথা অমান্য করা। ৭০। কটু বাক্য বলিয়া সম্মানী লোকের মান হানি করা। ৭১। ফলবান বৃক্ষের নীচে পায়খানা-প্রস্রাব করা। ৭২। পরিবারের স্ত্রীলোক বেপর্দায় রাখা। ৭৩। প্রস্রাবের স্থানে বসিয়া অযু করা। (নাফেউল খালায়েক)

নিম্নলিখিত কাজগুলি আর্থিক সচ্ছলতা ও সৌভাগ্য আননয়ন করে ঃ—

আমাদের হযরত রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি এই ৪টি কাজের অভ্যাস করিবে সে কখনও দরিদ্র থাকিবে না। যথাঃ—

১। প্রভাত হইবার পূর্বে শয্যাত্যাগ করা। ২। নামাযের সময় হইবার পূর্বে অযু করা। ৩। এশা ও বেতেরের নামাযের পর কথা না বলা। ৪। আযানের পূর্বে মসজিদে হাযির হওয়া।

হযরত সাল্মান ফারেসী (রাঃ) হইতে হযরত রসূল (সাঃ) এর এইরূপ ১০টি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, যদদ্বারা মানুষ ধনী ও সৌভাগ্যশালী হইতে পারে। যথা ঃ—

১। মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার করা। ২। আকীক পাথরের আংটি আঙ্গুলে পরিধান করা। ৩। বেশী পরিমাণে আল্লাহ্র যিকির করা। ৪। বৃহস্পতিবারে নখ কর্তন করা। ৫। অন্ধ লোকের সাহায্য করা। ৬। সর্বদা জুতা বা খড়ম ব্যবহার করা। ৭। মসজিদ ঝাড়ু দেওয়া। ৮। ব্যবসায়-বাণিজ্যে ওয়াদার সততা রক্ষা করা। ৯। সক্ষম লোকের হজ্জ আদায় করা। ১০। উৎকৃষ্ট ফসলের চাষ করা।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে— যে ব্যক্তি জমরুদ পাথরের কিংবা আকীক পাথরের আংটি পরিবে অথবা সঙ্গে রাখিবে, সে কখনও দরিদ্র হইবে না ও সর্বদা প্রফুল্ল মনে কাল যাপন করিবে। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, নিম্নোক্ত কাজগুলি দ্বারাও মানুষ ধনী হইতে পারে। যথাঃ—

১। আল্লাহ তায়ালার এবাদতে মশগুল থাকা ও স্ত্রী-পুত্রপরিজনকে এবাদতের জন্য তাম্বিহ করা। ২। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রাত্রে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করা। ৩। আমানত রক্ষা ও আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা। ৪। সোবহে সাদেকের সময় শয্যা ত্যাগ করা। ৫। কোরআন শরীফের তাজীম করা। ৬। শবে-বরাতের রাত্রে আল্লাহ্‌র নিকট রিযিকের জন্য প্রার্থনা করা। ৭। আশুরার দিন নিজ পরিবারবর্গকে ও ফকীর-মিসকীনদিগকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করান। ৮। আপন পরিবারবর্গের সহিত সদ্ব্যবহার করা। ৯। আল্লাহকে অন্তরের সহিত ভয় করা। ১০। সাধ্যানুসারে দান-খয়রাত করাকে অভ্যাসে পরিণত করা। ১১। মাতা-পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করা। ১২। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চুরি ও যিনা হইতে দূরে থাকা। ১৩। আযানের উত্তর দেওয়া। ১৪। হক কথা বলা। ১৫। লোভ ত্যাগ করা। ১৬। আল্লাহ্‌র নিয়ামতের প্রতি শোক্‌র ও সবর করা। ১৭। জামায়াতের সহিত নামায আদায় করা। ১৮। ঘরে সিরকা রাখা। ১৯। চাশ্‌তের নামায পড়া! ২০। প্রত্যেক চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ই তারিখে রোযা রাখা। ২১। হলুদে রঙের জুতা পরা। ২২। বিশেষ করিয়া এশার নামায জামায়াতে আদায় করা।

নিম্নলিখিত ১০টি কার্য দ্বারা মানুষ স্বাস্থ্যবান ও সবল হয় এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায় ঃ—

১। মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করা। ২। হালাল জন্তুর ঘাড়ের মাংসা খাওয়া। ৩। ঠাণ্ডা শরবত পান করা। ৪। ঠাণ্ডা রুটি খাওয়া। ৫। গরম ভাত খাওয়া। ৬। শুষ্ক আঞ্জির খাওয়া। ৭। মিষ্ট সেবফল খাওয়া। ৮। মধু পান করা। ৯। অপক্ক আঙ্গুর খাওয়া। ১০। সর্বদা মাথায় তৈল ব্যবহার করা।

নিম্নলিখিত ১২টি কার্য দ্বারা স্বাস্থ্য নষ্ট হয় ও স্মরণশক্তি লোপ পায় ঃ—

১। ঘাড় কামান। ২। ইঁদুরের উচ্ছিষ্ট খাওয়া। ৩। টক দ্রব্য ভক্ষণ করা। ৪। উকুন পাইয়া জীবিত ছাড়িয়া দেওয়া। ৫। কোন জিনিসের উপর ঠেস্ দিয়া কিছু ভক্ষণ করা। ৬। বিশুদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা। ৭। আঙ্গুল দ্বারা খেলা করা, (যথা— কেরাম বোর্ড খেলা)। ৮। সর্বদা কবর আযাবের বর্ণনা পাঠ করা বা শ্রবণ করা। ৯। বিসমিল্লাহ না বলিয়া কিছু পানাহার করা। ১০। আসরের নামাযান্তে নিদ্রা যাওয়া। ১১। ফাঁসিকাষ্ঠে চড়ান লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা। ১২। মৃত ব্যক্তির কবরের উপর লিখিত স্মৃতিফলকের দিকে দৃষ্টিপাত করা।

নিম্নলিখিত ১১টি কার্য দ্বারা মানুষের হৃদয় কঠিন হয় ঃ—

১। দাঁড়াইয়া পায়জামা পরা। ২। পা পাতিয়া তাহার উপর বসা। ৩। ঘর ঝাড়ু দিয়া ঘরের মধ্যে আবর্জনা জমা করিয়া রাখা। ৪। ছাগলের পালের মধ্যে সর্বদা যাতায়াত করা। ৫। দাঁতে নখ কাটা। ৬। বাম হাতে খাওয়া। ৭। পরিধানের কাপড়ের আঁচল দ্বারা মুখ পরিষ্কার করা। ৮। ডিমের খোলের উপর দিয়া যাতায়াত করা। ৯। ডান হাতে পায়খানা-প্রস্রাবের রাস্তা পরিষ্কার করা। ১০। পাথর দ্বারা খেলা করা। ১১। রাত্রিকালে একাকী গমন করা।

নিম্নলিখিত ৪টি অভ্যাস দ্বারা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় ঃ—

১। আল্লাহ তায়ালার সৃজিত সবুজ বৃক্ষ-লতার প্রতি দৃষ্টি করা। ২। মাতা-পিতা, পীর, ওস্তাদ ও আলেমগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করা। ৩। সর্বদা কোরআন তেলওয়াত করা। ৪। কা'বা শরীফের দিকে দৃষ্টি করা।

নিম্নলিখিত ৫টি অভ্যাস দ্বারা দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায় ঃ—

১। কটু (লবণাক্ত) দ্রব্য ভক্ষণ করা। ২। গরম পানি মাথায় দেওয়া। ৩। সূর্যের দিকে তাকান। ৪। শত্রুর দিকে তাকান। ৫। আসরের নামাযের পর লেখাপড়া করা।

নিম্নলিখিত ১০টি অভ্যাস মানুষের বার্ধক্য আনয়ন করে ঃ—

১। নিদ্রা হইতে উঠিয়া ঠাণ্ডা পানি পান করা। ২। গোলাপ পানি দ্বারা চুল ধৌত করা। ৩। স্ত্রীলোকের লিঙ্গের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। ৪। স্ত্রীলোকের সঙ্গে সর্বদা নিদ্রা যাওয়া। ৫। পরিধানের কাপড় দ্বারা মুখ পরিষ্কার করা। ৬। অধিক স্ত্রীসহবাস করা। ৭। অধিক চিন্তা করা। ৮। হীনাবস্থায় জীবন যাপন করা। ৯। অধোমুখী হইয়া শয়ন করা। ১০। ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস করা।

নিম্নলিখিত ৪টি কারণে শরীর মোটা হয় ঃ—

১। পশ্‌মি কাপড় পরিলে। ২। সর্বদা আনন্দে জীবন যাপন করিলে। ৩। নিশ্চিন্ত মনে কাল যাপন করিলে। ৪। ঋণ না থাকিলে।

নিম্নলিখিত ৪টি অভ্যাস দ্বারা শরীর দুর্বল হয় ঃ—

১। অল্প আহার করিলে। ২। অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস করিলে। ৩। গোসলখানায় বসিয়া থাকিলে। ৪। সূর্যাস্তের সময় নিদ্রা গেলে।

নিম্নলিখিত প্রকারের স্ত্রীলোক বিবাহ করা ভাল নহে ঃ—

১। যাহার শরীর বেঁটে। ২। যাহার চুল বেঁটে। ৩। যাহার শরীর মোটা। ৪। যে কর্কশভাষিণী ও বন্ধ্যা। ৫। যে অপব্যয় করিতে ভালবাসে। ৬। যে কলহপ্রিয় ও যাহার হাত লম্বা ৭। বেড়াইতে বাহির হইলে যে এদিক-ওদিক কুভাবে তাকায়। ৮। অন্যের তালাকী স্ত্রীলোক।

যে ওস্তাদের মনে কষ্ট দেয় তাহার উপর ৪টি বিপদ উপস্থিত হয় ঃ –

১। যাহা শিখিয়াছে তাহা ভুলিয়া যায়। ২। উপার্জনে উন্নতি হয় না। ৩। আয়ু কমিয়া অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। ৪। বেঈমান হইয়া মৃত্যু হয়।

কোন বিষয়ে তাড়াতাড়ি করা শয়তানের কাজ, কিন্তু নিম্নোক্ত ৫টি কাজে তাড়াতাড়ি করা সুন্নত ঃ—

১। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা। ২। মেয়েদের বিবাহ দেওয়া। ৩। ঋণ পরিশোধ করা। ৪। গোনাহ করার পর তাওবা করা। ৫। প্রবাসীকে আহার দেওয়া।

মানুষের স্বভাব

আল্লাহ তায়ালা পাক কোরআনের ১৭ পারায় সূরা আম্বিয়ার ৩৭ আয়াতের প্রথম অংশে বলিয়াছেন যে—

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ -

অর্থাৎঃ— "মানুষ সত্বরতা-প্রিয়রূপে সৃষ্টি হইয়াছে।" এই স্বভাব দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই মানুষ বর্তমান অবস্থার প্রতি বেশী আস্থাবান ও আশান্বিত এবং উপস্থিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও লাভালাভের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ও লালায়িত হয়; এই স্বভাবের দোষেই তাহারা পরকালের অনন্ত সুখের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে না। মানুষ মনে করে, হাতের একটি পাখী জঙ্গলের অনেক পাখীর সমান। যাহারা এই স্বভাব বর্জন করিয়াছে তাহারাই লোভ ত্যাগ করিয়াছে ও প্রকৃত মানুষ হইতে পারিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

জীবনযাত্রায় আয়াতে কোর্‌আনের আমল

[কোরআন শরীফের সূরা ও আয়াতসমূহের ফযীলত]

আমলের নিয়ম ঃ ১। যে ব্যক্তি যে আমল করিবে তাহা সর্বদা নিয়মিতভাবে করিবে। আমল করিতে কামাই করিলে বরকত (আধিক্য) ও তাসির (ফল) কমিয়া যায়। যে আমল সর্বদা করা যায় তাহাই আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয়। বোখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهَا ٥

অর্থাৎ— ১। যে আমল সর্বদা করা যায়, তাহাই আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়তম।

২। পাক শরীরে পাক কাপড় পরিয়া অযুর সহিত আমল করিবে।

৩। আমল আরম্ভ করার পূর্বে সূরা আ'বাসা (কোরআন, ৩০ পারা) পড়িয়া আরম্ভ করিবে, ইহাতে বাধা পড়িবে না।

তা-আউয (আশ্রয় প্রার্থনা)

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ٥

উচ্চারণ ঃ— আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতোয়ানির রাজীম।

অর্থ ঃ— অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

ফযীলত ঃ — এ আয়াতটি কোরআনের অংশ নহে, ইহা একটি অতিরিক্ত আয়াত (তঃ ইব্‌নে জরীর)। হযরত জিব্রাইল (আঃ) হযরত রাসূল (সাঃ)-কে সর্বপ্রথম এই আয়াত শিক্ষা দেন। ইহাকে তা-আউয বলা হয়। এই আয়াতের ফযীলতে দীন-দুনিয়ার মঙ্গল লাভ করিতে হইলে ও অনিষ্টকর বিষয় হইতে নিরাপদ থাকিতে হইলে নিজেকে অক্ষম ও একমাত্র আল্লাহ্‌কেই সক্ষম জানিতে হইবে। কোর্‌আনের ১৪ পারায় সূরা নহলের ৯ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, "তুমি যখন কোরআন পাঠ কর, তখন আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা

করিও।" শয়তান এতই শক্তিশালী যে, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ব্যতীত তাহার চক্রান্ত হইতে বাঁচিয়া থাকা দুর্বল মানুষের পক্ষে দুষ্কর ও অসম্ভব। হযরত হাসান বসরী বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তিনি তাহার ও শয়তানের মধ্যে একশত পর্দার আবরণ ফেলিয়া দেন। ইমাম আওযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদিন আমার সম্মুখে বিরাট আকারের একটি ভূত উপস্থিত হইল। আমি তাহার চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়া তা-আউয পড়িতে লাগিলাম। ভূতটা আমাকে বলিল — আপনি অতি মহতের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন, এই বলিয়া সে অদৃশ্য হইয়া গেল। হযরত নূহ্ নবী (আঃ) পুত্রের জন্য দোয়া করিবার সময়, হযরত ইউসুফ (আঃ) জুলায়খার ষড়যন্ত্রের সময়, হযরত মূসা (আঃ) গরু যবেহ ব্যাপারে ও হযরত মরিয়ম হযরত জিব্রাইল (আঃ)কে পরপুরুষরূপে আসিতে দেখিয়া তা-আউয পড়িয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছিলেন।

তাসমিয়াহ (নামবাক্য বা কল্যাণবাক্য)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ০

অর্থ ঃ — পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়াবান আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করিতেছি)। এই আয়াতের অপর নাম 'তাসমিয়াহ'। ইহাকে কোরআনের তাজ বলা হয়। এই আয়াতযোগেই কোরআন শরীফ নাযিল হইয়াছে। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন যে, ইহা কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত। এই পবিত্র আয়াত শরীফ যোগে আল্লাহ তায়ালার "রহমান" ও "রহীম" নামক দয়াসূচক নাম দুইটি বিশ্বমানবের সম্মুখে সর্বপ্রথম উপস্থিত হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালার যাত নাম "আল্লাহ্র" সহিত এই পবিত্র নাম দুইটির সমাবেশ হইয়াছে বলিয়া তাসমিয়াহ্র অসীম মাহাত্ম্য রহিয়াছে। "তাসমিয়াহ" মুসলমানকে তাহার ধর্ম ও কর্মজীবনের প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার অসীম করুণা ও দয়ায় ধ্যান ও সাধনাকে জাগাইয়া রাখিতে শিক্ষা দিতেছে। আল্লাহ্র একটি নাম خالق খালিক্ (সৃজনকারী) ও অপর একটি নাম بديع বাদিউ (নব-সৃষ্টিকর্তা বিনানুকরণে)। বিশ্ব-জগতের সমস্ত সৃষ্টি তাঁহার হুকুম ও ইচ্ছায় হইয়াছে। তাঁহার হুকুম ও ইচ্ছা ব্যতীত কোন কাজ বা বস্তুর অস্তিত্ব লাভ হইতে পারে না। সেজন্য কোন কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে তাঁহার করুণাময় নাম স্মরণ করিয়া তাঁহার দয়া ও শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যের জন্য তাসমিয়াহ সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত।

হযরত রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন যে, কোন শুভ কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে "তাসমিয়াহ" পড়িয়া আরম্ভ না করিলে তাহা বরকতশূন্য হইয়া যায়। তাসমিয়াহ্র গৌরব ও ফযীলত বর্ণনা করা অসম্ভব। ইহা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও রহমতের নিদর্শন। সেজন্য কোর্‌আন শরীফে সূরা তাওবার প্রারম্ভে তাসমিয়াহ লিখিত হয় নাই। কারণ ঐ সূরায় জেহাদের কঠোর আদেশ রহিয়াছে। কোন প্রাণী যবেহ করার সময় শুধু "বিস্‌মিল্লাহ" পড়িতে হয়। "রাহমানির রাহীম" অংশটুকু পড়িবার বিধান নাই। যেহেতু এই সকল কাজ দয়া প্রকাশ নহে। অত্যাচার, অবিচার ও কুকার্যে লিপ্ত হওয়ার সময় তাসমিয়াহ পড়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। হযরত রসূল (সাঃ) ইহা নীরবে পড়ার ব্যবস্থা দিয়াছেন;(সহীহ্ মোসলেম)। প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে পরকালের মঙ্গলের জন্য অধিক সংখ্যায় তাসমিয়াহ পাঠ করা উচিত। আল্লাহ তায়ালার রহমত আকর্ষণের পক্ষে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট আয়াত।

বিসমিল্লাহ্র ফযীলত

১। হযরত ওমর (রাঃ) শুধু বিসমিল্লাহ লিখিত একটি টুপী প্রেরণ করিয়া রোমের বাদশাহ্র শিরঃপীড়া আরোগ্য করিয়াছিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) জনৈক অগ্নিপূজকের প্রস্তাবানুযায়ী ইসলামের গৌরব প্রদর্শনকল্পে বিসমিল্লাহ বলিয়া তীব্র বিষ পান করিয়াছিলেন। অথচ ইহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হইয়াছিল না।

২। হযরত নূহ্ (আঃ) এই আয়াতের কল্যাণে মহাপ্লাবনের সময় রক্ষা পাইয়াছিলেন। নমরূদের কন্যা বিবি রহীমা ইহার গুণে ভীষণ অগ্নিকুণ্ড হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া ইহার কল্যাণে ফুটন্ত তৈলের মধ্যে নিরাপদে ছিলেন। ফেরাউন নিজ প্রাসাদের দরজায় এই পবিত্র আয়াতটি লিখিত রাখায় বহুদিন পর্যন্ত আল্লাহ্র গজব হইতে নিরাপদ ছিল। হযরত যায়েদ ইব্‌নে হারেস ইহারই কল্যাণে এক ভীষণ শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

৩। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা কোন নবীর প্রতি অহী প্রেরণ করিয়াছিলেন, যে কেহ জীবনে ৪ হাজার বার বিসমিল্লাহ পড়িয়াছে বলিয়া তাহার আমলনামায় লেখা থাকিলে হাশরের দিন তাহার পতাকা আরশের নিকট স্থাপিত হইবে। (তঃ কবীর)

৪। বিসমিল্লাহ পাঠকারীর দিবারাত্রির অধিকাংশ গোনাহ আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দেন।

৫। কোন ব্যক্তির অন্তিম উপদেশ মতে তাহার মৃত্যুর পর তাহার কপালে ও বুকে বিসমিল্লাহ লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কথিত আছে, ঐ ব্যক্তি ইহার বরকতে কবর আযাব হইতে সম্পূর্ণ রেহাই পাইয়াছিল। বলাবাহুল্য, এই অবস্থায় আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিতে লিখিয়া দিতে হয়। (দুররুল মোখতার)

৬। একজন অলী তাঁহার কাফনে এই আয়াত শরীফ লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করেন যে, হাশরের দিন আমি আল্লাহ্‌র নিকট তাঁহার করুণাময় নামের উপযুক্ত মূল্য দাবী করিব। (তঃ কবীর)

৭। অধিক পরিমাণে বিসমিল্লাহ পড়িলে পরলোকগত মাতা-পিতার গোনাহ মাফ হইয়া যায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

৮। ইমাম গায্‌যালী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, কোন সৎ বাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য এক হাজার বার বিসমিল্লাহ পড়িয়া দুই রাকাত নফল নামায পড়িবে ও নিজের মনের বাসনা সম্বন্ধে মোনাজাত করিবে। এইরূপে বার হাজার বার একই রাত্রে পড়িবে। ইন্‌শাআল্লাহ মনের বাসনা পূর্ণ হইবে।

৯। অধিক সংখ্যায় বিসমিল্লাহ পড়িলে আল্লাহ তায়ালা রুযী এত বেশী করিয়া দেন যে, তাহা ধারণা করা যায় না এবং মানুষ পাঠকারীকে ভয় ও ভক্তি করিয়া থাকে।

১০। শয়নকালে ২১ বার পড়িয়া শুইলে সেই রাত্রে শয়তান, মানুষ, চোর, ডাকাত, অগ্নিদাহ, দৈব মৃত্যু ও প্রত্যেক প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

১১। পাগল, মৃগীরোগী কিংবা জ্বিনে পাওয়া লোকের কানে ৪১ বার পড়িয়া ফুঁকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার চৈতন্য হয়।

১১। অত্যাচারী যালিম ব্যক্তির সম্মুখে ৫০ বার পড়িলে অত্যাচারী ও যালিম ব্যক্তি নত হইবে, তাহাদের মনে ভয় ও ভক্তির উদ্রেক হইবে এবং তাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

১৩। একশত বার পড়িয়া বেদনাস্থলে কিংবা জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির উপর ৭ দিন ফুঁকিলে বেদনা ও জাদু দূর হয়।

১৪। খালেছ নিয়তে ৭১ বার পড়িয়া বৃষ্টির জন্য দোয়া করিলে আল্লাহ্‌র ফজলে বৃষ্টি হইবে।

১৫। প্রত্যেক রবিবারে সূর্যোদয়ের সময় কেবলামুখী হইয়া ৩১৩ বার পড়িয়া ১০০ বার দরূদ শরীফ পড়িলে আশাতীতভাবে রুযী বৃদ্ধি পায়।

১৬। ৭ দিন রোযা রাখিয়া নির্জন স্থানে বসিয়া প্রত্যহ ৭৮৭ বার পড়িলে নিশ্চয় মতলব পূর্ণ হয়।

১৭। বাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য, শত্রু বা অত্যাচারীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভবান হওয়ার জন্য প্রত্যহ ৭৮৭ বার পড়িতে থাকিবে।

১৮। ৪০ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর খালেছ নিয়তে ২৫০০ বার পড়িলে আল্লাহ তায়ালা অন্তর খুলিয়া দিবেন ও অন্তরের অদৃশ্য বিষয়ের তত্ত্বসকল প্রকাশ পাইবে। সমস্ত মানুষ তাহার ভক্ত ও অনুরক্ত হইবে এবং সে ব্যক্তি লোকের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিতে পারিবে।

১৯। সর্বদা দৈনিক এক হাজার বার পড়িলে আল্লাহ অতি সহজে দীন-দুনিয়ার মতলব পূর্ণ করিয়া দেন।

২০। ২৫০০ বার পড়িলে সকল লোক বাধ্য থাকে।

২১। কারারুদ্ধ কিংবা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি দিবারাত্রি এক হাজার বার পড়িলে জেল হইতে মুক্তি লাভ করে ও বিপদ হইতে উদ্ধার পায়।

২২। বর্ষার পানির উপর এক হাজার বার পড়িয়া যাহাকে খাওয়াইবে সে অতি প্রিয়পাত্র হইবে এবং ঐ পানি ৭ দিন পর্যন্ত সূর্যোদয়ের সময় পান করিলে মেধা ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

২৩। যে ব্যক্তি উঠিতে বসিতে বিসমিল্লাহ পড়িবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার মৃত্যু-যন্ত্রণা ও মন্‌কির নকিরের সওয়াল জওয়াব সহজ করিয়া দেন এবং তাহার কবর অতি প্রশস্ত করিয়া দেন, হিসাব-নিকাশ সহজভাবে হয় ও সে অনায়াসে বেহেশ্‌তে দাখিল হয়।

২৪। ৬২৫ বার লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে লোকের নিকট সম্মান লাভ করে এবং কেহ কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

২৫। ফজর ও এশার নামাযের পর ৭৮৭ বার পড়িলে মনের কামনা পূর্ণ হয় ও সকল প্রকার বিপদ হইতে নিরাপদ থাকা যায়।

২৬। মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য রাত্রে কোর্‌আন শরীফের প্রত্যেক ছতরের উপর বিসমিল্লাহ বলিয়া আঙ্গুল বুলাইয়া যাইবে, এইভাবে সমস্ত কোর্‌আন শরীফ খতম করিবে, ইনশাআল্লাহ মনের বাসনা পূর্ণ হইবে।

২৭। কাগজে ১০০ বার লিখিয়া মাটির পাত্রের মধ্যে ভরিয়া ক্ষেতের মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ ক্ষেতে বেশী ফসল হইবে ও আপদ-বিপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে।

খত্‌মে তাসমিয়াহ

সোয়া লাখ বার বিসমিল্লাহ পড়িলে সকল প্রকার কঠিন মতলব শীঘ্র পূর্ণ হয়, কঠিন ব্যাধি আরোগ্য ও কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়। এই তদবীরকেই খত্‌মে তাসমিয়াহ বলা হয়; (ইহা অতি পরীক্ষিত তদবীর)।

শানে নুযূল ঃ — আমাদের হযরত রসূল (সাঃ) শবে মে'রাজের সময় বেহেশ্‌তে উপস্থিত হইলে আবে-কাওসার নহরটির ইহা বেহেশ্‌তের একটি নহরের নাম, আমাদের হযরত রসূল (সাঃ) ইহার পানি, যাহা মধু হইতে মিষ্ট, দুগ্ধ হইতে শুভ্র ও বরফ হইতে ঠাণ্ডা, স্বীয় উম্মতগণকে পান করাইবেন।] উৎপত্তিস্থল কোথায় তাহা জানিবার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট আরয করিলেন। আল্লাহ পাক বলিলেন, "আপনি নহরের কিনারা ধরিয়া উহার উৎপত্তিস্থলের দিকে অগ্রসর হউন।" হযরত রসূল (সাঃ) বহুদূর চলিয়াও উৎপত্তিস্থল না পাওয়ায় পুনরায় আরয করিলেন — "হে মহিমাময় আল্লাহ! এত চলিয়াও ইহার উৎপত্তিস্থলের ঠিকানা পাইতেছি না, আপনি দয়া করিয়া দেখাইয়া না দিলে তাহা আর দেখা হইবে না।" তখন আল্লাহ পাক বলিলেন — "আপনি বিসমিল্লাহ বলিয়া পুনরায় অগ্রসর হইতে থাকুন।" হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিসমিল্লাহ বলিয়া কতটুকু অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইলেন যে, আবে-কাওসার নহরটি প্রকাণ্ড এক বাক্সের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। হযরত রসূল (সাঃ) পুনরায় আরয করিলেন— "হে আল্লাহ! এই বাক্সের ভিতর কি আছে, আমি দেখিতে ইচ্ছা করি।" আল্লাহ বলিলেন, "বিসমিল্লাহ বলিয়া বাক্সের দরজায় আঘাত করুন।" হযরত (সাঃ) তাহাই করিলেন—বাক্সের দরজা খুলিয়া গেল। হযরত (সাঃ) দেখিতে পাইলেন যে, ঐ বাক্সের ভিতরে আরবী অক্ষরে "বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম" ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং নহরের অমৃত ধারাটি বিসমিল্লাহ শরীফের শেষ 'মীম' অক্ষরের লেজ হইতে নামিয়া আসিয়াছে; (সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিকা)।

মক্কায় অবতীর্ণ	الفاتحة —সূরা ফাতেহা (আরম্ভ)	৩ আয়াত

بسم الله الرحمن الرحيم

١- الحمد لله رب العلمين ۝ ٢- الرحمن الرحيم ۝ ٣- مالك يوم الدين ۝ ٤- اياك نعبد واياك نستعين ۝ ٥- اهدنا الصراط المستقيم ۝ ٦- صراط الذين انعمت عليهم ۝ ٧- غير المغضوب عليهم ولا الضالين ۝ امين ۝

উচ্চারণঃ— ১। আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল্ আলামীন্। ২। আর্‌রাহ্‌মানির রাহীম। ৩। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ৪। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈন। ৫। ইহ্‌দিনাস্ সিরাতাল মুসতাক্বীম। ৬। সিরাতাল্লাযীনা আন্‌আমতা আলাইহিম; ৭। গাইরিল মাগদূবি আ'লাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন। (আমীন)

অর্থ ঃ— (১) বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য সমুদয় প্রশংসা (২) যিনি করুণাময় ও অতি কৃপাশীল; (৩) যিনি বিচার দিবসের অধিপতি; (৪) (হে আল্লাহ!) আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি; (৫) আমাদিগকে সরল পথে চালিত কর; (৬) তাহাদের পথে যাহাদিগকে তুমি বিশেষ অনুগ্রহে অনুগৃহীত করিয়াছ (নবী, রসূল ও ঈমানদারগণের পথে); (৭) যাহাদের প্রতি অভিশাপ প্রকাশ করা হইয়াছে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট — তাহাদের পথে নহে; (ইহুদী, খ্রীষ্টান ও কাফেরগণের পথে নহে)। তাহাই হউক।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই সূরায় ৭টি আয়াতে ২৫টি শব্দ ও ১২৫টি হরফ আছে। ইহাতে একাধারে আল্লাহ্‌র মহিমা, প্রশংসা এবং তাঁহার নিকট দোয়া ও প্রার্থনা রহিয়াছে। হযরত রসূল (সাঃ) এই মহিমান্বিত সূরাকে "ফাতিহাতুল কিতাব" অর্থাৎ কিতাবের আরম্ভ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই সূরা যোগেই কোরআন শরীফ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া তিনি এই সূরাকে "উম্মুল কোর্‌আন" অর্থাৎ কোর্‌আনের জননী বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন।

হযরত রসূল (সাঃ) হযরত জিব্রাইল (আঃ) কর্তৃক এই শুভ সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে ২টি নূর লাভ করিয়াছেন।

যাহা পূর্বে কোন নবী প্রাপ্ত হন নাই, উহার একটি সূরা ফাতেহা ও অন্যটি সূরা বাকারার শেষ তিনটি আয়াত; (৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। নামাযের প্রত্যেক রাকাতে এই সূরা পড়িতে হয় বলিয়া ইহার আর এক নাম "সূরাতুস্ সালাত" অর্থাৎ নামাযের সূরা। পাক কোরআনের ১৪ পারায় সূরা হিজরের ৮৭ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হযরত রসূল (সাঃ)কে বলিয়াছেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাকে পুনরাবৃত্তির জন্য সাতটি আয়াত ও মহান কোরআন দান করিয়াছি। অর্থাৎ আমি তোমাকে কোরআন ও উহার সার সদৃশ পুনঃ পুনঃ পঠনীয় সাত আয়াত বিশিষ্ট সূরা ফাতেহা দান করিয়াছি। এইজন্য এই সূরার আর এক নাম হইয়াছে "সাবউল মাসানী" বা পুনরুক্তির আয়াত। ইহাকে "সূরাতুল হাম্দ" অর্থাৎ প্রশংসাসূচক সূরাও বলা হইয়া থাকে। কারণ, আল্লাহ তায়ালার প্রশংসাযোগে এই সূরা নাযিল হইয়াছে। হযরত রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন যে, ইহা কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা; তওরাত, যবুর ও ইঞ্জীলে ইহার তুল্য কোন সূরাই নাযিল হয় নাই। কোরআন শরীফ সমস্ত আসমানী কিতাবের সার এবং সূরা ফাতেহা কোরআনের সার। যে ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করিলেন, তিনি যেন সমস্ত ইঞ্জীল, তওরাত, যবুর ও কোরআন শরীফ পাঠ করিলেন। যে ব্যক্তি এই সূরার তফসীর জ্ঞাত হইলেন, তিনি যেন সমস্ত কোরআনের তফসীর জ্ঞাত হইলেন। এই সকল উক্তির একটি কারণ রহিয়াছে, তাহা এই— "এক আল্লাহ্র মহিমা ও একত্ব (তৌহীদ) প্রচার করার জন্য ও মানবকে সরল এবং সত্য পথ দেখাইবার উদ্দেশ্য লইয়া পাক কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। সূরা ফাতিহা সেই সকল উদ্দেশ্য প্রচার করার পক্ষে নিতান্ত স্পষ্ট। এই সূরার প্রথম আয়াতত্রয় দ্বারা আল্লাহ্র মহিমা ও প্রশংসা ঘোষণা করা হয়। ৪র্থ আয়াত দ্বারা তাঁহার ইবাদত প্রচার করা হয় ও তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। ৫ম আয়াত দ্বারা সত্য ও সরল পথে চালিত করার প্রার্থনা করা হয়। অতএব, এই সূরায় যে কোরআনের যাবতীয় উদ্দেশ্য ও শিক্ষার সার রহিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কথিত আছে যে, এই সূরার ৭টি আয়াত মুসলমানদের জন্য দোযখের ৭টি দরজা বন্ধ করে। হযরত রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন যে, সর্পবিষ নষ্ট হওয়া, মৃগীরোগ আরোগ্য হওয়া, বাত, বহুমূত্র, যক্ষা, ক্ষয়কাশ ও অন্যান্য কঠিন রোগ আরোগ্য হওয়া, রিযিক বৃদ্ধি হওয়া ও মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার পক্ষে এই সূরার ফযীলত বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সূরায় রোগ আরোগ্যকারী ফযীলত আছে বলিয়া ইহাকে 'সূরায়ে শিফা' অর্থাৎ আরোগ্যকারী সূরা বলা হয়।

সূরা ফাতেহার ফযীলত

(১)

খাস আমল

"খাযীনাতুল আসরার" নামক কিতাবে লিখিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি ফজরের সুন্নত ও ফরযের মধ্য সময়ে বিসমিল্লাহসহ ২১ বার সূরা ফাতেহা পড়িবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট যে মর্তবা ও দরজা কামনা করিবে তাহাই পাইবে। এই আমলকারী দরিদ্র থাকিলে অর্থশালী হইবে, ঋণগ্রস্ত থাকিলে ঋণমুক্ত হইবে, দুর্বল থাকিলে শক্তিশালী হইবে ও প্রবাসী হইলে ধারণাতীত সম্মান লাভ করিবে। সকলের অনুরক্ত ও ভক্তিভাজন হইবে, শত্রুর চক্ষে ভয়ংকর ও বন্ধুর নিকট প্রীতিভাজন হইবে। যতদিন এই আমল করিবে, ততদিন আল্লাহ্র বিশেষ হেফাযতে থাকিবে। ৪০ দিন পর্যন্ত কাযা না করিয়া এই আমল করিলে যাহার চাকরি নষ্ট হইয়াছে সে চাকরি ফিরিয়া পাইবে। যদি বন্ধ্যা স্ত্রীলোক এই আমল করে তবে সে সন্তান লাভ করিবে। দীন-দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য এই একটিমাত্র আমল কায়েম রাখিলেই যথেষ্ট; (ফতোয়ায়ে সাফিয়া)। কিন্তু এই নিয়মে বিসমিল্লাহ্র সহিত মিলাইয়া পড়িবে। যথা ঃ—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

হইতে সূরার শেষ পর্যন্ত।

উচ্চারণ ঃ— বিসমিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহীমিল্ হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

১। এরূপ মিলাইয়া পড়িলে আল্লাহ্র "রাহমান ও রাহীম" নামের সহিত তাঁহার প্রশংসাসূচক 'হাম্দ' শব্দটি যোগ হয় বলিয়া ইহার ফযীলত বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

২। বিসমিল্লাহ্র সহিত মিলাইয়া সূরা ফাতেহা পড়িয়া প্লেগ ও কলেরা রোগীর শরীরে ফুঁক দিলে আশ্চর্যরূপে আরোগ্য হয়।

৩। অনুরূপ বিসমিল্লাহ্র সহিত মিলাইয়া ৪১ বার সূরা ফাতেহা পড়িয়া রোগীর মুখে ফুঁক দিলে ইন্শাআল্লাহ রোগ আরোগ্য হয়; (বহু পরীক্ষিত)।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই সূরা বিসমিল্লাহ্র সহিত ৪০ বার পড়িয়া প্রত্যেকবার পানিতে ফুঁকিয়া জ্বরগ্রস্ত রোগীর মুখে ছিটাইয়া দিলে ইন্শাআল্লাহ জ্বর দূর হইবে।

৫। সূরা ফাতেহা লিখিয়া ও ইহার مالك يوم الدين আয়াতটি ৭ বার লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করতঃ যে ফলের গাছে ফল ধরে না, তাহাতে ঐ পানি ছিটাইয়া দিলে ফল ধরিবে।

৬। ইহা প্রত্যহ শেষ রাত্রে ৫১ বার পড়িলে সংসার উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে ও সকল কাজ সহজসাধ্য হইবে।

৭। প্রত্যহ ফরয নামাযের পর বিসমিল্লাহসহ ৭ বার পড়িলে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য রহমতের দরজা খুলিয়া দিবেন ও ১০০ বার পড়িলে অতিসত্বর বাসনা পূর্ণ হইবে।

৮। প্রত্যহ ৩১৩ বার পড়িলে যে কোন কঠিন মতলব হউক না কেন তাহা পূর্ণ হইবে।

৯। মতলব পূর্ণ হওয়ার জন্য হযরত আলী (কারঃ) এই সূরা পাঞ্জেগানা নামাযের পর একশত বার ও ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) নির্জনে বসিয়া এক হাজার বার পড়ার ব্যবস্থা দিয়াছেন। হযরত কুতুব সাহাবুদ্দীন (রহঃ) স্বপ্নযোগে হযরত রসূল (সাঃ) হইতে সর্বপ্রকার মতলব পূরণের জন্য সূরা ফাতেহা এক হাজার বার পড়ার উপদেশ পাইয়াছিলেন।

ইহা রুযী বৃদ্ধির উৎকৃষ্ট আমল

১০। প্রত্যেক চান্দ্রমাসের প্রথম রবিবার হইতে ৭ দিন পর্যন্ত এইরূপ আমল করিবে যে, এই সূরা বিসমিল্লাহসহ প্রথম রবিবার ৭০ বার, সোমবার ৬০ বার, মঙ্গলবার ৫০ বার, বুধবার ৪০ বার, বৃহস্পতিবার ৩০ বার, শুক্রবার ২০ বার ও শনিবার ১০ বার পড়িবে; কিন্তু প্রত্যেক দিন চন্দ্রোদয় হওয়ার পর পড়িবে। ইন্‌শাআল্লাহ অবিলম্বে ইহার উপকারিতা অনুভব করিতে পারিবে। অল্প পরিশ্রমে অত্যধিক রিযিক পাওয়ার ইহাই প্রশস্ত উপায়।

১১। যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহসহ ফজরের নামাযের পর ৩০ বার, যোহরের নামাযের পর ২৫ বার ও আসরের নামাযের পর ২০ বার, মাগরিবের নামাযের পর ২৫ বার ও এশার নামাযের পর ১০ বার পড়িবে, আল্লাহ তাহার রুযী বেশী করিয়া দিবেন, তাহার সম্মান বৃদ্ধি পাইবে, মতলব পূর্ণ হইবে ও দোয়া কবুল হইবে।

১২। শয়নকালে সূরা ফাতেহা, সূরা ইখলাস, সূরা নাস, সূরা ফালাক্ব ৩ বার করিয়া পড়িলে মৃত্যু ব্যতীত সর্বপ্রকার বিপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে।

১৩। যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর ইহা ১২৫ বার পড়িবে, নিঃসন্দেহে তাহার মতলব পূর্ণ হইবে।

১৪। কারারুদ্ধ ব্যক্তি ১২১ বার পড়িয়া হাতকড়া ও পায়ের বেড়ির উপর ফুঁক দিলে শীঘ্রই তাহার মুক্তির ব্যবস্থা হইবে।

১৫। প্রবাসে যাওয়ার ও ফিরিবার সময় ৪১ বার পড়িয়া শরীরে ফুঁক দিলে ইন্‌শাআল্লাহ পথে কোন বিপদে পড়িবে না।

১৬। ফজরের নামাযের পর প্রত্যহ বিসমিল্লাহ মিলাইয়া এই সূরা ৪১ বার পড়িলে স্বাস্থ্য অটুট থাকে ও কোন ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না।

১৭। সূরা ফাতেহা ৪১ বার পড়িয়া চক্ষে ফুঁক দিলে চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় ও দাঁতের বেদনা উপশম হয়।

ফযীলতের বিশেষ বর্ণনা

এই সূরা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসাযোগে আরম্ভ হইয়াছে ও ইহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার দয়াসূচক দুইটি নাম "রাহমান ও রাহীম" বর্তমান রহিয়াছে। এই সূরা পাঠ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের স্মরণ করা হয়, সরল পথ অর্থে—সৎপথ, আল্লাহকে চিনিবার পথ, নির্ভাবনার পথ, অভাবহীন পথ, শান্তিময় ও মঙ্গলজনক পথ বুঝায়। এই সূরা একাধারে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শক্তির বর্ণনা এবং মোনাজাত। এই সকল কারণে ইহার আমল দ্বারা নানা প্রকার ফযীলত লাভ হইয়া থাকে।

মক্কায় অবতীর্ণ	اخلاص — সূরা ইখলাস (একত্ববাদ)	৪ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

١ - قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ج ٢- اَللّٰهُ الصَّمَدُ ج ٣- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ لا ٤- وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ع

উচ্চারণঃ— ক্বোল হুআল্লাহু আহাদ। ২। আল্লাহুস্ সামাদ। ৩। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ। ৪। ওয়ালাম ইয়াকুঁল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থঃ— ১। [হে মুহাম্মদ (সাঃ)] বল, আল্লাহ অদ্বিতীয় (এক)। ২। আল্লাহ কাহারও প্রত্যাশী নহেন। ৩। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তিনিও কাহারও জাত নহেন। ৪। এবং কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন।

শানে নুযূল ঃ— একজন কোরাইশ হযরত রাসূল (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার আল্লাহ্ তায়ালার সিফাত বর্ণনা করুন। তাহার উত্তরস্বরূপ এই সূরা নাযিল হয় (বোখারী)। এই সূরায় আল্লাহ্‌র যে সকল সিফাত ও শক্তির বর্ণনা হইয়াছে, তাহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি ব্যবহৃত হয় না। এইজন্য এই সূরার নাম ইখলাস অর্থাৎ 'পৃথককারী' সূরা হইয়াছে; (কোন বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক করা হয়)। এই সূরা দ্বারা আল্লাহ্‌র মহিমা ও শক্তি পৃথক করা হইয়াছে। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন না; জন্ম দিলে তাঁহার স্বভাবে সহজাতীয় দোষ দেখা দিত। তিনি কাহারও দ্বারা সৃষ্ট হন নাই; এইরূপ হইলে তাঁহাকে নিজের সৃষ্টির জন্য অন্যের উপর নির্ভর করিতে হইত ও তিনি ন্যায়পরায়ণ মহা বিচারক হইতে পারিতেন না। তিনি স্বয়ং নিরপেক্ষ এবং সমস্ত বিশ্ব-জগত তাঁহার মুখাপেক্ষী। এই সূরা দ্বারা আল্লাহ্‌র 'তৌহীদ' একত্ব ঘোষণা করা হইয়াছে, অন্য প্রাণী বা বস্তুর ইবাদতকে বাতিল করা হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালার একচ্ছত্র সিফাত ও শক্তির বর্ণনা এবং শির্‌ককে মিথ্যা ঘোষণা করা হইয়াছে বলিয়া সূরার ফযীলত অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। এই সূরা ঈমানের মূল ভিত্তি। ইহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে ঈমানদার হওয়া যায় না ও শেরেকী প্রসার লাভ করে। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই আল্লাহ তায়ালার অন্যান্য সিফাতের বিকাশ হইয়াছে। ইহা কোর্‌আনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। যে এই সূরা পাঠ করে, আল্লাহ তাহাকে অতি প্রিয় জ্ঞান করেন।

ফযীলত

১। এই সূরায় আল্লাহ তায়ালার তৌহীদের বাণী ঘোষণা করা হয় বলিয়া এই সূরা ফজর ও মাগরিবের সময় পড়িলে শেরেকী গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকা যায়, ঈমানের দুর্বলতা নষ্ট হয় ও বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

২। কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য কিংবা অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করার জন্য বিসমিল্লাহসহ এক হাজার বার লিখিতে হয়; (ইহা বহু পরীক্ষিত)।

৩। যে ব্যক্তি সর্বদা প্রাতে এই সূরা পড়িবে তাহার মঙ্গল হইতে থাকিবে, আল্লাহ তাহার নেগাহবান থাকিবেন। ইহা প্রত্যেক 'বালার' দাওয়া।

৪। এই সূরা মাটির বাসনে ৭ বার বিসমিল্লাহসহ লিখিয়া ধুইয়া রোগীকে পান করাইলে রোগ আরোগ্য হয়।

৫। ইহা বিসমিল্লাহসহ ৩১৩ বার লিখিলে মতলব পূর্ণ হয়।

৬। এশার নামাযের পর দাঁড়াইয়া ১০১ বার পড়িলে সমস্ত গোনাহ মাফ হয়।

৭। আল্লাহ্‌র গযব বন্ধ করার জন্য ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। যখন পুরুষে পুরুষে সঙ্গম করিতে আরম্ভ করে, সেই সময় আল্লাহ্‌র আরশ কাঁপিতে থাকে ও সমস্ত আকাশ ভাঙ্গিয়া ধরাতলে পড়িবার উপক্রম হয়, তখন ফেরেশ্‌তাগণ আরশের কিনারা ধরিয়া সূরা ইখলাস পড়িয়া আল্লাহ্ গযব ঠাণ্ডা করেন।

৮। হযরত আলী (কারঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি কবরস্থানে যাইয়া সূরা ইখলাস ১১ বার পাঠ করিয়া মৃত ব্যক্তিগণের রূহের উপর বখ্‌শিয়া দেয়, সেই ব্যক্তি কবরস্থানের সমস্ত কবরবাসীগণের সম-সংখ্যক নেকী লাভ করে।

মক্কায় অবতীর্ণ	الناس —— সূরা নাস (মানব)	৬ আয়াত

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

١- قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ٢- مَلِكِ النَّاسِ ٣- اِلٰهِ النَّاسِ ٤- مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ٥- الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ٦- مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ○

উচ্চারণঃ— ১। ক্বোল আউযু বিরাব্বিন্নাসি, ২। মালিকিন্নাসি, ৩। ইলাহিন্নাস, ৪। মিন্ শাররিল ওয়াস্‌ওয়াসিল খান্নাস্, ৫। আল্লাযী ইউওয়াসবিসু ফী সুদূরিন্নাসি, ৬। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

অর্থঃ— ১। [হে মুহাম্মদ (সাঃ)!] বল যে, আমি আশ্রয় লইতেছি মানবের প্রতিপালকের, ২। মানবের অধিপতির, ৩। ও উপাস্যের নিকট, ৪। লুক্কায়িত কুমন্ত্রণাদাতার (শয়তানের) অনিষ্ট হইতে, ৫। যে মানবের অন্তঃকরণে কুভাব আনিয়া দেয়, ৬। জ্বিন ও মানুষের মধ্য হইতে।

শানে নুযূলঃ— ইহা কোরআনের শেষ সূরা। লোবাঈদ ইব্‌নে আসেম নামক এক ব্যক্তি জনৈকা ইহুদী স্ত্রীলোকের সহযোগে হযরত রাসূল (সাঃ)কে জাদু করিয়া ৬ মাসকাল রোগগ্রস্ত করিয়া রাখে। হযরত (সাঃ) স্বপ্নযোগে জানিতে পারেন যে, শত্রুগণ তাঁহার মাথার চুল হরণ করতঃ তাঁহাকে জাদুমন্ত্র করিয়া ১১টি

গিরা দিয়া একটি গভীর কূপের মধ্যে পাথর চাপা দিয়া রাখিয়াছে। চুলটি কূপ হইতে উঠান হইলে হযরত জিব্রাইল (আঃ) ১১টি আয়াতবিশিষ্ট এই সূরা ও পরবর্তী সূরা ফালাক্ব লইয়া উপস্থিত হন। ইহাদের এক একটি আয়াত পড়িয়া এক একটি গিরার উপর ফুঁক দেওয়া মাত্র চুলের গিরাগুলি খুলিয়া যায়। সফরের চাঁদের শেষ বুধবার আল্লাহ্র রহমতে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই মহাসঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া সুস্থ হইয়া উঠেন। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়াই মুসলমানগণ সফর চান্দের শেষ বুধবার 'আখেরী চাহার শোম্বা' উপলক্ষে মৌলুদ, খতম ইত্যাদি পড়াইয়া অশেষ সওয়াব হাসিল করেন ও আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। এই সূরা দুইটিকে 'মোওয়ায্ যাতাইন' (দ্বিবিধ আশ্রয়) বলা হয়। হযরত (সাঃ) এর উপর জাদু নষ্ট করার উপলক্ষ করিয়া এই সূরা দুইটি নাযিল হওয়ায় ইহারা বিশেষরূপে তাবীযের জন্য ব্যবহৃত হয়। অনেকেই এই সূরা দুইটিকে জাদু-টোনা নষ্ট করার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। কু-লোকের শত্রুতা ও অনিষ্ট নিবারণের পক্ষে এই সূরা দুইটি অত্যন্ত কার্যকরী। ইহাদের মধ্যে জাদুকর ও কু-লোকের অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা আছে বলিয়া ইহারা এই গুণ ও শক্তি লাভ করিয়াছে। অনেকে এই সূরা ২টিকে একই সূরার দুইটি অংশ বলিয়া মনে করেন। ইহাদের ফযীলত একইরূপ বলিয়া একত্রে দেওয়া গেল।

ফযীলত

১। এই সূরা দুইটি পড়িয়া শরীরে ফুঁক দিলে ও লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে সকল প্রকারের বেদনা, জাদু ও বদ-নযর দূর হয়। শুইবার সময় পড়িয়া শুইলে সকল প্রকার বিপদ ও শত্রুর অনিষ্ট হইতে নিরাপদ থাকা যায়। কাগজে লিখিয়া ছোট শিশুদের গলায় বাঁধিয়া দিলে বদ নযর লাগিতে পারে না। হাকিমের নিকট যাইবার সময় পড়িলে তাহার ক্রোধ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

২। শয়নকালে এবং ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর সূরা ইখলাস, সূরা নাস ও সূরা ফালাক্ব তিনবার করিয়া পড়িয়া সমস্ত শরীরে ফুঁক দিলে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৩। জুমুয়ার নামাযের পর উপরোক্ত প্রত্যেকটি সূরা ৭ বার পড়িলে পরবর্তী জুমুয়া পর্যন্ত নিরাপদ থাকা যায়।

৪। সূরা নাস ও সূরা ফালাক্ব ৪১ বার পড়িয়া জাদুগ্রস্ত লোকের উপর কিংবা যে কোন রোগীর উপর ৭ বার ফুঁক দিলে আরোগ্য লাভ করে।

৫। এই সূরা একশত কিংবা এক হাজার বার পড়িলে শয়তানী খেয়াল দূর হয়।

৬। হযরত আকবা ইবনে ওমর হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনার জন্য এই সূরা ২টির ন্যায় আর কোন উত্তম প্রার্থনা নাই; (তফসীর কাদেরী)।

মক্কায় অবতীর্ণ	الفلق। —— সূরা ফালাক্ব (ভোর)	৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

١- قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ ٢- مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ ٣- وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ ٤- وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ ٥- وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ؏

উচ্চারণঃ— ১। ক্বোল আঊযু বিরাব্বিল ফালাক্ব, ২। মিন্ শার্‌রি মা খালাক্ব, ৩। ওয়া মিন্ শার্‌রি গাসিকিন্ ইযা ওয়াক্বাব, ৪। ওয়া মিন্ শার্‌রিন্ নাফ্ফাসাতে ফিল উ'ক্বাদ, ৫। ওয়া মিন্ শার্‌রি হাসিদিন্ ইযা হাসাদ।

অর্থ ঃ— ১। [মুহাম্মদ (সাঃ)!] বল—আমি আশ্রয় লইতেছি প্রভাত কালের প্রভুর নিকট, ২। তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অনিষ্ট হইতে। ৪। এবং গ্রন্থিসমূহে ফুঁৎকারকারিণীগণের (জাদুকর স্ত্রীলোক) অনিষ্ট হইতে। ৫। এবং হিংসুকগণ যখন হিংসা করে তাহাদের অনিষ্ট হইতে।

খাসিয়তঃ—১। এই সূরা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা করা হইয়াছে, সেইজন্য ইহার আমল দ্বারা কু-লোকের অনিষ্ট হইতে এবং পার্থিব ও পরলোকের বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

২। বালক-বালিকা, দাস-দাসী ও গরু-ঘোড়ার কানে এই সূরা পড়িয়া ফুঁক দিলে তাহাদের অবাধ্যতা ও অসৎ স্বভাব দূর হয়।

৩। কোন ব্যক্তির উপর বদ আসর হইলে উহা পড়িয়া দম করিলে জাদু ও আসর নষ্ট হয়।

মক্কায় অবতীর্ণ	اللهب —সূরা লাহাব (অগ্নিশিখা)	৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

١- تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ○ ٢- مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ○ ٣- سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ○ ٤- وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ○ ٥- فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ○

উচ্চারণঃ— ১। তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিঁও ওয়া তাব্বা, ২। মা আগনা আন্হু মালুহু ওয়ামা কাসাব, ৩। সাইয়াস্লা নারান যাতা লাহাবিঁও, ৪। ওয়ামরাআতুহু হাম্মালাতাল হাতাব, ৫। ফী জীদিহা হাব্লুম মিম্মাসাদ।

অর্থ ঃ— ১। আবু লাহাবের হস্ত দুইটি নষ্ট হইয়াছে এবং সে নিজেও বিনষ্ট হইয়াছে, ২। তাহার ধন-সম্পদ তাহার কোন কাজে লাগে নাই, ৩। শীঘ্রই সে অগ্নিশিখায় নিক্ষিপ্ত হইবে, ৪। এবং তাহার কাষ্ঠবহনকারী পত্নী, ৫। যাহার গলায় খেজুর পাতার দড়ি আটকাইয়া রহিয়াছে।

শানে নুযূল ঃ— আবু লাহাব হযরত (সাঃ)এর পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিল। তাহার স্ত্রী আবু সুফিয়ানের ভগ্নী উম্মে জমিলা। আবু লাহাব ও তাহার স্ত্রী হযরত (সাঃ)কে কষ্ট দিবার জন্য এমন কি প্রাণে মারিয়া ফেলিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিত। উম্মে জমিলা সর্বদা হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে নানাপ্রকার দুর্নাম ও কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইত এবং জঙ্গল হইতে কাঁটা সংগ্রহ করিয়া রাত্রিযোগে হযরতের যাতায়াতের পথে বিছাইয়া রাখিত। আবু লাহাব পরম রূপবান পুরুষ ছিল। তাহার মুখমণ্ডল আগুনের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল বলিয়া লোকে তাহাকে আবু লাহাব অর্থাৎ আগুনের পিতা বলিয়া ডাকিত। কর্মফলের দোষে পরিণামে অস্পৃশ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া বিনাচিকিৎসায় তাহার মৃত্যু হয়। তাহার স্ত্রীও শেষ জীবনে কাষ্ঠ বহন করিয়া অতি কষ্টে জীবন যাপন করিয়াছিল। একদা তাহার স্ত্রী কাঁটার বোঝা লইয়া যাইবার সময় হঠাৎ বোঝা উল্টাইয়া গিয়া খেজুর পাতার দড়িতে ফাঁসি লাগিয়া যায় এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে। এই সূরার শেষ আয়াতে তাহার ঐরূপ অপমৃত্যুর উল্লেখ হইয়াছে।

শিক্ষা ঃ— ১। এই সূরা মানবকে এই শিক্ষা দিতেছে যে, যাহারা সর্বদা অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে ও কুৎসা রটনা করিয়া বেড়ায়, তাহাদের পরিণাম অতি শোচনীয় ও ভয়াবহ হইয়া থাকে। ধন-সম্পদ ও লাবণ্য মানুষকে পাপের পরিণাম হইতে বাঁচাইতে পারে না। আবু লাহাব ও তাহার স্ত্রীর শেষ দশাই তাহার প্রমাণ।

খাসিয়ত ঃ— ১। শত্রু দমন করার আবশ্যক হইলে এই সূরা প্রত্যহ অনেকবার পড়িবে। হযরত (সাঃ)এর শত্রুগণের ধ্বংস হওয়ার বর্ণনা আছে বলিয়া এই সূরার আমল দ্বারা শত্রু দমন করা যায়।

২। এই সূরা কাগজে লিখিয়া বেদনার স্থানে বাঁধিয়া দিলে বেদনা কমিয়া যায়।

মক্কায় অবতীর্ণ	نصر —সূরা নাসর (সাহায্য)	৩ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ ٢- وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ ٣- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۚ

উচ্চারণ ঃ— ১। ইযা জায়া নাস্রুল্লাহি ওয়াল ফাত্হু। ২। ওয়ারাআইতান্নাসা ইয়াদ্খুলূনা ফি দীনিল্লাহি আফওয়াজা। ৩। ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াসতাগফিরহু ইন্নাহু কানা তাওয়াবা।

অর্থ ঃ— ১। যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসিবে, ২। এবং তুমি লোকদিগকে দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে, ৩। তখন তুমি আপন প্রতিপালকের প্রশংসাময় পবিত্রতা ঘোষণা করিবে ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল।

শানে নুযূল ঃ— ইমাম বাইহাকী ইব্নে ওমরের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, বিদায় হজ্জের দিন মিনায় এই সূরা নাযিল হয়। এই সূরায় হযরত (সাঃ)কে আল্লাহ্র ভাবী সাহায্য ও মক্কা বিজয়ের আভাস দেওয়া হইয়াছে এবং প্রকারান্তরে হযরত (সাঃ) এর আসন্ন ওফাত শরীফের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। ইহা নাযিল

হওয়ার কিছুদিন পরই হযরত (সাঃ) ইন্তেকাল করেন। এই সূরা মানুষকে ধৈর্যশীল ও আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়। মানুষ যখন নিজ সাধনায় সফলতা লাভ করে, তখন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, ইহাতে সফলতার অহংকার দূর হইয়া যায়।

খাসিয়ত ঃ— ১। এই সূরা রাঙ্গের মধ্যে খোদাই করিয়া জালের সঙ্গে বাঁধিয়া দিলে জালে অত্যধিক মৎস্য ধৃত হয়। এই সূরায় দলে দলে লোক প্রবেশ করার আল্লাহ্‌র একটি আদেশবাণী আছে। জালের মধ্যে দলে দলে লোক প্রবেশ করা সম্ভবপর নহে, ইহাতে যাহা প্রবেশ করিতে পারে তাহাই প্রবেশ করিবে। অর্থাৎ দলে দলে মাছ প্রবেশ করিবে। এইরূপে সূরায় বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার উপরোক্ত আদেশবাণী তামিল হইয়া থাকে।

২। উপরোক্ত কারণে এই সূরায় আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও বিজয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া এই সূরা কাঠের মধ্যে খোদাই করিয়া দোকানে লটকাইয়া রাখিলে গ্রাহক সংগ্রহ হয়; ইহা জয়ের সূরা।

মক্কায় অবতীর্ণ	الكفرون -সূরা কাফিরূন (কাফেরগণ)	৬ আয়াত

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

١- قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ٢- لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ○ ٣- وَلَاۤ

اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ○ ٤- وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ○ ٥- وَلَاۤ اَنْتُمْ

عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ○ ٦- لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ○

উচ্চারণঃ— ১। ক্বোল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূনা। ২। লা আ'বুদু মা তা'বুদূনা ৩। ওয়ালা আন্তুম আ'বিদুনা মা আ'বুদ। ৪। ওয়ালা আনা আ'বিদুম মা আ'বাদতুম ৫। ওয়ালা আন্তুম আ'বিদূনা মা আ'বুদ ৬। লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন।

অর্থঃ— [হে মুহাম্মদ (সাঃ)!] ১। বল— হে অবিশ্বাসী দল। ২। আমি তাহার এবাদত করি না, তোমরা যাহার এবাদত কর। ৩। এবং আমি যাঁহার এবাদত

করি তোমরা তাঁহার এবাদত কর না। ৪। তোমরা যাহার পূজা কর, আমি তাহার পূজক নহি। ৫। আমি যাহার এবাদত করি তোমরা তাঁহার এবাদত কর না। ৬। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (কর্মফল) এবং আমার জন্য আমার ধর্ম (কর্মফল)।

শানে নুযূলঃ— শত অত্যাচার, অবিচার ও বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)এর উৎসাহ ও ইসলাম ধর্মের প্রসার কিছুতেই নষ্ট হইতেছে না দেখিয়া আবুজেহেল প্রমুখ কাফেরগণ হযরত (সাঃ)এর নিকট হইতে তাঁহার চাচা আব্বাসের মারফত প্রস্তাব পাঠাইলেন যে, আর বিবাদ-বিসম্বাদে কাজ নাই। মুহাম্মদ আমাদের দেব-দেবীর পূজা করুক আমরাও তাঁহার আল্লাহ্‌র উপাসনা করিব। আপাততঃ না হয় এক বৎসরের জন্য এরূপ মিটমাট হইয়া যাক। এই প্রস্তাবের উত্তরে এই সূরা নাযিল হয়।

শিক্ষাঃ— এই সূরা এই শিক্ষা দিতেছে যে, আল্লাহ্‌র এবাদতে বিন্দুমাত্র অংশীদার স্থির করা যায় না। তৌহীদ অতি পবিত্র ও অখণ্ডনীয়। কুফরী ও ইসলামের মধ্যে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে, তৌহীদ ও শেরেকীর মধ্যে কোন প্রকার মধ্যপন্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর নহে। ইসলামের তৌহীদ নিঃসন্দেহে আপোষহীন। তৌহীদকে সর্বদা সকল অবস্থায় শিরক হইতে পবিত্র রাখার জন্য এই সূরা মুসলমানকে সাবধান করিয়া দিতেছে। ইহা সূরা ইখ্‌লাসের তফসীর রূপে ধরা যাইতে পারে।

খাসিয়তঃ— আল্লাহ তায়ালার তৌহীদকে দৃঢ় বিশ্বাসে আঁকড়াইয়া ধরার ও শেরেকীকে সর্বদা ও সকল অবস্থায় মিথ্যাজ্ঞানে বর্জন করার উপদেশবাণী লইয়া এই সূরা নাযিল হইয়াছে বলিয়া উহার প্রধান ফযীলত এই হইয়াছে যে, সকালে ও সন্ধ্যায় পড়িলে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান দৃঢ় হয়, মনে শেরেকীর ধারণা বিন্দুমাত্র আসিতে পারে না।

মক্কায় অবতীর্ণ	الكوثر —সূরা কাউসার (প্রচুরতা)	৩ আয়াত

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

١- اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ○ ٢- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ○

٣- اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ○

উচ্চারণঃ— ১। ইন্না আ'তোয়াইনা কালকাউসার। ২। ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ান্‌হার। ৩। ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আব্‌তার।

অর্থঃ— ১। [হে মুহাম্মদ (সাঃ)!] নিশ্চয় আমি তোমাকে কাউসার * দান করিয়াছি। ২। অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্য নামায পড় ও কোরবানী কর। ৩। নিশ্চয় তোমার শত্রু লেজ কর্তিত (নির্বংশ)।

শানে নুযূলঃ— হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পুত্রগণ পর পর পরলোক গমন করায় কাফেরগণ আনন্দিত হইয়া হযরত (সাঃ)কে "আবতার" অর্থাৎ নির্বংশ বলিয়া ঘৃণা করিতে থাকে ও উল্লাস করিয়া প্রচার করিতে থাকে যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বীন ইসলাম ও খ্যাতি লোপ পাইয়া যাইবে। তাহাদের এইরূপ বিদ্রূপে হযরত (সাঃ)এর প্রাণে আঘাত লাগে। ইহা নিবারণের জন্য এই সূরা নাযিল হয় এবং বলিয়া দেওয়া হয় যে, যাহারা এইরূপ উল্লাস করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারাই ধ্বংস হইয়া যাইবে। বর্তমান জগতে ৬০ কোটি মুসলমান ইহার সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের হযরত (সাঃ) অমর হইয়া রহিয়াছেন, কেয়ামত পর্যন্ত তাঁহার ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ও কোটি কোটি ভক্ত উম্মতগণ তাঁহার পবিত্র রূহ মোবারকের উপর দরূদ শরীফ পড়িতে থাকিবে। আযানে, দরূদে ও কলেমায় তাঁহার মধুনাম উচ্চারিত হইবে। যাহারা তাঁহার প্রতি এইরূপ বিদ্রূপ করিয়াছিল, তাহারাই নির্বংশ হইয়াছে, তাহাদের অস্তিত্ব পৃথিবীর বুক হইতে মুছিয়া গিয়াছে। হযরত রাসূল (সাঃ)কে কাফেররা নির্বংশ বলিয়া গালি দিয়াছিল বলিয়া কোন অপুত্রক ব্যক্তিকে নির্বংশ বলিয়া গালি দেওয়া প্রকারান্তরে অত্র সূরাটিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

খাসিয়তঃ—১। জুময়ার রাত্রে এই সূরা এক হাজার বার ও দরূদ শরীফ এক হাজার বার পড়িলে স্বপ্নে হযরত রসূল (সাঃ)এর যিয়ারত লাভ হয়।

২। নির্জন স্থানে বসিয়া ৩০০ বার পড়িলে শত্রু দমন হয় ও শত্রুর উপর জয়লাভ করা যায়। হযরত (সাঃ)এর শত্রুগণের শত্রুতা উপলক্ষে এই সূরা নাযিল হওয়ায় ইহার আমল দ্বারা এইরূপ ফযীলত লাভ হয়।

৩। রুযী বৃদ্ধি, মান-ইয্‌যত লাভের জন্য ও প্রত্যেক প্রকার মকসুদ পূর্ণ হওয়ার জন্য এবং জেল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক হাজার বার পড়িবে।

---

* কাউসার বেহেশ্‌তের একটি নহরের নাম। হযরত রসূল (সাঃ) হাশরের দিন ইহার মধুতুল্য পানি আপন উম্মতগণকে পান করাইবেন। (তফসীর কাদেরী) এইখানেই ইহ-পরকালের অফুরন্ত নেয়ামত ও অশেষ মঙ্গল বুঝায়।

৪। গোলাপ পানির উপর পড়িয়া প্রত্যহ ঐ পানি চক্ষে দিলে চক্ষের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পায়।

মক্কায় অবতীর্ণ	الماعون –সূরা মাউন (ব্যবহার্য দ্রব্য)	৭ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- أَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝ ٢- فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝ ٣- وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ ٤- فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ ٥- الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ ٦- الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ۝ ٧- وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

উচ্চারণঃ— ১। আরাআইতাল্লাযী ইউকায্‌যিবু বিদ্দীন। ২। ফাযালিকাল্লাযী ইয়াদোওল ইয়াতীম। ৩। ওয়া লা ইয়াহোদ্দো আ'লা তোয়ামিল মিসকীন। ৪। ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লিন। ৫। আল্লাযীনা হুম আন্ সালাতিহিম সাহুন। ৬। আল্লাযীনাহুম ইউরাউন। ৭। ওয়া ইয়ামনাউনাল মাউন।

অর্থঃ— তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ, যে কেয়ামত মিথ্যা জ্ঞান করে? ২। অনন্তর সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে * তাড়াইয়া দেয়। ৩। এবং কখনও দুঃখীকে অন্ন দিয়া উৎসাহ দেয় না। ৪। অনন্তর আক্ষেপ সেই নামাযীদিগের জন্য, ৫। যাহারা নামাযে ভুল ও আলস্য করে, ৬। যাহারা লোক দেখানো নামায পড়ে। ৭। এবং সাধারণ গৃহ-ব্যবহার্য দ্রব্য (অপরকে) ব্যবহারের জন্য দেয় না।

---

* এতীমগণ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দয়া ও হেফাযতের পাত্র। এতীমের উপর অত্যাচার হইলে আল্লাহ্‌র আরশ কাঁপিয়া উঠে। আমাদের হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এতীম ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে "আবু তালেবের এতীম" বলিয়া ডাকিত। এতীম তাঁহার একটি নাম। এতীমগণ আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া 'এতীম' শব্দটি তাঁহার নিকট অতি প্রিয় ও বিশেষভাবে রক্ষিত। পরীক্ষার পর দেখা গিয়াছে কোরআনের যে আয়াত শরীফে 'এতীম" শব্দ আছে, তাহার উপর মধু লাগাইয়া খোলা জায়গায় রাখিয়া দিলে পীপিলিকাগণ এতীম শব্দ বাদ দিয়া অন্যান্য শব্দের উপরিস্থিত মধু পান করে; (মুসনদে ইমাম আযম)।

হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, যে পরিবারে এতীমের আদর হয় সেই পরিবারই উত্তম। তিনি আরও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এতীমের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে সেই ব্যক্তি বেহেশ্‌তের মধ্যে আমার সঙ্গে বাস করিবে।

শানে নুযূল ঃ— অধিকাংশ সাহাবাগণের মতে এই সূরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই সূরার প্রথম ভাগে মোনাফেক আস্ ইব্নে আবু ওয়ায়েলের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে ও শেষ অর্ধেকে কৃপণ আবদুর রহমান ইব্নে আবু মুনাফের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং মোটামুটিভাবে ভুল পথ অনুসরণকারী ও মুনাফেকগণের সর্বনাশের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তফ্সীরে বায়যাবীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবুজেহেল কোন এতীম ছেলের সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী ছিল। একদিন সেই এতীম বস্ত্রহীন উলঙ্গ অবস্থায় তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া টাকা চাহিলে আবুজেহেল তাহাকে কর্কশ ভাষায় তাড়াইয়া দেয়। আবু সুফিয়ান একটি উট যবেহ করিলে এক এতীম আসিয়া কিছু গোশ্ত চাহিয়াছিল। আবু সুফিয়ান রাগান্বিত হইয়া একটি লাঠি দ্বারা সেই এতীমের মাথায় খুব জোরে আঘাত করিয়াছিলেন। ইহাতে আল্লাহ তাহাদের উপর খুব অসন্তুষ্ট হইয়া এই সূরা নাযিল করেন এবং তাহাদিগকে দোযখের ভয় প্রদর্শন করেন ও তৎসঙ্গে অমনোযোগী নামাযীদের শাস্তির কথা বর্ণনা করেন।

শিক্ষাঃ— এই সূরায় কেয়ামতে বিশ্বাসহীন ব্যক্তিগণের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা কেয়ামত বিশ্বাস করে না, তাহারা সাধারণতঃ পার্থিব সুখ-দুঃখের বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকে। কামনার আয়েশে ইন্দ্রিয়-সুখই তাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাইয়া যায়, দরিদ্রের প্রতি স্নেহ-মমতা, সামাজিক আদান-প্রদান ও সাহায্য ইহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করে। এতীমগণ তাহাদের নিকট হইতে বিতাড়িত হয়, গৃহহীন, নিঃসহায়রা তাহাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয়; তাহারা শুধু এক কামনা দ্বারা চালিত হয় ও ইহকাল-সর্বস্ব হইয়া পড়ে। তাহারা মুখে কেয়ামত বিশ্বাস করে ও নামায পড়ে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহারা নাস্তিক। সেইজন্য আল্লাহ তায়ালা এইরূপ হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য মোনাফেকগণের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে— হে মুহাম্মদ (সাঃ)! তুমি কি এমন লোকও দেখিয়াছ? যাহারা কেয়ামত অবিশ্বাস করে। এইরূপ লোক নিয়ম পালন করার জন্য ও পরহেযগারী দেখাইবার জন্য নামায পড়িয়া আল্লাহ তায়ালাকে ধোকা দিবার অপচেষ্টা করে। তাহারা মনের ও আত্মার উন্নতির জন্য নামায পড়ে না। প্রকৃত নামায এমনই একটি পরশ-পাথর, যাহা অপকর্ম ও খোদাদ্রোহিতা নষ্ট করে, কার্য ও সময়ের শৃঙ্খলা আনয়ন করে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মজ্জাগত করিয়া দেয়, কর্ম ও চরিত্রের আদর্শ উন্নত করিয়া তোলে, বিশেষ করিয়া আল্লাহ্র প্রতি ভক্তি, একাগ্রতা ও ভয় জাগাইয়া দেয়। নামাযের এই সকল উদ্দেশ্যের প্রতি যাহারা উদাসীন, তাহারা কেয়ামত বিশ্বাস করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা মোনাফেক, তাহাদের সর্বনাশ অনিবার্য।

নীতিঃ— প্রতিবেশীগণের মধ্যে পরস্পর গৃহ-ব্যবহার্য দ্রব্য আদান-প্রদান করার কথা এই সূরায় উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা সামাজিক জীবনের ভিত্তি। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই মানুষ সামাজিক জীবনে পরস্পর সাহায্য লাভ করিয়া টিকিয়া আছে। এই সূরা নৈতিক শিক্ষা, মনের পবিত্রতা ও সামাজিক আদান-প্রদানের নীতি শিক্ষা দিতেছে। কোর্আন যে সমাজ বিজ্ঞানেরও মহাগ্রন্থ, এই সূরা তাহার প্রমাণ।

খাছিয়তঃ— ১। গৃহ-দ্রব্য প্রতিবেশীকে ব্যবহারের জন্য দিবার উপদেশ লইয়া এই সূরা নাযিল হইয়াছে, এইজন্য এই সূরার নাম 'মাউন' হইয়াছে। ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর এই সূরা পড়িয়া ফুঁক দিলে জিনিসপত্র নিরাপদ থাকে।

৩। যে ব্যক্তি যোহরের নামাযের পর এই সূরা ৪১ বার পড়িবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাহার রুযী-রোযগার বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

মক্কায় অবতীর্ণ	قريش—সূরা ক্বোরাইশ (কোরেশগণ)	৪ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ ٢- اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ

٣- فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ ٤- الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ع

উচ্চারণঃ— ১। লিঈলাফি ক্বোরাইশিন। ২। ঈলাফিহিম রিহ্লাতাশ্ শিতা-ই ওয়াস্সাইফ। ৩। ফাল্ইয়া'বুদূ রাব্বা হাযাল বাইত। ৪। আল্লাযী আত্আমাহুম মিন জুইওঁ ওয়া আ-মানাহুম মিন খাউফ।

অর্থঃ— ১। আশ্চর্য ক্বোরাইশদের অনুরাগ। ২। তাহাদের অনুরাগ শীত ও গ্রীষ্মকালে তাহাদের বিদেশ যাত্রার জন্য। ৩। অতএব তাহাদের উচিত এই গৃহের (কা'বা শরীফের) প্রভুর (আল্লাহ্‌র) ইবাদত করা। ৪। যিনি তাহাদিগকে ক্ষুধায় অন্নদান করিয়াছেন ও (শত্রুর) ভয় হইতে নিরাপদ করিয়াছেন।

শানে নুযূলঃ— কেহ কেহ এই সূরাকে সূরা ফীলের অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ সূরা ফীলের সহিত এই সূরার সম্পর্ক রহিয়াছে। সূরা ফীলে আব্‌রাহার সৈন্য ধ্বংস করিয়া আল্লাহ তায়ালা মক্কাবাসীগণের যে উপকার করিয়াছেন, এই সূরায় সেই উপকারের জন্য তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কথা বলা হইয়াছে। ক্বোরাইশগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)এর বংশধর। তিনি কা'বা শরীফ নির্মাণ করিবার সময় আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন যে, "হে আমার প্রতিপালক! এই নগরকে (মক্কা) শান্তিপূর্ণ কর এবং ইহার অধিবাসীগণকে ফলজাত দ্রব্য দ্বারা উপজীবিকা দান কর।" আল্লাহ তাঁহার এই দোয়া কবুল করেন ও মক্কা মরুভূমি বলিয়া ইহার নিকটবর্তী 'তায়েফ' নামক ভূ-খণ্ডকে উর্বর করিয়া দেন। মক্কাবাসীগণ সেখান হইতে ফলমূল পাইতে থাকে। ক্বোরাইশগণ শীতকালে ইয়ামন দেশে, গ্রীষ্মকালে সিরিয়া (শাম) দেশে বাণিজ্য করিয়া বিপুল অর্থ লাভ করিত। আল্লাহ তায়ালা আব্‌রাহাকে ধ্বংস করিয়া ক্বোরাইশগণের বাণিজ্যের পথ আরও প্রশস্ত করিয়া দিলেন। আল্লাহ তায়ালা প্রসারতার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া কা'বা ঘরে আল্লাহ্‌র ইবাদত কায়েম রাখার জন্য তাকীদ করিয়াছেন। কা'বা শরীফ মুসলিম জাতির লক্ষ্য ও কেন্দ্রস্থল। এই কেন্দ্রের উপরই মুসলিম জাতীয় জীবনের যোগসূত্র ও শৃঙ্খলা নির্ভর করিতেছে। সুদৃঢ় কেন্দ্রের বলেই জাতীয় জীবন স্থায়ী হয়। কা'বা শরীফ মুসলমানদের অন্তরের প্রদীপ ও জাতীয় জীবনের ভিত্তি। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়া ইসলাম বাঁচিয়া আছে। ইহার আকর্ষণে মুসলিম জাহান একদিকে ও এক লক্ষ্যে ধাবিত হইতেছে। এই কেন্দ্র বেষ্টন করিয়াই আল্লাহ্‌র ইবাদত গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহুদীগণ এই কেন্দ্রচ্যুত হইয়াই রাজ্যহারা হইয়া ভবঘুরের মত পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে। যে দিন মুসলমানগণ এই কেন্দ্রভ্রষ্ট হইবে সে দিন তাহারা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবে ও তাহাদের পতন অনিবার্য হইয়া পড়িবে। যে পর্যন্ত তাহারা কা'বা শরীফ পবিত্র রাখিবে, সে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করিতে থাকিবে।

খাসিয়তঃ—১। শত্রুর উপর জয়লাভের জন্য ফজরের নামাযের পর একশত বার দরূদ শরীফ পড়িয়া এক হাজার বার এই সূরা পড়িবে এবং পুনরায় একশত বার দরূদ শরীফ পড়িবে ও শত্রুর উপর জয়লাভের জন্য প্রার্থনা করিবে। এই নিয়মে ৭ দিন পড়িবে। এই সূরার শেষ আয়াতে শত্রুর ভয় হইতে নিরাপদ রাখার আল্লাহ্‌র একটি আশ্বাসবাণী আছে, সেইজন্য ইহার বরকতে এই আমল দ্বারা শত্রুর উপর জয়লাভ হয়।

২। খাদ্যদ্রব্যের উপর এই সূরা পড়িয়া ফুঁক দিয়া খাইলে খাদ্যে কোন অজ্ঞাত খারাপ বস্তু থাকিলে তাহাতে ক্ষতি হইবে না।

মক্কায় অবতীর্ণ	الفيل —সূরা ফীল (হাতী)	৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

١- اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ○ ٢- اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ٣- وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ○ ٤- تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ○ ٥- فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ○

উচ্চারণঃ—১। আলাম তারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বিআস্‌হাবিল ফীল। ২। আলাম্ ইয়াজ্‌আ'ল কাইদাহুম ফী তাদ্‌লীলিওঁ। ৩। ওয়া আরসালা আলাইহিম তাইরান আবাবীল। ৪। তারমীহিম বিহিজারাতিম মিন্ ছিজ্জীল। ফাজাআ'লাহুম কাআছ্‌ফিম্ মা'কুল।

অর্থঃ—১। তুমি কি দেখ নাই; তোমার প্রভু হাতী মালিকগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? ২। তিনি কি তাহাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দেন নাই? ৩। এবং তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে দলে দলে আবাবীল পাখী পাঠাইয়াছিলেন। ৪। যাহারা (পাখীরা) তাহাদের উপর কঙ্করের শিলা নিক্ষেপ করিয়াছিল। ৫। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে চর্বিত ঘাসের ন্যায় করিয়াছিলেন।

শানে নুযূলঃ— কা'বা শরীফ আরবের লোকের নিকট অতি আদরের ও সম্মানের গৃহ ছিল। ইয়ামনের খৃষ্টান শাসনকর্তা আব্‌রাহা ভাবিল, যদি তাহার দেশে এমন একটি মন্দির তৈয়ার করা যায় তাহা হইলে লোকেরা

কা'বা শরীফ ছাড়িয়া তাহার মন্দিরে উপাসনা করিতে আসিবে, তাহাতে তাহার দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক উন্নতি হইবে। এই ভাবিয়া সে ইয়ামনের রাজধানী 'সানা' নগরে মর্মর পাথর দ্বারা 'ফালস' নামক এক মনোরম গির্জা তৈয়ার করিয়া উহার ভিতর অনেকগুলি মূর্তি স্থাপন করিল। কিন্তু আরবের লোকেরা তাহার মতলব বুঝিতে পারিয়া তাহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং তাহার মন্দিরে প্রবেশ করিল না। বরং "নওফেল" নামক এক আরব্য যুবক তাহার মন্দির অপবিত্র করিয়া আসিল। এই সকল কারণে আব্‌রাহা বুঝিতে পারিল যে, কা'বা শরীফ বর্তমান থাকিতে তাহার মন্দিরের সমাদর হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব স্থির করিল, কা'বা শরীফ ধ্বংস করিয়া ভূমিসাৎ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আব্‌রাহা বহুসংখ্যক হাতী ও সৈন্য লইয়া কা'বা শরীফের ঘর ভাঙ্গিতে রওয়ানা হইল। আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমে 'আবাবিল' নামক এক প্রকার সবুজ বর্ণের ক্ষুদ্র পাখী তাহাদিগকে শূন্যপথে আক্রমণ করিল। প্রত্যেক পাখীর মুখে একটি ও দুই পায়ে দুইটি পাথর ছিল। তাহারা একটি করিয়া পাথর আব্‌রাহার সৈন্য ও হাতীর উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এইরূপে আকাশপথে আক্রান্ত হইয়া আব্‌রাহার সমস্ত হাতী ও সৈন্য ধ্বংস হইয়া গেল। পাথরের আঘাতের চোটে সৈন্যগণের শরীর পচিতে লাগিল এবং তাহাদের মধ্যে বসন্ত রোগ দেখা দিল। পৃথিবীতে এই সময়ই সর্বপ্রথম বসন্ত রোগের আবির্ভাব হয়। হযরত রাসূল (সাঃ) এর জন্মের ১ মাস ৬ দিন পূর্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

শিক্ষাঃ— এই সূরা মানবকে এই শিক্ষা দিতেছে যে, আল্লাহ্ তায়ালার শক্তি ও কুদরতের নিকট কোন শক্তিই টিকিতে পারে না এবং আল্লাহ্ সহায় থাকিলে দুর্বলও প্রবলকে পরাস্ত করিতে পারে। এই সূরা 'লা হাওলায়' নিহিত মর্মের সাক্ষ্য দিতেছে।

আমরা দেখিতে পাই যে, কোন কোন সময় অতি নগণ্য তেজি ব্যক্তি আপন ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মহাশক্তিশালী ব্যক্তিকে আশাতীতভাবে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ পরাজয়ের মূলে যে আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা ও ইঙ্গিত বর্তমান থাকে, এই সূরা তাহারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

খাসিয়তঃ— এই সূরায় আল্লাহ্ তায়ালার অসীম শক্তি ও কুদরতে কা'বা শরীফের শত্রু ধ্বংস হওয়ার বর্ণনা রহিয়াছে বলিয়া ইহার একটি খাসিয়ত এই যে, শত্রুর সম্মুখে এই সূরা পড়িলে শত্রুর উপর জয়লাভ করা যায়।

মক্কায় অবতীর্ণ	القدر-সূরা কৃদর (মহিমা)	৬ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

١- اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ٥ ٢- وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ٥ ٣- لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ٥ ٤- تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ٥ ٥- سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ٥

উচ্চারণঃ—১। ইন্না আন্‌যাল্‌নাহু ফী লাইলাতিল ক্বাদ্‌রি। ২। ওয়ামা আদ্‌রাকা মা লাইলাতুল ক্বাদ্‌রি। ৩। লাইলাতুল ক্বাদ্‌রি খাইরুম মিন আল্‌ফি শাহ্‌রিন্। ৪। তানায্‌যালুল মালাইকাতু ওয়াররূহু ফীহা বিইয্‌নি রাব্বিহিম মিন্ কুল্লি আম্‌রিন। ৫। ছালামুন হিয়া হাত্তা মাত্‌লাইল ফাজরি।

অর্থঃ—১। নিশ্চয় আমি ইহাকে (কোরআন) মহিমাময়ী (শবে কৃদর) রাত্রিতে অবতীর্ণ করিয়াছি, ২। মহিমাময়ী রাত্রি কি, তুমি কি জান? ৩। মহিমাময়ী রাত্রি হাজার মাস হইতেও উত্তম, ৪। সেই রাত্রিতে ফেরেশ্‌তাগণ ও রূহ (জিব্রাইল আঃ) তাহাদের প্রতিপালকের আদেশে প্রত্যেক বিষয়ের যাবতীয় শান্তি লইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করেন। উহা (এই রাত্রি) ভোর পর্যন্ত শান্তিপ্রদ থাকে।

শানে নুযূলঃ— একদিন হযরত রসূল (সাঃ) সাহাবাগণের নিকট বর্ণনা করিতেছিলেন যে, বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে শামউন নামক একজন আ'বেদ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ইবাদতের কোন সীমা ছিল না। তিনি এক হাজার বৎসরকাল আল্লাহ্‌র ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন। ইহা শুনিয়া সাহাবাগণ আক্ষেপভরে বলিয়া উঠিলেন যে, আপনার উম্মতগণ তো এত দীর্ঘ আয়ু লাভ করে নাই, তাহাদের পক্ষে এত দীর্ঘকাল ইবাদত করা সম্ভবপর হইবে না, তবে তাহাদের কি উপায় হইবে? এইরূপ আক্ষেপের উত্তরে এই সূরা নাযিল হয় এবং জানাইয়া দেওয়া হয় যে, রসূল (সাঃ) এর উম্মতগণকে "লাইলাতুল কৃদর" অমূল্য নেয়ামত স্বরূপ দান করা

হইয়াছে। এই এক রাত্রের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত হইতেও বেশী নেকজনক। রমযান মাসের ২৭শে (শবে ক্বদর) রাত্রে আল্লাহ তায়ালা রহমতের এক হাজার দুয়ার খুলিয়া দেন। ইহার এত বেশী ফযীলত বলিয়াই সমস্ত পৃথিবীর মুসলমান এই রাত্রি ব্যাপিয়া আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশ্‌গুল থাকেন।

ফযীলতের বর্ণনাঃ — লাইলাতুল ক্বদর-এর রাত্রে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সর্বপ্রথম কোর্‌আনের আল-আলাক্ব সূরা অবতীর্ণ করেন। এই রাত্রেই সমস্ত কোর্‌আন লওহ্‌ মাহ্‌ফুয হইতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর নিকট নাযিল করার জন্য হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এর নিকট অর্পিত ও গচ্ছিত হয়। এই সূরায় পাক কোর্‌আন মজীদ নাযিল হওয়ার শুভ সংবাদ রহিয়াছে ও শবে ক্বদর রাত্রির ফযীলতও বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল কারণে এই সূরার আমল দ্বারা নিম্নলিখিত ফযীলত ও খাসিয়ত লাভ হয়।

খাসিয়তঃ— ১। কোন কাজে যাত্রা করিবার পূর্বে এই সূরা পড়িয়া গেলে ঐ কাজে আল্লাহ তায়ালার রহমত লাভ হয় ও ফল শুভ হইয়া থাকে। ২। এই সূরার আমল দ্বারা চক্ষের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয় (৬ষ্ঠ অধ্যায় দেখুন) ৩। একমুষ্টি আমন ধানের চাউলের উপর ২১ বার এই সূরা পড়িয়া সন্ধ্যার সময় ঘরের দরজার সামনে ছড়াইয়া রাখিবে। মোরগ ঘরে যাইবার সময় ঐ চাউল খাইতে থাকিবে। রাতকানা ব্যক্তি ঐ চাউল খাইবে। আল্লাহ্‌র ফজলে রাতকানা দোষ ভাল হইবে। ৪। কলেরার প্রাদুর্ভাব হইলে প্রত্যহ ফজরের সময় এই সূরা ৩ বার পড়িয়া শরীরে ফুঁক দিলে ইন্‌শাআল্লাহ এই রোগে আক্রান্ত হইবে না; (ইহা অতি পরীক্ষিত তদ্‌বীর)। ৫। সর্বদা এই সূরা পাঠ করিলে বিপদাপদ হইতে নিরাপদ থাকা যায় ও আল্লাহ তায়ালার রহমত লাভ হয়। ৬। যে ব্যক্তি প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই সূরা পড়িবে, শত্রু ও বন্ধু সকলেই তাহাকে সম্মান করিবে। ৭। নদীর তীরে বসিয়া এই সূরা পড়িতে থাকিলে নদী পার হওয়ার উপায় জুটিয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

কোর্‌আনে জীবন সমস্যার উপায়

রুযী বৃদ্ধি, ঋণ পরিশোধ, আর্থিক উন্নতি, স্মরণশক্তি ও এল্‌ম বৃদ্ধির আমল

(নিম্নলিখিত আয়াত এক বা একাধিকবার আমল করা যাইতে পারে)

[১]

١- قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ ٢- تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥

উচ্চারণঃ—১। ক্বুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুল্‌কি তু'তিল মুল্‌কা মান তাশাউ ওয়া তানযিউল মুলকা মিম্মান তাশাউ, ওয়া তুইয্‌যু মান তাশাউ ওয়া তুযিল্লু মান তাশাউ বিয়াদিকাল খাইর। ইন্নাকা আ'লা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর। ২। তুলিজুল্লাইলা ফিন্নাহারি ওয়া তুলিজুন্নাহারা ফিল্লাইলি ওয়া তুখ্‌রিজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি ওয়া তুখ্‌রিজুল মাইয়্যিতা মিনাল্‌ হাইয়্যি, ওয়া তারযুকু মান্‌ তাশাউ বিগাইরি হিসাব।

অর্থঃ— [হে মুহাম্মদ (সাঃ)!] বল, হে আল্লাহ! তুমি সমস্ত রাজ্যের অধিপতি, তুমি যাহাকে ইচ্ছা বাদশাহী প্রদান কর এবং তুমি যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা কর বাদশাহী কাড়িয়া লও এবং যাহাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর এবং যাহাকে ইচ্ছা অপদস্থ কর, তোমার হাতেই সর্বমঙ্গল এবং নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান। তুমি রাত্রিকে দিবসে পরিণত কর এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর। মৃত (নির্জীব) হইতে জীবিতকে বাহির কর ও জীবিত হইতে মৃতকে বাহির কর

(জীবতকে মৃত কর) এবং যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত উপজীবিকা প্রদান করিয়া থাক।

খাসিয়তঃ— ১। এই আয়াত দুইটি ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর সাতবার পড়িলে আল্লাহ্‌র ফজলে ঋণ পরিশোধ হয় ও শত্রু দমন থাকে।

২। যে ব্যক্তি প্রত্যহ নামাযের পর ও শুইবার সময় এই আয়াত দুইটি অনেকবার পড়িবে, আল্লাহ তাহার রিযিক সচ্ছল করিয়া দিবেন, অদৃষ্টের প্রসন্নতা দান করিবেন ও তাহার দরিদ্রতা দূর করিবেন।

শানে নুযূলঃ— হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদিনায় অবস্থানকালে ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ হযরত (সাঃ)কে এই বলিয়া বিদ্রূপ করিতে যে, তিনি কখনও নবী নহেন; নবী হইলে তাঁহার এরূপ দুরবস্থা থাকিবে কেন? হযরত দাউদ এবং হযরত সোলায়মান নবী ছিলেন, তাঁহারা তো দরিদ্র ছিলেন না; বরং তাঁহারা ঐশ্বর্যশালী বাদ্‌শাহ ছিলেন। প্রকৃত নবী হইলে তিনিও তদ্রূপ সম্পদশালী হইতেন; ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের এরূপ উক্তির উত্তরে এই আয়াত দুইটি নাযিল হয় এবং ইহার পর হইতে মুসলমানগণের আর্থিক উন্নতির সূচনা হয়। ইহার কিছুদিন পরেই রোম ও পারস্যের বিশাল রাজ্য ও বিপুল ধন-সম্পদ মুসলিম খলীফাগণের হস্তগত হয়। এই আয়াতে বলা হইতেছে যে, ধন-সম্পত্তি লাভ করা কিংবা না করা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই। হযরত রসূল (সাঃ) এর দরিদ্রতাকে উপলক্ষ করিয়া এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টান শত্রুগণের বিদ্রূপের উত্তরস্বরূপ এই আয়াত নাযিল হওয়ায় ইহার ফযীলত এই হইয়াছে যে, ইহার আমল দ্বারা ধন-সম্পত্তি লাভ হয় এবং শত্রু দমন হয়। মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে যে সকল শক্তি ও কুদরতের ধারণা করা যায় না, এই আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালার ঐ সকল কুদরতের ও শক্তির চরম বর্ণনা হইয়াছে। উহার যিকির দ্বারা আল্লাহ্‌র শক্তি ও কুদরতের নিকট আত্মসমর্পণ করা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র শক্তি ও কুদরতের শরণাপন্ন হয়, নিশ্চয় তাহার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও দয়ার উদ্রেক হয়। হযরত মায়াজ (রাঃ) হযরত রসূল (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় ঋণের বিষয় উল্লেখ করিলে তিনি তাঁহাকে এই আয়াত পড়িতে আদেশ দেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহাতে "ইসমে আযম" রহিয়াছে। হযরত আনাসের (রাঃ) বর্ণনায় জানা যায়, ওহুদ পর্বত পরিমাণ ঋণ থাকিলেও ইহার আমল দ্বারা ঐ ঋণ পরিশোধ হইয়া যায়।

[২]

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ٥

উচ্ছারণঃ— লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল্ আযীম।

অর্থঃ— সর্বোচ্চ মহাশক্তিশালী আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কোন কাজ সাধন করার কাহারও কোন শক্তি নাই।

ফযীলতঃ—১। এই কলেমার যিকির দ্বারা আল্লাহ তায়ালার অসীম শক্তির স্মরণ করা হয় ও তাঁহার ঐ শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করা হয়। ফলে পাঠকারীর উপর আল্লাহ্‌র সাহায্য ও রহমত নাযিল হয় এবং তিনি তাহার সহায় হন। এই কলেমা রুযী বৃদ্ধি, বাসনা পূর্ণ হওয়া, ধন-সম্পত্তি লাভ হওয়া, উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হওয়া, বিপদাপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া ও শয়তান বিতাড়নের পক্ষে অতিশয় কার্যকরী।

২। হযরত রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন যে, এই কলেমা বেশী পরিমাণ পাঠ কর। ইহা বিপদের ৯৯টি দরজা বন্ধ করে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই কলেমা ১০০ বার পড়িবে, সে কখনও দরিদ্র থাকিবে না।

৩। হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রুযী কম হইতে থাকিলে এই কলেমা বেশী পরিমাণে পড়।

৪। হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে দৈনিক ১০০ বার ইহা পড়িবে, সে কখনও দরিদ্র হইবে না; (ইহা হযরত বড় পীর সাহেবের আমল)।

৫। কোন কঠিন কাজ উপস্থিত হইলে কিংবা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলে এই কলেমা প্রত্যহ এক হাজার বার পড়িবে। ইন্‌শাআল্লাহ কাজ সহজসাধ্য হইয়া পড়িবে ও ঋণ পরিশোধ হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ইহা ১০০ বার পড়িবে, মানুষ তাহার বাধ্য থাকিবে ও লোকের নিকট সম্মান লাভ করিবে।

৬। বোখারী শরীফে লিখিত হইয়াছে যে, ইহা বেহেশতের ধন-ভাণ্ডারের একটি ভাণ্ডার। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা বেহেশতের একটি দরজা। কোরআন শরীফে সূরা জ্বিনের ১৪শ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে, ফলতঃ সে সুপথেরই অনুসন্ধান করে। আল্লাহ্‌র শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করার জন্য ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত।

[৩]

اَللهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ٥

উচ্চারণঃ— আল্লাহু লাতীফুম বিইবাদিহি ইয়ারযুকু মাই ইয়াশাউ ওয়াহুয়াল কাভিইউল আযীয। (২৫ পারা, সূরা শূরা, ১৯ আয়াত)।

অর্থঃ— আল্লাহ বান্দাগণের প্রতি করুণাশীল। তিনি যাহাকে ইচ্ছা উপজীবিকা (রিযিক) দান করেন এবং তিনি মহাশক্তিশালী ও মহাপরাক্রান্ত।

খাসিয়তঃ— প্রত্যেক নামাযের পর এই আয়াত অনেকবার পড়িলে রুযী বৃদ্ধি হয়। এই আয়াত দ্বারা মানবদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও শক্তির উপর রিযিক নির্ভর করে এবং এই বিষয়ে তাঁহার শক্তিই সর্বোপরি। এই আয়াত পাঠ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার ঐ শক্তি ও রহমতের স্মরণ করা হয়, সেইজন্য ইহার বরকতে রিযিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

[৪]

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ٥

উচ্চারণঃ— আল্লাহুম্মা আকফিনী বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগ্‌নিনী বিফাদলিকা আম্মান্ ছিওয়াকা।

অর্থঃ— হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হালাল জিনিস দান করিয়া হারাম জিনিস হইতে রক্ষা কর এবং নিজ অনুগ্রহে আমাকে অন্যের মুখাপেক্ষী করিও না।

খাসিয়তঃ— হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন ৭০ বার এই দোয়া পড়িবে, অল্প দিনের মধ্যে আল্লাহ তাহাকে ধনী ও সৌভাগ্যশালী করিয়া দিবেন; (তঃ জাহেদী)। হযরত আলী (কার্রাঃ) এই দোয়া সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, শুক্রবার দিন জুময়ার নামাযের পূর্বে ও পরে ১০০ বার করিয়া দরূদ শরীফ পড়িয়া এই দোয়া ৫৭০ বার পড়িলে আল্লাহ্‌র রহমতে পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকিলেও তাহা অল্প দিনের মধ্যে পরিশোধ হইয়া যাইবে; (মাজমাউল ফাওয়ায়িদ)।

[৫]

اَللّٰهُمَّ يَا فَارِجَ الْهَمِّ كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَرَحِيْمَ الْاٰخِرَةِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْحَمَنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَتُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَّحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ ٥

উচ্চারণঃ— আল্লাহুম্মা ইয়া ফারিজাল হাম্মি কাশিফাল্ গাম্মি মুজিবা দা'ওয়াতিল মুযতাররীনা ইয়া রাহ্‌মানাদ্দুনইয়া ওয়া রাহীমাল্ আখিরাতি ইয়া আরহামার রাহিমীনা। আস্‌আলুকা আন্ তারহামনী রাহমাতাম্ মিন্ ইন্দিকা ওয়া তুগ্‌নিনী বিহা আররাহমাতিম্ মান ছিওয়াকা।

অর্থঃ— হে কষ্ট দূরকারী, হে চিন্তা হরণকারী ও বিপদগ্রস্ত লোকের প্রার্থনা কবুলকারী আল্লাহ! হে ইহ-পরকালের পরম দয়ালু আল্লাহ! হে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণানিধান! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমার অনুগ্রহে আমার উপর শান্তি (রহমত) অর্পণ কর ও আমাকে অন্যের মুখাপেক্ষী করিও না।

খাসিয়তঃ— হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত রসূল (সাঃ) আমাদিগকে এই দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি এই দোয়া নিয়মিতভাবে পড়িবে, তাহার ওহুদ পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকিলেও আল্লাহ্‌র রহমতে পরিশোধ হইয়া যাইবে। হযরত (সাঃ) যে দোয়া পড়ার জন্য আদেশ দিয়াছেন তাহা হইতে উত্তম দোয়া আর কি হইতে পারে? (গুনিয়াতুত্তালেবীন)

[৬]

যে ব্যক্তি **'চাশ্‌তের নামায'** সর্বদা পড়িবে সে কখনও দরিদ্র থাকিবে না কিংবা দরিদ্র হইবে না। বুযুর্গগণ বলিয়াছেন যে, দুইটি জিনিস একত্রে থাকিতে পারে না, চাশ্‌তের নামায ও দরিদ্রতা। চাশ্‌তের নামায দরিদ্রতা দূর করে।

চাশ্‌তের নামায পড়ার নিয়মঃ- সূর্য গরম হওয়ার পর হইতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত এই নামায পড়ার সময়। ইহা ৪, ৮ কিংবা ১২ রাকাত পড়া যায়। ৪ রাকাত করিয়া সুন্নতের নিয়মে পড়িতে হয়।

[৭]

সূরা মুয্‌যাম্মিলের আমল (২৯ পারা)

ধন-সম্পত্তি লাভ ও সাংসারিক উন্নতির জন্য ইহা একটি উৎকৃষ্ট আমল। ৪০ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ একই সময় ১১ বার দরূদ শরীফ ও ১১১১ বার **يا مغنى** (ইয়া-মুগ্‌নিউ) (হে অভাব মোচনকারী!) পড়িবে। তৎপর ১ বার সূরা মুয্‌যাম্মিল পড়িয়া পুনরায় ১১ বার দরূদ শরীফ পড়িবে। এইরূপে ৪০ দিন আমল করিলে আল্লাহ আশ্চর্যরূপে নানা প্রকার উন্নতি প্রদান করিবেন। কিবলামুখী হইয়া পড়িবে,

কাহারও সহিত কথাবার্তা বলিবে না ও ৪০ দিনের মধ্যে কাযা করিবে না। (সূরা মুয্যাম্মিলের তফসীর ও অন্যান্য ফযীলত পাঞ্জ সূরায় দেখুন)।

١- الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۔ وَالَّذِیْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ٥ ٢- اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۔ كُلٌّ يَّجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۔ ٣- وَهُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِیَ وَاَنْهٰرًا ۔ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِی الَّيْلَ النَّهَارَ ۔ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٥

(১৩ পারা, সূরা রা'দ, আয়াত ১—৩)।

অর্থঃ—১। আলিফ্ লাম-মীম রা (হে পয়গম্বর!) এই কিতাবের আয়াতসমূহ, আর যাহা তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি নাযিল হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই বিশ্বাস করে না। ২। তিনিই আল্লাহ, যিনি খুঁটি ব্যতীত আকাশকে উচ্চ করিয়া রাখিয়াছেন যাহা তোমরা দেখিতেছ, অনন্তর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ; আর সূর্য-চন্দ্রকে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকে নির্দিষ্ট নিয়মাধীনে ভ্রমণ করিতেছে। (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ প্রচার করার জন্য ইহাদের কার্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন—যেন তোমাদের প্রতিপালকের সন্দর্শন সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পার। ৩। এবং তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছেন ও তন্মধ্যে পর্বতমালা ও নদীসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তন্মধ্যে প্রত্যেক প্রকার ফল দুই রকম (তিক্ত ও মিষ্ট) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করিয়াছেন। নিশ্চয়ই উহাদের মধ্যে চিন্তাশীল লোকদিগের জন্য (আল্লাহ্‌র কুদরতের) নিদর্শন রহিয়াছে।

আলিফ্ লা-ম্-মী-ম রা—এই বর্ণমালার প্রকৃত অর্থ ও ফযীলত আল্লাহ ব্যতীত অপর কেহ অবগত নহে। তফসীরকারগণ ইহার আনুমানিক অর্থ 'আমি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী আল্লাহ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

খাসিয়তঃ— এই আয়াত ৩টিকে জলপাই গাছের ৪টি পাতার উপর লিখিয়া ঘর কিম্বা দোকানের চারি কোণে পুঁতিয়া রাখিলে দোকান ও বাড়ীর আশাতীত উন্নতি হয়।

শানে নুযূলঃ— এই 'সূরা রা'দ' হযরত রসূল (সাঃ) মক্কা শরীফ ত্যাগ করিয়া মদিনা শরীফ গমনের কিছুদিন পূর্বে নাযিল হয়। যে সকল কাফের তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহা নাযিল হয়। এই আয়াত ৩টিতে আল্লাহ্‌র অসীম কুদরত ও শক্তির বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তাঁহার প্রকাশ্য কুদরতের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের বর্ণনা রহিয়াছে বলিয়া ইহার আমল দ্বারা তাঁহার রহমত নাযিল হয় ও আমলকারীর আর্থিক উন্নতি হয়।

[৯]

রুযী বৃদ্ধির জন্য চাঁদের প্রথম জুমুয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ৪০ জুমুয়া পর্যন্ত প্রত্যহ মাগরেবের নামাযের পর নিম্নোক্ত ১০ আয়াত ১১ বার পড়িবে এবং ২নং আয়াতটি প্রত্যহ জুমুয়ার নামাযের পর যাফরান দ্বারা কাগজে লিখিয়া কুয়ার পানিতে ফেলিয়া দিবে। ইনশাআল্লাহ তায়ালা এই আমল দ্বারা অর্থশালী হইতে পারিবে কিন্তু জুমুয়া কাযা করিতে পারিবে না।

১নং আয়াত

আয়াতে কুতুব ঃ

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۔ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَیْءٍ ۔ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِیْٓ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ۔ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ

اَلْاَمْرِشَيْءٍ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا - قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ - وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ - وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

উচ্চারণঃ— সুম্মা আন্‌যালা আলাইকুম মিম বা'দিল গাম্মে আমানাতান্ নুয়াসাইঁ ইয়াগ্‌শা তায়েফাতাম মিন্‌কুম ওয়া তায়েফাতুন ক্বাদ আহাম্মাত্‌হুম আনফুসুহুম ইয়াযুন্নূনা বিল্লাহি গাইরাল হাক্কে যাননাল্ জাহিলিয়্যাতি ইয়াকুলুনা হাল লানা মিনাল আমরি মিন শাইইন ; ক্বোল ইন্নাল্ আম্‌রা কুল্লাহু লিল্লাহি ইয়ুখ্‌ফুনা ফী আনফুসিহিম মালা ইউব্‌দুনা লাকা ইয়াকুলুনা লাও কানা লানা মিনাল আম্‌রি শাইউম্ মাকুতিলনা হাহুনা ক্বোল্ লাও কুন্তুম ফী বুইউতিকুম লাবারাযাল্লাযীনা কুতিবা আলাইহিমুল ক্বাত্‌লু ইলা মাদাজিইহিম ওয়া লেইয়াবতালিইয়াল্লাহু মা ফী সুদুরিকুম, ওয়া লিইউমাহ্‌হিসা মা ফী কুলু বিকুম ; ওয়াল্লাহু আলীমুম বিযাতিস্ সুদুর। (সূরা আলে-ইমরান, ১৫৪-১৫৫ আয়াত)

অর্থঃ— অনন্তর তিনি (আল্লাহ) দুঃখের পর তোমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করিলেন ; ইহা তন্দ্রা—যাহা তোমাদের এক দলকে আবৃত করিয়াছে। অপর দল আল্লাহ সম্বন্ধে সত্যের পরিবর্তে অজ্ঞতা ধারণ করিতেছিল যে, এ বিষয়ে কি আমাদের কোন অধিকার নাই: তাহারা অন্তরে যাহা গোপন রাখে তাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিবে না। তাহারা বলে—যদি এ বিষয়ে আমাদের কোন অধিকার থাকিত তবে আমরা এখানে নিহত হইতাম না। হে মুহাম্মদ (সাঃ)! তুমি বল, —নিহত হওয়া যাহাদের লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই নিজ গন্তব্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং ইহা এইজন্য যে, তোমাদের অন্তরে যাহা আছে আল্লাহ তাহা জানেন—এই প্রকারে তিনি তোমাদের অন্তর পরীক্ষা করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ মনের গোপন ভাবও জ্ঞাত আছেন।

শানে নুযূল ও ফযীলতের বর্ণনাঃ— হযরত রসূল (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধে পর্বতের ঘাঁটি রক্ষার জন্য যে সকল মুসলমান সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহারা যখন দেখিলেন যে, মুসলমান সৈন্যগণের প্রবল আক্রমণে কাফেরগণ পালাইয়া যাইতেছে, তখন তাহারা যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া মালে-গনীমত আহরণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। কাফেরগণ এই সুযোগে ভিন্ন পথে ফিরিয়া আসিয়া শূন্য ঘাঁটি দখল করিয়া বসিল। ইহাতে মুসলমানগণ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িলে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম সৈন্যগণের উপর তন্দ্রা আনয়ন করিয়া তাহাদের চিন্তা, শ্রম ও ক্লান্তি দূর করিয়া দিলেন। এইরূপে আল্লাহ তায়ালার কুদরতে দুঃখ ও ক্ষতির পর তাহাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হয় ও তাহারা নূতন তেজে পুনরায় কাফেরগণকে আক্রমণ করিয়া ঘাঁটি দখল করিয়া লয়। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট মুসলমানগণকে বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র হুকুম ও নির্দেশ ব্যতীত কেহই নিহত বা আহত হইতে পারে না। আল্লাহ্‌র লিখন কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। যাহার মৃত্যু যেখানে ধার্য হইয়াছে, তাহাকে নিশ্চয় সেখানে উপস্থিত হইতে হইবে, ইহা রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। তিনি মানুষের মনের সকল ভাব জ্ঞাত আছেন—তাঁহার জ্ঞানের অগোচর কিছুই থাকিতে পারে না। এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মানুষের মৃত্যু আল্লাহ্‌র সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে রহিয়াছে। এই আয়াতের যিকির দ্বারা আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের স্মরণ করা হয় ও তাঁহার শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করা হয় ; সেইজন্য এই আয়াতের আমল দ্বারা আল্লাহ্‌র রহমত অবতীর্ণ হয় ও পাঠকারীর উন্নতি সাধিত হয়। এই আয়াতের অন্যান্য ফযীলত এই যে, ফজর ও মাগরেবের পর যে ব্যক্তি এই আয়াত পড়িবে, তাহার পরিজন নিরাপদে থাকিবে। ১১ বার এই আয়াত পড়িয়া সরিষার তৈলের উপর ফুঁক দিবে এবং জ্বিন ও ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির শরীরে মালিশ করিবে ; আল্লাহ্‌র ফজলে জ্বিনের আছর দূর হইয়া যাইবে। প্রত্যহ একই সময় মালিশ করিতে হয়। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌র শক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোপরি বলিয়া স্মরণ করা হয় ; ফলে জ্বিন ও ভূতের শক্তি অচল হইয়া যায়।

কুয়ায় ফেলিবার ২নং আয়াত

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ *

(সূরা আ'রাফ, ১০ আয়াত)

অর্থঃ— এবং নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে পৃথিবীতে স্থিতিশীল করিয়াছি এবং ইহাতে তোমাদের জীবিকা নির্বাহের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি ; তোমরা অত্যন্ত অল্প পরিমাণে কৃতজ্ঞতা করিয়া থাক।

ফযীলতের বর্ণনাঃ— এই আয়াতে আল্লাহ মানুষকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ও অনুগ্রহে মানুষ রিযিক পাইয়া থাকে এবং তিনিই পৃথিবীতে মানুষের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই আয়াতে তাঁহার রিযিক দেওয়ার শক্তি ও অনুগ্রহের বর্ণনা আছে, সেজন্য ইহার বরকতে রিযিক বৃদ্ধি পায়। এই আয়াতটির আর একটি খাসিয়ত এই যে, জুময়ার নামাযের পর লিখিয়া ঘরে বা দোকানে রাখিলে ধন-সম্পত্তি ও রিযিক বৃদ্ধি পায়।

[১০]

রুযী বৃদ্ধি ও বিপদাপদ হইতে নিরাপদ থাকার জন্য এই আয়াতটি প্রত্যেক নামাযের পর তিনবার পড়িবে ও নিম্নোক্ত দোয়াটি ১ বার পড়িবেঃ—

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا *

উচ্চারণঃ— ওয়ামাইঁ ইয়াত্তাক্বিল্লাহা ইয়াজ্‌আল লাহু মাখরাজাওঁ ওয়া ইয়ারযুকুহু মিন্ হাইছু লা ইয়াহ্‌তাসিবু ওয়ামাইঁ ইয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহি ফাহুয়া হাছবুহু ইন্নাল্লাহা বালিগু আম্‌রিহি ক্বাদ জায়ালাল্লাহু লিকুল্লি শাইইন ক্বাদরান্।
(সূরা তালাক ২-৩ আয়াত)

অর্থঃ— যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহই তাহার (ঝগড়া-কলহ হইতে) নিষ্কৃতির পথ বাহির করিয়া দেন এবং তাহাকে এমন স্থান হইতে জীবিকা দান করেন যাহা সে ধারণাও করে নাই এবং যে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে, ফলতঃ আল্লাহ তাহার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজ কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

শানে নুযূলঃ— এই আয়াতটি স্ত্রীলোকের তালাকের বিধি উপলক্ষ করিয়া নাযিল হইয়াছে। এই সূরায় আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন যে, তালাকী স্ত্রীলোকের ইদ্দত অতীত হইলে হয় তাহাদিগকে (হিলা করতঃ) পুনরায় বিবাহ করিয়া গ্রহণ কর, আর না হয় তাহাদের প্রাপ্য মোহরানা আদায় করিয়া মুক্ত করিয়া দাও। স্ত্রীলোকের মোহরানা আদায় করিতে অবহেলা করিও না। মোহরানা আদায় করিলে দরিদ্র হইবে, ঐরূপ ভুল ধারণা পোষণ করিও না। কারণ এই আয়াতে বলা হইয়াছে

যে, আল্লাহই রিযিক দিয়া থাকেন এবং সকল কার্যে তাঁহার সাহায্যই যথেষ্ট ও সকল বিষয়ে তাঁহার উপর নির্ভর করা উচিত। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌র শক্তি ও অনুগ্রহের যিকির করা হয় ও তাঁহার উপর নির্ভর করার বিষয় ব্যক্ত করা হয়, সেজন্য রিযিকের উপর তাঁহার রহমত নাযিল হয় ও বিপদাপদ দূর হয়।

দোয়াঃ— يَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ سَبِّبْ -

উচ্চারণঃ— ইয়া মুসাব্বিবাল আসবাবে্ সাব্বিব্।

অর্থঃ— হে সমুদয় অভাবের উপায়কারী আল্লাহ! তুমি আমার অভাব মোচনের উপায় করিয়া দাও।

বর্ণনাঃ— হযরত মওলানা আবদুল আওয়াল মরহুম মাগফুর বলিয়াছেন যে, আমার ওস্তাদ হযরত মাওলানা আবদুল হক সাহেব বলিয়াছেন—উপরের আয়াতগুলি প্রত্যেক নামাযের পর ১৫ বার পড়িলে কখনও হাত খালি থাকিবে না। আমি ইহা আমল করিয়া অত্যন্ত ফল পাইয়াছি।

[১১]

বেকারের আমল

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللّٰهُ ـ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اٰتٰهَا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا -

উচ্চারণঃ— ওয়ামান কুদিরা আলাইহি রিয্‌কুহু ফালইউনফিক্ মিম্মা আতাহুল্লাহু লা ইউকাল্লেফুল্লাহু নাফসান ইল্লা মা আতাহা সাইয়াজআলুল্লাহু বা'দা উস্‌রিইঁ ইউস্‌রা। (সূরা তালাক, ৭ আয়াত)।

অর্থঃ— অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে তাহার জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যয় করিবে। আল্লাহ যাহাকে যাহা দান করিয়াছেন উহা ব্যতীত কাহাকেও অতিরিক্ত কষ্ট দেন না। আল্লাহ অভাবের পর শীঘ্রই সচ্ছলতা দান করিয়া থাকেন।

শানে নুযূলঃ— স্ত্রীলোকের মোহরানা আদায় উপলক্ষে আল্লাহ এই আয়াতে বলিয়াছেন যে, ধনী ও অবস্থাশালী স্বামীর পক্ষে আর্থিক অবস্থানুযায়ী তালাকী স্ত্রীলোকের ইদ্দতকালের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ, আল্লাহ

কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না এবং তিনি অভাবের পর সচ্ছলতা প্রদান করিয়া থাকেন। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালার এরূপ আশ্বাসবাণী থাকায় ইহার আমল দ্বারা ঐ আশ্বাসবাণী স্মরণ করা হয়। ফলে তাহার রহমত ও নিম্নোক্ত ফযীলত লাভ হয়।

খাসিয়তঃ— যে ব্যক্তির জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হইয়া পড়ে ও বেকার অবস্থায় সর্বদা রিযিকের জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, সে জুমুয়ার দিন মধ্যরাত্রে উঠিয়া ওযু করিয়া পাক-সাফ্ কাপড় পরিবে, তৎপর একশতবার 'ইস্তেগ্‌ফারটি' একশতবার দরূদ শরীফ ও একশতবার উপরোক্ত আয়াত পড়িবে এবং পুনরায় একশতবার দরূদ শরীফ পড়িয়া শুইয়া থাকিবে, স্বপ্নে জানিতে পারিবে যে, কোন্ উপায়ে তাহার রিযিকের সচ্ছলতা আসিবে।

ইস্তেগ্‌ফারটি এই ঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ -

উচ্চারণঃ— আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন্ কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতুবু ইলাইহি।

অর্থঃ— আমার প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট সকল প্রকার পাপ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি ও তাঁহার নিকটই (তওবা) প্রত্যাবর্তন করিতেছি।

দরূদ শরীফটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ -

উচ্চারণঃ— আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

অর্থঃ— হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি, তাঁহার বংশধরগণের প্রতি ও তাঁহার আসহাবগণের প্রতি তোমার রহমত ও কল্যাণ প্রেরণ কর।

[১২]

এই আয়াত কাগজে লিখিয়া ব্যবসায়ের স্থানে বা দোকানে রাখিলে ব্যবসায়ের উন্নতি হয় ও দোকানে বেশী খরিদ্দার জুটে।

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ - وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ - ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

— (সূরা তওবা, ১১১ আয়াত)

অর্থঃ— নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের নিকট হইতে বেহেশ্‌তের সুখ-সম্পদের পরিবর্তে তাহাদের জীবন ও ধন-সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। কেননা, তাহারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিয়া নিহত করিতেছে ও নিহত হইতেছে। ইহাই তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআনে সত্য অঙ্গীকাররূপে প্রতিশ্রুত হইয়াছে এবং আল্লাহ হইতে কে বেশী অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়া থাকে ? অতএব, আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের যে ক্রয়-বিক্রয়ের কারবার হইয়াছে তাহার জন্য আনন্দিত হও এবং ইহাই তোমাদের জীবনের বৃহৎ সফলতা।

শানে নুযূল ঃ— লাইলাতুল আকাবাঃ অর্থাৎ, আকাবা নামক পর্বতের উপর গভীর রাত্রে কয়েকজন মদীনাবাসী হযরত (সাঃ) এর নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌নে রাওয়াহা নামক এক ব্যক্তি হযরত (সাঃ)কে বলেন যে, "হে রসূলাল্লাহ! আমাদিগকে আল্লাহ্‌র জন্য ও আপনার জন্য যাহা করিতে হইবে সে বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করুন।" হযরত (সাঃ) উত্তর দেন যে, "তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবে এবং কাহাকেও তাঁহার অংশী স্থির করিবে না।" আমার জন্য এই যে, "আবশ্যক হইলে ইসলামের জন্য নিজের জীবন ও সম্পত্তি ব্যয় করিবে।" এই উত্তর দেওয়ার পর মুসলিমগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল ও পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল যে, আমরা এই সকল ত্যাগের পরিবর্তে কি পুরস্কার লাভ করিব ? এই প্রশ্নের উত্তরে এই আয়াত নাযিল হয় এবং বলিয়া দেওয়া হয় যে, ইহার বিনিময়ে তোমরা পরকালে অনন্ত জীবন ও অফুরন্ত সুখ-সম্পদপূর্ণ বেহেশ্‌ত লাভ করিবে। আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত দ্বারা লাভজনক ব্যবসায়ের অঙ্গীকার করিয়াছেন—যদিও ইহা পার্থিব ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায় নহে। বস্তুতঃ এই আয়াতে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভের কথা উল্লেখ থাকায় ইহার বরকতে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করা যায়।

[১৩]

১। বৃহস্পতিবার দিন ওযু করিয়া কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির পিরহানের এক টুকরা কাপড়ে নিম্নোক্ত আয়াত দুইটি লিখিয়া দোকানঘর কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের স্থানে লটকাইয়া রাখিলে ব্যবসায়ে উন্নতি লভ হয়। ২। কাগজে লিখিয়া বেকার ব্যক্তির হাতে বাঁধিলে তাহার কর্ম প্রাপ্তি ঘটে। কাহারও কোন স্থানে বিবাহের কথাবার্তা হইতে থাকিলে সে ব্যক্তির হাতে এই আয়াত লিখিয়া বাঁধিয়া দিলে নিশ্চয় সে স্থানেই তাহার বিবাহ হইবে।

١- قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ - يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ - وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٢- يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ - وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ -

— (সূরা আলে ইম্‌রান, ৭৩-৭৪ আয়াত)

অর্থঃ— ১। (হে মুহাম্মদ)! বলিয়া দাও যে, আল্লাহ্‌র হাতেই গৌরব, তিনি যাহাকে ইচ্ছা উহা দান করেন এবং আল্লাহ প্রশস্ত মহাজ্ঞানী।

২। তিনি যাহার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় করুণা দান করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ মহা গৌরবশালী।

শানে নুযূলঃ— ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ সকাল বেলায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া বৈকালে তাহা ত্যাগ করিত এবং এইভাবে বিশ্বাসীগণের মনে সন্দেহ জন্মাইবার চেষ্টা করিত যে, হযরত রসূল (সাঃ) সত্য নবী নহেন এবং ইসলাম সত্য ধর্ম নহে। সত্য ধর্ম হইলে লোকেরা ইহা গ্রহণ করিয়া পুনরায় ত্যাগ করিবে কেন? খ্রীষ্টান ও ইহুদীগণের এরূপ চক্রান্তের সতর্কতারূপে এই আয়াত নাযিল হয় এবং তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে নিষেধ করা হয়। এই আয়াতে বলা হইতেছে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে সকলকেই হেদায়েত করিতে পারেন এবং তাঁহার হেদায়েতই প্রকৃত হেদায়েত এবং সকল প্রকার মঙ্গল ও দয়া তাঁহার হাতেই রহিয়াছে; তাঁহার ইচ্ছার উপরেই মানুষের সুখ-সম্পদ ও গৌরব লাভ নির্ভর করে এবং তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই এই সকল দান করেন। তিনি সকল গৌরবের অধিকারী। ইহাতে আল্লাহ তায়ালার এই শক্তি ও সিফতের বর্ণনা আছে বলিয়া এই আয়াত দ্বারা উপরোক্ত ফযীলত লাভ হয়।

[১৪]

এই আয়াত শরীফ কাঠের তক্তার উপর লিখিয়া দোকান বা ব্যবসায়ের স্থানে লটকাইয়া রাখিলে ইন্‌শাআল্লাহ ব্যবসায়ে উন্নতি হয়। পশ্চিম দেশের সওদাগরদের দোকানে প্রায়ই এই আয়াত লটকান দেখা যায়।

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ * وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ *

— (১৪শ পারা, সূরা হেজর, ১৯-২০ আয়াত)

অর্থঃ— আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছি এবং ইহার মধ্যে পর্বতসমূহ স্থাপন করিয়াছি এবং ইহার মধ্যে আমি প্রত্যেক বস্তু আবশ্যক অনুযায়ী উৎপন্ন করিয়াছি, আর আমি পৃথিবীর মধ্যে তোমাদের জীবিকা উৎপাদন করিয়াছি। কেবল তোমাদের জন্যই নহে; বরং অন্যান্য প্রাণীর জীবিকাও প্রদান করিয়াছি, যাহাদের জীবিকার উপলক্ষ তোমরা নহ।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— আল্লাহ তায়ালাই সকল প্রাণীর রিযিকের একমাত্র মালিক ও দাতা। এই আয়াতে তাঁহার ঐ শক্তির ও অনুগ্রহের বর্ণনা আছে; সুতরাং ইহার আমল দ্বারা তাঁহার ঐ শক্তির ঘোষণা ও স্মরণ করা হয় বলিয়া ইহার ফযীলতে রিযিকের উপর আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হয়।

[১৫]

ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করার ইহা একটি সহজ উপায়। যে ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যে সঠিক পরিমাণে ওজন করিবে, সে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিবে। আল্লাহ তায়ালা পাক কোর্‌আনের ১৫ পারায় সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৫ আয়াতে বলিয়াছেন যে—

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ - ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا *

অর্থাৎ ঃ—(আল্লাহ বলিয়াছেন)— "এবং তোমরা যখন পরিমাপ করিবে তখন সঠিক পরিমাপ করিও, সঠিকভাবে ওজন করিও; ইহার পরিণাম উত্তম এবং কল্যাণকর।"

এই আয়াতে সঠিক ওজনকারীগণের পরিণাম উত্তম ও কল্যাণকর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালার খাস কালাম কখনও মিথ্যা হইতে পারে না।

[১৬]

সর্বদা নিয়মিতভাবে কোর্‌আন শরীফ তেলাওয়াত করিলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা যায়। পাক কোর্‌আন ইহার তেলাওয়াতকারীর জন্য দোয়া করিয়া থাকে। সকাল বেলা কোর্‌আন পাঠ করা উত্তম। সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াতে আল্লাহ বলিতেছেন যে, প্রভাতে কোর্‌আন পড়, প্রভাতে কোর্‌আন পাঠ সাক্ষীস্বরূপ হইবে।

(১৭)

— [সূরা ওয়াকিয়ার আমল-পাঞ্জ সূরায় দ্রষ্টব্য]

সূরা ফাৎহার ফযীলত (কোর্‌আন, ২৬ পারা)

১। রমযান শরীফের চাঁদ উঠিবার সময় এই সূরা ৩ বার পড়িলে সমস্ত বৎসর কোন অভাব-অনটন উপস্থিত হইবে না।

২। নৌকা কিংবা জাহাজে এই সূরা পড়িলে নৌকা কিংবা জাহাজ ডুবিবে না।

৩। কেহ এই সূরা স্বপ্নে দেখিলে তাহার আর্থিক উন্নতি হয় এবং দীন ও দুনিয়ার অপরিসীম মঙ্গল লাভ হয়।

শানে নুযূল ও ফযীলতের বর্ণনাঃ— ফাৎহা অর্থ বিজয়। সুপ্রসিদ্ধ হোদায়বিয়ার সন্ধি উপলক্ষে আল্লাহ এই সূরা নাযিল করিয়া হযরত রসূল (সাঃ)—কে ইসলামের মহাবিজয়ের সুসংবাদ দিয়াছেন। এই সন্ধির পর হইতে ইসলামের বিজয়-প্রসার আরম্ভ হয়। ইহার এক বৎসর পরই মুসলমানগণ মহানগরী মক্কা জয় করিয়া সমগ্র আরবের উপর ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। এই কারণে এই সূরার নাম ফাৎহা অর্থাৎ বিজয় হইয়াছে। এই সূরার ৬ষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ তায়ালার দয়া ও ক্ষমতাশীলতা স্মরণ করা হয়, ২৯ আয়াত দ্বারা মোমেনগণের প্রতি আল্লাহ্‌র উত্তম পুরস্কারের অঙ্গীকার স্মরণ করা হয়। অধিকন্তু, এই সূরা পাঠ দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত বেহেশ্‌তের নেয়ামতের স্মরণ করা হয় এবং আল্লাহ্‌র অসীম শক্তি ও মহিমা ঘোষণা করা হয়। এই সকল কারণে এই সূরা

বিশেষভাবে ফযীলত লাভ করিয়াছে। হযরত রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন যে, জগতের সমুদয় বস্তু হইতে এই সূরা অধিক প্রিয়।

[১৮]

নিম্নোক্ত দোয়াটি বেশী দিন বেশী পরিমাণে পড়িলে কিংবা প্রাতে ও সন্ধ্যায় বহু পরিমাণে পড়িলে এবং প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩ বার করিয়া পড়িলে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হইয়া যায়।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ *

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ। আমি তোমার নিকট সমুদয় বিপদ, অনুতাপ, অলসতা ও জড়তা হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি এবং দুর্বলতা, কৃপণতা, ঋণের ভীষণ কষ্ট-যন্ত্রণা ও মানুষের ক্রোধ হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

[১৯]

কারবারে লাভবান হইবার তদবীর

জুময়ার নামাযের পর নিম্নের দোয়া ৭০ বার পড়িলে আল্লাহ অর্থশালী করিয়া দিবেন। দোকানদার এই দোয়া তাবীয করিয়া সঙ্গে রাখিলে কারবারে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। এই দোয়ার মধ্যে আল্লাহ্‌র কয়েকটি বিশেষ গুণবাচক নাম রহিয়াছে, ইহাদের বরকতে আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হয়।

اَللّٰهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ - يَا فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ اَكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ *

উচ্চারণ ঃ— আল্লাহুম্মা ইয়া গানিউ, ইয়া হামীদু, ইয়া মুবদিউ, ইয়া মুয়ীদু, ইয়া ফাআ'লুল্লিমা ইউরিদু, ইয়া রাহীমু, ইয়া ওয়াদুদু! আকফিনী বিহালালিকা আন্ হারামিকা ওয়া বিতাআতিকা আন মা'ছিয়াতিকা ওয়া বিফাদলিকা আম্মান ছিওয়াকা।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! হে সম্পদশালী! হে প্রশংসনীয়! হে প্রথম সৃষ্টিকারী! হে পুনর্বার সৃজনকারী (কেয়ামতের দিন)! হে ইচ্ছাকৃত কিছু করার অধিকারী! হে দয়াময়! হে বন্ধু! তোমার হালাল বস্তু দ্বারা আমাকে হারাম হইতে রক্ষা কর এবং তোমার এবাদত দ্বারা তোমার অবাধ্যতা হইতে রক্ষা কর এবং তোমার মঙ্গল দ্বারা আমাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে রক্ষা কর।

[২০]

যে ব্যক্তি প্রত্যহ নিম্নোক্ত দোয়া ৭০ বার পড়িবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার ধন-সম্পত্তি ও আয় বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا *

উচ্চারণ ঃ— আসতাগ্‌ফিরুল্লাহা ইন্নাহু কানা গাফ্‌ফারা।

অর্থ ঃ— আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তিনি অত্যন্ত ক্ষমা প্রদানকারী।

ফযীলত ঃ— পাক কোর্‌আন ও হাদীস শরীফে "ইস্তেগফারের" বহু ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। "ইস্তেগফারকারীকে" আল্লাহ অত্যন্ত পছন্দ করিয়া থাকেন (বিস্তারিত তফসীর অষ্টম অধ্যায়ে দেখুন)।

[২১]

হালাল রুযী পাইবার আমল

وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ •

উচ্চারণ ঃ— ওয়ারযুকনা ওয়া আন্তা খাইরুর্‌রাযেক্বীন।

অর্থ ঃ— এবং আমাদিগকে জীবিকা প্রদান কর এবং তুমিই উত্তম জীবিকাদাতা।

ফযীলত ঃ— উপরোক্ত আয়াত শরীফ প্রত্যহ ১০০ বার পড়িলে হালাল রুযী লাভ করা যায়। আল্লাহ সকল রিযিকেরই অধিকারী, পরন্তু এই আয়াত দ্বারা বিশেষভাবে উত্তম (হালাল) রিযিকের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হয়।

[২২]

সূরা কাহ্‌ফের ফযীলত—(১৫ পারা, কোর্‌আন)

১। এই সূরা লিখিয়া বোতলে ভরিয়া ঘরে রাখিলে অভাব ও কর্জের দায় হইতে নিশ্চিত থাকা যায় এবং ঐ বাড়ীর লোককে কেহ কোন দিন অনিষ্ট করিতে পারে না।

২। প্রত্যেক শুক্রবার জুময়ার নামাযের পর এই সূরা পড়িলে রুযীতে বরকত হয়।

জ্বিন হাসিল করার আমল

৩। অনেকেরই জ্বিন হাসিল (বাধ্য) করার প্রবল ইচ্ছা দেখা যায়। জ্বিন হাসিল করার জন্য এই সূরার আমলই সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু জ্বিন হাসিল করার চেষ্টা করা বিপজ্জনক বলিয়া ইচ্ছা থাকিলেও অনেকে এই দুরূহ কাজে অগ্রসর হয় না। নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে কিংবা সাহসের অভাব থাকিলে এই বিপদসঙ্কুল কাজে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন নহে। কোন ওয়াকিফহাল আলেম কিম্বা পীরের তত্ত্বাবধান ও নির্দেশ ব্যতীত এই আমলের চেষ্টাকারীগণকে সাবধান করা হইতেছে। এই আমল করিতে হইলে ৪০ দিন পর্যন্ত বা-ওযু প্রত্যহ রাত্রিতে নির্জন ঘরে বসিয়া ৭৫ আয়াত হইতে এই সূরার শেষ পর্যন্ত পড়িবে। অর্থাৎ—'ক্বালা আলাম আকুল' পারার প্রথম আয়াত قال الم اقل হইতে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়িবে। এই আয়াতগুলির মধ্যে হযরত খিযির (আঃ) এর অসাধারণ শক্তির বর্ণনা, জুলকারনাইনের ইয়াজুজ-মাজুজ দমন করার ঘটনাসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা থাকায় ইহারা এরূপ ফযীলতপূর্ণ হইয়াছে, এই আয়াতগুলি ১৪ দিন আমলের পরই নির্দশন দেখিতে পাইবে ও সাহসের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

শানে নুযূলঃ— হারেছ প্রভৃতি দুষ্ট প্রকৃতির কোরাইশগণ ইহুদীগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল যে, আমাদিগকে এমন অজ্ঞাত ঘটনা বলিয়া দাও যাহা সাধারণ মানুষ জ্ঞাত নহে। আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)কে ঐ ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার নবুওতের সত্যতা পরীক্ষা করিব। তদনুযায়ী ইহুদীরা আস্‌হাবে কাহ্‌ফ অর্থাৎ গুহাবাসী যুবকগণের ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য শিখাইয়া দেয় এবং এ কথাও বলিয়া দেয় যে, যদি মুহাম্মদ নিরক্ষর হইয়াও ঐ ঘটনা সঠিকভাবে বলিয়া দিতে পারে, তবে তাঁহাকে সত্য নবী বলিয়া গ্রহণ করিবে। তাঁহারা হযরত (সাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া আস্‌হাবে কাহ্‌ফের ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে

ইহার উত্তরে এই সূরা নাযিল হয়। আস্‌হাবে কাহ্‌ফের ঘটনায় আল্লাহ তায়ালার অনন্ত কুদরতের অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া ইহার দ্বারা আশ্চর্যরূপে অনেক ফযীলত ও অসাধারণ কার্য সাধিত হয়। এই সূরাকে কোর্‌আনের ছুরি বলা হয়, যেহেতু ইহার আমল দ্বারা অতি সত্বর ফল লাভ করা যায়।

আস্‌হাবে কাহ্‌ফের ঘটনাটি এইঃ— 'আফসুস শহরে দাকিয়ানুস নামে এক পৌত্তলিক বাদশাহ ছিল। সে তাহার দেশের লোকদিগকে মূর্তি পূজা করার জন্য অত্যাচার করিত। নিম্নোক্ত ৭ জন ধর্মপরায়ণ যুবক তাহার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁহাদের প্রার্থনা কবুল করিয়া তাঁহাদিগকে পর্বতগুহায় ৩০৯ বৎসরকাল নিদ্রিতাবস্থায় রাখিয়া দেন। তাঁহারা আর একবার জাগরিত হইয়া পুনরায় মৃত্যুবরণ করেন। মতান্তরে পুনর্জীবিত হইয়া হযরত ইমাম মেহ্‌দীর সহগামী হইবেন। তাঁহাদের একটি কুকুরও ছিল। এই ৮ জনকে আসহাবে কাহফ বলা হয়। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই এই সূরা নাযিল হইয়াছে।

ফযীলত ঃ— ১। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন ঘরে আগুন লাগিলে একখানা কাপড়ে আসহাবে কাহফের নামগুলি লিখিয়া আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিলে আগুন নিভিয়া যায়।

২। শিশু কাঁদিতে থাকিলে এই নামগুলি লিখিয়া তাহার মাথার নীচে রাখিয়া দিলে কান্না থামিয়া যায়।

৩। এই নামগুলি লিখিয়া স্ত্রীলোকের বাম বাজুতে বাঁধিয়া দিলে সহজে সন্তান প্রসব হয় ও সঙ্গে রাখিলে প্রাণনাশ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। ঘরের দরজায় রাখিলে অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। নৌকায় রাখিলে নৌকাডুবি হয় না। সঙ্গে রাখিলে টাকা-পয়সার সচ্ছলতা হয় ও সম্মান লাভ হয়।

৪। হযরত আবু সাঈদ মুহাম্মদ মুফ্‌তী (রাঃ) স্বপ্নযোগে আস্‌হাবে কাহ্‌ফকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমরা বরকত লাভের জন্য আপনাদের নামগুলি লিখিয়া রাখি, কিন্তু কোন ফল পাই না কেন? ইহাতে তাঁহারা উত্তর করেন যে— আমাদের নামগুলি গোলাকারে লিখিতে হয় ও মধ্যস্থলে কুকুরটির নাম লিখিতে হয়।

নামগুলি এই ঃ—

১। مَكْسَلْمِيْنَا —মাক্‌সেলাইনিয়া। ২। مَسْلِيْنَا — মাস্‌লিনিয়া। ৩। يَمْلِيْخَا —ইয়ামলিখা। ৪। مَرْنُوْش —মারনুশ। ৫। دَبَرْنُوْش —দাবারনুশ। ৬। شَاذَنُوْش —শাযনুশ। ৭। كَفَشْطَطْيُوْش —কাফ্‌শাত্‌তাইউশ। ৮। কুকুরটির নাম قِطْمِيْر —কিত্‌মীর।

আস্‌হাবে কাহ্‌ফের ঘটনা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাঁহার কুদরতের এক রহস্যময় উজ্জ্বল নির্দশন মানবের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ৩০৯ বৎসর ঘুমন্ত অবস্থায় থাকিয়া পুনঃ যখন তাঁহারা জাগরিত হন, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের একজনের সঙ্গে দাকিয়ানুস বাদশাহের সময়ের একটি মুদ্রা ছিল। তিনি উহা লইয়া শহরে উপস্থিত হইলে জানিতে পারেন যে, ইহা ৩০৯ বৎসর পূর্বের দাকিয়ানুস বাদশাহের সময়ের মুদ্রা। নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, মাত্র একদিন সময় বা দিনের কিছু অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহারা আল্লাহ্‌র কুদরতে ও অনুগ্রহে কেয়ামত পর্যন্ত পর্বতগুহায় নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে থাকিবেন ও আল্লাহ্‌র কুদরতের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। তাঁহারা আল্লাহ্‌র বিশেষ নিরাপত্তা লাভের পাত্র, তাঁহাদের নামগুলিও এই কারণে নিরাপত্তা আনয়ন করে। নামগুলি যেখানে বর্তমান থাকে সেখানে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল হয়। সেইজন্য এই নামগুলি বিপদাপদ ও অশান্তি নিবারণের সহায় হয় ও ইহাদের সহিত শান্তি বিরাজ করে। এই সূরা লিখিয়া বোতলে ভরিয়া রাখার বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে, আস্‌হাবে কাহ্‌ফগণ বিশেষ যত্নে রক্ষিত আছেন, সেইজন্য তাঁহাদের ঘটনার বর্ণনা ও নামগুলি হেফাজতে রাখিলে বিশেষ বরকত লাভ হয়।

কুকুর ও বাঘের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার তদবীর

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ -

উচ্চারণঃ— ওয়া কালবুহুম বাসিতুন যিরাআইহি বিলওয়াসীদ।

(সূরা কাহফ, ১৮ আয়াত)

অর্থঃ— এবং তাহাদের কুকুর দরজার উপর নির্বাক অবস্থায় থাবা দুইটি প্রসারিত করিয়া রহিয়াছিল।

খাসিয়তঃ— যদি কোন সময় কুকুর কিংবা বাঘে আক্রমণ করে, তবে তৎক্ষণাৎ এই আয়াত পড়িলে তাহারা চুপ হইয়া যাইবে।

শানে নুযূলঃ— এই আয়াতে উপরোক্ত আস্‌হাবে কাহ্‌ফের 'কিতমীর' নামক কুকুরটির বর্ণনা করা হইয়াছে। নিদ্রিত অবস্থায় যাহাতে আস্‌হাবে কাহ্‌ফের যুবকগণের দেহ পচিতে না পারে সেজন্য আল্লাহ তায়ালা মাঝে মাঝে তাহাদের পাশ ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। দীর্ঘ ৩০৯ বৎসর কাল ঘুমন্ত অবস্থায় থাকায় তাঁহাদের চুল ও নখ বর্ধিত হইয়া তাঁহারা ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গী কুকুরটিও থাবা বিস্তার করিয়া নির্বাক অবস্থায় দরজার মধ্যে অটল হইয়া রহিয়াছিল। এই আয়াতে ঐ কুকুরের নির্বাক ও অটল অবস্থার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তায়ালার কুদরতের বর্ণনা করা হইয়াছে। সেইজন্য ইহার বরকতে বাঘ ও কুকুর নির্বাক ও অচল হইয়া যায়। যে কয়টি পশু বেহেশ্‌তে দাখিল হইবে, এই কুকুরটি তাহাদের অন্যতম।

[২৩]

সূরা ইনশিরাহের আমল (৩০ পারা)

১। যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর এই সূরা ৯ বার পড়িবে আল্লাহ তাহার রিযিক বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

২। ৭ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের পর ৪১ বার পড়িলে নিশ্চয় আল্লাহ অর্থশালী করিয়া দিবেন।

৩। কোন সঙ্কটে পড়িলে প্রত্যেক দিন বিসমিল্লাহসহ ৭ শত কিংবা এক হাজার বার পড়িলে ইনশাআল্লাহ সঙ্কট দূর হইবে।

৪। এই সূরা কাচের বাসনে লিখিয়া গোলাপ পানি দ্বারা ধুইয়া খাইলে চিন্তা দূর হয়।

শানে নুযূল ও ফযীলতের বর্ণনাঃ— একদিন হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের কাজের জটিলতা ও নিরাশার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় এই সূরা নাযিল হয়। এই সূরার ৫—৬ আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন যে, 'কষ্টের পর সুখ নিশ্চয় আসিবে।" আল্লাহ্‌র এই আশ্বাসবাণী পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা হয় বলিয়া ইহার বরকতে জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয়। এই সূরা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আশ্বাস দিয়াছেন এবং জোরের সহিত দুইবার বলিয়াছেন যে, "কষ্টের পরেই সুখ"; কাজেই অপেক্ষা কর—নিরাশ হইবে না। সেইজন্যই কোন আরব্য কবি বলিয়াছেন যে, বিপদে পড়িলে "আলাম নাশরাহ্‌" সূরা অর্থাৎ সূরা ইনশিরাহ্‌ স্মরণ কর। এই সূরা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা হযরতের মনের নৈরাশ্য দূর করিয়া ভবিষ্যতের সফলতার সুসমাচার দিয়াছেন।

[২৪]

সূরা আলক্বারিয়াতের আমল (৩০ পারা)

ফযীলত ঃ— এই সূরা বেশী পরিমাণে পড়িলে রুযী বৃদ্ধি হয়; (আঃ কোর্‌আন)। এই সূরায় কেয়ামতের অবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে; কেয়ামতকে 'ক্বারেয়া' বলা হইয়াছে। কারণ, কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনা হৃদয়কে আন্দোলিত করে। এই সূরার ৬ —৭ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, কেয়ামতের দিন যাহাদের নেকীর পাল্লা ভারী হইবে, তাহারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে ও সুখময় জীবন যাপন করিবে। সুখময় জীবন পৃথিবীতেও লাভ করা যায়। মানুষের মনের বাসনাও এই যে, এই শান্তিপূর্ণ পৃথিবীতে সুখময় ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করুক। এই সূরাতে আনন্দময় পরিপুষ্ট জীবন লাভ করার আল্লাহ তায়ালার একটি বাণী থাকায় ইহার আমল দ্বারা উপরোক্ত ফযীলত লাভ হইয়া থাকে।

[২৫]

নিম্নের আয়াত দুইটিকে ৫ টুক্‌রা সুতার কাপড়ে লিখিয়া নিজের মালামালের সঙ্গে রাখিলে ব্যবসায়ে উন্নতি হয়।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ * لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ
وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ـ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ *

(২২ পারা, সূরা ফাতির, ২৯-৩০ আয়াত)

অর্থঃ— যাহারা আল্লাহ্‌র কিতাব (কোর্‌আন) পড়ে, নামায পড়ে ও তাহাদিগকে আমি যে রিযিক দিয়াছি তাহা হইতে কিয়দংশ গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাহারা ঐরূপ ব্যবসায়ের ইচ্ছা করিয়াছে যাহা কখনই নষ্ট হইবে না। কেননা, আল্লাহ তাহাদিগকে পূর্ণ প্রতিদান দিবেন এবং নিজ দয়া-গুণে অধিকতর দান দিবেন। (নিশ্চয়) তিনি ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী।

ফযীলত ঃ— আল্লাহ তায়ালা নিয়মিত কোর্‌আন পাঠকারী, নামায আদায়কারী ও দান-খয়রাতকারীগণের প্রতিফলের বিষয় বর্ণনা করিয়া এই আয়াত দুইটি নাযিল করিয়াছেন। তিনি অঙ্গীকার করিতেছেন যে, যাহারা এই কাজগুলি নিয়মিতভাবে সমাধান করিবে, তিনি তাহাদিগকে অধিকতর রিযিক দান করিবেন এবং তাহাদের এই কাজগুলি কখনও ব্যর্থ হইবে না। তাহারাই আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ইহাদের সুফল প্রাপ্ত হইবে। এই আয়াতে আল্লাহ্‌র দানের উল্লেখ থাকায় ইহার আমল দ্বারা উপরোক্ত ফযীলত লাভ হয়।

[২৬]

(হুরূফে নূরানী)

কোর্‌আন শরীফের কয়েকটি সূরার প্রথমভাগে যথাক্রমে আলিফ, লাম, মীম, সোয়াদ প্রভৃতি কয়েকটি অক্ষর আছে; ইহাদিগকে "হুরূফে মোকাত্তেয়াত" বলা হয়। তন্মধ্যে আলিফ হে, সোয়াদ, কাফ, রে, নূন, লাম, ও ইয়া—এই কয়েকটি অক্ষর আছে; ইহাদের প্রত্যেকটি আল্লাহ্‌র নামের প্রথম অক্ষর বলিয়া এই হরফগুলির সমষ্টিকে 'হুরূফে নূরানী' বলে।

ফযীলত ঃ— এই 'হুরূফে নূরানী'গুলি লিখিয়া মাল-সম্পত্তির সহিত কিংবা ক্ষেতে রাখিলে বিপদের হাত হইতে নিরাপদ থাকা যায়; লিখিয়া নিজের সঙ্গে রাখিলে সকল প্রকার বালা-মসিবত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, অভাব মোচন হয়। প্রবাসকালে পড়িলে নিরাপদে বাড়ী ফিরিয়া আসা যায়।

সত্য কথা বলার ফল

যাহারা সর্বদা সত্য কথা বলে তাহারা যাহা বলে তাহাই সত্য হয়; যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে, আল্লাহ তাহার কোন কথাই মিথ্যা হইতে দেন না। সত্য বলা আল্লাহ ও নবীগণের স্বভাব।

মিথ্যা বলার ফল

মিথ্যা কথা জঘন্য পাপ, মিথ্যাবাদীর ঈমান নাই। মিথ্যাবাদীর জীবিকা অর্জনের পথ সংকীর্ণ হয় (হাদীস), আয়ু কমিয়া যায়, তবে পাঁচ জায়গায় মিথ্যা বলা যাইতে পারে ঃ

১। জেহাদের সময় শত্রুর নিকট। ২। বিবাদরত ব্যক্তির মিলনের জন্য। ৩। স্ত্রীর মন ভোলানোর জন্য (আমি তোমাকে অন্য স্ত্রী অপেক্ষা বেশী ভালবাসি)। ৪। বালক-বালিকাকে লেখাপড়ায় উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার দেওয়ার মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া যায়। ৫। যাহা বলিবার ইচ্ছা নাই, অথচ জীবনের দায়ে বলিতে হইবে, এরূপ কথা বলা; কিন্তু, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কঠিন গোনাহ।

[১]

স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও এলেম বৃদ্ধির আমল

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا *

উচ্চারণঃ— রাব্বি যিদ্‌নী ইল্‌মা (১৬ পারা, সূরা তাহা, ১১৪ আয়াত)।

অর্থ ঃ— হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া দাও।

খাসিয়ত ঃ— প্রত্যেক নামাযের পর এই আয়াত কয়েকবার পড়িলে স্মরণশক্তি ও এলেম বৃদ্ধি পায়।

শানে নুযূল ঃ— আল্লাহ তায়ালা হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলিতেছেন যে, আপনার উপর ওহী সম্পূর্ণ নাযিল হইবার পূর্বে জিব্রাইল (আঃ) এর সঙ্গে সঙ্গে পড়িবার চেষ্টা করিবেন না; কারণ, ইহাতে আপনার কষ্ট হয়। কেননা, জিব্রাইলের সঙ্গে সঙ্গে পড়া আবার জিব্রাইলের পড়া শোনা, এই দুইটি কাজ একত্রে করা কষ্টকর। অতএব, ওহী পূর্ণ হওয়ার পরই আপনি পড়িবেন। আপনার মনে থাকিবে না — এই কথা কখনও সন্দেহ করিবেন না। কারণ, আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার ভার আমি নিজেই আমার জিম্মায় লইয়াছি। আর আপনিও স্মরণশক্তির জন্য আমার নিকট উপরোক্ত দোয়া পাঠ করিতে থাকেন যে, হে আল্লাহ! আমার মেধাশক্তি ও এলেম বৃদ্ধি করিয়া দাও।

[২]

স্মরণশক্তি ও এলেম বৃদ্ধির জন্য ফজরের নামাযের পর এই দোয়া ২১ বার পড়িবে ঃ

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ - وَيَسِّرْ لِىْ اَمْرِىْ - وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ - يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ *

উচ্চারণঃ— রাব্বিশরাহলী সাদ্‌রী ওয়া ইয়াস্‌সিরলী, আমরী, ওয়াহলুল ওক্‌দাতাম্‌ মিল্লিসানী ইয়াফক্বাহু ক্বাওলী। (১৬ পারা, সূরা তাহা, ২৫ — ২৮ আয়াত)।

অর্থঃ— হে আমার প্রতিপালক! আমার অন্তঃকরণ খুলিয়া দাও ও আমার কাজ সহজ করিয়া দাও এবং আমার জিহ্বা হইতে জড়তা দূর করিয়া দাও, যেন তাহারা আমার কথা বুঝিতে পারে।

শানে নুযূলঃ—হযরত মূসা (আঃ) শৈশবে বেদীন ফেরাউনের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। একদিন ফেরাউন শিশু হযরত মূসা (আঃ)কে কোলে লইয়া মন্ত্রীগণের সহিত আলাপ করিতেছিল, এমন সময় কথায় কথায় আল্লাহ্‌র নিন্দাবাদ আরম্ভ হইল। তখন শিশু মূসা (আঃ) ফেরাউনের কোলে থাকিয়াই হঠাৎ তাহার গালে ও মুখে চড় মারিতে লাগিলেন। ফেরাউন রাগে অস্থির হইয়া হযরত মূসা (আঃ)কে মারিয়া ফেলিবার আদেশ দিল। এদিকে ফেরাউনের ধর্মপ্রাণা স্ত্রী বিবি আছিয়া এই সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং ফেরাউনকে বলিলেন যে, এই দুধের শিশু কি ভাল-মন্দ বুঝিতে পারে? এ যে ইয়াকুত (লাল রঙ্গের পাথর) মনে করিয়া আগুনেও হাত দিতে পারে! এই কথা শুনিয়া ফেরাউন থামিয়া গেল এবং হুকুম দিল—আচ্ছা একটি ইয়াকুত ও জ্বলন্ত অঙ্গার আনিয়া শিশু হযরত মূসা (আঃ) এর সামনে রাখা হউক। বেগম আছিয়া আল্লাহ্‌র দরগাহে মোনাজাত করিতে লাগিলেন; আল্লাহ তাহার মান রক্ষা করিলেন। হযরত মূসা (আঃ) ইয়াকুত রাখিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারে হাত দিয়া মুখে পুরিয়া দিলেন। ফেরাউন থামিয়া গেল ও হযরত মূসা (আঃ) এর প্রাণ রক্ষা হইল। কিন্তু জিহ্বা পুড়িয়া যাওয়ায় তিনি তোত্‌লা হইয়া গেলেন। তৎপর হযরত মূসা (আঃ) তূর পর্বতে নবুয়ত প্রাপ্ত হইলে আল্লাহ তাঁহাকে ফেরাউনের রাজ্যে গিয়া হেদায়েত করিতে আদেশ করিলেন। তিনি এই আদেশ পাইয়া আল্লাহ্‌র নিকট আরয করিলেন যে, "হে আমার প্রতিপালক! আমার তোত্‌লামির জন্য লোকে আমার কথা বুঝিতে পারিবে না।" তখন তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে তাঁহার তোত্‌লামি দূর হইবার জন্য এই দোয়া প্রার্থনা করিলে তাঁহার দোয়া কবুল হইল, তোত্‌লামি দূর হইল ও তাঁহার জ্ঞান বৃদ্ধি পাইল।

[৩]

যে ব্যক্তি ৭ দিন পর্যন্ত বা-ওযু ৭০ বার সূরা ফাতেহা (আলহামদু সূরা) পড়িয়া পানির উপর ফুঁক দিয়া ঐ পানি খাইবে, আল্লাহ্‌র ফযলে তাহার এলেম ও কৌশল বৃদ্ধি পাইবে। নেশা ও পাপ কাজ হইতে তাহার মন বিরত থাকিবে এবং স্মরণশক্তি এত বৃদ্ধি পাইবে যে, একবার শুনিলে বা পড়িলে তাহা কখনও ভুলিবে না।

এই আয়াত ৪টি ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর ১১ বার পড়িলে স্মরণশক্তি ও এলেম বৃদ্ধি পায়

اَلرَّحْمٰنُ - عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ *

উচ্চারণঃ—১। আর্‌রাহমানু। ২। আ'ল্লামাল কোর্‌আন। ৩। খালাক্বাল ইন্‌সানা। ৪। আল্লামাহুল বায়ান।

অর্থঃ—১। অসীম দয়াময় (আল্লাহ)। কোর্‌আন শিক্ষা দিয়াছেন। ৩। তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। ৪। তাহাকে (মানবকে) কথা বলিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই আয়াত ৪টি সূরা আর্‌রাহমানের প্রথম ভাগে রহিয়াছে। এই আয়াতগুলি দ্বারা আল্লাহ তায়ালা জানাইয়াছেন যে, সকল প্রকার শিক্ষার মূলে তাঁহার রহমত ও ইচ্ছা বর্তমান রহিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা ও অনুগ্রহ ব্যতীত কেহ কিছু শিক্ষা করিতে পারে না। এই আয়াত দ্বারা তাঁহার ঐ সকল শক্তি ও রহমতের স্মরণ করা হয়, ফলে ইহাদের বরকতে পাঠকের উপর এলেম শিক্ষার রহমত নাযিল হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমলে কোর্‌আনে রোগ-শোকের তদবীর

(চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি পাওয়ার তদবীর)

[১]

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ *

উচ্চারণ ঃ— ফাকাশাফ্‌না আন্‌কা গিতাআকা ফাবাসারুকাল ইয়াওমা হাদীদ।

(২৬ পারা, সূরা ক্বাফ, ২২ আয়াত)

অর্থ ঃ— আমি তোমার চোখের আবরণ (পর্দা) খুলিয়া দিয়াছি। অতএব, তোমার দৃষ্টিশক্তি এখন প্রখর হইয়াছে।

খাসিয়ত ঃ— এই আয়াতটি প্রত্যেক নামাযের পর ৩ বার করিয়া পড়িয়া আঙ্গুলে ফুঁক দিয়া আঙ্গুল চোখে লাগাইলে চোখের জ্যোতি কখনও হ্রাস পাইবে না ও চোখের কোন পীড়া থাকিলে তাহা ক্রমশঃ আরোগ্য হইয়া যাইবে।

শানে নুযূল ঃ— হাশরের দিন পাপীগণের যে অবস্থা হইবে তাহা বর্ণনা করিয়া এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, সেদিন কাহারও কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ কৃতকর্ম স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে এবং আল্লাহ তায়ালা পাপীগণকে বলিবেন যে, আজ আমি তোমাদের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। তোমরা স্বচক্ষে নিজ নিজ আমলনামা দেখিয়া লও। এই আয়াতে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হওয়ার আল্লাহ্র একটি আদেশবাণী থাকায় ইহার বরকতে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় ও চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়।

[২]

(চোখের বেদনার তদবীর)

সর্বদা কোরআন পাঠ করিলে চোখের জ্যোতি সমভাবে থাকে ও চোখে কোন বেদনা ও পীড়া হয় না।

[৩]

চোখে বেদনা হইলে ফজরের সুন্নত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতেহা ৪১ বার পড়িলে ইনশাআল্লাহ বেদনা দূর হইবে; (ইহা পরীক্ষিত)। এই আমলের অন্যান্য ফযীলত (সূরা ফাতেহার তফসীরে দ্রষ্টব্য)।

[৪]

সূরা কাওসার (৩০ পারা) গোলাপ পানিতে পড়িয়া প্রত্যেক দিন চোখে দিলে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায় ও বেদনা দূর হয়।

[৫]

যে ব্যক্তি অযু করার পর আকাশের দিকে চাহিয়া একবার সূরা ক্বদর (৩০ পারা) পড়িবে, ইনশাআল্লাহ তাহার চোখের জ্যোতি কখনও নষ্ট হইবে না ; (এই সূরার তফসীর দ্রষ্টব্য)।

[৬]

اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ - وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ— ইন্নামা ইয়াস্তাজীবুল্লাযীনা ইয়াসমাউনা ওয়াল মাউতা ইয়াব-আসুহুমুল্লাহু ছুম্মা ইলাইহি ইউরজাউন। (৭ পারা, সূরা আনআম, ৩৬ আয়াত)।

অর্থ ঃ— যাহারা শুনিয়াছে কেবল তাহারাই ইহা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ মৃতকে (কেয়ামতের দিন) উঠাইবেন, তৎপর তাঁহারই দিকে ফিরিয়া যাইবে।

খাসিয়ত ঃ— কাহারও চোখে কোন প্রকার দোষ দেখা দিলে বা শরীরের কোন অঙ্গের কোন অনিষ্ট হইলে পর পর তিন দিন রোযা রাখিবে এবং দুধ ও চিনি দ্বারা ইফ্তার করিবে এবং অর্ধরাত্রে উঠিয়া তামার কলম দ্বারা যাফ্রান ও গোলাপ পানি দ্বারা নিজের বা ঐরূপ রোগীর ডান হাতে এই আয়াত লিখিয়া চাটিয়া খাইবে অথবা খাওয়াইবে। ৩ দিন এই আমল করিলে ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করিবে।

শানে নুযূলঃ— আরবের পৌত্তলিকরা নানাপ্রকার মা'জেযা দেখাইবার জন্য হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বিরক্ত করিত। তাহারা মা'জেযা দেখিয়াও ঈমান আনিত না। হযরত রসূল (সাঃ) আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দুই টুক্রা করিয়া দেখাইয়াছিলেন। তথাপি কাফেরগণ তাঁহার নবুয়ত বিশ্বাস করে নাই। সেইজন্য আল্লাহ এই আয়াতে হযরত রসূল (সাঃ)কে বলিয়াছিলেন যে, কাফেরগণকে মা'জেযা দেখাইয়া কোন ফল হইবে না। যাহারা বিশ্বাসী তাহারা সদুপদেশ শুনিয়াই সত্য ধর্ম গ্রহণ করিবে। চাক্ষুষ মা'জেযা দেখার জন্য তাহারা ব্যস্ত হইবে না। এই আয়াতে স্বচক্ষে মা'জেযা দেখার আগ্রহ সংবরণ করিয়া ইসলামের প্রতি ও হযরত রসূল (সাঃ) এর নবুয়তের প্রতি ঈমান স্থাপন করার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেইজন্য ইহার আমল দ্বারা চক্ষু রোগ আরোগ্য হয়।

রাতকানা আরোগ্য হওয়ার তদবীর

(৭২ পৃষ্ঠায় সূরা ক্বদরের তফসীর দেখুন)

দন্ত রোগের তদবীর

[১]

নিম্নলিখিত নিয়মে বেত্রের নামায পড়িলে কখনও দাঁত পড়িবে না। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর 'অত্তীন' (৩০ পারা) ও ২য় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা 'আল্হাকোমুত্তাকাসোর' (৩০ পারা) ও ৩য় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর 'সূরা ইখলাস' পড়িবে, (ইহা বহু পরীক্ষিত)।

ফযীলতঃ— ১। সূরা অত্তীনের ৩য় আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন যে, নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করিয়াছি। (দাঁত মানুষের সৌন্দর্যের একটি বিশেষ উপকরণ)। ২। সূরা আল্হাকোমুত্তাকাসোরে মানুষের সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের এবং ইহার ৮ম আয়াতে আল্লাহ্র অনুগ্রহের বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে। (দাঁত মানুষের সৌন্দর্য ও আল্লাহ্র প্রদত্ত অন্যতম নেয়ামত)। ৩। সূরা ইখলাসে

আল্লাহ্‌র তৌহীদ ও শক্তির বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল কারণে উপরোক্ত আমল দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত নেয়ামতগুলির স্মরণ করা হয় ও তাঁহার তৌহীদ এবং শক্তির বর্ণনা করা হয়; ফলে উপরোক্ত ফযীলত লাভ হয়।

[২]

একদিন হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) কঠিন দন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া হযরত রসূল (সাঃ) এর নিকট এই বিষয় আরজ করিলেন। তিনি তাঁহাকে নিম্নলিখিত নিয়মে প্রত্যেক দিন মাগরিবের নামাযের পর দুই রাকাত নফল নামায পড়ার জন্য আদেশ দেন। যথা—প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কাফেরূন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস একবার করিয়া পড়িবে। হযরত গেফারী বলিয়াছেন, আমি হামেশা এই নিয়মে নামায পড়িতাম। ইহার পর হইতে আর কখনও দাঁতে বেদনা হয় নাই (উপরোক্ত সূরাগুলির ফযীলত যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে)। আমাদের হযরত (সাঃ) যে আমল করার জন্য আদেশ দিয়াছেন, তাহা যে অতি উত্তম ফলপ্রদ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

[৩]

হাদীস শরীফে দাড়ি রাখার জন্য জরুরী নির্দেশ রহিয়াছে। প্রত্যেক মুসলমানের দাড়ি রাখা সুন্নতে মোয়াক্কাদা (জরুরী)। বর্তমান যুগের ডাক্তারগণ গবেষণা দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছেন যে, দাড়ি রাখিলে চক্ষু ও দাঁত ভাল থাকে। হযরত রসূল (সাঃ) এর হাদীসের বিধানগুলি যে মানুষের ইহ-পরকালের জন্য মঙ্গলজনক ইহা তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

সর্বপ্রকার পীড়া আরোগ্য হওয়ার তদবীর

(আয়াতে শিফা)

١- وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ * ٢- وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ *
٣- يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ *
٤- وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ * ٥- وَاِذَا
مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ * ٦- قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ *

১। ১০ পারা, সূরা, তওবা, ১৪ আয়াতের অংশ। ২। ১১ পারা, সূরা ইউনুস, ৫৭ আয়াত। ৩। ১৪ পারা, সূরা নাহ্‌ল, ৬৯ আয়াত। ৪। ১৫ পারা, সূরা বনী ইসরাইল, ৮২ আয়াত। ৫। ১৯ পারা, সূরা শোয়ারা, ৮০ আয়াত। ৬। ২৪ পারা, সূরা হা-মীম, ৪৪ আয়াত।

অর্থঃ—১। আল্লাহ বিশ্বাসীগণের অন্তর আরোগ্য করিবেন, ২। নিশ্চয়ই তোমাদের আন্তরিক রোগসমূহের আরোগ্যকারী ঔষধ রহিয়াছে। ৩। উহাদের (মৌমাছিদের) উপর হইতে নানা রঙ্গের পানীয় (মধু) নির্গত হয়; উহার মধ্যে মানুষের জন্য রোগ আরোগ্যকারী ঔষধ রহিয়াছে। ৪। আমি কোর্‌আনে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহা বিশ্বাসীগণের জন্য (মনের রোগসমূহের) আরোগ্য ও অনুগ্রহস্বরূপ; ৫। এবং যখন আমি পীড়িত হই, তখন তিনিই (আল্লাহ) আমাকে আরোগ্য করিয়া থাকেন। ৬। বল, বিশ্বাসীগণের জন্য সুপথ ও আরোগ্য রহিয়াছে।

খাসিয়তঃ— যে কোন কঠিন রোগে আয়াতগুলি চীনা মাটির বাসনে লিখিয়া ধুইয়া রোগীকে পানি খাওয়াইবে অথবা তাবীয লিখিয়া গলায় বাঁধিবে। যেরূপ কঠিন রোগই হউক না কেন আল্লাহ্‌র ফযলে তাহা আরোগ্য হইবে। ইহা সর্বরোগনাশক তাবীয। ইহাতেও যদি আরোগ্য না হয়, তবে মাগরিবের নামাযের পর সূরা ইয়াসীন তিনবার পড়িয়া রোগীর শরীরে ফুঁক দিবে; তাহাতে হয় রোগী আরোগ্য লাভ করিবে, না হয় মরিয়া যাইবে। পাক কোর্‌আনের এক নাম শিফা অর্থাৎ আরোগ্যকারী। পাক কোর্‌আনে মানুষের অন্তরের ও শরীরের ব্যাধি আরোগ্য করার গুণ রহিয়াছে। এই আয়াতগুলিতে কোর্‌আনের ঐ গুণসমূহের বর্ণনা রহিয়াছে এবং ইহা দ্বারা রোগ আরোগ্য হয় বলিয়া ইহাদিগকে আয়াতে শিফা বলা হয়। এই আয়াতগুলি মানুষের জন্য রোগ্য আরোগ্য বাণী লইয়া নাযিল হওয়ায় ইহাদের বরকতে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। ৩য় আয়াতে স্পষ্ট জানা যায় যে, মধু একটি মূল্যবান ও মহোপকারী ঔষধ। সেজন্য সর্বরোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও দুরারোগ্য ব্যাধির তদবীর

يَا حَيُّ حِيْنَ لَا حَيَّ فِىْ دَيْمُوْمِيَّةِ مُلْكِهٖ وَبَقَائِهٖ يَا حَيُّ *

উচ্চারণঃ— ইয়া হাইয়্যু হিনা লা হাইয়্যুন্ ফী দাইমুমিয়্যাতি মুল্‌কিহী ওয়া বাক্বাইহী ইয়া হাইয়্যু।

অর্থঃ— হে চিরজীবী (আল্লাহ)! যে সময় তোমার রাজত্বের স্থায়িত্বে, অস্তিত্বে কিছুই বর্তমান ছিল না, সে সময়ও তুমি বর্তমান ছিলে হে চিরজীবী।

খাসিয়তঃ— ১। যে ব্যক্তি ৩ লক্ষ বার এই দোয়া পড়িবে, মৃত্যু ব্যতীত তাহার আর কোন রোগ হইবে না।

২। এই দোয়াটি ও সূরা ফাতেহা সাদা চীনা বাসনে লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া রোগীকে ৪ দিন পান করাইবে ও ১ লক্ষ ৪০ হাজার বার বিসমিল্লাহ পড়িবে। নিশ্চয়ই রোগ আরোগ্য হইবে; (বহু পরীক্ষিত)।

ফযীলতঃ— আল্লাহ তায়ালা যে চিরস্থায়ী ও চিরজীবী, এই দোয়ার যিকির দ্বারা তাঁহার ঐ সিফতের বর্ণনা করিয়া অনন্ত স্থায়িত্বের সাক্ষ্য দেওয়া হয়, ফলে এই যিকিরের উপযুক্ত প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তায়ালা পাঠকারীর জীবনের অস্তিত্বের অন্তরায় রোগ-ব্যাধি দূর করিয়া দেন।

[২]

يَا اَللّٰهُ

জুময়ার দিন আছরের নামাযের পর হইতে মাগরিব পর্যন্ত يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ (ইয়া আল্লাহু! ইয়া রাহমানু! ইয়া রাহীমু!) পড়িতে থাকিবে। এইরূপ ২১ দিন পড়িলে আল্লাহ্‌র রহমতে রোগ আরোগ্য হইবে।

সর্বপ্রকার বেদনা ও রোগের তদবীর

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۔ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا *

উচ্চারণঃ— ওয়া বিলহাক্কি আন্‌যালনাহু ওয়া বিলহাক্কি নাযালা, ওয়ামা আরসাল্‌নাকা ইল্লা মুবাশ্‌শিরাওঁ ওয়া নাযীরা।

(১৫ পারা, সূরা বনী ইসরাঈল, ১০৫ আয়াত)

অর্থঃ— এবং আমি ইহাকে (কোর্‌আনকে) সত্যরূপ নাযিল করিয়াছি; এবং ইহা ঠিকভাবেই নাযিল হইয়াছে ও আমি আপনাকে (রসূলকে) সুসংবাদদাতা (মো'মেনদের জন্য) ও ভয়প্রদর্শক (কাফেরদের জন্য) স্বরূপ ব্যতীত পাঠাই নাই।

খাসিয়তঃ— সকল প্রকার রোগ, সর্বপ্রকার বেদনার জন্য পীড়িত স্থানে হাত রাখিয়া এই আয়াত ৩ বার পড়িয়া ফুঁক দিবে; ইনশাআল্লাহ সত্বর আরোগ্য লাভ করিবে।

শানে নুযূলঃ— কয়েকজন কাফের প্রচার করিতেছিল যে, কোর্‌আন শরীফ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজের কল্পনা ও খেয়াল অনুযায়ী রচনা করিয়া প্রচার করিতেছেন। তাহাদের এই মিথ্যা উক্তির উত্তরে এই আয়াত নাযিল হইয়াছিল।

এই আয়াত পাঠ দ্বারা পাক কোর্‌আনের সত্যতা ও হযরত রসূল (সাঃ) এর নবুয়তের মহিমা ও সত্যতা ঘোষণা করা হয়। এই দুইটি অমূল্য নেয়ামতের বরকতে উপরোক্ত ফযীলত লাভ হয়।

রোগ হইতে নিরাপদ থাকার তদবীর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۔ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ *

উচ্চারণঃ— আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী খালাকাস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়া জায়ালাজ্‌ জুলুমাতে ওয়ান্‌নূর, ছুম্মাল্লাযীনা কাফারূ বিরাব্বিহিম ইয়া'দিলুন।

অর্থঃ— আল্লাহ্‌র জন্যই সমস্ত প্রশংসা। যিনি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অন্ধকার ও আলোর সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি কাফেরগণ তাহাদের প্রতিপালকের সাদৃশ্য সৃষ্টি করিতেছে।

খাসিয়তঃ— যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এই আয়াতটি পড়িয়া ৭ বার হাতে ফুঁক দিয়া নিজের শরীরে হাত বুলাইবে, সে সর্বপ্রকার বেদনা ও বিপদাপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে।

ফযীলতঃ— আল্লাহ এই আয়াত দ্বারা তৌহীদের পোষকতায় বিশ্বজগতের বিশালতা ও সৃষ্টি কৌশলের বর্ণনা করিয়া অংশীবাদীগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। তৌহীদের বর্ণনা আছে বলিয়া এই আয়াতের শক্তি ও ফযীলত অসীম হইয়াছে, সেজন্য ইহার আমল দ্বারা উপরোক্ত ফযীলত লাভ হইয়া থাকে।

যে কোন পীড়া আরোগ্যের ও মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার তদবীর

[১]

يَا اَللّٰهُ الْمَحْمُوْدُ فِيْ كُلِّ فِعَالِهٖ يَا اَللّٰهُ *

উচ্চারণঃ— ইয়া আল্লাহুল্‌ মাহ্‌মুদু ফী কুল্লে ফিয়ালিহি ইয়া আল্লাহু।

অর্থঃ— হে আল্লাহ তুমি প্রত্যেক কাজে প্রশংসনীয়, হে আল্লাহ!

খাসিয়তঃ— ১। যে রোগীর আশা ডাক্তার কবিরাজগণ ছাড়িয়া দেয়, এরূপ রোগীর জন্য ইমাম সুহ্‌রাওয়ার্দী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, শুক্রবার জুময়ার নামাযের পূর্বে ওযু করিয়া একা এক ঘরে বসিয়া কেবলামুখী হইয়া দুইশত বার এই ইস্‌মে পাক পড়িবে, ইনশাআল্লাহ রোগমুক্ত হইবে। ২। দোর্‌রে মন্‌সুর, সহী আসমাউল

হোসনায় লিখিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি এই আমল করিবে, তাহার মনের বাসনা অতি সহজে পূর্ণ হইবে। এই আমলের বরকতে রোগ আরোগ্য হইবে।

ফযীলতঃ— এই ইস্‌মে পাকের যিকির দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সকল কাজেই প্রশংসনীয় বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তিনি নিজেও প্রশংসনীয় এবং তাঁহার কাজও তদ্রূপ বলিয়া প্রশংসা করার ফলে এই ফযীলত লাভ হয়।

رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

উচ্চারণঃ— রাব্বি আন্নি মাস্‌সানিয়াদ্ব যোররো ওয়া আন্তা আরহামুর রাহেমীন। (১৭ পারা, সূরা আম্বিয়া, ৮৩ আয়াত)

অর্থঃ— হে প্রতিপালক! আমাকে রোগ যন্ত্রণায় ধরিয়াছে এবং তুমিই অনুগ্রহকারীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনুগ্রহকারী।

ফযীলতঃ— বালা মসিবতের সময় এই আয়াত সর্বদা পড়িলে উদ্ধার পাওয়া যায়।

শানে নুযূলঃ— হযরত আইয়ুব নবী (আঃ) সুদীর্ঘ ১৯ বৎসরকাল গলিত কুষ্ঠ রোগে ভুগিয়া অস্থিসার হইয়াছিলেন এবং সমস্ত ধন-সম্পত্তি হারাইয়া দরিদ্রতার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট এই দোয়া পেশ করিয়া মুক্তিলাভ করেন ও পূর্ব স্বাস্থ্য এবং ধন-সম্পত্তি ফিরিয়া পান। হযরত আইয়ুব নবী (আঃ) এর কঠোর ধৈর্য ও আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা মুসলিম জগতে এক অপূর্ব ঘটনা। এই আয়াত পাঠ দ্বারা হযরত আইয়ুব নবী (আঃ) এর উপর আল্লাহ্‌র অসীম রহমত উদ্রেক হওয়ার বিষয় ও তাঁহারই অনুগ্রহে আইয়ুব নবী (আঃ) এক কঠিন বিপদ ও রোগমুক্ত হওয়ার বিষয় স্মরণ করা হয়। এতদ্ভিন্ন ইহাও স্মরণ করা হয় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ বিপদমুক্ত করিতে পারে না, এইজন্য ইহার আমল দ্বারা বিপদ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

[২]

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ *

উচ্চারণঃ— হাস্‌বুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।
(৪র্থ পারা, সূরা আলে-এমরান, ৭৩ আয়াত)

অর্থঃ— আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট ও মঙ্গলময় কার্যকারক।

খাসিয়তঃ— ১। যে কোন বিপদাপদের সময় ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর এক হাজার বার এই আয়াত পড়িলে বিপদ উদ্ধার হয়। ২। দৈনিক নির্দিষ্ট সময় ৫০০ বার এই আয়াত পড়িলে আল্লাহ রুযী-রোযগার বৃদ্ধি করিয়া দিয়া থাকেন।

শানে নুযূল ঃ— ছোট বদরের যুদ্ধের সময় হযরত রাসূল (সাঃ) এর নিকট সংবাদ আসিল যে, কাফেরগণ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া মুসলমানগণকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। এই সংবাদ শুনিয়া হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবাগণ এই উত্তর দিয়াছিলেন। আল্লাহ এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া ঐ যুদ্ধে মুসলমানদিগকে জয়যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতা প্রকাশ করার জন্য ইহা অতি উত্তম আয়াত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দয়ার উপর নির্ভর করে, তিনি তাহাকে বিপদে সাহায্য করিয়া থাকেন। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালার দয়ার উপর আশ্রয় গ্রহণ করা হয় বলিয়া ইহার আমল দ্বারা আশ্চর্যরূপ ফললাভ হয়।

[৩]

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ *

উচ্চারণঃ— ফাল্লাহু খায়রুন হাফিযাওঁ ওয়া হুয়া আরহামুর রাহিমীন।

অর্থঃ— [হযরত ইয়াকুব (আঃ) বলিয়াছেন] সুতরাং আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষক এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা অধিকতর দয়াবান।

খাসিয়তঃ— শত্রু কিংবা অন্য কোন বিপদের ভয় হইলে প্রত্যহ অনেকবার এই আয়াত পড়িবে, ইনশাআল্লাহ বিপদ ও ভয় দূর হইবে।

শানে নুযূলঃ— হযরত ইউসুফ নবী (আঃ) এর ভ্রাতাগণ হিংসাপরবশ হইয়া তাঁহাকে কুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল। মিসরের একদল সওদাগর আল্লাহ্‌র হুকুমে তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করেন। এদিকে তাঁহার ভ্রাতাগণ প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া রক্তমাখা কাপড় লইয়া তাহাদের পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হয় ও প্রকাশ করে যে, ইউসুফকে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে। হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর মনে সন্দেহ জন্মিল, তিনি তাহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন না। এই ঘটনার কিছুদিন পর পুনরায় তাঁহার পুত্রগণ তাহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রাণপণে

রক্ষা করিবে বলিয়া হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর নিকট অঙ্গীকার করিল। তিনি তাহাদের প্রস্তাবের উত্তরে বলিলেন যে, আমি তোমাদের কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। ইহার পূর্বে ইউসুফকে তোমাদের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা কর নাই, আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষক, তাঁহার উপর নির্ভর করা উচিত। এই আয়াত দ্বারা হযরত ইয়াকুব নবীর (আঃ) ঐ উক্তির স্মরণ করা হয় যে, আল্লাহ রক্ষা না করিলে মানুষের সাধ্য নাই যে, কাহাকেও রক্ষা করে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে আল্লাহ তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

দোয়ায়ে ইউনুস (আঃ)

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ— লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্তু মিনায্ যালিমীন।

অর্থ ঃ— (হে আল্লাহ!) তুমি ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নাই, তুমি পবিত্রতম, নিশ্চয় আমি যালেমগণের (অত্যাচারীদের) অন্তর্গত।

খাসিয়ত ঃ— ১। কঠিন বিপদ, মামলা-মোকদ্দমা ও সঙ্কটের সময় এই দোয়া সোয়া লক্ষ বার পড়িবে। প্রত্যেক একশতবার পড়া হইলে শরীর বা মুখে পানি দিবে। পাক অবস্থায় পাক বিছানায় বসিয়া কেবলামুখী হইয়া পড়িবে। ৩, ৭ কিংবা ৪০ দিনে শেষ করিবে। মাছের পেটের ভিতর অন্ধকারের মধ্যে এই দোয়া জন্মলাভ করিয়াছিল বলিয়া অন্ধকারে বসিয়া পড়িলে আরও সত্বর ফল লাভ হয়। খতম শেষ হইলে একবার এই আয়াত পড়িবে ঃ

فَسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ— ফাসতাজাবনা লাহু ওয়া নাজ্জাইনাহু মিনাল গাম্মি ওয়া কাযালিকা নুনজিল মুমিনীন। (১৭ পারা, সূরা আম্বিয়া, ৮৮ আয়াত)

অর্থ ঃ— "তৎপর আমি তাঁহার (হযরত ইউনুস নবীর) দোয়া কবুল করিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং এইরূপে আমি বিশ্বাসীগণকে উদ্ধার করিয়া থাকি।" এই তদবীরকে খত্‌মে ইউনুস বলা হয়। ইহা প্রত্যেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী ও অব্যর্থ ফলপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

শানে নুযূল ঃ— হযরত ইউনুস (আঃ) বনী ইসরাইল বংশের অন্যতম নবী ছিলেন। তিনি হযরত ঈসা (আঃ) এর ৮২ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে নিনোয়া (বর্তমান নিনেভা) নগরে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। নিনোয়া নগরের লোকেরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, তাহারা হযরত ইউনুস নবী (আঃ) এর উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইতে লাগিল। তিনি তাহাদের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আল্লাহ্‌র নিকট এই বলিয়া বদদোয়া করিলেন যে, ৪০ দিনের মধ্যে আল্লাহ্‌র গযবে তাহারা ধ্বংস হইয়া যাউক। তাঁহার বদ্‌দোয়া কবুল হইল। ঠিক ৪০ দিনের দিন সমস্ত আকাশ আগুনের মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। নিনোয়া শহরের অধিবাসীগণ প্রাণের ভয়ে শহর ছাড়িয়া ময়দানে জমা হইল। তাহারা ভয়ে আল্লাহ্‌র নিকট অন্তরের সহিত তওবা করিল; আল্লাহ্‌র দয়ার উদ্রেক হইল। বিপদ থামিয়া গেল। হযরত ইউনুস (আঃ) এর বদ্‌দোয়া রদ হইয়া গেল। নিনোয়াবাসীগণ আল্লাহ্‌র রাস্তা ধরিল। এদিকে হযরত ইউনুস জাহাজে উঠিলেন, হঠাৎ মধ্য সমুদ্রে ঐ জাহাজ থামিয়া গেল। জাহাজের লোকেরা স্থির করিল যে, নিশ্চয়ই এই জাহাজে এমন কোন লোক আছে — যে তাহার মনিবের সহিত রাগ করিয়া পালাইয়া আসিয়াছে; তাহারই পাপে জাহাজ আটকাইয়া গিয়াছে। সেই পলাতক ব্যক্তিটি কে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য জাহাজে লটারি হইল ; তাহাতে হযরত ইউনুস (আঃ) এর নাম উঠিল। সকলে মিলিয়া তাঁহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিল, জাহাজ পূর্বের ন্যায় চলিতে আরম্ভ করিল। এদিকে হযরত ইউনুস (আঃ) সমুদ্রে পড়িবামাত্র এক প্রকাণ্ড মৎস্য তাঁহাকে গিলিয়া ফেলিল। তাঁহার বদ্‌দোয়ায় নিনোয়াবাসীগণের কোন শাস্তি হইল না বলিয়া হযরত ইউনুস (আঃ) এর মনে রাগ আসিয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা দয়ার সাগর ও করুণাময়, তিনি পাপীদের শাস্তি দেন বটে, কিন্তু পাপীগণ যদি অন্তরের সহিত তওবা করে ও পাপ পথ ছাড়িয়া সৎ পথ ধরে, তাহা হইলে তিনি তাহাদের অপরাধ মাফ করিয়া তাঁহার গাফ্‌ফার নামের পরিচয় দিয়া থাকেন ; কিন্তু হযরত ইউনুস (আঃ) একথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর মাছের পেটে গিয়া তাঁহার চৈতন্য হইল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমি ত সেই অবাধ্য গোলাম —

আমার মনিব আল্লাহ্‌র নিকট হইতে রাগ করিয়া আসিয়াছি। তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন ও নিরুপায় অবস্থায় মাছের পেটে থাকিয়া নিজেকে নিজে ধিক্কার দিয়া এই দোয়া পড়িলেন। তাঁহার দোয়াও কবুল হইল। মাছ হযরত ইউনুস নবী (আঃ)কে গিলিয়া অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করিতেছিল। অবেশেষে অসহ্য হইয়া ৩ দিন পর বমি করিয়া তাঁহাকে এক দ্বীপের কিনারায় ফেলিয়া চলিয়া গেল। তিনি মাছের উদর হইতে বাহির হইয়া অনাহারে ও অনিদ্রায় অবশ হইয়া পড়িলেন ও আল্লাহ্‌র শুক্‌রিয়া আদায় করিয়া ৪ রাকাত নামায পড়িলেন। তখন আসরের নামাযের ওয়াক্ত ছিল। এই সময় হইতেই আসরের নামাযের প্রবর্তন হয়। আল্লাহ্‌র হুকুমে সেখানে একটি লাউ গাছ জন্মিল ; তিনি উহার ছায়া পাইলেন ও মশা-মাছির উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইলেন। জঙ্গল হইতে একটি ছাগী আসিয়া তাঁহাকে দুগ্ধ দিতে লাগিল, ক্রমে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

খাসিয়ত ঃ— এই দোয়া দ্বারা হযরত ইউনুস (আঃ) নিজের ভুল ও আল্লাহ তায়ালার প্রতি অবাধ্যতা স্মরণ করিয়া নিজেকে অত্যাচারী (যালেম) বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মনের দুর্বলতা ও অবাধ্যতার সহিত আল্লাহ তায়ালার সর্বোচ্চ পবিত্রতার তুলনা করিয়া ধিক্কারের সহিত নিজেকে অতি হীন জ্ঞান করিয়াছিলেন। এরূপ তুলনার জন্যই আল্লাহ তায়ালার দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল ও তিনি তাঁহার বিপদে সহায় হইয়াছিলেন। **এই তুলনাটিই এই দোয়ার সারমর্ম।** ইহা দ্বারা ইউনুস নবী (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট সরলভাবে ও অকপট মনে নিজের দোষ স্বীকার করিয়াছিলেন। পাক কোর্‌আনের কোন দোয়ার মধ্যে কোন নবী এরূপ তুলনামূলকভাবে নিজের ভুল ব্যক্ত করেন নাই। আল্লাহ্‌র নিকট নিজেকে হীনতম জ্ঞান করিয়া তাঁহার দয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করার জন্য ইহাই শ্রেষ্ঠ দোয়া। এইজন্যই এই দোয়ার কার্যকারিতা ও ফযীলত অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। এই দোয়া পাঠকারীকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, একজন বিখ্যাত নবী যদি আল্লাহ্‌র নিকট নিজেকে এত হেয় ও নগণ্য মনে করিতে পারেন, তবে সাধারণ মানুষ তাঁহার নিকট কত নগণ্য,ও ছোট, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

লাউগাছ ছায়া দিয়াছিল ও ছাগী দুগ্ধ দিয়াছিল বলিয়া হযরত ইউনুস (আঃ) এই দুইটি জিনিসের জন্য দোয়া করিয়াছিলেন। সেজন্য লাউ কলেরা রোগের এবং ছাগলের দুগ্ধ যক্ষ্মা ও ক্ষয় রোগের প্রতিষেধক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হওয়ার গুণ লাভ করিয়াছে। এই দোয়ার মধ্যে **"ইসমে আযম"** আছে বলিয়া অনেকে ধারণা করিয়া থাকেন।

শিক্ষা ঃ— ১। অন্তরের সহিত আল্লাহকে ভয় করিয়া সিদ্‌ক দেলে তওবা করিলে মানুষ যত পাপ করুক না কেন, আল্লাহ তাহা মাফ করিয়া দেন।

২। আল্লাহ্‌র নিকট সকল মানুষ সমান ; বিচার ক্ষেত্রে তিনি কোন প্রভেদ করেন না। ৩। পাপের পরিণাম এড়াইতে পারিবে না।

অন্যান্য ফযীলত ঃ— ১। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পীড়িত ব্যক্তি এই দোয়া পড়িলে তাহার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে, আর যদি মরিয়া যায়, তবে শাহাদতের দরজা লাভ করিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে মধ্য রাত্রে উঠিয়া দুই রাকাত নামায পড়িয়া ছালাম ফিরাইয়া সেজদায় যাইয়া ৪০ বার এই দোয়া পড়িলে বিপদ মুক্ত হয়। ২। যে কেহ প্রত্যহ দোয়ায়ে ইউনুস এক হাজার বার পড়িবে, সে প্রত্যেক প্রকার মর্যাদা লাভ করিবে। তাহার রিযিক বৃদ্ধি পাইবে ও দুঃখকষ্ট দূর হইবে, শয়তান ও অত্যাচারীগণ তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাহার জন্য আল্লাহ্‌র রহমতের দরজা খোলা থাকিবে। ৩। এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমার একটি বাসনা আছে, আমি কি উপায়ে উহা লাভ করিতে পারিব ? তিনি উত্তর করিলেন যে, তুমি সেজদায় যাইয়া ৪০ বার দোয়ায়ে ইউনুস পড়িবে ও আঙ্গুল দ্বারা প্রত্যেকবার ইশারা করিবে।

দোয়া কবুল হইবার আমল

وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ
رُسُلُ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ○

উচ্চারণ ঃ— ওয়া ইযা জাআত্‌হুম্‌ আয়াতুন্‌ ক্বালু লান্‌ নু'মিনা হাত্তা নু'তা মিস্‌লা মা উতিয়া রুসুলুল্লাহি ; আল্লাহু আ'লামু হাইছু ইয়াজআলু রিসালাতাহু।

(৮ পারা, সূরা আনয়াম, ১২৪ আয়াত)

অর্থ ঃ— এবং তাহাদের নিকট যখন কোন নিদর্শন (মা'জেযা) উপস্থিত হয়, তখন তাহারা বলে যে আল্লাহ, রসূলগণ (আঃ)কে যাহা দিয়াছেন, আমাদিগকে যে

পর্যন্ত তাহা দেওয়া না হয়, সে পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস করিব না। আল্লাহ জানেন তাঁহার সুসমাচার (নবুয়ত)কোথায় প্রদান করিবেন।

এই আমল দুইটির মধ্যে 'আল্লাহ' শব্দ পাশাপাশি দুইবার আছে। এই আল্লাহ শব্দ দুইটির মধ্যস্থানে অর্থাৎ, রসুলুল্লাহ পর্যন্ত পড়িয়া যে কোন দোয়া চাহিয়া শেষ পর্যন্ত পড়িলে তাহা কবুল হইবে।

শানে নুযূল ঃ— আবুজেহেল প্রভৃতি কাফেরগণ হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মা'জেযা ও শক্তি দেখিয়া বলিত যে, আমরা যে পর্যন্ত এইরূপ শক্তি লাভ না করিব, সে পর্যন্ত আমরা তাঁহার নবুয়তের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিব না। মানুষ হিসাবে আমাদের এইরূপ শক্তি লাভ করিবার অধিকার আছে। তাহার উত্তরে এই আয়াত নাযিল হয় এবং তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হয় যে, নবুয়ত লাভ করার উপযুক্ত পাত্র কে তাহা আল্লাহই জ্ঞাত আছেন, অপর কেহ উহা বুঝিবে না। এই আয়াত পাঠ দ্বারা হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সত্যতা ও গৌরবের স্মরণ করা হয়, সেজন্য নবুয়তের ফযীলত ও বরকত লাভ করে।

গোনাহ মাফের দোয়া

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ○

উচ্চারণ ঃ— রাব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগ্‌ফির লানা ওয়া তারহাম্‌না লানাকুনান্না মিনাল খাসেরীন। (৮ পারা, সূরা আ-রাফ, ২৩ আয়াত)

অর্থ ঃ— হে আমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ)! আমরা নিজেরাই নিজেদের জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি। এখন যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর ও আমাদের প্রতি সদয় না হও, তবে আমরা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্তগণের মধ্যে পণ্য হইব।

খাসিয়ত ঃ— প্রত্যেক নামাযের পর এই আয়াত পড়িয়া মোনাজাত করিলে গোনাহ মাফ হয় ও নাজাত পাওয়া যায়।

শানে নুযূল ঃ— হযরত আদম (আঃ) বেহেশ্‌ত হইতে বিতাড়িত হইয়া যখন দুনিয়াতে আসিয়া পড়েন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র নিকট এই মোনাজাত পড়িয়া গোনাহ মাফ পাইয়াছিলেন। এই মোনাজাত দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকট নিজ দোষ স্বীকার করা হয়, ফলে আল্লাহ মোনাজাতকারীর গোনাহ মাফ করিয়া দেন।

দীর্ঘায়ু লাভ করার আমল

সূরা তওবার (১১ পারা) শেষ দুইটি আয়াতের ফযীলত

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○ ٢- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

উচ্চারণ ঃ— লাক্বাদ জাআকুম রাসূলুম মিন্ আন্‌ফুসিকুম আযীযুন আলাইহি মা আনিত্তুম হারীসুন আলাইকুম্ বিলমুমেনীনা রাউফুর্ রাহীম। ফাইন তাওয়াল্লাও ফাক্বুল হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, আলাইহি তা'ওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আর্‌শিল আযীম।

অর্থ ঃ— ১। নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট রসূল আসিয়াছেন। তিনি তোমাদের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁহার নিকট অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। বিশ্বাসীগণের (মুসলমানগণের) উপর তিনি স্নেহশীল ও দয়াবান বটে। ২। অনন্তর যদি তাহারা বিমুখ হয় (হে রসূল)! তুমি বলিয়া দাও যে, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নাই। আমি তাঁহার উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।

শানে নুযূল ঃ— কাফেরগণ ইসলামের সত্যতা ও রসূল (সাঃ) এর অলৌকিক মা'জেযা দেখিয়াও তাঁহার সহিত নানাপ্রকার কূটতর্কের অবতারণা করিয়া বেড়াইত। তাহাদের ঐরূপ ব্যবহারের উত্তরস্বরূপ এই আয়াত দুইটি নাযিল হয় এবং তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হয় যে, শত অপমান-অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াও হযরত রসূল (সাঃ) সর্বদা মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য দোয়া করিয়া থাকেন ; ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, তিনি সত্য নবী। সত্য নবীর ইহা হইতে আর কি উৎকৃষ্ট প্রমাণ থাকিতে পারে ? ইহা সত্ত্বেও যদি তাহারা তোমার পথে না আসে তবে কোন চিন্তার কারণ নাই, আল্লাহ্‌র সাহায্যই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দোয়া ও আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতার বর্ণনা এই আয়াত ব্যতীত কোর্‌আনের আর কোন আয়াতে একত্রে বর্ণিত হয় নাই।

মুসলিম জীবনে এই দুইটি নেয়ামতের যিকির হইতে উত্তম যিকির আর কি হইতে পারে ? এই আয়াত দুইটি দ্বারা আমাদের হযরত রসূল (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়। প্রায় সকল নবীই কোন না কোন কারণে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন ; এমনকি কেহ কেহ বদ্‌দোয়া পর্যন্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের হযরত রসূল (সাঃ) আমাদের মঙ্গল ও হিত ব্যতীত ভুলেও কখনও অনিষ্ট চিন্তা করেন নাই; বরং তিনি সকল অবস্থায় আমাদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াবান এবং তিনি আমাদের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করিয়া থাকেন। এই সকল কারণেই তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ মানব ও শ্রেষ্ঠ নবীরূপে সম্মানিত হইয়াছেন। "রাউফুর্‌ রাহীম" আল্লাহ তায়ালার দুইটি পবিত্র নাম। এই নাম দুইটি দ্বারা তাঁহার স্নেহ ও দয়ার সিফতের বর্ণনা করা হয়। তিনি এই আয়াতে আমাদের হযরত রসূল (সাঃ) কেও এই দুইটি পবিত্র নামের সিফত বিশিষ্ট বলিয়া

যিয়ারত (সাক্ষাৎ) লাভ না হইয়া পারিবে না। (আবু দাউদ) যে দিন এই আয়াত পড়িবে, সে দিন আহত বা নিহত হইবে না।

৪। রোজ ৪১ বার পড়িলে স্বপ্নে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যিয়ারত লাভ হইবে।

৫। পীড়িত অবস্থায় এই আয়াত দুইটি পড়িলে আরোগ্য লাভ হইবে। একব্যক্তি ৭০ বৎসর পর্যন্ত পীড়িত ছিলেন। পরে আয়াত দুইটি পড়িতেন বলিয়া এই আমলের বরকতে তিনি ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। আয়ু বৃদ্ধির জন্য ইহা হইতে উৎকৃষ্ট কোন আয়াত কোরআনে নাযিল হয় নাই।

৬। আক্‌দোদ্দুরার নামক কিতাবে লিখিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর ইবনে মেহেদী হযরত রসূল (সাঃ)কে স্বপ্নে দেখিলেন। হযরত (সাঃ) তাহাকে আদেশ করেন যে, শিবৃলী তোমার নিকট আসিলে সম্মান দেখাইও, আমিও তাহাকে সম্মান দেখাইয়া থাকি। কারণ, তিনি ৮০ বৎসর যাবৎ প্রত্যেক নামাযের পর সূরা তওবার

রত রসূল (সাঃ) কেও আল্লাহ তায়ালার ন্যায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উপরোক্ত আয়াত সাঃ) এর এই সিফত দুইটির স্মরণ হয়ঃ ফলে সাহায্য পাঠকারীর উপর অবতীর্ণ হয় এবং ্যাণ হয়। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সিফত ভ করার পক্ষে ইহাই সর্বোত্তম আয়াত।

দর সময় এই আয়াত দুইটি পড়িলে বিপদ দূর

পর ১ বার এই আয়াত পড়িবে, সে রোজ- াত লাভ করিবে।

ামাযের পর এই পবিত্র আয়াত দুইটি ৭ বার বান হইবে, লাঞ্ছিত থাকিলে সম্মানিত হইবে, , দরিদ্র থাকিলে ধনবান হইবে, বিপদগ্রস্ত পমৃত্যু হইবে না, তাহার আয়ু বৃদ্ধি পাইবে ও ব এবং স্বপ্নে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর

আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভরশীল হওয়ার বর্ণনা রহিয়াছে, সেই জন্য ইহা পড়িলে তাঁহার রহমত ও সাহায্য লাভ হয়।

সপ্তম অধ্যায়

মানব জীবনে আয়াতে কোর্‌আনের ফযীলত

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

তিলকাররুসুল্‌	سورة البقرة -সূরা বাকারা,	২২৫ আয়াত

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ج لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ

اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ

দয়াময়।" এই আয়াতে আমাদের হয আমাদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াবান দুইটির যিকির দ্বারা আমাদের রসূল (তৎক্ষণাৎ তাঁহার দোয়া ও আল্লাহ্‌র পাঠকারীর ইহ-পরকালের অশেষ ক বর্ণনা করিয়া তাঁহার দোয়া ও স্নেহ ল

ফযীলত ঃ—১। যে কোন বিপদে হয়।

২। যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের হাশরে হযরত রসূল (সাঃ) এর শাফা

৩। যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয না করিয়া পড়িবে, সে দুর্বল থাকিলে ব পরাজিত থাকিলে পরাক্রান্ত হইবে থাকিলে বিপদমুক্ত হইবে ও তাহার তাহার সমস্ত কাজ সহজসাধ্য হই

بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

উচ্চারণ ঃ— আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল ক্বাইয়ুম! লা তা'খুযুহু ছিনাতুওঁ ওয়ালা নাওম ; লাহু মা ফিস্সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল্ আরদি মান্ যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইয্নিহী ; ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম ; ওয়ালা ইউহিতুনা বিশাইয়িম মিন ইলমিহী ইল্লা বিমা শা-য়া ওয়াসিয়া কুরসিইয়ুহুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল আলিয়্যাল আযীম।

অর্থ ঃ— আল্লাহ তায়ালাই (একমাত্র মা'বুদ) ; তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই, তিনি চিরস্থায়ী ও চিরজীবন্ত। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, আর আসমান ও জমিনের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট অনুরোধ করিতে পারে এমন কে আছে ? লোকের সম্মুখে যাহা কিছু আছে ও যাহা কিছু পশ্চাতে ঘটিয়াছে, তিনি তাহা জ্ঞাত আছেন। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত তাঁহার অসীম জ্ঞানের কোন বিষয় কেহ বুঝিতে পারে না। তাঁহার আসন (অবস্থান) আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্রই বিস্তৃত রহিয়াছে। এই উভয় স্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে তাঁহার কোন কষ্ট বা বেগ পাইতে হয় না। তিনি অতিশয় উন্নত ও মহান।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই মহিমান্বিত আয়াত শরীফ "আয়াতুল কুর্সী" নামে ইসলাম জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালার অবস্থান ও স্থিতির বর্ণনা যেভাবে করা হইয়াছে, পাক কোর্আনের আর কোন আয়াতে এইরূপ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয় নাই। এই আয়াত তৌহীদের ভিত্তিস্বরূপ। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই আল্লাহ্র অসীম শক্তি, অপরূপ মহিমা, অনন্ত কুদরত ও দয়ার বিকাশ হইয়াছে। এই আয়াতের মর্ম হৃদয়ে আল্লাহ্র বিশালতা ও অসীমতার এক সীমাহীন চিন্তাধারা বহাইয়া দেয়। ইহার মর্ম ও ভাব যথার্থরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে আল্লাহ্র অনন্ত মহিমা ও অফুরন্ত কুদরতের কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়। "ক্বোলিল্লাহুম্মা" আয়াতের মধ্যেও আল্লাহ্র অসীম কুদরত ও শক্তির বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু এই দুইটি আয়াতের ফযীলতের পার্থক্য হওয়ার কারণ এই যে, (১) 'ক্বোলিল্লাহুম্মার' মধ্যে আল্লাহ্র যে সকল শক্তি ও মহিমার বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা আমরা চর্মচক্ষে দেখিতে পাই; কিন্তু আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ্র যে সকল শক্তি ও কুদরতের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা আমরা চর্মচক্ষে দেখিতে

পাই না, কেবল জ্ঞান-বুদ্ধিতে উপলব্ধি করিয়া থাকি। কাফেরগণ হযরত রসূল (সাঃ) এর মা'জেযা ও আল্লাহ্র কুদরত চাক্ষুষ দেখিয়াও ঈমান আনয়ন করে নাই। আর মাত্র জ্ঞান-বুদ্ধিতে উপলব্ধি করিয়া আল্লাহ্র শক্তি ও কুদ্রতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যে আয়াত দ্বারা তাঁহার শক্তি ও কুদরতের যিকির করা যায়, তাহা দ্বারা যে বেশী ফযীলত লাভ হইবে, তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? (২) 'ক্বোলিল্লাহুম্মার' মধ্যে কেবল আল্লাহ্র শক্তি ও কুদরতের বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু আয়াতুল কুর্সীতে শক্তি ও কুদরতের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র অবস্থান ও স্থিতির বর্ণনা রহিয়াছে। অনেকে ধারণা করিয়া থাকেন যে, এই আয়াতে "ইস্মে আযম" নিহিত রহিয়াছে। প্রত্যেক অযীফার মধ্যে এ আয়াত শরীফ পড়া হইয়া থাকে।

সমগ্র কোর্আন ও অন্যান্য আস্মানী কিতাবসমূহের বৈশিষ্ট্য এই যে, যে কোন বিষয় বর্ণিত হউক কিংবা আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ দান করা হউক না কেন, সর্বত্রই আল্লাহ্র একত্ব, শক্তি, কুদরত ও দয়া ইত্যাদি গুণের উল্লেখ দেখা যায়। আয়াতুল কুর্সী ঐ সকল বর্ণনার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত। সমগ্র তৌরাত, যাবুর, ইঞ্জীল ও কোর্আনে ইহার তুলনা নাই। এইজন্য সহীহ্ হাদীসসমূহে এই গৌরবান্বিত আয়াতের অসীম ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ্ মুসলিম ও দারে-কুত্নীতে লিখিত হইয়াছে যে, ইহা কোর্আনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত। (মেশ্কাত, ইব্নে জরীর ও তফসীরে হক্কানী)।

এই আয়াত শরীফে আল্লাহ্র কয়েকটি বিশেষ সিফাত (গুণ) বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম বাক্যে বলা হইতেছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। এই বাক্য দ্বারা তাঁহার তৌহীদ (একত্ব) ঘোষণা করা হইয়াছে ও দ্বিতীয় বাক্যে তিনি চিরজীবী এবং সর্বত্র ও সর্বকালীন বিরাজমান; এই বাক্য দ্বারা যাহারা আল্লাহ্কে অচেতন শক্তি বলিয়া ধারণা করে তাহাদের ঐ ভুল ধারণা দূর করা হইয়াছে। তৃতীয় বাক্যে তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; মানুষ কিংবা অন্য কোন প্রাণী যত শক্তিশালী হউক না কেন, তাহারা সকলেই নিদ্রা ও তন্দ্রার বশীভূত হয়। নিদ্রা স্পর্শ করিলে তাহারা মৃতবৎ অচেতন হইয়া পড়ে ও শক্তিহীন হইয়া যায়। এই বাক্য দ্বারা বলা হইতেছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্ট জীবের স্বাভাবিক দুর্বলতা হইতে মুক্ত। এই

গুণ তাঁহার অসীম শক্তির অন্যতম প্রমাণ। চতুর্থ বাক্য দ্বারা প্রচার করা হইতেছে যে, তিনিই আকাশ, পাতাল ও বিশ্বসংসারের একমাত্র মালিক। এই বাক্য দ্বারা শেরেকির মূলোচ্ছেদ করা হইয়াছে। পঞ্চম বাক্য দ্বারা বলা হইয়াছে যে, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কেহ অন্যের জন্য সুপারিশও করিতে পারে না। এই বাক্য দ্বারা পীর, দরবেশ ও খৃষ্টানগণের মুক্তিবাদ বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ষষ্ঠ বাক্য দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, ভূত-ভবিষ্যতের জ্ঞান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নাই; এই বাক্য দ্বারা ভবিষ্যদ্বক্তাদের দর্প চূর্ণ করা হইয়াছে। সপ্তম বাক্য দ্বারা বলা হইতেছে, মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে আল্লাহ্ তায়ালার অসীম জ্ঞানের উপলব্ধি করা একেবারে অসম্ভব। যাহারা নিজেকে সর্বজ্ঞানী মনে করেন, এই বাক্য দ্বারা তাহাদের অহংকার খর্ব করা হইয়াছে। অষ্টম বাক্য দ্বারা বলা হইতেছে যে, আল্লাহ্ তায়ালার আসন অর্থাৎ, অবস্থান, স্থিতি, সাম্রাজ্য, শক্তি-মহিমা সমস্ত বিশ্ব-জাহান ব্যাপিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে; ইহার সীমানা ও আল্লাহ্‌র শক্তি-মহিমা অতিক্রম করার কাহারও সাধ্য নাই। নবম বাক্যে বলা হইতেছে যে, এই বিশ্ব-জগত রক্ষা করিতে আল্লাহ্‌র একটুও বেগ পাইতে হয় না, কিংবা ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। দশম বাক্যে ঘোষণা করা হইতেছে যে, তিনি উন্নত ও মহীয়ান, তাঁহার উপর আর কেহ নাই।

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ

অর্থঃ— আল্লাহ্ তায়ালার আসন (অবস্থান ও শক্তি-মহিমা) সমস্ত বিশ্বজগত ব্যাপিয়া সমানভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক বর্ণনাঃ— এই আয়াত শরীফের মর্ম ও অর্থকে মূল সূত্র ধরিয়া জার্মান ও ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিকগণ বেতারবার্তার (বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের) গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই যন্ত্র আবিষ্কারের গবেষণা আরম্ভ করার পূর্বে প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, যে শক্তি বলে বিশ্বজগত পরিচালিত হইতেছে তাহা আল্লাহতায়ালার শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে; যাহা আল্লাহ্‌র অদৃশ্য মহাশক্তির অংশরূপে বৈজ্ঞানিক মহলে ইলেকট্রন নামে পরিচিত থাকিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহরূপে অদৃশ্যভাবে চলিতেছে, তাহা পৃথিবীর সর্বত্র সমভাবে বর্তমান আছে কিনা জানিতে না পারিলে বেতারবার্তার প্রচলন সম্ভব হইতে পারে না। কারণ, ঐ শক্তিগুলি পৃথিবীর সর্বত্র সমভাবে বর্তমান না থাকিলে, বেতারবার্তার চালক শক্তিগুলি অধিকতর শক্তিশালী প্রবাহধারা কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যাইতে পারে। জার্মান বৈজ্ঞানিক এই আয়াত হইতে ধরিয়া লইলেন যে, আল্লাহ্‌র শক্তি পৃথিবীর সর্বত্র

সমান প্রভাব লইয়া বিরাজ করিতেছে। অতএব, ইলেকট্রনের শক্তি বিশ্ব-জগতের সর্বত্র সমানভাবে বর্তমান রহিয়াছে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা আরম্ভ করিয়া অবশেষে সফলতা লাভ করেন। বর্তমান কালের রেডিও যন্ত্র এই গবেষণারই ফল। বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি যে পাক কোর্‌আনে নিহিত রহিয়াছে, ইহা তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আল্লাহ তায়ালা সূরা ইয়াসীনের প্রথম ভাগেও বলিয়াছেন যে, ইহা মহাবিজ্ঞানের কোর্‌আন। জার্মান দেশেই কোর্‌আনের অত্যধিক গবেষণা হইয়া থাকে এবং জার্মান বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা দ্বারা কোরআনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করিয়া প্রতিদিন জগতকে চমৎকৃত করিয়া আসিতেছেন।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই আয়াতে আল্লাহ্‌র আকার অর্থাৎ বিশালতার বর্ণনা রহিয়াছে। 'আয়াতুল কুর্‌সী' পাঠ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সর্বত্র বিরাজমানতা, অবস্থান ও তাঁহার 'হাযের-নাযের' হওয়া স্মরণ করা হয়। আল্লাহ তায়ালার উপস্থিতির যিকির হইতে বেশী ফযীলতের যিকির আর কি হইতে পারে ? এই কারণে এই আয়াতের যিকির দ্বারা অসীম ফযীলত হাসেল হয়।

ফযীলতঃ— ১। সহীহ্ বোখারী শরীফে লিখিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি প্রভাতে ও শয়নকালে আয়াতুল কুর্‌সী পড়িয়া থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাহার রক্ষক। সুতরাং সমস্ত দিবারাত্রির মধ্যে শয়তান তাহার নিকট আসিতে পারে না। শয়তান অঙ্গীকার করিয়াছে যে, যে ব্যক্তি আয়াতুল কুর্‌সী পড়িবে আমি তাহার নিকট যাইব না।

২। শুক্রবার আসরের নামাযের পর নির্জন স্থানে বসিয়া এই আয়াত ৭ বার পড়িলে মনে এক আশ্চর্য ভাবের উদয় হয় ও ঐ সময় পাঠকারীর দোয়া কবুল হয়।

৩। ক্রমান্বয়ে ৩১৩ বার পড়িলে অশেষ কল্যাণ হয়। শত্রুর সহিত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বে ৩১৩ বার পড়িয়া লইলে অবশ্যই জয়যুক্ত হওয়া যায়। ৩১৩ বার পড়িয়া প্রত্যেকবার পড়া শেষ হইলে খাদ্য দ্রব্যের উপর ফুঁক দিলে, ইনশাআল্লাহ ইহাতে বরকত হইবে।

৪। যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ১ বার ইহা পড়িবে তাহার রিযিক অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। সকালবেলা ঘর হইতে বাহির হওয়ার পূর্বে এই আয়াত পড়িয়া বাহির হইলে কখনো অন্যের মুখাপেক্ষী হইবে না।

৫। হযরত রসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের সময় হযরত আযরাঈল (আঃ) বলিয়াছেন যে, আপনার উম্মতগণের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ১ বার আয়াতুল কুরসী পড়িবে, আমি তাহার রূহ (আত্মা) অতি সহজে কবয করিব।

৬। বিদেশে যাত্রাকালে এই আয়াত পড়িয়া যাত্রা করিলে সর্বপ্রকার বিপদ থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

৭। কোন কাজে রওয়ানা হইবার পূর্বে এই আয়াত পড়িয়া বাম পা প্রথম ফেলিবে, সেই কাজে অবশ্য সুফল হইবে। [ইহা ইমাম কুফী (রহঃ) এর বর্ণনা ও বহু পরীক্ষিত]।

৮। দৈনিক ইহা ১৭০ বার পড়িলে প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়, মনের বাসনা পূর্ণ হয়, দুঃখ-যন্ত্রণা দূর হয়, রিযিক বৃদ্ধি পায়। বর্ণিত আছে যে, কোন এক ব্যক্তিকে বাঘে আক্রমণ করিয়াছিল, সে এই আয়াত পড়া মাত্র বাঘ পালাইয়া যায়।

৯। জনাব পীর মুহিউদ্দীন আল-আরাবী বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ৪০ দিন পর্যন্ত এই আয়াত পড়িবে, রূহানী মোয়াক্কেল তাহার নিকট আসিবে ও তাহার মনের বাসনা পূর্ণ হইবে, স্বপ্নে হযরত রসূল (সাঃ) এর যিয়ারত লাভ হইবে ও তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ লাভ করার সৌভাগ্য হইবে।

১০। রাত্রে একাকী রাস্তায় চলিবার সময় এই আয়াত পড়িতে থাকিলে দেও, পরী, জ্বিন, ভূত, প্রেত ইত্যাদি কাছে আসিবে না।

১১। গোনাহ্‌গার ব্যক্তি প্রত্যহ ১৭ বার পড়িলে তাহার মন্দ স্বভাব দূর হইবে।

১২। আয়াতুল কুর্‌সীর মধ্যে ৫০টি শব্দ আছে, প্রত্যেকটি শব্দ এক একবার পড়িয়া বৃষ্টির পানিতে ফুঁক দিয়া ঐ পানি পান করিলে আক্কেল বৃদ্ধি পায়। সর্বদা এই ৫০টি শব্দ পড়িলে মনের বাসনা পূর্ণ হয়। (এই আমলটি নিঃসন্দেহ বলিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে)।

১৩। ২০১ বার পড়িয়া দীন-দুনিয়ার কোন মতলব চাহিলে আল্লাহ তাহা পূর্ণ করিয়া দিবেন।

১৪। প্রত্যহ ১৭০ বার পড়িলে বাদশাহ ও হাকিমগণ সম্মান করিবে, যাহেরী ও বাতেনী এলেম লাভ করিতে পারিবে ও মানুষ বাধ্য থাকিবে।

১৫। ৫০ বার পড়িয়া বৃষ্টির পানির উপর ফুঁক দিয়া পান করিলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

১৬। ঘর, বাগান ও দোকানের দরজায় লিখিয়া লট্‌কাইয়া রাখিলে রিযিক বৃদ্ধি পায়, চোর-ডাকাত তথায় প্রবেশ করিতে পারে না ও অগ্নিদাহ হয় না।

১৭। আসরের নামাযের পর ২১ বার পড়িয়া অম্বলের রোগীর পেটে ফুঁক দিলে অম্বলের দোষ সারিয়া যায়।

১৮। শরীর বন্ধ করিতে হইলে এশার নামাযের পর ৩ বার পড়িয়া দুই হাতে ফুঁক দিয়া তালি দিবে। ৩ বার পড়িয়া বিদেশে অবস্থিত লোকের দিকে ফুঁক দিলে ঐ ব্যক্তি নিরাপদে থাকিবে।

১৯। কাশির পীড়া দূর করিবার জন্য ৭ টুকরা লবণ লইয়া প্রত্যেক টুকরার উপর আয়াতুল কুর্‌সী ৭ বার পড়িয়া দম করিবে। একাদিক্রমে ঐ লবণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে কোন কিছু খাওয়ার পূর্বে এক টুকরা খাইবে, ইন্‌শাআল্লাহ কাশির পীড়া দূর হইবে।

২০। বস্তুতঃ সর্বদা আয়াতুল কুর্‌সী পড়িলে দীন-দুনিয়ার নানা প্রকার কল্যাণ হয়।

কোর্‌আনের ৭টি আয়াতের ফযীলত

١- قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ج هُوَ مَوْلٰنَا ج وَعَلَى
اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ * ٢- وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ
لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ج وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ج يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ
مِنْ عِبَادِهٖ ط وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ * ٣- وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ
اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ط كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ
مُّبِيْنٍ ○ ٤- اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ ط مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا
هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ط اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ ٥- وَكَاَيِّنْ مِّنْ
دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا صلے اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ صلے وَهُوَ السَّمِيْعُ

الْعَلِيمُ ○ ٦- مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا

يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

٧ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ

هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ

قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۚ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ○

উচ্চারণঃ— ক্বোল্ লাইঁইউসীবানা ইল্লা মা কাতাবাল্লাহু লানা হুয়া মাওলানা ওয়া আলাল্লাহি ফাল্‌ইয়াতাওয়াক্কালিল্ মো'মেনুন। (সূরা তাওবা, ৫১ আয়াত) ২। ওয়াইঁ ইয়াম্‌সাস্‌কাল্লাহু বেদুর্‌রিন ফালা কাশেফা লাহু ইল্লা হুয়া, ওয়াইঁ ইউরেদকা বেখাইরিন্ ফালা রাদ্দা লেফাদ্‌লিহী ইউসীবু বিহী মাইয়াশাও মিন এবাদিহী, ওয়া হুয়াল গাফুরুর রাহীম। (সূরা ইউনুস, ১০৭ আয়াত) ৩। ওয়ামা মিন্ দাব্‌বাতিন্ ফিল্ আর্‌দে ইল্লা আলাল্লাহে রিযক্বোহা ওয়া ইয়া'লামু মুসতাক্বার্‌রাহা ওয়া মুসতাওদাআ'হা ; কুল্লুন্ ফী কিতাবিম্ মুবীন। (সূরা হূদ, ৬ আয়াত) ৪। ইন্নী তাওয়াক্কালতু আল্লাহে রাব্বী ওয়া রাব্‌বিকুম, মা মিন্ দা-ব্‌বাতিন ইল্লা হুয়া আখেযুম বেনা-সিয়াতিহা ইন্না রাব্বী আলা সিরাতিম মুসতাক্বীম। (সূরা হূদ, ৫৬ আয়াত) ৫। ওয়া কাআইয়্যেম মিন্ দা-ব্‌বাতিল্ লা তাহমিলু রিয্‌ক্বাহা ; আল্লাহু ইয়ারযুক্বোহা ওয়া ইয়্যাকুম ওয়া হুয়াস্ সামিউল আলীম। (সূরা আনকাবুত, ৬০ আয়াত) ৬। মা ইয়াফ্‌তাহিল্লাহু লিন্নাসি মির্‌রাহ্‌মাতিন ফালা মুম্‌সিকা লাহা, ওয়া মা ইয়ুম্‌সিক্ ফালা মুর্‌সিলা লাহু মিম্ বাদেহী ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম। (সূরা ফাতের, ২ আয়াত) ৭। ওয়া লাইন্ সায়ালতাহুম মান্ খালাক্বাস সামাওয়াতে ওয়াল আর্‌দা লাইয়াক্বুলুন্নাল্লাহু ক্বোল আফারায়াইতুম মা তাদউনা মিন দূনিল্লাহে ইন্ আরাদানিয়াল্লাহু বে দুর্‌রিন হাল হুন্না কাশেফাতু দুর্‌রিহী আও আরাদানী বেরাহ্‌মাতিহি হাল হুন্না মুম্‌সেকাতু রাহমাতিহী ; ক্বোল হাসবিআল্লাহু : আলাইহে ইয়াতাওয়াক্কালুল মুতাওয়াক্কেলুন। (সূরা যুমার, ৩৮ আয়াত)

অর্থঃ— ১। তুমি বলিয়া দাও — আল্লাহ আমাদের জন্য যাহা লিখিয়াছেন তাহা ব্যতীত অন্য কোন বিপদ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তিনি আমাদের মালিক এবং বিশ্বাসীগণের পক্ষে আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করা উচিৎ।

শানে নুযূলঃ— কাফেরগণ হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জয় দেখিলে মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট হইত এবং তাঁহার উপর কোন বিপদ পতিত হইতে দেখিলে তাহারা বলিত যে, আমরা ত পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে, এইরূপ বিপদ উপস্থিত হইবে। আল্লাহ তাহাদের ঐরূপ স্বভাব উপলক্ষ করিয়া এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন।

অর্থঃ— ২। যদি আল্লাহ তোমাকে অমঙ্গল দ্বারা আক্রান্ত করেন, তবে তিনি ব্যতীত কেহই ইহা হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না এবং তিনি যদি তোমার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তবে কেহই তাহা রোধ করিতে পারিবে না। তিনি তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন।

শানে নুযূলঃ— কাফেরগণ মঙ্গল লাভের জন্য ও বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য মূর্তি পূজা করিত। আল্লাহ এই আয়াত দ্বারা হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা ভাল-মন্দ করিবার একমাত্র অধিকারী, কোন দেব-দেবী কিম্বা মূর্তির তিলমাত্র শক্তি নাই।

অর্থঃ— ৩। পৃথিবীতে এমন কোন ভ্রমণশীল প্রাণী নাই, যাহার জীবিকা আল্লাহ্‌র আয়ত্তাধীন ব্যতীত আছে এবং তিনিই তাহাদের বিশ্রামের ও থাকিবার স্থান সকল অবগত আছেন। এই সকল বিষয় প্রকাশ্য গ্রন্থ কোর্‌আনে লিখিত রহিয়াছে।

বর্ণনাঃ— এই আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত জীব-জন্তুর জীবিকাদাতা, প্রতিপালক ও তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কেহ জীবিকা পাইতে পারে না।

অর্থ ঃ— ৪। নিশ্চয় আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করি। তিনি বিচরণশীল প্রাণীর ভাগ্য ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহার বাহিরে কোন বিচরণশীল প্রাণী নাই। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথে রহিয়াছেন।

শানে নুযূলঃ— হযরত হূদ নবী (আঃ) 'আদ' জাতির জন্য প্রেরিত নবী ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে দেব-দেবীর পূজা ছাড়িয়া আল্লাহ্‌র এবাদত করার জন্য অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই ; বরং তিনি নবী নহেন বলিয়া প্রতিবাদ করিতে থাকে এবং বলে যে,

আমাদের দেব-দেবী অসন্তুষ্ট হইয়া তোমার মতিভ্রম ঘটাইয়া দিয়াছে। তাহাদের এই উক্তির উত্তরে এই আয়াত দ্বারা বলিয়া দেওয়া হয় যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও হুকুম ব্যতীত মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর মঙ্গল কিংবা অমঙ্গল হইতে পারে না। তিনি সকলের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন।

অর্থ ঃ— ৫। এমন কতক জীব-জন্তু রহিয়াছে, যাহারা নিজেদের জীবিকা বহন করে না। কিন্তু আল্লাহ তাহাদিগকে ও তোমাদিগকে জীবিকা দিয়া থাকেন এবং তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

শানে নুযূল ঃ— মক্কার কাফেরগণ যখন মুসলমানগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন আল্লাহ তাহাদিগকে মক্কা ছাড়িয়া অন্যত্র নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইতে আদেশ করেন। স্বদেশ ও আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া বিদেশে যাইয়া কোথায় আশ্রয় লইবে ও কিভাবে জীবিকা অর্জন করিবে, মুসলমানগণ এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত দ্বারা তাহাদিগকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি জীবিকা দিয়া থাকেন। জীবিকার জন্য তাঁহারই উপর নির্ভর করা উচিত। তিনি সকল বিষয় শ্রবণ করেন ও তিনি মহাজ্ঞানী।

অর্থ ঃ— ৬। আল্লাহ তাঁহার অনুগ্রহ হইতে যাহা কিছু দেন কেহই তাহা বন্ধ করিতে পারে না এবং তিনি যাহা বন্ধ করেন কেহ তাহা খুলিতে পারে না এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

বর্ণনা ঃ— এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উপর কাহারও হাত নাই ; তিনিই তাঁহার অনুগ্রহ দান করা বা না করার একমাত্র মালিক।

অর্থ ঃ— ৭। এবং তুমি যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করিয়াছেন ? অবশ্য তাহারা বলিবে যে—আল্লাহ। তুমি বল, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাকে ডাকিয়া থাক তোমরা ভাবিয়াছ কি ? যদি আল্লাহ আমাকে দুঃখ-কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহারা কি সে দুঃখ দূর করিয়া দিতে পারে ? অথবা তিনি যদি অনুগ্রহ দান করেন তাহা কি তাহারা রোধ করিতে পারে ? [হে মুহাম্মদ (সাঃ!)] তুমি বল—আল্লাহ্‌ই আমার পক্ষে যথেষ্ট। নির্ভরশীলগণ তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন।

শানে নুযূল ঃ— হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রকাশ্যভাবে মূর্তিপূজার অসারতার বিষয় প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে কাফেরগণ তাঁহাকে এই বলিয়া ভয়

দেখাইতে লাগিল যে, তাহাদের দেব-দেবীর নিন্দা করিলে তাহারা অসন্তুষ্ট হইবে এবং তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিবে। এই কথার উত্তরে এই আয়াত নাযিল হয় এবং বলিয়া দেওয়া হয় যে, মানুষের ভাল-মন্দ হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, তাঁহার উপর কাহারও কোন হাত নাই এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করাই উত্তম পথ।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— হযরত কা'বোল আহ্‌বার (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই ৭টি আয়াত পড়িবে, সে আসমান-জমিনের সম্পূর্ণ বিপদাপদ ও সঙ্কট হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং মৃত্যু ব্যতীত তাহার অন্য কোন বিপদ আসিবে না। এই আয়াতগুলি নবীগণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে মঙ্গলামঙ্গলের জন্য আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভর করার উপদেশ বাণী লইয়া নাযিল হইয়াছে। ইহাদের আমল দ্বারা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার দয়া ও ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করা হয়। এই ভাব বর্ণনার জন্য এই আয়াতগুলি সর্বোৎকৃষ্ট। সেইজন্য ইহাদের আমল দ্বারা আল্লাহ্‌র সাহায্য ও রহমত লাভ হয় এবং সর্বপ্রকার বিপদাপদ হইতে নিরাপদ থাকা যায়। পাক কোর্‌আনে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে—যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে তিনিই তাঁহার অভিভাবক ও রক্ষক।

দোযখের দরজা বন্ধ হওয়ার আমল

١-حٰمٓ ۚ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ ٢-حٰمٓ ۚ
تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۚ ٣-حٰمٓ ۚ عٓسٓقٓ * ٤-حٰمٓ ۚ
وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ ۝ ٥-حٰمٓ ۚ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ ۝ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ
لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ * ٦-حٰمٓ ۚ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ
الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ * ٧-حٰمٓ ۚ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ *

উচ্চারণঃ— ১। হা-মীম; তানযীলুল কিতাবে মিনাল্লাহিল আযীযিল আলীম। (সূরা মোমেন, ১ম— ২য় আয়াত)

২। হা-মীম্ ; তান্‌যীলুম্ মিনার্ রাহ্‌মানির্ রাহীম। (২৪ পারা, সূরা হা-মীম, ১ম—২য় আয়াত)

৩। হা-মীম্ ; আঈন, ছীন, ক্বাফ্। (সূরা শূরা, ১ম — ২য় আয়াত)

৪। হা-মীম্ ; ওয়াল কিতাবিল্ মুবীন্! (সূরা যোখরোফ, ১ম — ২য় আয়াত)

৫। হা-মীম্ ; ওয়াল কিতাবিল্ মুবীন্, ইন্না আনজাল্‌নাহু ফী লাইলাতিম্ মোবারাকাতিন ইন্না কুন্না মুন্‌যেরীন। (সূরা দোখান, ১ম—৩য় আয়াত)

৬। হা-মীম্ ; তান্‌যীলুল কিতাবে মিনাল্লাহিল আযীযিল হাকীম। (সূরা জাসিয়াহ, ১ম—২য় আয়াত)

৭। হা-মীম ; তান্‌যীলুল কিতাবে মিনাল্লাহিল আযীযিল হাকীম। (সূরা আহ্‌কাফ, ১ম-২য় আয়াত)

অর্থ ঃ— ১। হা-মীম্ ; মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানবান্ আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এই কিতাব (কোর্‌আন) নাযিল হইয়াছে।

২। হা-মীম্ ; পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়াবান আল্লাহ দ্বারা এই কিতাব (কোর্‌আন) নাযিল হইয়াছে।

৩। হা-মীম্ ; আঈন, ছীন, ক্বাফ।

৪। হা-মীম্; এই উজ্জ্বল কিতাব (কোর্‌আন) সাক্ষী।

৫। হা-মীম্ ; এই উজ্জ্বল কিতাব (কোর্‌আন) সাক্ষী। নিশ্চয় আমি ইহা মঙ্গলময় (শবে ক্বদর) রাত্রিতে নাযিল করিয়াছি ; নিশ্চয় আমি কোর্‌আন দ্বারা আযাবের ভয় দেখাইয়া থাকি।

৬-৭। হা-মীম্ ; মহাপরাক্রমশালী, মহাবৈজ্ঞানিক আল্লাহ হইতে এই কিতাব (কোর্‌আন) নাযিল হইয়াছে।

ফযীলতঃ— হযরত রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন যে, পাক কোর্‌আনে ৭টি সূরার প্রথমে "হা মীম" আছে, দোযখেও ৭টি দরজা আছে। হাশরের দিন দোযখের প্রত্যেক দরজায় একটি করিয়া 'হা-মীম্' সূরা লিখিত থাকিবে এবং প্রত্যেক সূরা আল্লাহ্‌র নিকট আরয করিতে থাকিবে যে, "যে ব্যক্তি আমাকে দুনিয়ায় থাকিতে প্রত্যহ পড়িয়াছে ও বিশ্বাস করিয়াছে, তাহাকে এই দরজা দিয়া দোযখে প্রবেশ করাইও না।" (তঃ হক্কানী) যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই ৭টি আয়াত পড়িবে, তাহার জন্য দোযখের ৭টি দরজাই বন্ধ থাকিবে।

হা-মীম ঃ— কেহ কেহ বলেন যে, ইহা আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট নাম। কেহ বলেন যে, ইহার অর্থ—"হাইউল ক্বাইউম" চিরজীবী (চিরস্থায়ী)। আবার কেহ বলেন যে, ইহা রাহ্‌মানুর রাহীম (পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু) এর সংকেত।

কোন কোন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ 'হা-মীম' আল্লাহ্‌র একটি নাম বিশেষ; তোমরা রাত্রিকালে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে 'হা-মীম্' বলিয়া আহবান করিও, শত্রুরা কখনও তোমাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। ইহা একপ্রকার দোয়া ও আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা।

"আঈন, সীন, ক্বাফঃ— আঈন অর্থ— 'আলিম' অর্থাৎ মহাজ্ঞানী ; 'সীন' অর্থ— "সামী" অর্থাৎ শ্রবণকারী ; 'ক্বাফ' অর্থ "ক্বাদীর" অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে ; কিন্তু এই সবই আনুমানিক অর্থ। ইহাদের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ও রসূল (সাঃ) ব্যতীত অন্য কেহ অবগত নহেন।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— আল্লাহ্‌র তৌহীদ, হযরত (সাঃ) এর নবুয়ত ও পবিত্র ইসলাম কোর্‌আনের সত্যতার উপর নির্ভর করে। এই তিনটি পবিত্রতম নেয়ামতের সত্যতা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে কোর্‌আনের সত্যতা ঘোষণা করা আবশ্যক। যে উপরোক্ত ৭টি "হা-মীম্" আয়াত দ্বারা পাক কোর্‌আনের সত্যতা ও পবিত্রতার সাক্ষ্য দিবে, হাশরের দিন সেই পাক কোর্‌আন তাহার জন্য যে শাফায়াতকারী হইবে তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে ? আসমানী কিতাব ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় আমাদের কোর্‌আন শরীফ জড় পদার্থের মত অসার নহে, ইহা আল্লাহ তায়ালার সজীবতাপূর্ণ শক্তিশালী কালাম।

ফেরেশ্‌তাগণের দোয়া লাভের আমল

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ * ٢- هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ

الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ٣- هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۚ

لَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ *

উচ্চারণঃ—১। হুয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হু, আলিমুল গাইবি ওয়াশ্‌-শাহাদাতি হুয়ার্‌ রাহমানুর রাহীম। ২। হুয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল মালিকুল কুদ্দুসুস্‌-সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আযীযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বিরু সুবহানাল্লাহি আম্মা ইউশ্‌রিকুন। ৩। হুয়াল্লাহুল খালিকুল বারিউল মুসাউয়্যিরু লাহুল আসমাউল হোস্‌না, ইউসাব্বিহু লাহু মা ফিস্‌সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌দি ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম। (২৮ পারা, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত)

অর্থ ঃ — ১। তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই, তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞানবান, তিনি অতি দয়ালু ও অনুগ্রহকারী বটে। ২। তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনি পবিত্রতম শাহানশাহ, শান্তিদাতা, নিরাপত্তা প্রদানকারী, অভিভাবক (রক্ষক), মহাশক্তিশালী, প্রভাবশালী, মহিমাময়, অতিশয় সম্মানিত। তাঁহার সহিত তাহারা (মোশ্‌রেকেরা) যে অংশী স্থির করে, তিনি তাহা হইতে পবিত্র। ৩। তিনি আল্লাহ, প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, নির্মাণকর্তা, আকৃতিদাতা তাঁহারই জন্য উত্তম নামসমূহ। আসমান-জমিনের সৃষ্টি বস্তুমাত্রই তাঁহারই পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময় ও কৌশলী।

ফযীলত ঃ— হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি সকালে "আউযু বিল্লাহিস্‌ সামীইল আলীমে মিনাশ্‌ শাইতোয়ানির রাজীম" (অর্থাৎ আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি) পড়িয়া এই আয়াতগুলি তিনবার পড়িবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকিবেন। ঐ দিন তাহার মৃত্যু হইলে সে শহীদের দরজা লাভ করিবে। (তিরমিযী)

এই আয়াত তিনটি সূরা হাশরের (২৮ পারা) শেষ ভাগ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে; এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তায়ালার কয়েকটি বিশেষ গুণের বর্ণনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র তৌহীদ, শ্রেষ্ঠত্ব, শক্তি মহিমার একত্র সমাবেশের জন্য এই আয়াতগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ। এই আয়াতগুলি আল্লাহ্‌র খাস কালাম, কোন নবীর উক্তির বর্ণনা নহে ; এইজন্য ইহাদের ফযীলত অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে—তিনিই অভিভাবক ও করুণাময় এবং এই আয়াতগুলি ক্বোলিল্লাহুম্মা আয়াত, আয়াতুল কুরসী ও সূরা ইখলাসের সমভাবাপন্ন। অনেকে ধারণা করিয়া থাকেন যে, ইহাদের মধ্যে 'ইস্‌মে আযম' নিহিত রহিয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

আয়াতে কোর্‌আনে বিবিধ অভাব পূরণের আমল

ইসতিগফারের ফযীলত

(١) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (٢) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ○ (٣) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ○ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

উচ্চারণঃ— ১। ফাক্বোলতু সতাগফিরু রাব্বাকুম, ইন্নাহু কানা গাফ্‌ফারা। ২। ইউরসিলিস্‌ সামায়া আলাইকুম মিদ্‌রারা। ৩। ওয়া ইউমদিদকুম বিআম ওয়ালিওঁ ওয়া বানীনা। ওয়া ইয়াজআল্‌ লাকুম জান্নাতিওঁ ওয়া ইয়াজআল লাকুম আনহারা। (সূরা নূহ, ১০-১২ আয়াত)

অর্থ ঃ— ১। অনন্তর আমি বলিয়াছিলাম যে, তোমরা আপন প্রতিপালকের নিকট স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা প্রদানকারী। ২। তিনি তোমাদের জন্য আকাশ হইতে বৃষ্টি প্রদান করিবেন। ৩। এবং তিনি তোমাদিগকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের জন্য উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করিবেন এবং নদীসমূহ প্রবাহিত করিবেন।

খাসিয়ত ঃ— ১। হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, ইস্‌তিগফার সর্ববিধ বিপদাপদ দূর হওয়া ও মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার পক্ষে বিশেষ কার্যকরী। আল্লাহ তায়ালা ইস্‌তিগফার পাঠকারীকে অত্যন্ত পছন্দ করেন ও তাহার উপর নানাপ্রকার রহমত প্রেরণ করিয়া থাকেন। এই আয়াতগুলি অযুর সহিত সর্বদা পড়িলে সকল প্রকার বিপদাপদ হইতে নিরাপদ থাকা যায় ও মনের বাসনা পূর্ণ হয়। একদিন কতিপয় লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের কেহ সন্তান হওয়ার জন্য, কেহ বৃষ্টি হওয়ার জন্য ও কেহ অভাব পূরণ হওয়ার জন্য আবেদন করেন। তিনি সকলকেই তওবা-ইস্‌তিগফার পড়ার আদেশ দেন। তাহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুযুর! আপনি সকলের কথার উত্তরে একই ব্যবস্থা দিয়াছেন, ইহার কারণ কি?" ইহার উত্তরে তিনি এই আয়াত পড়িয়া বলিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা পাক কোর্‌আনে ইস্‌তিগফার পড়ার জন্য আদেশ দিয়াছেন।

২। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, "ইস্তিগফার পড়িলে প্রত্যেক প্রকার অভাব দূর হয়, যদি তোমরা মুক্তি চাও তবে সর্বদা ইস্তিগফার পড়িবে।"

শানে নুযূল ঃ— হযরত নূহ্ (আঃ) তাঁহার অবাধ্য সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র অনুগ্রহ সম্পদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহা আল্লাহ্র আদেশ। তিনি ক্ষমাশীল ও ক্ষমা করিবেন বলিয়া এই আয়াতে বলা হইয়াছে। ক্ষমা করার ফলে মানুষ সুখ-সম্পদ লাভ করিবে বলিয়া এই আয়াতে আল্লাহ্র আশ্বাস বাণী রহিয়াছে, এই জন্য এই আয়াতের আমল দ্বারা সকল অভাব দূর হয় ও মনের বাসনা পূর্ণ হয়। সূরা মুয্যাম্মিলের শেষ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যেঃ—

وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *

অর্থাৎ ঃ— এবং তোমরা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

প্রবাসকালে মান-ইয্যতের সহিত থাকার আমল

رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا *

উচ্চারণঃ— রাব্বি আদ্খিলনী মুদ্খালা সিদকিওঁ ওয়া আখ্রিজনী মোখ্রাজা সিদ্কিওঁ ওয়াজআল্ লী মিল্লাদুনকা সুলতানান্নাসীরা। (সূরা বনী ইসরাইল, ৮৩ আয়াত)

অর্থাৎ ঃ— হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ঠিকভাবে প্রবেশ করাও ও ঠিকভাবে বহির্গত কর এবং আমার জন্য তোমার নিকট হইতে সাহায্যকারী শক্তি দান কর।

খাঁসিয়ত ঃ— প্রবাসে যাত্রাকালে ও ফিরিবার সময় এই আয়াত পড়িলে প্রবাসে মান-ইয্যতের সহিত থাকা যায়।

শানে নুযূল ঃ— কাফেরগণের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া হযরত রসূল (সাঃ) মক্কা শরীফ ছাড়িয়া মদীনা শরীফ রওয়ানা হইবার পূর্বে এই দোয়া পড়িয়াছিলেন এবং ইহার বরকতে তিনি মদীনা শরীফে সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন।

প্রবাসকালে এই আয়াত পড়িলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা যায়

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ— রাব্বি আন্যিলনী মুন্যালাম্ মোবারাকাওঁ ওয়া আন্তা খাইরোল মুন্যিলীন। (১৮ পারা, সূরা মো'মেনুন, ২৯ আয়াত)

অর্থ ঃ— হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে মঙ্গলমতে অবতীর্ণ করিও এবং তুমিই উত্তম অবতরণকারী।

খাসিয়ত ঃ— কোন শহরে বা স্থানে উপস্থিত হইয়া এই আয়াত পড়িলে সেখানে নিরাপদে থাকা যায়।

শানে নুযূল ঃ— হযরত নূহ্ (আঃ) মহাপ্লাবনের সময় এই দোয়া পড়িয়া জাহাজে নিরাপদে ছিলেন, আল্লাহ তাঁহাকে এই দোয়া পড়িতে আদেশ দিয়াছিলেন। এই দোয়া পড়িয়া জাহাজে কিংবা নৌকায় উঠিলে নিরাপদে থাকা যায়।

চাকর চাকরানী বাধ্য থাকার তদবীর

اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ *

উচ্চারণ ঃ— ইন্নী তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি রাব্বী ওয়া রাব্বিকুম মা মিন দাব্বাতিন ইল্লা হুয়া আখিযুম বিনাসিয়াতিহা ইন্না রাব্বী আলা সেরাতিম মোসতাক্বীম। (১২ পারা, সূরা হুদ, ৫৬ আয়াত)

অর্থ ঃ— নিশ্চয়ই আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র উপর নির্ভর করি, তিনি (সৃষ্ট জগতের সকল বস্তুর) অদৃষ্ট ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার লিখনের বাহিরে কোন প্রাণী নাই, আমার প্রতিপালক (আল্লাহ) সরল পথে আছেন।

খাসিয়ত ঃ— দাস-দাসী অবাধ্য হইয়া উঠিলে কপালের চুল ধরিয়া এই আয়াত তিনবার পড়িয়া ফুঁক দিলে তাহারা অনুগত হইবে।

শানে নুযূল ঃ— হযরত হুদ নবী (আঃ) আদ জাতির জন্য রসূল প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহার নবুয়ত বিশ্বাস করিত না ; বরং তাহারা তাঁহাকে বলিত — "আমাদের কোন দেবতা বিরক্ত হইয়া তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া

দিয়াছেন।" তিনি এই আয়াত দ্বারা তাহাদের এই উক্তির উত্তর দিয়াছিলেন। ইহাতে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করার কথা প্রকাশ করা হয় এবং তিনি যে সরল পথে আছেন, তাহা স্মরণ করা হয় ; সেজন্য ইহার আমল দ্বারা দাস-দাসীগণ সরল পথে আসিয়া থাকে।

চাকুরী লাভের তদবীর

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ فِىْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ *

উচ্চারণঃ— আল্লাহুম্মা ছাল্লি ছালাতান্ কামেলাতান ওঁয়া সাল্লিম সলিমান্‌ তাম্মান্ আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিনিল্লাযী তানহাল্লু বিহিল ওক্বাদু ওয়া তান্‌ফারেজু বিহিল কুরাবো ওয়া তোক্‌যা বিহিল হাওয়ায়েজু ওয়া তুনালু বিহির রাগায়েবু ওয়া হুস্‌নোল খাওয়াতিমে ওয়া ইউসতাসক্বাল গামামু বিওয়াজহিহিল কারীমে, ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ফী কুল্লি লামহাতিওঁ ওয়া নাফাসিম বিআদাদে কুল্লি মা'লুমিল্লাকা।

এই দরূদ ৪৪৪৪ বার পড়িলে নিশ্চয় চাকুরী লাভ হয়।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ধর্মনেতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর তোমার পূর্ণ অনুগ্রহ ও শান্তি অবতীর্ণ কর, যাহার উপলক্ষে সমুদয় মনঃকষ্ট ও বিপদ দূর হয়, সমস্ত বাসনা ও ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং সকল কাজের পরিণামফল শুভ হয় ও সমুদয় চিন্তা দূর হয় এবং তাঁহার বংশধর ও সাহাবাগণের রূহ্ মোবারকের উপর প্রতি মুহূর্তে ও পলকে তোমার জ্ঞাত বস্তুর সংখ্যা পরিমাণ অনুগ্রহ ও শান্তি অবতীর্ণ কর।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই দরূদ শরীফ পাঠে অসংখ্য রহমতের বর্ণনা করা হয় ও সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসূল (সাঃ) কে উপলক্ষ করিয়া কল্যাণের জন্য দোয়া প্রার্থনা করা হয়। সেইজন্য ইহার আমল দ্বারা পাঠকারী আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করে এবং তাহার অভাব ও বেকারাবস্থা দূর হয়। এই দরূদকে 'ছালাতে নারিয়া' বলে।

চাকুরীতে ও জীবনের অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি লাভ করার আমল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

١. تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

٢. وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ٣. وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۞

উচ্চারণঃ—১। তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুল্‌কু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইইন্ ক্বাদীর। (সূরা মুলক, প্রথম আয়াত) ২। ইন্নাহু হুয়া আগ্‌না ওয়া আক্বনা। (সূরা নাজ্‌ম, ৪৮ আয়াত) ৩। ওয়াল্লাহু ইয়াখ্‌তাস্‌সু বেরাহমাতিহী মাইঁয়াশা-উ, ওয়াল্লাহু যুলফায্‌লিল আযীম্। (সূরা বাকারাহ, ১০৫ আয়াত)

অর্থঃ— তিনিই (আল্লাহ) বরকত অর্থাৎ কল্যাণবর্ধক, যাঁহার হস্তে রাজত্ব (আধিপত্য) রহিয়াছে এবং তিনিই সর্বশক্তিমান। ২। এবং তিনিই সম্পদ ও আধিপত্য দান করেন। ৩। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহে বিশেষত্ব দান করেন এবং আল্লাহ্‌ই মহাকল্যাণের অধিকারী।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই আয়াত পাঠ দ্বারা আল্লাহ তায়ালাই যে সকল প্রকার কল্যাণ, মঙ্গল ও অনুগ্রহের একমাত্র দাতা, তাহা স্মরণ করা হয়, ফলে পাঠকারীর উপর তাঁহার কল্যাণ ও অনুগ্রহ নাযিল হইয়া সাংসারিক জীবনে উন্নতি লাভ হয়। এই আয়াত তিনটি সর্বদা নিয়মিত পড়িলে সাংসারিক উন্নতি লাভ হয় ও চাকুরীতে পদোন্নতি হয়।

নষ্ট চাকুরী উদ্ধারের উপায়

(সূরা ফাতেহার তফসীর দ্রষ্টব্য)

অত্যাচারী কর্মচারীর চাকুরী নষ্ট করার তদবীর

(সূরা রা'দ, ১৩ পারা)

যে অন্ধকার রাত্রিতে মেঘের গর্জন হয় ও বিদ্যুৎ চমকাইতে থাকে, সেই রাত্রে নূতন বড় বাসনে সূরা রা'দ লিখিয়া বর্ষার পানিতে ধুইবে ; ঐ পানি অন্ধকার রাত্রিতে অত্যাচারীর ঘরের দরজায় ছিটাইয়া দিবে, ইন্‌শাআল্লাহ তাহার চাকুরী নষ্ট হইয়া যাইবে।

খাসিয়তের বর্ণনা ঃ— এই সূরার ১৫ আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন যে, যাহারা অধর্ম ও অসৎকর্ম করিয়া পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করে, তিনি তাহাদের প্রতি অভিসম্পাত প্রেরণ করেন। এই সূরায় অবিশ্বাসী অত্যাচারীগণের অমঙ্গল ও বিপদের বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে আল্লাহ তায়ালার অভিসম্পাতের এইরূপ আদেশ রহিয়াছে বলিয়া ইহার আমল দ্বারা তাঁহার অভিসম্পাত অবতীর্ণ হয়। এই সূরার ১২ আয়াতে মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের বর্ণনা রহিয়াছে, সেইজন্য মেঘের গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকাইতে থাকার সময় এই আয়াতের আমল বিশেষ কার্যকরী হইয়া থাকে।

মনের বাসনা ও অভাব পূরণের পরীক্ষিত তদবীর

ইমাম জা'ফর সাদেক (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাহারও কিছু বাসনা থাকিলে নিম্নোক্ত আয়াত কাগজে লিখিয়া স্রোতঃশীলা নদীর পানিতে ভাসাইয়া দিবে ও ভাসাইবার সময় নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়িবে এবং দোয়া পড়িবার সময় নিজের বাসনা ও অভাবের কথা স্মরণ করিবে ; ইনশাআল্লাহ মনের বাসনা পূর্ণ হইবে ও অভাব দূর হইবে।

ভাসাইবার আয়াত

١ . بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ ٢ . مِنَ الْعَبْدِ الذَّلِيْلِ اِلَى الرَّبِّ الْجَلِيْلِ ○ ٣ . رَبِّ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ◎

অর্থঃ— ১। পরম দয়াময় করুণাশীল আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করিতেছি)। ২। অতি হীন বান্দার নিকট হইতে গৌরবান্বিত প্রতিপালকের (আল্লাহ্র নিকট) প্রার্থনা। ৩। হে প্রতিপালক! নিশ্চয় আমাকে যাবতীয় বিপদে স্পর্শ করিয়াছে, আর তুমি অনুগ্রহকারীগণের মধ্যে অধিকতর অনুগ্রহকারী।

ফযীলতের বর্ণনাঃ— আল্লাহ্র নিকট আর্জি পেশ করার ইহা একটি তদবীর। প্রার্থনাটি সর্বপ্রথমে আল্লাহ্র করুণাময় নামের স্মরণ লইয়া আরম্ভ হইয়াছে ও শেষ আয়াতে হযরত আইয়ুব নবী (আঃ) ১৮ বৎসর দুরন্ত কুষ্ঠরোগে ভুগিয়া যে দোয়ার বরকতে রোগমুক্তি পাইয়াছিলেন ও লুপ্ত সম্পদ ফিরাইয়া পাইয়াছিলেন, তাহা রহিয়াছে। এই আয়াতের আমল প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালার দ্বারা বিপদ-মুক্তির এবং রহমত ও শক্তির স্মরণ করা হয়। এই কয়েকটি কারণে উক্ত তদবীর দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

দোয়াটি এই ঃ—

اَللّٰهُمَّ بِمُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَصَحْبِهِ الْمَرْضِيِّيْنَ اِقْضِ حَاجَتِيْ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ ●

উচ্চারণঃ— আল্লাহুম্মা বিমুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহিত্তায়্যিবীনাত্ ত্বাহিরীনা ওয়া সাহ্‌বিহিল মারযিয়্যীনা ইক্বদ্বি হাজাতী ইয়া আক্‌রামাল আক্‌রামীন।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর এবং তাঁহার পুণ্যাত্মা ও পবিত্র বংশধর এবং সঙ্গীগণ, যাঁহারা তোমার নৈকট্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপলক্ষে আমার বাসনা পূর্ণ কর। হে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মানী!

কঠিন কাজ সহজসাধ্য হওয়ার তদবীর

وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللهِ ۚ اِنَّ اللهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ○

উচ্চারণঃ— ওয়া উফাব্বিযু আম্‌রী ইলাল্লাহি ইন্নাল্লাহা বাসীরুম বিল-ইবাদ। (২৫ পারা, সূরা মো'মেন, ৪৪ আয়াতের শেষ অংশ)

অর্থঃ— এবং আমি আমার কার্য আল্লাহ্র উপর সমর্পণ করিলাম, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপন বান্দাগণের প্রতি দৃষ্টিকারী।

শানে নুযূল ঃ— ফেরাউনের সময় একজন ঈমানদার ব্যক্তি হযরত মূসা (আঃ) কে সত্য নবী বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি তাহাদিগকে বলিতেন যে, তোমরা বিশ্বাস কর আর না কর, আমি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের উপর আমার কার্যের ভার অর্পণ করিয়াছি। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালার রহমত ও দয়ার উপর কাজের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয় ; সেইজন্য ইহার বরকতে কাজ সহজসাধ্য হয়।

খাসিয়তঃ— কোন কঠিন কাজ উপস্থিত হইলে এই আয়াত পড়িতে থাকিলে কাজ সহজসাধ্য হয়।

কেয়ামতের দিন মুখ উজ্জ্বল হওয়ার আমল

إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ○

উচ্চারণঃ— ইন্নাহু হুয়াল বার্‌রুর্ রাহীম। (২৭ পারা, সূরা তূর, ২৭ আয়াতের শেষ অংশ)

অর্থ ঃ— নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) অতিশয় সহৃদয় ও মেহেরবান বটেন।

খাসিয়তঃ— যে ব্যক্তি প্রত্যহ নামাযের পর এই আয়াত ১১ বার পড়িয়া হাতের আঙ্গুলের উপর ফুঁক দিয়া তাহার কপালে মর্দন করিবে, ইন্‌শাআল্লাহ কেয়ামতের দিন তাহার মুখ উজ্জ্বল হইবে।

শানে নুযূল ঃ— যে সকল লোকের বেহেশ্‌তে যাওয়ার সৌভাগ্য হইবে, তাঁহারা বেহেশ্‌তের মধ্যে থাকিয়া এই আয়াত পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিবেন ও বেহেশ্‌তের নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করিবেন। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত বেহেশ্‌তের নেয়ামতের স্মরণ করা হয় ও তাঁহার অনুগ্রহের প্রশংসা করা হয়। কেয়ামতের দিন আল্লাহ এইরূপ প্রশংসার পুরস্কার স্বরূপ মুখ উজ্জ্বল করিয়া দিবেন।

যাদু নষ্ট করার তদবীর

কাহারও প্রতি যাদুটোনা কিম্বা বাণ প্রয়োগ হইলে এই আয়াত লিখিয়া তাহার গলায় বাঁধিয়া দিলে কিম্বা ইহা পেয়ালায় লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া পানি খাওয়াইয়া দিলে ইন্‌শাআল্লাহ, যাদুটোনা বা বাণ নষ্ট হইয়া যাইবে ; (ইহা বহু পরীক্ষিত)।

১. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ○ ২. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ○

উচ্চারণঃ— ১। ফালাম্মা আল্‌ক্বাও ক্বালা মূসা মা জি'তুম বিহিস্ সিহরু ইন্নাল্লাহা ছাইউবতিলুহু ইন্নাল্লাহা লা ইউছলিহু আমালাল মুফ্‌সিদীন। ২। ওয়া ইউহিক্কুল্লাহুল হাক্কা বিকালিমাতিহী ওয়ালাও কারিহাল মুজরিমুন। (১১ পারা, সূরা ইউনুস, ৮১—৮২)

অর্থ ঃ— ১। তৎপর তাহারা যখন রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করিল, তখন মূসা (আঃ) বলিলেন, তোমরা যাহা আনিয়াছ তাহা যাদু ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

আল্লাহ নিশ্চয় ইহা অচিরে রহিত করিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কুকর্মকারীগণের কর্ম সংশোধন করিবেন না। ২। এবং আল্লাহ তাঁহার পাক কালাম দ্বারা সত্য সাব্যস্ত করিবেন, যদিও উহা পাপীগণের নিকট অপ্রিয় বিবেচিত হয়।

শানে নুযূল ঃ— হযরত মূসা (আঃ)কে ফেরাউন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, আপনার নবুয়তের কি নিদর্শন আছে ? আপনি সত্য নবী হইলে নবুয়তের নিদর্শন প্রদর্শন করুন। তখন হযরত মূসা (আঃ) হাতের লাঠি মাটিতে ফেলিয়া দিলেন, অমনি ইহা এক প্রকাণ্ড সাপ হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ফেরাউন বলিল যে, ইহা একটি যাদু মাত্র। তাঁহাকে জব্দ করার জন্য ফেরাউন যাদুকরগণকে ডাকিয়া আনিল। যাদুকরগণ লাঠির মধ্যে সূক্ষ্ম সূতা বাঁধিয়া মাটিতে ফেলিল ও উহা দ্বারা সাপের খেলা দেখাইতে লাগিল। যাদুকরগণের হাত সাফাইর দরুন কেহ তাহা ধরিতে পারিল না। অনন্তর হযরত মূসা (আঃ) এইসব কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার হাতের লাঠি মাটিতে ফেলিলেন, তৎক্ষণাৎ উহা এক বড় সাপ হইয়া সকল সাপগুলিকে সূতাসহ গিলিয়া ফেলিল। যাদুকরণগণের ভেল্কিবাজি ধরা পড়িলে তাহারা তওবা করিয়া ঈমান আনিল। এই আয়াতসমূহে যাদু নষ্ট করার ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে ও ইহাতে যাদু নষ্ট হইবে বলিয়া আল্লাহ্‌র বাণী রহিয়াছে ; সেজন্য ইহাদের আমল দ্বারা যাদুটোনা নষ্ট হয়।

স্বামী বশীভূত করার আমল

যে স্ত্রীলোকের স্বামী সর্বদা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে, এই আয়াত শরীফ কোন মিষ্টি দ্রব্যের উপর পড়িয়া ফুঁক দিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া দিলে ইন্‌শাআল্লাহ স্ত্রীর প্রতি স্বামী আকৃষ্ট হইবে ; (স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত হারাম উদ্দেশ্যে ইহা কার্যকরী হইবে না)।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ط وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ط وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ○

উচ্চারণঃ— ১। ওয়া মিনান্নাসি মাইঁ ইয়াত্তাখিযু মিন্ দূনিল্লাহি আনদাদাইঁ ইউহিব্বূনাহুম কাহুব্বিল্লাহি ওয়াল্লাযীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বাল্ লিল্লাহি

ওয়ালাও ইয়ারাল্লাযীনা যালামু ইয্‌ ইয়ারাওনাল আযাবা আন্নাল কুওয়্যাতা লিল্লাহি জামীয়াওঁ ওয়া আন্নাল্লাহা শাদীদুল আযাব। (সূরা বাক্বারাহ্‌, ১৬৫ আয়াত)।

অর্থ ঃ— এবং মানুষের মধ্যে এমন কতক আছে ; তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে আল্লাহ্‌র অংশী স্থির করে, ইহাদিগকে আল্লাহ্‌র ন্যায় প্রেম-ভক্তি করিয়া থাকে ; বস্তুতঃ যাহারা ঈমানদার, আল্লাহ্‌র প্রতি তাহাদের প্রেম-ভক্তি অধিকতর দৃঢ় এবং যাহারা নিজেদের উপর এইভাবে অত্যাচার করিয়াছে, তাহারা যদি আল্লাহ্‌র শাস্তি দেখিত তবেই বুঝিত যে, আল্লাহ কঠোর শাস্তি-দাতা এবং সর্বশক্তিই তাঁহার।

শানে নুযূল ঃ— যাহারা আল্লাহ্‌র এবাদত ছাড়িয়া দেব-দেবীর উপাসনা করে এবং দেব-দেবীকে প্রেম-ভক্তি করে, তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই আয়াত নাযিল হইয়াছে। এই আয়াত আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেম-ভক্তি স্মরণ করাইয়া দেয় এবং এই বাণী লইয়া ইহা নাযিল হওয়ায় ইহার আমল দ্বারা ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

বন্ধুত্ব স্থাপন করার আমল

এই আয়াতটি পড়িয়া মিষ্টি দ্রব্যের উপর ফুঁক দিয়া যাহাকে খাওয়ান যায় তাহার সহিত বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপিত হয় ঃ—

১. هُوَ الَّذِىْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ○ ২. وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

উচ্চারণ ঃ— ১। হুয়াল্লাযী আইয়্যাদাকা বিনাস্‌রিহি ওয়া বিল্‌মু'মিনীন, ২। ওয়া আল্লাফা বাইনা কুলুবিহিম, লাও আন্‌ফাক্‌তা মা ফিল্‌ আর্‌দি জামীয়াম্‌ মা আল্লাফতা বাইনা কুলুবিহিম ওয়া লাকিন্নাহা আল্লাফা বাইনাহুম ইন্নাহু আযীযুন হাকীম। (১০ পারা, সূরা আনফাল, ৬২—৬৩ আয়াত)।

অর্থ ঃ— ১। তিনিই তাঁহার সাহায্য দ্বারা তোমাকে ও বিশ্বাসীগণকে শক্তিশালী করিয়াছেন। ২। এবং তিনি তাহাদের অন্তরে পরস্পর প্রীতি সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি পৃথিবীর সমুদয় ধন-রত্ন ব্যয় করিলেও তাহাদের অন্তরে স্নেহ সৃজন করিতে পারিবে না ; কিন্তু আল্লাহ তাহাদের অন্তরে স্নেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তিনি শক্তিশালী, বিজ্ঞানময়।

শানে নুযূল ঃ— এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালা হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত তিনি আরব জাতির মধ্যে একতা ও প্রীতি স্থাপন করিতে পারিতেন না। সমস্ত একতা ও ভালবাসার মূলে আল্লাহ্‌র শক্তি ও ইচ্ছা বর্তমান রহিয়াছে। এই আয়াতের আমল দ্বারা ঐ শক্তি ও ইচ্ছার স্মরণ করা হয় ও আশ্রয় লওয়া হয়। ফলে উপরোক্ত ফযীলত লাভ হয়।

দুই জনের মধ্যে শত্রুতা ও মতান্তর সৃষ্টি করার তদবীর

দুই ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা ও মতান্তর সৃষ্টি করিতে হইলে এই আয়াত গাছের পাতার উপর লিখিবে ঃ—

وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ط

(৬ পারা, সূরা আল্‌মায়েদা, ৬৪ আয়াতের অংশ)

অর্থ ঃ— এবং তাহাদের মধ্যে আমি কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছি।

শানে নুযূল ঃ— ইহুদী ও খৃষ্টানগণ মুসলমানদের সহিত শত্রুতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল ও আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হইয়াছিল। ইহুদীগণ কয়েক ঘন্টার মধ্যে কয়েকজন নবীকেও হত্যা করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের ঐ সব মহাপাপের জন্য অভিশাপ দিয়া এই আয়াতে বলিয়াছেন যে, তাহারা কেয়ামত পর্যন্ত পরস্পর শত্রুতায় লিপ্ত থাকিবে। বিগত দুইটি মহাযুদ্ধ এই আয়াতের সত্যতার প্রমাণ। এই আয়াতে শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ার আল্লাহ তায়ালার একটি আদেশ রহিয়াছে, ইহার খাসিয়তে এই আয়াতের আমল দ্বারা শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

তৎপর উপরোক্ত আয়াতের নীচে এই নকশা লিখিবে

নকশার বর্ণনা ঃ— যাদুকরের কুফরী কালামের কিছু কিছু শক্তি বর্তমান আছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র পাক কালামের শক্তির নিকট ইহাদের শক্তি কিছুই নহে। পূর্বকালে লোকেরা যাদুমন্ত্রের দ্বারা মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করিত। এই নকশায় আল্লাহ্‌র নামের নীচে "সেহর" (যাদু) শব্দটি দ্বারা প্রতীয়মান করা হয় যে, যাদুমন্ত্র আল্লাহ্‌র অসীম শক্তির নিকট অকিঞ্চিতকর। এই নকশায় উক্ত ভাবের বর্ণনা থাকায় ইহার বরকতে উপরোক্ত ফল লাভ হয়।

الله الله
سحر
الله الله

তৎপর এই নকশার নীচে লিখিবে অমুক ও অমুকের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হউক। অমুক অমুকের স্থলে দুই জনের নাম লিখিবে এবং ইহা তাবীয করিয়া

পুরাতন দুই কবরের মাধ্যস্থলে পুঁতিয়া রাখিলে তাহাদের মধ্যে শত্রুতা আরম্ভ হইবে। (অন্যায়ভাবে এই আমল করিলে কবীরা গোনাহ হইবে)

ঝগড়া-বিবাদ ও হিংসা-দ্বেষ রহিত করার তদবীর

নূতন কাটা কলম দ্বারা মিঠাই, খোরমা, আঞ্জির কিংবা আমের উপর এই আয়াত লিখিয়া যাহাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও হিংসা-দ্বেষ আছে তাহাদিগকে খাওইয়া দিবে ; ইন্‌শাআল্লাহ তাহাদের মধ্যে ভালবাসা ও স্নেহ স্থাপিত হইবে।

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰنَا لِهٰذَا ۗ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۗ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

(৮ পারা, সূরা আ'রাফ, ৪৩ আয়াত)

অর্থ ঃ— অনন্তর বেহেশ্‌তে আমি তাহাদের অন্তরের অশান্তি দূর করিব যাহাদের নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত রহিয়াছে। এবং তাহারা বলিবে—সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি ইহার দিকে পথ দেখাইয়াছেন। তিনি যদি আমাদিগকে পথ না দেখাইতেন তবে আমরা কখনও এই পথের সন্ধান পাইতাম না; (এতদুদ্দেশ্যে) নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের রসূলগণ সত্য (ধর্ম) লইয়া আগমন করিয়াছেন; আর তাহাদিকে ডাকিয়া বলা হইবে যে—তোমাদের জন্যই এই বেহেশ্‌ত। তোমরা যে সকল কার্য করিয়াছ তাহার প্রতিফলস্বরূপ তোমাদিগকে বেহেশ্‌তের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে।

শানে নুযূল ঃ— এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সুখ-শান্তিপূর্ণ বেহেশ্‌তের অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। পার্থিব জীবনে যত সুখই লাভ হউক না কেন, মানুষ কখনই প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারে না, কারণ মানুষের মনে সর্বদা নানা প্রকার কামনা, বাসনা ও হিংসা-দ্বেষ জাগরিত হইয়া সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বেহেশ্‌তবাসীগণের অন্তর হইতে এই সকল অশান্তি দূর করিয়া দিবেন ও তাহারা পূর্ণ সুখের অধিকারী হইয়া আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতে থাকিবে। এই আয়াতে মনের অশান্তি দূর করিয়া দেওয়ার আল্লাহ্‌র একটি আশ্বাসবাণী থাকায় ইহার আমল দ্বারা শত্রুতা ও হিংসাজনিত অশান্তি দূর হয়।

সর্প দংশন হইতে নিরাপদ থাকার তদবীর

হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী সাহেবের 'মোজাররাবাত' নামক কিতাবে লিখিত হইয়াছে যে, যদি কোন ব্যক্তি এই শব্দগুলি একবার উচ্চারণ করে, তবে এক বৎসরের মধ্যে তাহাকে সর্পে দংশন করিবে না।

يَا بِلَهْ مُوِّيْ سَانُثْ نَهْ كَاتِيْ ۝

উচ্চারণঃ— ইয়া বিলাহ্ মুঈ সানুছ নাহ্ কাতি।

এই শব্দগুলি সুরিয়ানী ভাষার শব্দ। হযরত মূসা নবী (আঃ) এর সময় প্রথম সাপের যাদু-মন্ত্র প্রসার লাভ করে। হাতের লাঠি দ্বারা সাপের যাদু-মন্ত্র নষ্ট করার মা'জেযা তাঁহার নবুয়তের বিশেষ নিদর্শন। সাপের শক্তি ও বিষ নষ্ট করার জন্য ঐ জামানায় অনেকগুলি আয়াত ও ইস্‌ম নাযিল হইয়াছিল, ইহা তাহাদের অন্যতম। অনেকে ধারণা করিয়া থাকেন যে, এই শব্দগুলি তৌরাতের অন্তর্ভুক্ত। ইহার সঠিক অর্থ ও তফসীর কেহই অবগত নহেন, তবে ইহা সাপ হইতে নিরাপত্তার জন্য বহুকাল ধরিয়া পরীক্ষিত তদবীররূপে ব্যবহার লাভ করিয়া আসিতেছে (ইহার কার্যকারিতায় কোন সন্দেহ নাই)।

দ্বিতীয় তদবীর

ফজর ও মাগরিবের সময় ৩ বার করিয়া এই আয়াত শরীফ পড়িলে সর্পে দংশন করিবে না।

سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ۝

উচ্চারণঃ— সালামুন আলা নূহিন ফিল আলামীন। (২৩ পারা, সূরা সাফ্‌ফাত, ৭৯ আয়াত)।

অর্থঃ— সমস্ত জগতের প্রত্যেক দিকে (এই রব রহিয়াছে যে) নূহ্ নবী (আঃ) এর উপর শান্তি (সালাম) অবতীর্ণ হউক।

শানে নুযূল ঃ— এই আয়াতে নূহ্ নবী (আঃ) এর উপর মহাপ্লাবনের সময় আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, আমি ধর্মদ্রোহীদিগকে মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম ও আমার দয়ার চিহ্নস্বরূপ নূহ্ নবী (আঃ) ও তাঁহার পরিজন সাহাবাগণকে ভয়াবহ প্লাবন এবং তুফান হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম। পৃথিবীতে একমাত্র তাঁহার বংশধরগণই অবশিষ্ট ছিল, সেজন্য জগদ্বাসীগণ এখনও আমার প্রিয় নূহ্

নবীর (আঃ) কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি সালাম প্রেরণ করিয়া থাকে। আমার অন্যান্য ঈমানদার সেবকগণও এইরূপভাবে ইহ-পরকালে আমার অনুগ্রহ লাভ করিবে। এই আয়াতটি হযরত নূহ্ নবী (আঃ) এর প্রতি একটি দরূদ বিশেষ, ইহার বরকতে তাঁহার দোয়া ও আল্লাহ্র রহমত লাভ হয়। ফলে পাঠকারী সর্প দংশনের বিপদ হইতে নিরাপদে থাকে।

সর্পবিষ নষ্টের পরীক্ষিত তদবীর

١- قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ٥ ٢- فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ٥

٣- قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ٥ ٤- سَلٰمٌ

عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ٥ ٥- اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ

فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ٥

উচ্চারণ ঃ— ক্বালা আলক্বিহা ইয়া মূসা। ২। ফাআলক্বাহা ফাইযা হিয়া হাইয়্যাতুন তাস্আ। ৩। ক্বালা খুয্হা ওয়ালা তাখাফ্ সানুয়ীদুহা সীরাতাহাল উলা। (সূরা তা-হা, ১৯-২১ আয়াত) ৪। সালামুন আলা নূহিন্ ফিল-আলামীন। (সূরা সাফ্ফাত, ৭৯ আয়াত)। ৫। আফাগায়রা দীনিল্লাহে ইয়াব গুনা ওয়া লাহু আস্লামা মান্ ফিস্ সামাওয়াতে ওয়াল আরদি তাওয়াওঁ ওয়া কারহাওঁ ওয়া ইলাইহি ইউরজাউন। (সূরা আলে ইম্রান, ৮৩ আয়াত)।

অর্থঃ— ১। তিনি (আল্লাহ) বলিয়াছেন, হে মূসা! তুমি ইহা (লাঠি) নিক্ষেপ কর। ২। তিনি উহা নিক্ষেপ করিলেন, তখনই উহা অজগর সর্প হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। ৩। তিনি (আল্লাহ্) বলিয়াছেন—তুমি (হযরত মূসা) ইহাকে ধর এবং ভয় পাইও না ; আমি ইহাকে প্রথম বারের ন্যায় (লাঠিতে) পরিবর্তন করিয়া দিতেছি। ৪। পৃথিবী ব্যাপিয়া নূহের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ হউক। ৫। তাহারা কি আল্লাহ্র দীন ব্যতীত অন্য দীনকে কামনা করিয়া থাকে ? অথচ আসমান ও জমিনের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই ইচ্ছায় অনিশ্চয়তায় তাঁহারই অনুগত হইয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।

শানে নুযূল ঃ— ১—৩ আয়াতে হযরত মূসা (আঃ) এর সাপ ধ্বংস করার মা'জেযা বর্ণিত হইয়াছে। ৪র্থ আয়াতে হযরত নূহ্ নবী (আঃ) এর প্রতি তুফানের সময় আল্লাহ্র অনুগ্রহের বর্ণনা রহিয়াছে ও ৫ম আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্র শক্তিই সকল সৃষ্টির উপর প্রবল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই সকল কারণে এই আয়াতগুলির আমল দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার রহমত ও কুদরতের বর্ণনা হয় বলিয়া উপরোক্ত ফযীলত লাভ হয়।

ঘরে সর্প না থাকার তদবীর

যে ঘরে সর্প থাকে বলিয়া সন্দেহ হয়, সেই ঘরে শয়নকালে এই আয়াত পড়িলে সর্প কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

سَلٰمٌ عَلٰۤى اِلْ يَاسِيْنَ ٥

উচ্চারণ ঃ— সালামুন আলা ইল্ইয়াসীন। (২৩ পারা, সূরা সাফ্ফাত, ১৩০ আয়াত)

অর্থ ঃ— হযরত ইলিয়াস নবী (আঃ) এর উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

শানে নুযূল ঃ— হযরত ইলিয়াস নবী (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ) এর হাজার বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে কালে লোকেরা সূর্যের উপাসনা করিত। তিনি তাহাদিগকে আল্লাহ্র এবাদতে ফিরাইয়া আনার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহারা হযরত ইলিয়াস (আঃ) এর উপর নানা প্রকার নির্যাতন ও অমানুষিক অত্যাচার চালাইতে থাকে ; তথাপি তিনি প্রচারকার্য হইতে বিরত হন নাই। সেইজন্য আল্লাহ তাঁহাকে বিশ্বস্ত বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ও তাঁহার প্রতি শান্তিবাণী প্রেরণ করিয়াছেন। এই আয়াতটি হযরত ইলিয়াস নবী (আঃ) এর প্রতি দরূদ। এই দরূদ শরীফের বরকতে তাঁহার দোয়া ও আল্লাহ তায়ালার রহমত লাভ হয়, সেইজন্য পাঠকারী নিরাপত্তা লাভ করে।

সাপ ও কুকুরের বিষ নষ্ট করার তদবীর

اَللّٰهُ الصَّمَدُ (আল্লাহুছ্ ছামাদ) কালামটি ৪০ বার কাঁসার থালায় পড়িয়া সাপ কিংবা কুকুরের কাটা রোগীর পিঠে লাগাইবে। বিষ থাকা পর্যন্ত থালাটি পিঠে লাগিয়া থাকিবে, বিষ নষ্ট হইয়া গেলে থালা পড়িয়া যাইবে।

যে কোন বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের তদবীর

কোন বিষাক্ত প্রাণী কামড়াইলে দংশিত স্থানের চতুর্দিকে আঙ্গুল স্পর্শ করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে এক নিঃশ্বাসে ৭ বার এই আয়াত পড়িয়া ফুঁক দিলে বিষের যন্ত্রণা দূর হয়।

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ— ওয়া ইযা বাতাশ্‌তুম বাতাশ্‌তুম জাব্বারীনা। (সূরা শোয়ারা, ১৩০ আয়াত)

অর্থ ঃ— এবং যখন তোমরা (কোন লোকের প্রতি) হস্ত নিক্ষেপ কর, তখন (তাহাকে) অতি কঠিনভাবেই আক্রমণ করিয়া থাক।

শানে নুযূল ঃ— হযরত হুদ নবীর (আঃ) সময়ে লোকেরা অতি শক্তিশালী ছিল, তাহারা বহু পরিশ্রমে ও অর্থ ব্যয়ে অট্টালিকা এবং ইমারত নির্মাণ করিতে পছন্দ করিত। হযরত হুদ নবী (আঃ) তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন যে, এই সকল ব্যর্থ হইয়া যাইবে, পরকালে ইহারা তোমাদের কোন কাজে লাগিবে না। যদি মঙ্গল চাও তবে আল্লাহকে ভয় কর ও তাঁহার বাধ্য হও। এই আয়াতে তাহাদের বল-বিক্রমের কথা বলা হইয়াছে। তাহারা কাহাকেও আক্রমণ করিলে প্রবলবেগে আক্রমণ করিত, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার আক্রমণ ক্ষমতার নিকট তাহাদের বল-বিক্রম কিছুই নহে। এই আয়াতে বল-বিক্রম ও আক্রমণের বিষয় উল্লেখ থাকায় ও ইহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার অসীম ক্ষমতা পরিস্ফুট করা হয় বলিয়া ইহার আমল দ্বারা বিষাক্ত প্রাণীর আক্রমণের গতিরোধ হয়। কলেরার আবির্ভাব হইলে প্রত্যহ এই আয়াত কয়েকবার পড়িলে কলেরার আক্রমণ হইতে নিরাপদে থাকা যায়।

কলেরা রোগের তদবীর

গ্রামে কলেরা দেখা দিলে এই পবিত্র আয়াত শরীফটি ১৪ শত বার পড়িয়া পানিতে ফুঁক দিয়া প্রত্যেককে ৩ দিন খাওয়াইয়া দিবে অথবা প্রত্যহ ২৮০ বার পড়িবে অথবা ৫ বার কাগজে লিখিয়া তাবীয করিয়া সঙ্গে রাখিবে।

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ۝

উচ্চারণ ঃ— সালামুন ক্বাওলাম্ মির্ রাব্বির্ রাহীম। (২৩ পারা, সূরা ইয়াসীন, ৫৮ আয়াত)।

অর্থ ঃ— করুণাময় প্রতিপালক (আল্লাহ) হইতে সালাম সম্ভাষিত হইবে। (সূরা নূরে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কল্যাণযুক্ত আশীর্বাদ আসে)।

শানে নুযূল ঃ— হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, সূরা ইয়াসীন কোর্‌আনের দিল্ (কেন্দ্র)। এই আয়াত শরীফটিও সূরা ইয়াসীনের দিল্ (কেন্দ্র)। এই আয়াতে বলা হইয়াছে, যে সকল লোক বেহেশ্‌তে দাখিল হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবে, তাহারা আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে শান্তিবাণী (সালাম) লাভ করিবে। আল্লাহ্‌র নিকট হইতে শান্তিবাণী লাভ করাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য ও সৌভাগ্য। মানুষ ইহা হইতে উত্তম নেয়ামতের কল্পনা করিতে পারে না। এই আয়াতের যিকির দ্বারা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে শান্তি লাভ করার কথা স্মরণ করা হয়, সেইজন্য পাঠকারীর উপর তাঁহার রহমত নাযিল হয়। এই আয়াতের সম্পূর্ণ ফযীলত বর্ণনা করা অসম্ভব। সর্বদা এই আয়াত পড়িতে থাকিলে আল্লাহ তায়ালার রহমত লাভ হয়, তিনি নেগাহবান থাকেন ও তাঁহার নৈকট্য লাভ হয়। রাত্রে এশার নামাযের পর ৭ বার এই আয়াত পড়িয়া শুইয়া থাকিলে স্বপ্নে ওলী-আল্লাহগণের সাক্ষাৎ লাভ হয় ও তাঁহাদের উপদেশ লাভ করা যায়। এই আয়াতের যিকির দ্বারা মানুষ কামালিয়াতের দরজায়ও পৌঁছিতে পারে।

কলেরার ২য় তদবীর

(৭২ পৃষ্ঠায় সূরা কদরের তফসীর দেখুন)

কলেরা রোগে কর্পূরের গুণ

কলেরা রোগে কর্পূরের বিশেষ গুণ আছে বলিয়া ডাক্তারগণ গবেষণা দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছেন ; তাহারা কলেরা রোগীকে কর্পূর মিশ্রিত পানি খাইবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার আবিষ্কারক জার্মান ডাক্তার হ্যানিমান সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন যে, কর্পূরই কলেরার একমাত্র ঔষধ। তাঁহার আবিষ্কৃত কর্পূরের তৈয়ারী কেম্‌ফার নামক ঔষধটি ডাক্তারগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কর্পূর যে একটি অতি উত্তম প্রতিষেধক দ্রব্য, তাহা ১৯ শত বৎসর পূর্বেই পাক কোর্‌আনে উল্লেখ করা হইয়াছে; পাক কোর্‌আনের ২৯ পারার সূরা দাহরের ৫ম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে ঃ—

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝

অর্থ ঃ— নিশ্চয়ই পুণ্যবানগণ কর্পূর মিশ্রিত পান-পাত্র হইতে পান করিবে।

ফযীলত ঃ— কেয়ামতের দিন মানুষের জন্য মহাসঙ্কট উপস্থিত হইবে। নানাপ্রাকার পূতিগন্ধ, বিষাক্ত বাতাস, অসহ্য গরম ও নানা প্রকার কষ্ট হইবে।

আল্লাহ্ তায়ালা এই আয়াতে বলিয়াছেন যে, পুণ্যবানগণ ঐ দিন কর্পূর মিশ্রিত পানি পান করিবে ও উহার গুণে তাহাদিগকে কোন প্রকার কষ্ট ও মসিবত স্পর্শ করিতে পারিবে না। কষ্ট-যন্ত্রণা রোধ করার পক্ষে এ দিন কর্পূর বিশেষ কার্যকরী হইবে। কর্পূরকে আল্লাহ তায়ালা প্রতিষেধক শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইজন্য ইহা দ্বারা কলেরার বিষ রোধ করা যায়।

কর্পূরের এই গুণ থাকায় প্রাচীনকালে এবং বর্তমান যুগেও কর্পূর উপহারের সামগ্রীরূপে রাজদরবারে সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে।

মৃত লাশে কর্পূর মাখিয়া রাখিলে পচিতে পারে না। কর্পূর যে আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত প্রতিষেধক শক্তিসম্পন্ন একটি নেয়ামত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বসন্ত রোগের তদবীর

পাক কোর্আনের নিম্নোক্ত আয়াতটি ৭ বার পড়িয়া ১টি চাউলের উপর ফুঁক দিবে, এইরূপে ৭টি চাউলের উপর ৭ বার ফুঁক দিবে, তৎপর এক একটি চাউল এক একজনকে খাইতে দিবে। আল্লাহ্র রহমতে তাহাদের বসন্ত রোগ হইবে না, হইলেও অতি অল্প হইবে ঃ—

وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ ۝

উচ্চারণ ঃ— ওয়া ইইঁইয়াম্‌সাস্‌কাল্লাহু বিদুর্‌রিন ফালা কাশিফা লাহু ইল্লা হুয়া। (১১ পারা, সূরা ইউনূস, ১০৭ আয়াত)

অর্থ ঃ— অনন্তর আল্লাহ যদি তোমাকে অমঙ্গল দেন, তবে তিনি ব্যতীত আর কেহ তোমাকে অমঙ্গল হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, সর্বশক্তিমান ও করুণাময় আল্লাহই মানবের ভাল-মন্দ করার একমাত্র মালিক। এই আয়াত পাঠ দ্বারা তাঁহার ঐ শক্তি স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করা হয়। ফলে তিনি রোগ, শোক ও বিপদ হইতে নিরাপদে রাখেন।

দ্বিতীয় তদবীর

সূরা আর্‌রাহমানের আমল (২৭ পারা)

১। বসন্ত রোগ শহরে দেখা দিলে কয়েকটি নীল রঙ্গের সূতা লইয়া সূরা আর্‌রাহমান পড়িতে আরম্ভ করিবে এবং প্রত্যেক "ফাবেআইয়্যে আলায়ে

রাব্বিকুমা তুকায্যিবান" আয়াত পর্যন্ত পড়িয়া সূতায় একটি গিরা দিবে। এইরূপ ৩১টি গিরা দেওয়া হইলে সূরাটি শেষ হইবে। তৎপর সূতাটি রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে ; ইন্‌শাআল্লাহ রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।

২। এইরূপভাবে পড়া সূতা স্ত্রীলোকের গলায় বাঁধিয়া দিলে গর্ভ নষ্ট হইবে না ও গর্ভবতী স্ত্রীলোক সহজে সন্তান প্রসব করিবে। (সূরা আর্‌-রাহমানের অন্যান্য ফযীলত পাঞ্জ সূরায় দ্রষ্টব্য)

বসন্ত ও কলেরার প্রাদুর্ভাব না হওয়ার তদবীর

গ্রামে কলেরা বা বসন্ত আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা হইলে অনেক লোক মসজিদে বা কোন খোলা জায়গায় বসিয়া নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে ঃ—

এস্তেগফার— ১০০০ বার, লা হাওলা ৫০০ বার, দরূদে শিফা ৪০০ বার এবং শেষে বালা দূর হওয়ার জন্য মোনাজাত করিবে।

প্লীহা বৃদ্ধি নিবারণের তদবীর

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ

اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ۚ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

অর্থ ঃ— নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও যমীনকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, যেন বিচলিত না হয় (টলিয়া না যায়) এবং যদি উহারা বিচলিত হয় তবে তিনি ব্যতীত অপর কেহই এই দুইটিকে আটকাইয়া রাখিবার নাই, নিশ্চয়ই তিনি ধৈর্যশীল, ক্ষমাকারী: (সূরা ফাতের, ৪১ আয়াত)।

ফযীলত ঃ— ১। এই আয়াতটি লিখিয়া তাবীয বানাইয়া প্লীহার উপর বাঁধিয়া দিলে ইন্‌শাআল্লাহ প্লীহা বৃদ্ধি বন্ধ হইবে। এই আয়াত শরীফে আসমান-যমীন আল্লাহ পাক আটকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতার বর্ণনা রহিয়াছে। এই বর্ণনার ফযীলতে প্লীহা আটকাইয়া থাকে, বৃদ্ধি পাইতে পারে না। (আমালে কোর্আনী)

২। অনবরত ৩ দিন পর্যন্ত সূরা মোমতাহানা লিখিয়া ধুইয়া ঐ পানি পান করিলে প্লীহা রোগ নিরাময় হয়।

কয়েকটি বিশিষ্ট সূরার ফযীলত

সূরা নূহ্ — রাত্রে শুইবার সময় পাঠ করিলে স্বপ্নদোষ হয় না।

সূরা জ্বিন — কাহারও উপর জ্বিনের আছর হইলে সূরা জ্বিন পড়িয়া ঝাড়িলে অথবা তাবীয বাঁধিলে আছর দূর হয়।

সূরা মোয্‌যাম্মিল — এই সূরা পাঠে রুযী-রোযগার বৃদ্ধি পায়। ইহা পাঠের বিশেষ নিয়ম এই যে, দিন-রাতের মধ্যে একটি সময় নির্দিষ্ট করিয়া লইবে, ঐ নির্দিষ্ট সময়ে প্রথমে এগার বার দরূদ শরীফ পড়িয়া এগার শত এগার বার يا مغنى (ইয়া মুগনিইউ) পড়িবে, পরে এগার বার সূরা মোয্‌যাম্মিল পাঠ করতঃ পুনরায় এগার বার দরূদ শরীফ পড়িবে। এই নিয়ম চল্লিশ দিন পালন করিলে নানাদিক দিয়া রুযীর পথ খুলিয়া যায়।

আয়াতুল কুরসীর মাহাত্ম্য

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ হইতে وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ॰

প্রত্যেক নামাযের পরে একবার করিয়া পাঠ করিলে শয়তানের প্ররোচনা ও অপকার হইতে বাঁচা যায়। ইহা রীতিমত পাঠে নির্ধন ধনবান হয় এবং এমন স্থান হইতে জীবিকা আসিয়া থাকে, যাহার ধারণাও মনে আসিতে পারে না। যদি প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকিবার সময় ও শুইবার সময় পাঠ করে তবে চুরি, পানিতে ডুবা, আগুনে পোড়া প্রভৃতি হইতে রক্ষা পায় এবং রোগ থাকিলে তাহা আরাম হয়; সব রকম ভয় দূর হয়। চাড়ার মধ্যে লিখিয়া মালের ভিতর রাখিয়া দিলে চোর ও আগুন হইতে রক্ষা হয় এবং মালে খুব বরকত হয়। বিদেশে বিপদের সময় আয়াতুল কুর্‌সী قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ এবং قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا

হইতে مُتَوَكِّلُوْنَ (১২১ — ১২২ পৃঃ দেখুন) পর্যন্ত পাঠ করতঃ নিজের চারিদিকে একটি কুণ্ডলী রেখা টানিয়া নিশ্চিন্তে শুইয়া থাকিবে, খোদার কৃপায় কোন জীব-জন্তু বা ভূত-প্রেত রেখার ভিতরে আসিয়া অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

একটি দোয়ার ফযীলত

যে ব্যক্তি কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত লোককে দেখিয়া কিংবা বিপদগ্রস্ত লোককে দেখিয়া এই দোয়া পড়িবে, আল্লাহ তায়ালা কখনও তাহাকে এই সকল রোগ ও বিপদে ফেলিবেন না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا ॰

উচ্চারণ ঃ— আলহাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আফানী মিম্‌মাবতালাকা বিহী ওয়া ফাদ্দালানী আলা কাসীরিম্ মিম্মান খালাক্বা তাফযীলা। (রুক্‌নে দীন)

অর্থ ঃ— সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি তুমি (রোগী) যে রোগে আক্রান্ত উহা হইতে আমাকে শান্তিতে রাখিয়াছেন এবং তাঁহার সৃষ্টির অধিকাংশ বস্তুর উপর আমাকে অশেষ সম্মানিত করিয়াছেন।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই দোয়া আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসাযোগে আরম্ভ হইয়াছে ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া শেষ হইয়াছে।

হযরত আলীর (কার্রাঃ) গবেষণামূলক সর্বরোগের একটি ঔষধ

فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ॰

উচ্চারণ ঃ— ফাকুলুহু হানীয়াম্ মারীয়া।

অর্থ ঃ— এই আয়াতটি কোরআনের ৪ পারায় সূরা নেসার ৪র্থ আয়াতের শেষ অংশে। ৪র্থ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, "তোমরা স্ত্রীলোকের প্রাপ্য মোহরানা আদায় কর; কিন্তু যদি তাহারা সন্তুষ্ট চিত্তে মোহরানা কিছু ফেরৎ দেয় তবে তাহা বিবেচনামত তৃপ্তির সহিত উপভোগ কর।" হযরত আলী (কার্রাঃ) গবেষণা দ্বারা এই আয়াতের ভাবার্থ হইতে একটি মহৌষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা এই—যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর পাওনা মোহরানার কিছু টাকা স্ত্রীকে নগদ দেয় ও তাহার স্ত্রী ঐ টাকা হইতে কিছু টাকা স্বামীকে ফেরত দেয় এবং স্বামী ঐ টাকা দ্বারা মধু ক্রয় করিয়া বৃষ্টির পানির সহিত মিশাইয়া যে কোন রোগীকে খাওয়াইয়া দেয়, তবে ইন্‌শাআল্লাহ রোগ আরোগ্য হইবে।

গবেষণার বর্ণনা ঃ— এই আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের ঐরূপ মোহরানার ফেরত দেওয়া টাকা তৃপ্তিকর। রোগীর পক্ষে

তৃপ্তিকর ঐ জিনিস যাহার দ্বারা তাহার রোগ আরোগ্য হয়, রোগীর পক্ষে ইহা তৃপ্তিকর হইতে হইলে ইহা দ্বারা তাহার রোগ আরোগ্য হইতে হয়। আল্লাহ তায়ালার এই কালামের মর্মানুসারে মোহরানার ফেরত দেওয়া টাকায় ক্রয় করা মধুর এই গুণ লাভ হইয়াছে। মধু যে একটি মহৌষধ তাহা এই গ্রন্থের আয়াতে শিফায়ও বর্ণিত হইয়াছে। পাক কোর্‌আনের এক নাম শিফা অর্থাৎ আরোগ্যকারী বিজ্ঞান। কোর্‌আন যে সর্ববিষয়ে মহাবিজ্ঞান এই আয়াত তাহার উত্তম প্রমাণ।

বৃষ্টির পানির গুণ ঃ— অনেক রোগের ঔষধই বৃষ্টির পানির সহিত মিশাইয়া সেবন করার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা সূরা কাফ-এর ৯ম আয়াতের প্রথম ভাগে বলিয়াছেন যেঃ—

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبٰرَكًا *

অর্থ ঃ— আমি আকাশ হইতে কল্যাণকর পানি বর্ষণ করি।

এই আয়াত হইতে জানা যায় যে, বৃষ্টির পানি মানুষের জন্য কল্যাণকর।

হযরত আলী (কার্রাঃ) ঃ হযরত আলী (কার্রাঃ) এল্‌মে মা রেফাতের প্রধান পীর। সে সময়ে কাবাগৃহে স্থাপিত মূর্তিপূজারী পুরোহিতের কার্য করার জন্য কোরায়েশ বংশীয় সর্দারগণ শৈশবেই হযরত আলী (কার্রাঃ) কে লেখাপড়ায় নিযুক্ত করেন। অসাধারণ প্রতিভা ও স্মরণশক্তি বলে অচিরেই তিনি আরবী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন ও আরবের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তি বলিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ইসলাম প্রচারের কার্যে নিয়োজিত হয়। জেহাদের সময় তাঁহার রচিত উত্তেজনাপূর্ণ কবিতাগুলি বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে। তাঁহার রচিত "দেওয়ানে আলী" নামক কাব্যগ্রন্থ আজও জগতে অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া সমাদর লাভ করিতেছে। এই মহাগ্রন্থে যে সকল উপদেশবাণী রহিয়াছে ইহার তুলনা নাই।

খোলাফায়ে রাশেদীন ঃ— (১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। (২) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)। (৩) হযরত ওসমান গনী (রাঃ) ও (৪) হযরত আলী (কার্রাঃ)-ইসলামের প্রথম যুগের এই ৪ জন খলীফাই খোলাফায়ে রাশেদীন নামে পরিচিত। হযরত ওমরের (রাঃ) অসাধারণ মনের বল,

স্পষ্টবাদিতা; হযরত আবু বকরের (রাঃ) অটল বিশ্বাস ও চিন্তাশীলতা; হযরত ওসমান গনীর (রাঃ) দানশীলতা, লজ্জাশীলতা ও নম্র স্বভাব এবং হযরত আলীর (কার্রাঃ) অসাধারণ বীরত্ব, এল্‌মে মা'রেফাতের অসাধারণ জ্ঞান ও ক্ষমাশীলতা ইসলামের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। কথিত আছে, হযরত ওসমান গনী (রাঃ) এত বেশী লাজুক ছিলেন যে, বালেগ হওয়ার পর তিনি কখনও নিজের লজ্জাস্থান দেখেন নাই। এই ৪ জন খলীফা পৃথিবীতে থাকিয়াই বেহেশ্‌তে দাখিল হওয়ার সুসংবাদ পাইয়াছিলেন।

মাথা ব্যথার তদবীর

মাথা ধরিলে এই আয়াত ৩ বার পড়িয়া মাথায় ফুঁক দিলে মাথা ধরা দূর হয়।

لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ— লা ইউসাদ্দাউনা আন্‌হা ওয়ালা ইউনযিফুন।

(সূরা ওয়াকেয়া, ১৯ আয়াত)

অর্থ ঃ— যাহাতে মাথা ধরা ও মাতলামি হইবে না।

শানে নুযূল ঃ— বেহেশ্‌তের মধ্যে লোকেরা যে পানীয় পান করিবে, এই আয়াতে তাহার গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে। বেহেশ্‌তে কিশোর বালকগণ সুরা পূর্ণ পানপাত্র লইয়া বেহেশ্‌তীগণের নিকট ঘুরিয়া বেড়াইবে। ঐ পানি পান করার দরুন তাহাদের শিরঃপীড়া কিংবা মাথা ব্যথা হইবে না। শিরঃপীড়া হইবে না বলিয়া এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালার একটি আদেশ আছে, সেইজন্য ইহার বরকতে মাথা ব্যথা দূর হয়।

আধ কপালে মাথা ব্যথার তদবীর

পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যে এই রোগের বেশী প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই আয়াত পড়িয়া ফুঁক দিলে সঙ্গে সঙ্গে উপশম হয় ; (ইহা বহু পরক্ষিত)।

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ

مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا *

উচ্চারণ ঃ— কুল্‌ মার রাব্‌বুস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, কুলিল্লাহু কুল আফাত্তাখায্‌তুম মিন্‌ দূনিহি আউলিয়া-আ লা ইয়ামলিকুনা লিআন্‌ফুসিহিম নাফআওঁ ওয়ালা দার্‌রা। (১৩ পারা, সূরা রা'দ, ১৬ আয়াত)

অর্থ ঃ— বল, আসমান ও যমীনের প্রতিপালক কে ? তুমি বল, আল্লাহ। বল—তবুও কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য অভিভাবক গ্রহণ করিতেছ ? যাহারা নিজেদের জন্যই কোন উপকার বা ক্ষতি-বৃদ্ধি করিতে পারে না।

শানে নুযূল ঃ- আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে আদেশ করিতেছেন যে, কাফেরগণকে জিজ্ঞাসা কর, বিশ্বজগতের প্রভু কে ? এই আয়াতে প্রশ্নবোধক ভাষায় তৌহীদের বর্ণনা থাকায় ইহার শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেইজন্য ইহার বরকতে উপরোক্ত ফযীলত লাভ হয়।

দ্বিতীয় তদবীর

এই আয়াত কাগজে লিখিয়া মস্তকে বাঁধিয়া দিলে মাথা ব্যথা সারিয়া যায়।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۝

উচ্চারণ ঃ— ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস্ সালিহাতি। (৩০ পারা, সূরা বাইয়্যিনাত, ৭ আয়াত)

অর্থঃ— নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করে, (তাহারাই শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি)।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই আয়াতে বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল লোকগণের গৌরব বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনার বরকতে উপরোক্ত ফযীলত লাভ হয়।

পেট বেদনার তদবীর

যে কোন কারণে পেট বেদনা হউক না কেন, এই আয়াত মাটির বাসনে জাফরান ও গোলাপ পানি দ্বারা লিখিয়া পানিতে ধুইয়া খাইলে সঙ্গে সঙ্গে পেটের বেদনা দূর হয়।

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ ۝

অর্থ ঃ— অনন্তর আমি তাহাদের মনের সন্দেহের অশান্তি দূর করিব।

শানে নুযূল ঃ— এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, আমি বেহেশ্‌তীগণের মনের দুশ্চিন্তা অশান্তি দূর করিব। অশান্তি দূর হওয়ার আল্লাহ্‌র একটি আদেশ আছে বলিয়া ইহার বরকতে এই আয়াতের আমল দ্বারা পেটের বেদনার অশান্তি দূর হয়।

দূষিত বেদনার তদবীর

সাধারণতঃ বুকে, পিঠে ও পাঁজরে এই বেদনায় আক্রমণ করিয়া থাকে। এই আয়াতটি কাগজে লিখিয়া বেদনার স্থানে চাপিয়া ধরিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

(৭ম পারা, সূরা আনআ'ম, ৬৭ আয়াত)

অর্থঃ— প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীর একটি সময় নির্ধারিত আছে এবং শীঘ্রই (আমার সত্যতা) তোমরা জানিতে পারিবে।

শানে নুযূল ঃ— কাফেরগণ হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে এই কথা বলিত যে, আমাদের উপর কবে শাস্তি উপস্থিত হইবে, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিন। যে দিন শাস্তি উপস্থিত হইবে আমরা সেই দিন ঈমান আনিব। তাহাদের এই কথার উত্তরে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে বলিয়াছেন যে, নির্দিষ্ট সময় আসিলে নিশ্চয় শাস্তি উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা আমার কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবে। এই আয়াতে কেয়ামতের ও হাশরের দিন আল্লাহ তায়ালা যে কঠোর শাস্তি নাযিল করিবেন তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ বর্ণনার খাসিয়তে বেদনার যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

নির্দিষ্ট সময় ঘুম হইতে উঠিবার তদবীর

নিদ্রা হইতে ইচ্ছাকৃত সময় উঠিতে হইলে এই আয়াত পড়িয়া শয়ন করিলে ইচ্ছাকৃত সময় ঘুম হইতে উঠা যায়।

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ

مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا

بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۝

উচ্চারণ ঃ— ওয়া ইয্ জায়াল্‌নাল বাইতা মাছাবাতাল্ লিন্নাসি ওয়া আমনা ,ওয়াত্তাখিযু মিম্মাকামি ইব্রাহীমা মুছাল্লা, ওয়া আহিদ্‌না ইলা ইব্রাহীমা ওয়া ইস্‌মাঈলা আন্ তাহহিরা বাইতিয়া লিত্তায়িফীনা ওয়াল আ'কিফীনা ওয়ার রুক্কাইস সুজুদ। (সূরা বাক্বারা, ১২৫ আয়াত)

অর্থ ঃ— যখন আমি কা'বাগৃহকে মানবজাতির জন্য উপাসনালয় ও নিরাপদ স্থানরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম এবং মাকামে ইব্রাহীমকে এবাদতের স্থান নির্দিষ্ট করিতেছিলাম যে— তোমরা আমার ঘরকে (কা'বা শরীফ) তাওয়াফকারী, এ'তেকাফকারী ও সেজদাকারী এবং রুকুকারীগণের জন্য পবিত্র রাখিও।

শানি নুযূল ঃ— জগদ্বিখ্যাত নবী ও সত্যধর্ম প্রচারক হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানগণের আদি-পুরুষ। তিনিই পবিত্র কা'বাগৃহ নির্মাণ করেন, এই পবিত্র স্থানকেই মাকামে ইব্রাহীম বলা হয়। এই পবিত্র পাথরখানা এখনও কা'বাগৃহে বর্তমান আছে। ইহা প্রতিবৎসর হাজীগণের হৃদয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পবিত্র স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। কা'বাগৃহের নির্মাণকালে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার ভুবনবিখ্যাত পিতৃভক্ত পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে আল্লাহ তায়ালা আশ্বাস দিয়া কা'বাগৃহ পবিত্র রাখার জন্য নির্দেশ দেন। এই আয়াত পাঠে আল্লাহ, কা'বাগৃহ ও তাঁহার প্রতি রুকু ও সেজদায় জাগ্রত অবস্থার স্মরণ করিয়া শয়ন করা হয়। সেইজন্য ইহার বরকতে ইচ্ছাকৃত সময় নিদ্রা হইতে উঠিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় তদবীর

এইরূপ সূরা কাহ্ফের শেষ ৪টি আয়াত পড়িয়া শুইলেও ইচ্ছাকৃত সময়ে ঘুম হইতে উঠা যায়।

মানুষ ও জন্তুর অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার তদবীর

কোন মানুষ বা জন্তু দ্বারা অনিষ্ট হইবার ভয় থাকিলে এই আয়াত পড়িয়া তাহাদের দিকে ফুঁক দিলে অনিষ্টের ভয় দূর হয়।

اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ٭

উচ্চারণ ঃ— আল্লাহু রাব্বুনা ওয়া রাব্বুকুম, লানা আ'মালুনা ওয়ালাকুম্ আ'মালুকুম, লা হুজ্জাতা বাইনানা ওয়া বাইনাকুম আল্লাহু ইয়াজ্‌মাউ বাইনানা ওয়া ইলাইহিল্ মাসীর। (২৫তম পারা, সূরা শূরা, ১৫ আয়াত)

অর্থ ঃ— আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের প্রতিপালক, তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে কোনই ঝগড়া নাই। আল্লাহ্ই আমাদিগকে (কেয়ামতের দিন) একত্র করিবেন এবং তাঁহারই দিকে আমরা ফিরিয়া যাইব।

শানে নুযূল ঃ— অবিশ্বাসীরা হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলিত যে, যদি সমস্ত রসূলগণের প্রতি একই ধর্ম প্রচারের আদেশ হইয়া থাকে তবে রসূলগণের উম্মতগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছেন কেন ? এই উক্তির উত্তরস্বরূপ এই আয়াত নাযিল হয় এবং বলিয়া দেওয়া হয় যে, সত্য প্রচার করাই রসূলগণের প্রধান কর্ম। আল্লাহ্ই সকলের একমাত্র উপাস্য —এই বিষয়ের তর্ক ব্যতীত আর কোন ঝগড়ার বিষয় নাই। প্রত্যেকের কর্মফলের জন্য প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে দায়ী হইতে হইবে, আল্লাহ্র নিকট হইতে কেহ এড়াইয়া যাইতে পারিবে না, পরিণামে একদিন সকলকেই তাঁহার দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, ঝগড়া করিয়া কোন ফল হইবে না। এই আয়াতে ঝগড়া নাই ও আল্লাহ তায়ালার সকলকে একত্র করার ক্ষমতা আছে বলিয়া দুইটি বাণী আছে; ইহাদের বরকতে এই আয়াতের আমল দ্বারা উপরোক্ত ফযীলত লাভ হয়।

ইয্যত ও সম্মান বৃদ্ধির আমল

জাফরান ও মধু একত্রে মিশাইয়া হলুদ রঙের রেশমী কাপড়ের উপর আয়াত লিখিয়া তাবীযের মত করিবে; তৎপর মোম ও কুন্দ্রকুট (বেনের দোকানে পাওয়া যায়) একত্রে মিশাইয়া তাহাতে আগুন ধরাইবে, ইহাতে যে ধুঁয়া হইবে সেই ধুঁয়া তাবীযে লাগাইবে। এই তাবীয সঙ্গে লইয়া যেখানে যাইবে আল্লাহ্র ফজলে ইয্যত ও সম্মান লাভ করিবে।

١- وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ - اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ٭

٢- وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٭

(১৬ পারা, সূরা মরিয়ম, ৫৬—৫৭ আয়াত)

অর্থ ঃ— ১। এবং কিতাবের অন্তর্গত ইদ্রীসের বর্ণনা কর, নিশ্চয় তিনি সত্যপরায়ণ নবী ছিলেন। ২। এবং আমি তাঁহাকে উন্নত স্থানে (বেহেশতে) উঠাইয়াছিলাম।

শানে নুযূল ঃ— হযরত ইদ্রীস (আঃ) হযরত আদম (আঃ) এর এন্তেকালের একশত বৎসর পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হযরত নূহ নবী (আঃ) এর পরদাদা ছিলেন। তাঁহার উপর ৩০ খানা সহিফা নাযিল হয়। তাঁহার আসল নাম 'আখনুখ'। অতি বিদ্বান ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে ইদ্রীস বলিয়া ডাকিত। তাঁহার সময় হইতেই সর্বপ্রথম অক্ষর দ্বারা লেখার প্রচলন হয়। তিনি দর্জির কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন ও ১২ মাস রোযা রাখিতেন। মুসাফিরকে না খাওয়াইয়া তিনি কখনও নিজে আহার করিতেন না। একদিন হযরত আযরাইল (আঃ) মানবরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার অতিথিরূপে উপস্থিত হন। তিনি হযরত ইদ্রীস (আঃ) এর আদরযত্নে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তিন দিন পর হযরত আযরাইল (আঃ) নিজের পরিচয় দিলে তখন হযরত ইদ্রীস (আঃ) তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে, আপনি ত সমস্ত প্রাণীর রূহ্ কবয করিয়া থাকেন, আপনি আমার রূহ্ কবয করুন, আমি মৃত্যু যন্ত্রণা দেখিতে চাই। আল্লাহ তায়ালার হুকুমে হযরত আযরাইল (আঃ) তাঁহার রূহ্ কবয করিলেন ও তিনি পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিলেন। তৎপর হযরত ইদ্রীস (আঃ) তাঁহাকে বেহেশ্‌ত দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বসিলেন। তাঁহার অনুরোধে হযরত আযরাইল (আঃ) তাঁহাকে বেহেশতে লইয়া গেলেন, এইরূপে হযরত ইদ্রীস (আঃ) সশরীরে বেহেশ্‌তে চলিয়া গেলেন। তিনি ব্যতীত কোন মানুষ সশরীরে বেহেশ্‌তে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। আমাদের হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) শবে মে'রাজের সময় বেহেশতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি চলিয়া আসিয়াছিলেন। মানুষের পক্ষে সশরীরে বেহেশ্‌তে যাওয়া হইতে উচ্চ সম্মান লাভ আর কি হইতে পারে ? আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিলে উচ্চ সম্মানও দিতে পারেন, এই আয়াতে তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার ঐরূপ শক্তি ও রহমতের বর্ণনা আছে বলিয়া ইহার আমল দ্বারা সম্মান লাভ হয়।

দ্বিতীয় তদবীর

পাক কোর্‌আনে সূরা ইউসুফ (১২ পারা) লিখিয়া ধুইয়া পানি পান করিলে লোকের নিকট সম্মান লাভ ও রিযিক বৃদ্ধি হয়।

তৃতীয় তদবীর

যে ব্যক্তি ৪০ দিন পর্যন্ত কামাই না করিয়া প্রত্যহ يَا عَزِيزُ (ইয়া আযীয্) (হে পরাক্রমশালী আল্লাহ) এই নাম ৪১ বার পড়িবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দিবেন ও সে লোকের অধীন কিম্বা মুখাপেক্ষী হইবে না।

চতুর্থ তদবীর

(বিসমিল্লাহ্‌র তফসীর দেখুন)।

একটি মহামূল্যবান তদবীর

অতি শীঘ্র মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য আলেম ও দরবেশগণ এই দোয়া এক হাজার বার পড়িতেন ; পুনরায় একশত বার দরূদ পড়িতেন।

اٰمَنْتُ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَىِّ الْقَيُّوْمِ *

উচ্চারণ ঃ— আমান্‌তু বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীমে ওয়া তাওয়াক্কালতু আলাল হাইয়্যিল ক্বাইয়্যুম।

অর্থ ঃ— আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ও গৌরবান্বিত আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলাম ও চিরজীবী চিরস্থায়ী আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিলাম।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই দোয়া দ্বারা আল্লাহ্‌র বিশেষ সিফাত বর্ণনা করিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করা হয়, সেইজন্য তাঁহার রহমত নাযিল হয়।

শরীর বন্ধ করার অদ্বিতীয় তদবীর

কোন বিপজ্জনক স্থানে মানুষ, জ্বিন কিংবা ভূতের ভয় হইলে আয়াতুল কুরসী (খালিদুন পর্যন্ত), সূরা ইখলাস্, সূরা ফালাক ও সূরা নাস এক এক বার করিয়া ও নিম্নোক্ত আয়াত একবার পড়িয়া নিজের চতুর্দিকে লাঠি দ্বারা একটি বৃত্ত টানিবে; ইন্‌শাআল্লাহ এই বৃত্তের ভিতরে কেহ কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

আয়াতটি এই

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ـ هُوَ مَوْلٰنَا وَعَلَى اللهِ

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ— কুল লাঁই ইউসিবানা ইল্লা মা কাতাবাল্লাহু লানা হুয়া মাওলানা ওয়া আ'লাল্লাহি ফালইয়াতাওয়াক্কালিল মু'মিনুন। (১০ম পারা, সূরা তওবা ৫১ আয়াত)।

অর্থঃ— বলিয়া দাও যে, যাহা কিছু আল্লাহ আমাদের অদৃষ্টে লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ব্যতীত কোন বিপদ আমাদের নিকট আসিতে পারিবে না। তিনি আমাদের প্রভু এবং বিশ্বাসীগণের পক্ষে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা উচিত।

শানে নুযুল ঃ— হযরত রসূল (সাঃ) এর উপর কোন যুদ্ধবিগ্রহ ও বিপদ উপস্থিত হইলে কপট বিশ্বাসীরা বলিত যে, আমরা ত পূর্বেই বলিয়াছিলাম। আমরা আমাদের বিশ্বাসমত কাজ করিয়া ভালই করিয়াছি। তাহাদের এই কথার উত্তরে এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বলিয়া দিয়াছেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন বিপদ আসিতে পারে না। অতএব মানুষের পক্ষে তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করা উচিত। এই আয়াতের আমল দ্বারা আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভর করা হয় বলিয়া তিনি বিপদ দূর করিয়া দেন।

বাড়ী বন্ধ করার তদবীর

বাড়ী হইতে সকল প্রকার জ্বিন ও ভূতের আছর দূর করার জন্য এই তদবীরটি অতি পরীক্ষিত। লোহার ৪টি বড় পেরেকের প্রত্যেকটির উপর সূরা মুয্‌যাম্মিল ৩ বার ও চেহেল কাফ ৩ বার পড়িয়া দম করিবে, তৎপর একজন বাড়ীর এক কোণায় দাঁড়াইয়া আযান দিবে, একজন একটি পেরেক সেই কোণায় যাইয়া পুঁতিবে ও খুব জোরে এই দোয়া পাক বলিতে বলিতে দ্বিতীয় কোণায় যাইয়া প্রথম কোণার তদবীরের ন্যায় এই দোয়া পড়িবে। তেমনিভাবে তৃতীয় ও শেষ কোণায় যাইয়া উত্তমরূপে পেরেক পুঁতিবে, ইহাতে সকল প্রকার আছর ও বালা দূর হইবে।

ইস্‌মে পাক

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ *

উচ্চারণ ঃ— সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ— আল্লাহ্‌ই পবিত্র, আল্লাহ্‌র জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় উপাস্য নাই। আর তিনি মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

চেহেল কাফ

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيْكَ وَاكِفَةً كِفْكَافُهَا كَكَمِيْنٍ كَانَ مِنْ كُلُكٍ تَكِرُّ كَرًّا كَكَرِّ الْكَرِّ فِيْ كَبَدٍ تَحْكِيْ مُشَكْشَكَةً كَلُكَلُكٍ لَكَكٍ * كَفَاكَ مَابِيْ كَفَاكَ الْكَافُ كُرْبَتَهُ يَا كَوْكَبًا كَانَ يَحْكِيْ كَوْكَبَ الْفَلَكِ *

উচ্চারণ ঃ— কাফাকা রাব্বুকা কাম ইয়াক্‌ফীকা ওয়াকিফাতান কিফ্‌কাফুহা কাকামিনেন কানা মিন কুলুকিন তাকিররু কাররান কাকার্‌রিল কাররি ফী কাবাদিন তাহ্‌কী মুশাক্‌শাকাতান কালুক্‌লুকিন। কাফাকা মা বি কাফাকাল্‌ কাফ্‌ফু কুর্‌বাতাহু, ইয়া কাওকাবান কানা ইয়াহকী কাওকাবাল ফলকি।

অন্যান্য ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই ইস্‌মের মধ্যে চল্লিশটি কাফ আছে। কাফ্‌ অক্ষরের শক্তি ও ফযীলত আয়াতে হেজবের তফসীরে বর্ণিত হইয়াছে। (১৮১ পৃঃ)।

খাসিয়ত ঃ— ১। ইহা তিনবার সরিষার তৈলের উপর পড়িয়া ফুঁক দিয়া জ্বিন-ভূতে পাওয়া রোগীর গায়ে মালিশ করিয়া দিলে জ্বিন ও ভূতের আছর দূর হয় অথবা ১১ বার আয়াতে কোতব ও ৭ বার এই ইস্‌ম পড়িয়া সরিষার তৈলে ফুঁক দিয়া জ্বিন ও ভূতে ধরা রোগীর গায়ে মালিশ করিলে রোগী নিশ্চয় আরোগ্য হইবে ও আছর দূর হইবে। ২। এই ইস্‌ম পানির উপর পড়িয়া ফুঁক দিয়া গর্ভবতী স্ত্রীলোককে খাওয়াইলে সহজে সন্তান প্রসব হয়।

ঘর হইতে জ্বিন-ভূত তাড়াইবার উপায়

ঘরে জ্বিন বা ভূতের উপদ্রব হইলে ৪টি লোহার পেরেক লইয়া প্রত্যেকটি পেরেকের উপর ২৫ বার সূরা ইখলাস ও ২৫ বার এই আয়াত ৩টি পড়িবে ও ৪টি পেরেক ঘরের ৪ কোণায় পুঁতিয়া রাখিবে, পেরেক পুঁতিবার সময় একজন আযান দিবে, জ্বিন ও ভূত দূর হইয়া যাইবে।

١ - اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا * ٢ - وَّاَكِيْدُ كَيْدًا * ٣ - فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا *

উচ্চারণ ঃ— ১। ইন্নাহুম ইয়াকীদুনা কাইদাওঁ। ২। ওয়া আকীদু কাইদা, ৩। ফামাহ্হিলিল কাফিরী-না আম্হিল্হুম রুওয়াইদা। (সূরা তারেক, শেষ তিন আয়াত, ৩০ পারা)।

অর্থ ঃ— ১। নিশ্চয় তাহারা (কাফেরগণ) ষড়যন্ত্র করিতেছে। ২। আমিও এক ষড়যন্ত্র করিতেছি। ৩। অতএব কাফেরগণকে সময় প্রদান কর—তাহাদিগকে অল্প অবকাশ প্রদান কর।

শানে নুযূলঃ— এক রাত্রে হযরত রসূল (সাঃ) তাঁহার চাচা আবু তালেবের নিকট বসিয়াছিলেন, এমন সময় উল্কাপাত হইতে আরম্ভ করিল। আবু তালেব তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সূরা তারেক নাযিল হয় (তঃ কাদেরী)। মক্কার কাফেরগণ বলিত যে, কেয়ামত মিথ্যা, অতএব অত্যাচার ও অবিচার চালাও। এই মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহারা কুকার্য করিতে থাকে, তাই এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, তাহাদিগকে অল্প সময়ের জন্য কুকার্য করিতে দাও, তাহাদের ষড়যন্ত্র অল্প সময়ের জন্য থাকিবে, কিন্তু যখন আমার চক্র আসিবে তখন তাহাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবে। মানুষ কিম্বা যে কোন প্রাণী যত কঠিন ষড়যন্ত্র করুক না কেন, আল্লাহ্র চক্রের নিকট কিছুই টিকিতে পারে না। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালার ঐ শক্তির বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া ইহার নিকট ভূত ও জ্বিনের দুষ্টামি টিকিতে পারে না।

জ্বিন ও ভূতে ধরা রোগীর তদবীর

পাক পানিতে আলহামদু, আয়াতুল কুরসী ও সূরা জ্বিনের প্রথম ৫টি আয়াত পড়িয়া জ্বিন বা ভূতে ধরা রোগীর মুখে ছিটাইয়া দিলে আছর দূর হয় ও ঐ পানি ঘরে ছিটাইয়া দিলে ঘর হইতে জ্বিন ও ভূত পলায়ন করে।

ইমাম গায্যালী (রঃ) এর বর্ণনা

ইমাম গায্যালী (রহঃ) কোন এক বুযুর্গ ব্যক্তির আমলের বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, এক দাসী রাত্রিতে প্রস্রাব করিতে বাহির হইলে জ্বিনের আছর হয় ও অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়, ঐ বুযুর্গ ব্যক্তি ইহা জানিতে পারিয়া এই কলেমাগুলি পড়িয়া ফুঁক দিতেই দাসীটি ভাল হইয়া উঠে। কলেমাগুলি এইঃ—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - الٓمّٓصٓ - طٰهٰ - طٰسٓمّٓ - كٓهٰيٰعٓصٓ -

يٰسٓ * وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ * حٰمٓ - عٓسٓقٓ - قٓ - نٓ - وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ— বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আলিফ ; লাম ; মীম ; সোয়াদ ; তাহা ; তোয়া ; সীন ; মীম ; কাফ ; হা; ইয়া ; আইন; সোয়াদ ; ইয়াসিন্ ওয়াল কোর্আনিল হাকীম ; হা মিম ; আঈন ; সীন ; কাফ ; কাফ নূন ওয়াল কালামে ওয়ামা ইয়াসতুরূন।

অর্থ ঃ— এই সকল যুক্ত অক্ষরগুলির অর্থ ও ফযীলত পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

বৃষ্টি আনয়ন করার তদবীর

অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে একটি মাটির নতুন সরা ভাঙ্গিয়া উহার এক টুকরার উপর এক আয়াত লিখিয়া একটি পরিষ্কার কাপড় দ্বারা মোড়ক করিবে ও ইহা লইয়া শস্যক্ষেত্রে যাইয়া উপরের দিকে ছুঁড়িবে। সরাটি মাটিতে পড়া মাত্র আকাশে মেঘের সূচনা দেখিতে পাইবে।

وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ○

(২৭ পারা, সূরা ক্বামার, ১২ আয়াত)

অর্থ ঃ— এবং পৃথিবীতে (আকাশ পানি দ্বারা) ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত করিয়াছিলাম, তদদ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি জমা হইয়াছিল।

শনে নুযূল ঃ— এই আয়াতে হযরত নূহ্ নবীর (আঃ) সময় যে মহাপ্লাবন হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালার হুকুমে ঐ সময় আকাশ হইতে পানি বর্ষিত হইয়া প্রবল বন্যায় পৃথিবী ভাসিয়া গিয়াছিল। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালার কুদরতে বন্যা সৃষ্টির বর্ণনা থাকায় ইহার আমল দ্বারা বৃষ্টি লাভ হয়।

বৃষ্টির জন্য হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দোয়া

ময়দানে বিরাট জামায়াতে উপস্থিত হইয়া বেশী পরিমাণে ইস্তেগফার পড়িবে ও বৃষ্টির জন্য ২ রাকাত নামায পড়িবে এবং আল্লাহ্র নিকট দুই হাত উঠাইয়া এই দোয়া পড়িবে। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বৃষ্টির জন্য এই দোয়া পড়িতেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ - اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَّبَلَاغًا اِلٰى خَيْرٍ ○

অর্থ ঃ— সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি দয়াময় ও কৃপাশীল এবং বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন। হে আল্লাহ! তুমিই একমাত্র উপাস্য, তুমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তুমি সম্পদশালী ও আমরা দীন-হীন, আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর এবং আমাদের জন্য যাহা অবতীর্ণ কর তাহা আমাদের জন্য শক্তিময় ও মঙ্গলজনক কর।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই দোয়া দ্বারা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করা হয় ও নিজকে অতি দীন-হীন ও আল্লাহকে সম্পদশালী জ্ঞান করা হয়। পাক কোর্আনের সূরা নূহের ১১—১২ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ; নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ; আকাশ হইতে তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করিবেন এবং তোমাদিগকে অর্থরাশি ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগান ও নদীসকল সৃষ্টি করিবেন। হযরত বয়যাবী (রহঃ) ও হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) এই আয়াতের মর্মানুসারে বৃষ্টির জন্য ইস্তেগফার পড়াই স্থির করিয়াছেন ; (ইস্তেগফারের অন্যান্য ফযীলত পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে)।

বৃষ্টি বন্ধ করার তদবীর

অধিক বৃষ্টির জন্য শস্য নষ্ট হইতে থাকিলে পাথরের ৭ খানা ছোট টুকরা হাতে লইয়া সূরা ফাতেহা সাত বার ও এই আয়াত সাতবার পড়িয়া পাথরগুলি এমন স্থানে রাখিয়া দিবে, যেখানে বৃষ্টির পানি পড়িতে না পারে, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি থামিয়া যাইবে। পুনরায় বৃষ্টির আবশ্যক হইলে পাথরগুলি স্রোতস্বিনী পানিতে ফেলিয়া দিবে।

وَقِيلَ يَٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ

وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ *

উচ্চারণ ঃ— ওয়া ক্বীলা ইয়া আরদুবলায়ী মাআকি ওয়া ইয়াসামাউ আক্বলিয়ী ওয়া গীদাল মাউ ওয়া কুদিআল আমরু ওয়াস্‌তাওয়াত আলাল্ জুদিয়্যি ওয়া ক্বীলা বু'দাল্লিল কাওমিজ্ জালিমীন। (১২ পারা, সূরা হুদ, ৪৪ আয়াত)।

অর্থ ঃ— এবং বলা হইয়াছে— হে পৃথিবী! তুমি তোমার জলরাশি থামাইয়া লও এবং হে আকাশ! তুমি বৃষ্টিপাত হইতে নিবৃত্ত হও এবং পানি শুকাইয়া গেল ও কার্যের মীমাংসা হইল এবং জুদী পর্বতে ইহা (নূহ্ নবীর জাহাজ) স্থির হইল এবং অত্যাচারী সম্প্রদায়কে দূর হওয়ার জন্য বলা হইল।

শানে নুযূল ঃ— হযরত নূহ্ (আঃ) প্রাচীন কালের অন্যতম প্রসিদ্ধ নবী ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার ভয়ে সর্বদা কাঁদিতেন বলিয়া নূহ্-ক্রন্দনকারী নামে পরিচিত হন ও আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন। তাঁহার সময় হইতেই শরীয়তের আদেশ নাযিল হয় এবং হালাল-হারামের পার্থক্য করা হয়। সে কালের লোকেরা তাঁহার অবাধ্য হইয়া উঠিলে অগত্যা তিনি তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা কবুল হয় ও বিশ্ববিশ্রুত সেই মহা তুফান আরম্ভ হয়। হযরত নূহ্ নবীর (আঃ) ৪০ জন অনুগামী ব্যতীত সকলে সেই তুফানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ; এইজন্যই হযরত নূহ (আঃ)কে দ্বিতীয় 'আদম' বলা হয়। এই আয়াতে হযরত নূহ নবীর (আঃ) ঐ তুফানের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তুফান ও বন্যা ৪০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ৪০ দিন পর উপরোক্ত হুকুম দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তুফান ও বন্যা থামাইয়া দেন। বন্যা থামিয়া যাওয়ার পর নূহ্ নবীর (আঃ) জাহাজ জুদী পর্বতের নিকট স্থির হইয়াছিল। জুদী আরমেনিয়ার অন্তর্গত একটি পাহাড় ; ঐ স্থানের অধিবাসীগণের বিশ্বাস—জুদী পর্বতে নূহ্ নবীর (আঃ) জাহাজের তক্তা এখনও বর্তমান আছে। যে কয়খানা তক্তা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা বহু দুরারোগ্য ব্যাধি অলৌকিকভাবে আরোগ্য হইয়াছে। এই আয়াতে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যাওয়ার আল্লাহ তায়ালার একটি আদেশ রহিয়াছে ; এইজন্য ইহার আমল দ্বারা বৃষ্টি বন্ধ হয়।

মেঘ আসিতে থাকিলে তাহা দূর করার তদবীর

মেঘ আসিতে থাকিলে এই আয়াতটি পড়িতে থাকিলে মেঘ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া যাইবে ; (অযথা এই আমল দ্বারা আল্লাহ্‌র কার্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়)।

وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا

উচ্চারণ ঃ— ওয়া ইয়াজআলুহু কিসাফান। (সূরা রুম, ৪৮ আয়াতের অংশ)।

অর্থ ঃ— এবং আল্লাহ উহা (মেঘ) ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন।

ফযীলতের বর্ণনাঃ— এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা মেঘগুলি ছিন্ন-বিছিন্ন করিয়া দেন এবং ইহা হইতে বৃষ্টি পতিত হয়। আল্লাহ্র আদেশে মেঘ ছিন্নভিন্ন হওয়ার বর্ণনা করা হয় বলিয়া ইহার আমল দ্বারা এইরূপ ফল লাভ হয়।

উত্তম বস্তু ক্রয় করিতে পারার তদবীর

কোন বস্তু, কাপড় , ঘড়ি, জন্তু অথবা দ্রব্য ক্রয় করার সময় এই আয়াত পড়িতে থাকিলে ইনশাআল্লাহ উত্তম জিনিস খরিদ করিতে পারা যায়।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ لا إِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا
وَإِنَّا إِن شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُونَ ۝

উচ্চারণ ঃ— ক্বালুদউ লানা রাব্বাকা ইউবাইল লানা মা হিয়া, ইন্নাল বাক্বারা তাশাবাহা আ'লাইনা ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু লামুহতাদুন। (সূরা বাক্বারা, ৭০ আয়াত)।

অর্থঃ— তাহারা বলিয়াছিল—ইহার আকৃতি কিরূপ তাহা বর্ণনা করার জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আমাদের নিকট সকল গরুই সমান এবং আল্লাহ ইচ্ছা করিলে আমরা সুপথগামী হইব।

শানে নুযূলঃ— হযরত মূসা নবীর (আঃ) সময় জনৈক ইহুদী লালসার বশবর্তী হইয়া তাহার চাচাকে হত্যা করিয়া অপর এক ব্যক্তির উপর হত্যার মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করে। হযরত মূসার (আঃ) নিকট অভিযোগের বিচার উপস্থিত হইলে (আল্লাহ্র হুকুমে) তিনি আদেশ করেন যে, তোমরা একটি গরু কোরবানী করিয়া ইহার মাংস নিহত ব্যক্তির কবরের উপর নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি জীবিত হইয়া প্রকৃত হত্যাকারীর নাম বলিয়া দিবে। ইহুদীগণ হযরত মূসার (আঃ) এই আদেশ পাইয়া বলিয়াছিল যে, আপনি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করুন কিরূপ আকৃতির গরু যবেহ করিতে হইবে ? কারণ আমাদের নিকট সকল গরুই সমান। তাহাদের অনুরোধে তিনি গরুর আকৃতি বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রর্থিনার উত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলিয়া দেন যে,—সুস্থকায়, সবল ও সুন্দর গরু যবেহ করিতে হইবে। অনন্তর ইহুদীগণ ঐরূপ একটি গরু যবেহ করিয়া উহার মাংস মৃত ব্যক্তির কবরে নিক্ষেপ করিল, মৃত ব্যক্তি জীবিত হইয়া প্রকৃত হত্যাকারীর

নাম বলিয়া দিয়া পুনরায় মরিয়া গেল। এই ঘটনা হযরত মূসার(আঃ) অন্যতম মা'জেযা। এই ঘটনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, অত্যন্ত ছোট বিষয়েও আল্লাহ তায়ালা উত্তম নির্বাচন করিয়া থাকেন। গরু একটি সামান্য জন্তু হইলেও উহার নির্বাচনেও তিনি উত্তম গরু যবেহ করার নির্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল বিষয়ের নির্বাচনেই উত্তম নীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন, এই ঘটনা তাহার অন্যতম প্রমাণ। তিনি প্রত্যেক জিনিস উত্তম নির্বাচনে সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রত্যেক যুগের শ্রেষ্ঠ মানবকে নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষকে নিজ প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত করিয়াছেন। ইহুদীগণের প্রার্থনানুযায়ী আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে গরু নির্বাচনের ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছেন, এই আয়াত পাঠে তাঁহার ঐ নির্বাচনে সাহায্য করার কথা ও তাঁহার ঐরূপ কুদরতের বিষয় স্মরণ করা হয়, সেজন্য পাঠকারীর নির্বাচন উত্তম হয়।

নিদ্রিত লোকের নিকট হইতে গোপন কথা জানিবার উপায়

নাবালিকা মেয়ের কাপড়ের উপর রবিবার রাত্র ৫ ঘটিকা অন্তে এই আয়াত লিখিয়া নিদ্রিত লোকের বুকের উপর রাখিবে, সে নিজের গোপন কথা প্রকাশ করিতে থাকিবে, (শরীয়তে যেস্থানে এই আমল করা জায়েয আছে সেই স্থানেই এই আমল করিবে, নতুবা গোনাহ হইবে)।

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا ط وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ ۝ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ط كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى
وَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

(সূরা বাক্বারা, ৭২—৭৩ আয়াত)

অর্থঃ— ১। (হে বনী ইসরাঈলগণ !) এবং যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া পরস্পরের উপর দোষারোপ করিতেছিলে এবং তোমরা গোপন করিতেছিলে, আল্লাহ তাহা প্রকাশ করিলেন। ২। তৎপর আমি বলিতেছিলাম যে, একখণ্ড মাংস দ্বারা আঘাত কর—এইরূপে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁহার (শক্তি) নির্দশন দেখাইয়া থাকেন, যেন তোমরা বুঝিতে পার, (কেয়ামত হওয়া অতি সত্য) [শানে নুযূল উপরের ঘটনায় লিখিত হইয়াছে।]

খাসিয়তের বর্ণনাঃ— আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতে উপরোক্ত খুনের গোপন বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিলে যে কোন গোপন বিষয় প্রকাশ করিয়া দিতে পারেন, এই ঘটনা তাহার প্রমাণ। এই আয়াতে তাঁহার ঐরূপ অসীম ক্ষমতা ও কুদরতের বর্ণনা রহিয়াছে বলিয়া ইহার আমল দ্বারা গোপন বিষয় প্রকাশিত হয়।

ধ্বজভঙ্গ ও প্রমেহ রোগের তদবীর

১। গোসলের পর হাতে পানি লইয়া এই আয়াতটি ৩ বার পড়িয়া পানিতে ফুঁক দিবে ও ঐ পানি খাইবে ; কয়েকদিন এইরূপ আমল করিলেই ধ্বজভঙ্গ ও প্রমেহ সারিয়া যাইবে, সর্বদা এই আমল করিলে স্বাস্থ্য অটুট থাকে।

২। আছরের নামাযের পর (পূর্বে ও পরে দরূদ শরীফ পড়িয়া) এই আয়াত ৩ বার পড়িলে রিযিক বৃদ্ধি পায় এবং কখনও হাত খালি থাকে না। মানুষের সুখ-সম্পদের বর্ণনা থাকায় ইহার আমল দ্বারা রিযিক বৃদ্ধি পায় ; (এই আমল পরীক্ষিত)।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۝

উচ্চারণঃ— যুইয়্যিনা লিন্নাসি হুব্বুশ্ শাহাওয়াতে মিনান্নিসায়ি ওয়াল বানীনা ওয়ালক্বানাতীরিল মোক্বান্‌তারাতি মিনাজ্জাহাবে ওয়াল ফিদ্দাতে ওয়াল খায়লিল মুসাওয়্যামাতি ওয়াল আন্‌য়ামে ওয়াল হার্‌ছি, যালিকা মাতাউল হায়াতিদ্দুনিয়া ওয়াল্লাহু এন্‌দাহু হুসনুল মায়াব। (সূরা আলে এম্‌রান, ১৪ আয়াত)।

অর্থঃ— মানবকে রমণীগণ ও সন্তান-সন্ততি, সোনা, চান্দি, শিক্ষিত ঘোড়া ও পালিত পশু এবং জায়গা-জমিনের প্রতি প্রেম প্রভৃতি আকর্ষণ দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছে। ইহা পার্থিব জীবনের সম্পদ এবং আল্লাহ্‌র নিকট চিরস্থায়ী উত্তম অবস্থান রহিয়াছে।

শানে নুযূল ঃ— এই আয়াত বদর যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া নাযিল হয়। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া যুদ্ধে বিপক্ষ দলকে পরাজিত করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা এই সুসময়ে তাঁহাকে উপদেশ দেন যে, পার্থিব

সুখ-সম্পদ ও বিজয়লাভ হইতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসন্ধান করাই উত্তম। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন যে, মানুষের সুখ-সম্পদের মধ্যে প্রিয়তমা স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ধন-রত্ন ও জায়গা-জমিনই প্রধান। মানুষ এই সকলের মোহে পড়িয়া ইহা পাইবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে এবং এইগুলি মানুষের সম্পদ। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে মানুষ এইগুলি পাইয়া থাকে। এই আয়াতে এইগুলিই মানুষের পার্থিব সুখ-সম্পদের উপাদান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পদ না থাকিলে মানুষ ইহা পাওয়া সত্ত্বেও সুখী হইতে পারে না।

ধ্বজভঙ্গ ও প্রমেহ রোগ মানুষের স্বাস্থ্য-সুখ ভোগ করার প্রধান অন্তরায়। এই আয়াতে মানুষের সুখ-সম্পদ বর্ণিত হওয়ায়, ইহার তাসিরে ইহার আমল দ্বারা ধ্বজভঙ্গ ও প্রমেহ দূর হইয়া সুখ-সম্পদ লাভ হয় ও রিযিক বৃদ্ধি পায়। স্ত্রী সহবাসের পূর্বে এই আয়াত পড়িলে ধন-জন লাভ হয়।

৩। যাদু ক্রিয়া দ্বারা পুরুষত্বহানি ঘটিলে কোন পাত্রে সূরা বাইয়্যেনা (লাম ইয়াকুন, ৩০ পারা) লিখিয়া ধুইয়া রোগীকে তিন দিন খাওয়াইলে ইন্‌শাআল্লাহ আরোগ্য হইবে।

স্ত্রীলোকের প্রসব কষ্ট দূর করার তদবীর

اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ۝ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝

(৩০ পারা, সূরা এনশিক্বাক্ব ১—৪ আয়াত)

অর্থ ঃ— ১। যখন আকাশমণ্ডল ফাটিয়া যাইবে। ২। এবং আপন প্রতিপালকের কথায় উদগ্রীব হইবে এবং ইহাকে উপযোগী করা হইবে (আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করার জন্য)। ৩। এবং যখন পৃথিবীকে বর্ধিত করা হইবে। ৪। এবং ইহার মধ্যে যাহা আছে তদসমুদয় নিক্ষিপ্ত হইবে ও শূন্য হইয়া যাইবে।

খাসিয়ত ঃ— স্ত্রীলোকের প্রসব কষ্ট উপস্থিত হইলে এই ৪টি আয়াত কাগজে লিখিয়া স্ত্রীলোকের বাম উরুতে বাঁধিয়া দিবে, অতি সহজে সন্তান প্রসব হইবে ; কিন্তু প্রসব হওয়ামাত্র তাবীয খুলিয়া ফেলিবে, নতুবা নাড়ি ভুঁড়ি বাহির হইয়া যাইতে পারে।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই আয়াতগুলিতে কেয়ামতের দিনের অবস্থার বর্ণনা হইয়াছে ও সেদিন আকাশ ও পৃথিবীর যেরূপ অবস্থা হইবে তাহা বর্ণিত

হইয়াছে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ অসীম শক্তিবলে পৃথিবীকে বর্ধিত করিয়া ফেলিবেন এবং ইহার মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা দূরে ফেলিয়া দিয়া খালি করিয়া লইবেন। ইহাতে খালি হইয়া যাওয়ার আল্লাহ তায়ালার একটি হুকুম রহিয়াছে, ইহার তাসিরে ও কেয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা থাকায় এই আয়াত গর্ভিণীর উরুতে বাঁধা থাকিলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া উদর খালি হয় ও আল্লাহ তায়ালার কালামের হুকুম তামিল হয়।

দ্বিতীয় তদবীর

স্ত্রীলোকের প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে এই আয়াত শরীফ পড়িয়া তাহার পেটে বা কোমরে ফুঁক দিলে কিম্বা লিখিয়া কোমরে বাঁধিয়া দিলে অতি সহজে সন্তান প্রসব হয়।

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا

فَفَتَقْنٰهُمَا ط وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ٥ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ٥

উচ্চারণ ঃ— আওয়ালাম্ ইয়ারাল্লাযীনা কাফারূ আন্নাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা কানাতা রাতকান ফাফাতাক্বনাহুমা ওয়াজ্আল্না মিনাল মায়ি কুল্লা শাইইন্ হাইইন্ আফালা ইউমিনুন। (১৭ পারা, সূরা আম্বিয়া, ৩০ আয়াত)।

অর্থ ঃ— অত্যাচারীরা কি লক্ষ্য করে নাই যে, আসমান ও জমিন উভয়ই (বস্তার ন্যায়) একত্রিত ছিল, তৎপর আমি উভয়কে পৃথক করিয়াছি এবং পানি দ্বারা সমুদয় সচেতন জীব সৃষ্টি করিয়াছি, তথাপি কি তাহারা আমাকে বিশ্বাস করিবে না?

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— কাফেরগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে বলিয়াছেন, পৃথিবী ও আকাশ একত্র ছিল, তিনি উভয়কে পৃথক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিয়াছেন ও প্রত্যেক জীবনকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন ; আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরত ও শক্তির বর্ণনা ইহা হইতে অধিক আর কি হইতে পারে? সন্তানকে মায়ের উদর হইতে পৃথক করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ কাজ। এই আয়াত দ্বারা তাঁহার ঐরূপ শক্তির বর্ণনা করা হয় বলিয়া ইহার বরকতে উপরোক্ত ফযীলত লাভ হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ الشَّكُوْرُ الصَّبُوْرُ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ٥

অর্থ ঃ— পরম দয়ালু ও কৃপাশীল আল্লাহ্র নামে। কৃতজ্ঞতা পছন্দকারী ও সহিষ্ণু এবং সর্বোচ্চ ও মহাশক্তিশালী আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নাই।

খাসিয়ত ঃ— প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে এই আয়াত লিখিয়া একখানা সাদা কাপড়ে কাগজখানি মুড়িয়া স্ত্রীলোকের গলায় বাঁধিয়া দিবে, আল্লাহ্র ফজলে সন্তান প্রসব হইবে, প্রসব হওয়া মাত্র কবজটি খুলিয়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখিবে।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই আয়াতের আমল দ্বারা আল্লাহ তায়ালার দয়া, শক্তি ও সহিষ্ণুতার নিকট আত্মসমর্পণ করা হয়, ফলে তাঁহার দয়ার উদ্রেক হয় এবং সঙ্কট দূর হয়।

চতুর্থ তদবীর

স্ত্রীলোকের বা কোন পশুর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে তাহার নিকট যে কোন ব্যক্তি এই দোয়া পড়িলে ইন্শাআল্লাহ সহজে প্রসব হইবে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عُدَّتِيْ فِيْ كُرْبَتِيْ وَاَنْتَ صَاحِبِيْ فِيْ غُرْبَتِيْ

وَاَنْتَ حَفِيْظِيْ عِنْدَ شِدَّتِيْ وَاَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِيْ يَا مُخْرِجَ النَّفْسِ

مِنَ النَّفْسِ خَلِّصْهَا بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ ٥

উচ্চারণ ঃ— আল্লাহুম্মা আন্তা উদ্দাতী ফি কুরবাতী ওয়া আন্তা সাহিবী ফী গুরবাতী ওয়া আন্তা হাফীযী ইন্দা শিদ্দাতী ওয়া আন্তা ওয়ালিয়্যি নি'য়মাতী ইয়া মুখরিজান্ নাফ্সি মিনান্নাফ্সি খাল্লিস্হা বিহাক্কি ইয়্যাকা না'বুদু।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! তুমি আমার বিপদের বন্ধু এবং অন্ন কষ্ট ও দরিদ্রতার সময়ের বন্ধু এবং তুমি আমার বিপদের সময়ের রক্ষক ও সুখ সম্পদে বন্ধু ও আমার আত্মাকে অপকর্ম হইতে বিরতকারী, তুমি আমাকে অপকর্ম হইতে রক্ষা কর, আমরা তোমারই এবাদত করি।

আল্লাহ্‌র শক্তি ও দয়ার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য ইহা একটি উত্তম দোয়া, ইহার বরকতে সঙ্কট উদ্ধার হয়।

গর্ভপাত নিবারণের তদবীর

যে স্ত্রীলোকের গর্ভ নষ্ট হইয়া যাওয়ার অভ্যাস হয়, তাহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত একটি সাদা সূতা মাপ দিয়া লইবে ও শুকনা কুসুম ফুল পানিতে ভিজাইয়া সূতাটিতে রং দিয়া শুকাইয়া ফেলিবে ; তৎপর এই আয়াতটি পড়িবে ও সূতায় ফুঁক দিয়া একটি গিরা দিবে, এইরূপ ৯ বার পড়িয়া ৯টি গিরা দিবে, তৎপর সূতাটি স্ত্রীলোকের কোমরে বাঁধিয়া দিবে ; সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত সূতাটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে থাকিবে। প্রসবের পর ইহা নদীতে ফেলিয়া দিবে ; (ইহা বিশেষ পরীক্ষিত)।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ○ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ ○

উচ্চারণ ঃ— ১। ওয়াস্‌বির ওয়ামা সাবরুকা ইল্লা বিল্লাহি ওয়া লা তাহযান আলাইহিম ওয়া লা তাকু ফী দাইকিম্‌ মিম্মা ইয়ামকুরূন। ২। ইন্নাল্লাহা মায়াল্লাযীনাত্তাক্বাওঁ ওয়াল্লাযীনা হুম মুহসিনূন। (সূরা নহলের শেষ ২ আয়াত)

অর্থ ঃ— ১। এবং তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং তোমার ধৈর্য আল্লাহ্‌রই সাহায্যে হয় এবং তাহাদের জন্য আক্ষেপ করিও না। তাহারা যে চক্রান্ত করিতেছিল, সেজন্য সঙ্কুচিত হইও না। ২। নিশ্চয় আল্লাহ সংযমী ও সৎকর্মশীলগণের সঙ্গে থাকেন।

শানে নুযূল ঃ— কাফেরগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর অত্যাচার করিতে থাকিলে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত দ্বারা তাঁহাকে ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য উপদেশ দেন এবং বলেন যে, যাহারা ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তাহাদের সহায়। এই আয়াতে ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র একটি আদেশবাণী আছে ; যাহার বরকতে সন্তান ধৈর্য সহকারে মাতৃগর্ভে থাকে ও গর্ভপাত রহিত হয়।

দ্বিতীয় তদবীর

এই আয়াত দুইটি লিখিয়া স্ত্রীলোকের পেটের উপর বাঁধিয়া দিলে ইন্‌শাআল্লাহ গর্ভ স্থায়ী হয়।

١- فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ○ ٢- اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ○

উচ্চারণ ঃ— ১। ফাল্লাহু খাইরুন্‌ হাফিযাওঁ ওয়া হুয়া আরহামুর রাহিমীন। (সূরা ইউসুফ, ৩৪ আয়াতের শেষ অংশ)। ২। আল্লাহু ইয়া'লামু মা তাহ্‌মিলু কুল্লু উন্‌সা ওয়া মা তাগীদুল আরহামু ওয়া মা তায্‌দাদু ওয়া কুল্লু শাইইন ইনদাহু বিমিক্বদারিন্‌। (সূরা রা'দ, ৮ আয়াত)।

অর্থ ঃ— ১। হযরত ইয়াকুব নবী (আঃ) বলিয়াছেন, বস্তুতঃ আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষক এবং তিনি দয়াশীলগণের দয়াময় ; (শানে নুযূল ও তফসীর ১৮০ পৃষ্ঠায়)।

২। প্রত্যেক নারী যাহা গর্ভে ধারণ করে এবং তাহাদের জরায়ু যাহা হ্রাস করে ও বৃদ্ধি করে তাহা আল্লাহ জ্ঞাত আছেন এবং তাঁহার নিকট প্রত্যেক বিষয়ের পরিমাণ রহিয়াছে।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— প্রথম আয়াতে আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ও ২য় আয়াতে মানুষ সৃজন কৌশলে জরায়ুর ভিতর আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের বর্ণনা রহিয়াছে। তাঁহার কুদরত ও অসীম জ্ঞানের বাহিরে কিছু থাকিতে পারে না। এই আয়াত দ্বারা তাঁহার ঐ কুদরতের বর্ণনা করা হয়। এইজন্য ইহার বরকতে উপরোক্ত ফযীলত লাভ হয়।

তৃতীয় তদবীর

গর্ভ রক্ষার জন্য এই আয়াতটির তাবীয করিয়া স্ত্রীলোকের পেটের উপর বাঁধিয়া রাখিবে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۔ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ○

(১৭ পারা, সূরা হজ্, ১ম আয়াত)।

অর্থ ঃ— হে মানবগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর ; নিশ্চয়ই সেই মহাকম্পনকাল (কেয়ামত) গুরুতর বিষয়।

শানে নুযূল ঃ— মক্কার কাফেরগণ কেয়ামত বিশ্বাস করিত না, আল্লাহ তায়ালা এই সূরার প্রথমেই তাহাদের এইরূপ ভুলের প্রতিবাদ করিয়া কেয়ামতের সত্যতার অকাট্য যুক্তি দেখাইয়াছেন। কেয়ামত বিশ্বাস না করিলে কেহই আল্লাহ্‌কে ভয় করিত না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও কেয়ামতের ভয়াবহ সময়ের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ তাহার রক্ষক। এই আয়াতে কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনার বর্ণনা আছে বলিয়া ইহার তাসিরে উপরোক্ত ফযীলত লাভ হয়।

চতুর্থ তদবীর

এই আয়াতগুলি লিখিয়া তাবীয করিয়া গর্ভ সঞ্চাররের সময় ৪০ দিন পর্যন্ত গর্ভবতীর কোমরে বাঁধিয়া রাখিবে, তৎপর ইহা খুলিয়া নবজাত শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিবে ; ইহাতে গর্ভ রক্ষা হইবে ও সন্তান সবল ও সুস্থ হইবে ; (ইহা বিশেষ পরীক্ষিত)।

وَالَّتِىٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ○ وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ط كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ○

(১৭ পারা, সূরা আম্বিয়া, ৯১-৯৩ আয়াত)

অর্থ ঃ— ১। এবং সেই স্ত্রীলোক (বিবি মরিয়ম) তিনি তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছেন, তৎপর আমি তাঁহার মধ্যে স্বীয় রূহ ফুৎকার করিয়াছিলাম (অনন্তর স্বামী ব্যতীতই তাঁহার গর্ভ হইয়াছিল) এবং আমি তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র (হযরত ঈসা আঃ) কে বিশ্বজগতের জন্য (আমার পূর্ণ ক্ষমতার) নিদর্শনস্বরূপ করিয়াছিলাম।

২। নিশ্চয় তাঁহারা তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক ; অতএব তোমরা আমার এবাদতে লিপ্ত হও। ৩। এবং যাহারা পরস্পরে মতভেদ করিয়া তাহাদের কর্মকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের সকলকেই আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে ; (কেয়ামতের দিন)।

শানে নুযূল ঃ— এই আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) এর রহস্যময় জন্ম বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার মাতা বিবি মরিয়ম বায়তুল মোকাদ্দাসে আল্লাহ্‌র এবাদতে লিপ্ত ছিলেন। তিনি যৌবনে উপনীত হইলে যথারীতি পর্দা

পালন করিতে থাকেন ; সেই সময় বিবি মরিয়মের নিকট আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে প্রেরণ করেন। তিনি মানবাকৃতি ধারণ করিয়া বিবি মরিয়মের সম্মুখে উপস্থিত হন। বিবি মরিয়ম অপরিচিত পুরুষবেশে হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে আসিতে দেখিয়া ভীতা হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন যে— যদি তুমি ধর্মপরায়ণ হও, তবে আমার উপর কোন অত্যাচার করিও না ; আমি তোমা হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হযরত জিব্রাইল (আঃ) বিবি মরিয়মকে অভয় দান করিয়া বলিয়াছিলেন যে— তুমি কোন ভয় করিও না, আমি তোমাকে ভাগ্যবান পুত্ররত্ন হযরত ঈসা (আঃ) এর সুসংবাদ দিতে আসিয়াছি। বিবি মরিয়ম উত্তর করিলেন যে, আমার বিবাহ হয় নাই ও আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই, তবে কিরূপে আমার সন্তান হইবে ? ইহা অসম্ভব কথা। হযরত জিব্রাইল (আঃ) উত্তর করিলেন— আল্লাহ্‌র ইচ্ছার নিকট ইহা কঠিন কাজ নহে, ইহা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ। অনন্তর আল্লাহ্‌র কুদরতে অবিবাহিতা অবস্থায় বিবি মরিয়ম গর্ভবতী হইলেন ও যথাসময়ে হযরত ঈসা (আঃ)কে প্রসব করিলেন। এই ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে আল্লাহ তায়ালার অনন্ত কুদরত ও অসীম ক্ষমতার জ্বলন্ত নিদর্শন। মানুষের জন্ম-রহস্যে এই ঘটনা দ্বারা তাঁহার কুদরতের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছে। আল্লাহ যদি এইরূপ অলৌকিকভাবে সন্তান সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে মাতৃগর্ভে শিশু সন্তানকে নিরাপদ রাখা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য কিছুই নহে। এই আয়াত দ্বারা তাঁহার ঐরূপ কুদরতের বর্ণনা হইয়াছে বলিয়া ইহার ফযীলতে মাতৃগর্ভে সন্তান নিরাপদ থাকে।

বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের তদবীর

যে স্ত্রীলোকের মোটেই গর্ভ সঞ্চার হয় না, সে এই আমল করিলে আল্লাহ্‌র রহমতে সন্তানের মুখ দেখিতে পাইবে। হরিণের চামড়ায় জাফরান ও গোলাপ পানি মিশ্রিত রং দ্বারা এই আয়াত চাঁদির তক্তিতে ভরিয়া সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিবে।

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ط بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ○

(১২ পারা, সূরা রা'দ, ৩১ আয়াত)

অর্থ ঃ— এবং যদি কোর্‌আন এই গুণবিশিষ্ট হইত, যাহা দ্বারা পর্বত স্থানান্তরিত করা যাইত এবং যাহা দ্বারা পৃথিবী কর্তন করা যাইত, অথবা যাহা দ্বারা মৃত কথা বলিতে পারিত (প্রকৃত কথা এই যে,) আল্লাহ্‌র জন্যই সমস্ত কার্যসমূহ।

শানে নুযূল ঃ— কয়েকজন কাফের হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলিয়াছিল যে, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! যদি তুমি আমাদিগকে দীন ইসলামে আনিতে চাও, তবে কোর্‌আন দ্বারা পর্বতগুলি স্থানান্তরিত করিয়া আমাদের যাতায়াতের পথ সহজ ও সুগম করিয়া দাও এবং কোন মৃত ব্যক্তিকে কথা বলাইয়া দেখাও। তাহা হইলে আমরা তোমার নবুয়তে বিশ্বাস করিব। আল্লাহ তায়ালা ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, কোর্‌আন দ্বারা ঐ সকল কাজ সাধন করা হইলেও তাহারা ঈমান আনিবে না। হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) এইরূপ বহু মা'জেযা দেখাইয়াও কাফেরগণকে আল্লাহ্‌র পথে আনিতে পারেন নাই। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে পলকের মধ্যে এই সকল অলৌকিক কার্য সাধন করিতে পারেন। তিনি অসীম কুদরতের বলে হযরত ঈসা (আঃ)কে মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করিয়াছেন। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের সন্তান হওয়া তাঁহার কুদরতের নিকট অতি সহজ কার্য। তিনি ইচ্ছা করিলে যে কোন কার্য সাধন করিতে পারেন। এই আয়াতে আল্লাহ্‌র ঐরূপ কুদরত ও শক্তির বর্ণনা হইয়াছে বলিয়া ইহার আমল দ্বারা উপরোক্ত ফল হয়।

দ্বিতীয় তদবীর

৪০টি লবঙ্গ লইয়া প্রত্যেকটির উপর নিম্নোক্ত আয়াত ৭ বার করিয়া পড়িয়া একটি পাত্রে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিবে এবং বন্ধ্যা স্ত্রীলোক যেদিন ঋতু হইতে পাক হইবে, সে দিন গোসল করিয়া রাত্রিতে একটি লবঙ্গ খাইবে, এইরূপ ৪০ দিন ৪০টি লবঙ্গ খাইবে ; ইন্‌শাআল্লাহ সন্তান হইবে। লবঙ্গ খাওয়ার পর পানি পান করিতে পারিবে না।

أَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ
سَحَابٌ ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا ط
وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ٥

উচ্চারণ ঃ— আও কাযুলুমাতিন্ ফি বাহ্‌রিল্লুজ্জিই ইয়াগশাহু মাওজুম্ মিন ফাওকিহী মাওজুম্ মিন ফাওক্বিহী সাহাবুন যুলুমাতুম্ বা'দুহা ফাওক্বা বা'দিন ইযা আখরাজা ইয়াদাহু লাম ইয়াকাদ ইয়ারাহা ওয়া মাল্লাম ইয়াজ্‌আলিল্লাহু লাহু নূরান ফামা লাহু মিন্ নূর। (১৮ পারা, সূরা নূর, ৪০ আয়াত)।

অর্থ ঃ— অনন্তর গভীর সমুদ্রে, যাহার অভ্যন্তর অন্ধকার রাশির ন্যায়, যাহার বিশাল বুকে ঢেউয়ের উপর ঢেউ সমাচ্ছন্ন, তাহার উপর অন্ধকার ঘনীভূত, যখন সে নিজ হাত বাহির করে তখন সে তাহা দেখিতে পায় না ; বস্তুতঃ আল্লাহ যাহাকে আলোক (সৎপথ) দান করেন না, ফলতঃ তাহার জন্য কোন আলোক নাই।

শানে নুযূল ঃ— এই আয়াতে অবিশ্বাসীগণের ইহ-পরকালের অসহায় অবস্থার কথা বর্ণিত হইয়াছে। অন্ধকার রাত্রিতে মেঘাচ্ছন্ন সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ব্যক্তি সমুদ্র তরঙ্গের ভিতর থাকিয়া যেরূপ নিজের হাত পর্যন্ত বাড়াইলে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ আল্লাহ তায়ালা যাহাকে আলোক (সৎপথ) দান করেন নাই, সে শত অনুসন্ধান করিয়াও ইহার সন্ধান পাইবে না, সে সত্যালোকের অভাবে অসত্যের অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কেহ কিছু লাভ করিতে পারে না। মানুষের শত চেষ্টা ও সাধনা তাহাকে সফলতা আনিয়া দিতে পারে না। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও ইচ্ছার উপর নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার ভাব রহিয়াছে, সেজন্য ইহার আমল দ্বারা আল্লাহ তায়ালার অপার করুণার উদ্রেক হয় ও আমলকারীর জীবনের অবলম্বন (সন্তান) লাভ হয়।

পুত্র কন্যা লাভের উপায়

যে ব্যক্তি পুত্র কন্যার মুখ দর্শনে নিরাশ হইয়াছে, তাহার পক্ষে প্রত্যেক নামাযের পর এই আয়াত তিন বার পড়া উচিত। এই আমল দ্বারা ইন্‌শাআল্লাহ সন্তান লাভ হইবে।

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ٥ رَبِّ هَبْ لِيْ
مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ٥ إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ٥

উচ্চারণ ঃ— ১। রাব্বি লা-তাযারনী ফারদাঁও ওয়া আন্‌তা খায়রুল ওয়ারিসীন। (সূরা আম্বিয়া, ৮৯ আয়াত)। ২। রাব্বি হাবলী মিল্লাদুনকা যুররিয়্যাতান তাইয়্যিবাতান ইন্নাকা সামিউদ্দোয়া। (সূরা আলে ইমরান, ৩৮ আয়াত)।

অর্থ ঃ— ১। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একাকী (নিঃসন্তান অবস্থায়) রাখিও না, তুমিই শ্রেষ্ঠতম উত্তরাধিকারী।

২। হে প্রতিপালক! তোমার নিকট হইতে আমাকে পবিত্র সন্তান দান কর, নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

শানে নুযূল ঃ— বৃদ্ধকাল পর্যন্ত পুত্র সন্তান না হওয়ায় হযরত যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট এই দোয়া পড়িয়া হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ)কে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় তদবীর

মুরগীর দুইটি ডিম সিদ্ধ করিয়া খোসা ছাড়াইয়া একটির উপর নিম্নোক্ত ১নং আয়াত লিখিবে, অপরটির উপর ২নং আয়াত লিখিবে ; তৎপর ১নং আয়াত লিখিত ডিমটি স্বামী খাইবে ও ২নং আয়াত লিখিত ডিমটি স্ত্রী খাইবে। এইরূপ ৪০ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ নূতন দুইটি ডিম উভয়ে খাইবে, ইন্‌শাআল্লাহ স্ত্রী হামেলা হইবে।

১নং আয়াত وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ○

২নং আয়াত وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ○

(২৭ পারা, সূরা যারিয়াত, ৪৭-৪৮ আয়াত)।

অর্থ ঃ— এবং আকাশকে আমি শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি, নিশ্চয় আমি প্রসারণকারী।

২। এবং পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করিয়াছি, ফলতঃ আমি কিরূপ উত্তম বিস্তারকারী।

শানে নুযূল ঃ— হযরত রসূল (সাঃ) এর বিরুদ্ধাচারী কোরেশগণকে সতর্ক করার জন্য এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবীর অপরূপ সৃষ্টি কৌশলের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার অসীম কুদরতের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে যে কোন বিষয় বর্ধিত ও বিস্তৃত করিতে পারেন, সন্তান সৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ কাজ। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালার কুদরত ও শক্তির বর্ণনা এইরূপভাবে হইয়াছে বলিয়া ইহার আমল দ্বারা উপরোক্ত ফযীলত লাভ হয়।

কোন জিনিস হারাইয়া গেলে তাহা পাওয়ার তদবীর

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ○

উচ্চারণ ঃ— ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। (সূরা বাক্বারা, ১৫৬ আয়াত)।

অর্থ ঃ— নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহারই দিকে ফিরিয়া যাইব ; (কেয়ামতের দিন)।

খাসিয়ত ঃ— এই আয়াত ৩০১ বার পড়িলে হারানো জিনিস পাওয়া যায়।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই আয়াত কেয়ামতে বিশ্বাস স্থাপন করার একটি ভিত্তি। এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, আমরা কেয়ামতের পর আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হইব। আল্লাহ্‌র নিকট ফিরিয়া যাওয়ার যেকের করা হয় বলিয়া ইহার বরকতে এই আয়াতের আমল দ্বারা হারানো জিনিস ফিরিয়া পাওয়া যায়। কাহারও মৃত্যু খবর শুনিলে এই আয়াত পড়িয়া মৃত্যু ও কেয়ামতকে স্মরণ করিতে হয়।

দ্বিতীয় তদবীর

সূরা দোহা (৩০ পারা) ৭ বার পড়িলে হারানো জিনিস পাওয়া যায়, পড়ার সময় এই সূরার নিম্নোক্ত সপ্তম আয়াতটি তিনবার পড়িবে ঃ—

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى ○

অর্থ ঃ— এবং তুমি পথহারা হইয়াছ, অমনি পথ দেখাইয়াছেন।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই সূরার ৫ম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলিয়াছেন যে, সত্বর তোমার প্রভু তোমাকে দান করিবেন ও তাহাতে তুমি তুষ্ট হইবে, ৬ষ্ঠ আয়াতে আশ্রয় প্রদান করার, ৭ম আয়াতে পথ প্রদর্শন করার ও ৮ম আয়াতে অভাব দূর করার আশ্বাসবাণী আছে ও এই আয়াতে হযরত (সাঃ) কে পথ দেখাইবার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ; এই সকল আশাপূর্ণ আল্লাহ্‌র কালামের স্মরণ করা হয় বলিয়া এই সূরার আমল দ্বারা এইরূপ ফযীলত লাভ হয়।

তৃতীয় তদবীর

কোন জিনিস হারাইয়া গেলে এই দোয়া পড়িতে থাকিবে, ইন্‌শাআল্লাহ জিনিস পাওয়া যাইবে ; কিম্বা সন্ধান পাওয়া যাইবে ঃ—

اَللّٰهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ اِجْمَعْ عَلَىَّ ضَالَّتِىْ ۝

উচ্চারণ ঃ— আল্লাহুম্মা ইয়া জামেয়ান্নাসি লিইয়াওমিল্লারাইবা ফীহি এজ্‌মা' আলাইয়্যা দাল্লাতী।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! তুমি নিঃসন্দেহ দিনে (কেয়ামতের দিন) মানবদিগকে একত্রকারী। তুমি আমার হারানো ধন একত্র কর।

পলাতক ব্যক্তি ফিরিয়া আসার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি পলাইয়া যায়, তবে এই আয়াত কাপড়ে লিখিয়া চরকার মধ্যে বাঁধিয়া প্রত্যহ ৬০ বার উল্টা ঘুরাইবে, এইরূপ ৪০ দিন ঘুরাইলে পলাতক ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবে।

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

অর্থ ঃ— তৎপর আমি তাঁহাকে [হযরত মূসা (আঃ) কে] তাঁহার মাতার নিকট পুনরায় আনিয়াছিলাম; যাহাতে তাঁহার চক্ষু শীতল হয় এবং যেন সন্তপ্ত না হয় এবং যেন সে জানিতে পারে যে, আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার সত্য ; কিন্তু তাহাদের অনেকেই ইহা অবগত নহে।

শানে নুযূল ঃ— ফেরাউনের ভয়ে হযরত মূসা (আঃ)কে জন্মের পর সিন্দুকে ভরিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফেরাউন ভাসমান সিন্দুক দেখিতে পাইয়া উহা খুলিতে আদেশ দেয়। সিন্দুকের ভিতর শিশু মূসাকে দেখিয়া তাহার দয়ার উদ্রেক হয় ও তাহাকে পালন করার ব্যবস্থা করিয়া দেয় ; আল্লাহ্‌র কুদরতে হযরত মূসার (আঃ) মাতা তাঁহার ধাত্রী নিযুক্ত হন। এই আয়াতে সেই ঘটনা বর্ণনা করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, হযরত মূসা (আঃ) কে ফিরাইয়া দিয়া তাহার মাতার মনঃকষ্ট দূর করিয়াছিলাম। ইহা আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের একটি নিদর্শন। তিনি ইচ্ছা করিলে এইভাবে সকলকেই সান্ত্বনা দিতে পারেন। এই আয়াতের আমল দ্বারা আল্লাহ্‌র কুদরতে মূসা (আঃ) কে যে তাঁহার মাতার নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহার স্মরণ করা হয় এবং আল্লাহ্‌র শক্তি-মহিমার বর্ণনা করা হয়, সেইজন্য ইহার বরকতে পলাতক ব্যক্তিকে ফিরিয়া পাওয়া যায়।

পলায়ন নিবারণের তদবীর

অবাধ্য স্ত্রী, পুত্র বা চাকর-চাকরানীর পলায়ন করিবার অভ্যাস হইলে সূরা ফাতেহা ও চার ক্বোল ৩ বার করিয়া ও সূরা তারেক একবার, সূরা দোহা ৩ বার পড়িয়া তাহাদের চাদরের বা রুমালের কোণে ফুঁক দিয়া গিরা দিলে পলায়ন করার অভ্যাস দূর হইবে।

কোর্‌আন ও মানব চরিত্র

আল্লাহ পাক কোর্‌আনে মানব চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, মানুষকে পাঁচটি বিশেষ স্বভাব দিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। ১। মানুষ বিশ্বাসঘাতক ; ২। অত্যাচারী ; ৩। অকৃতজ্ঞ ; ৪। চঞ্চল ও ৫। সত্বরতাপ্রিয়।

প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) বেহেশতের অফুরন্ত সুখ-সম্পদ উপভোগ করিয়াও অবশেষে বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া আল্লাহ্‌র আমানত গন্দম বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। হযরত আদমের (আঃ) বংশধর হিসাবে মানুষের মধ্যে এই স্বভাব থাকা অস্বাভাবিক নহে, তাই কোন কোন মানুষ নিজের প্রতি অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আত্মহত্যা পর্যন্ত করিয়া থাকে। চঞ্চল স্বভাবের জন্য মানুষ বেশীক্ষণ একইভাবে ও একই অবস্থায় স্থির থাকিতে পারে না। আবার মানুষ সত্বরতাপ্রিয় বলিয়া বর্তমান লইয়াই বেশী ব্যস্ত থাকে, বর্তমানের এক পয়সাকে ভবিষ্যতের হাজার টাকার চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করে এবং ইহকালের ক্ষণিক সুখের জন্য পরকালের অনন্ত সুখের কথা ভুলিয়া থাকে। যাহাতে মানুষ সীমার বাহিরে অপরকে বিশ্বাস করিয়া না ঠকে সেইজন্য আল্লাহ পাক মানুষের স্বভাবগুলি বর্ণনা করিয়া মানব জাতিকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

পাক কোর্‌আনে মানবের স্বভাব বর্ণনা করার ইহাই আসল উদ্দেশ্য। অতএব প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মানব চরিত্র ও স্বভাব জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

নবম অধ্যায়

আয়াতে কোরআনে বিবিধ তদবীর ও আমল

শত্রুর উপর জয়লাভ ও সম্মান বৃদ্ধির অব্যর্থ আমল

আয়াতে হেজ্‌ব (যুদ্ধের আয়াত)

নিম্নোক্ত ৫টি আয়াতের প্রত্যেকটির মধ্যে ১০টি ক্বাফ আছে, ক্বাফ অক্ষরের অর্থ ক্বাদীর অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ও কুদরত (মহিমা) বুঝায় (তঃ কবীর)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই বর্ণটি আল্লাহ তায়ালার একটি নাম। পাক কোর্‌আনের একটি সূরার নাম এই অক্ষরের মর্ম ও নামানুসারে সূরা 'ক্বাফ' হইয়াছে। অতএব ক্বাফ অক্ষরটির তাসির শক্তি ও জয়। এই আয়াত পাঁচটিতে ৫০টি ক্বাফ অক্ষর বর্তমান থাকায় ইহাদের আমল দ্বারা শক্তি ও জয়লাভ করার অন্যতম কারণ নির্দেশ করা হইয়াছে। এই আয়াতগুলি নবী ও রসূলগণের জেহাদ ও অন্যায় হত্যার ঘটনা অবলম্বনে নাযিল হইয়াছে ও হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জেহাদের বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ; এই সকল কারণে এই আয়াতগুলি যুদ্ধে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করার তাসির (গুণ) লাভ করিয়াছে।

ফযীলত ঃ— ১। যে ব্যক্তি এই আয়াতগুলি লিখিয়া সঙ্গে রাখিবে, আল্লাহ তাহাকে শত্রুর উপর জয়যুক্ত করিবেন, শত্রুর অস্ত্র ও চক্রান্ত তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। কেহ তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইবে, লোকের অন্তঃকরণে তাহার প্রতি ভয়ের সঞ্চার হইবে।

২। ফকীহ্ আলী আহমদ বিন মূসা বলিয়াছেন যে, কোরআনে ৫টি আয়াত আছে, যে কেহ ইহা শত্রুর সম্মুখে পড়িবে, শত্রু পরাজিত হইবে, অত্যাচারীর সম্মুখে পড়িলে আল্লাহ তাহার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবেন।

৩। পীর নজমুদ্দীন কোবরা লিখিয়াছেন যে— যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন এই পাঁচটি আয়াত পড়িবে, ফেরেশতাগণ তাহার সাক্ষী হইবেন ও সে সমস্ত বিষয়ে জয়ী হইবে, তাহার সম্মান বৃদ্ধি পাইবে, কেহ তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া জয়লাভ করিতে পারিবে না, তিনি কোতবের দরজা লাভ করিবেন। একজন কোতব বলিয়াছেন যে, আমি প্রত্যেক বিষয়ে এই আয়াতের আমলের বরকতে জয়লাভ করিয়াছি।

৪। সম্রাট সুলতান মাহমুদ গজনবীর নাম সকলেই অবগত আছেন। তিনি ১৭ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকবারই এই আয়াতের আমলের বরকতে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পীর হযরত মূসা ছেদরানী তাঁহাকে ইহা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

৫। যে ব্যক্তি জুমআর দিন এই আয়াত লিখিয়া ধুইয়া পানি খাইবে, তাহার সকল প্রকার পীড়া দূর হইবে ও ইহা লিখিয়া মস্তকে ধারণ করিয়া দরবারে গেলে সম্মান লাভ করিবে। লোকের ভক্তি আকর্ষণ করার পক্ষে এই আয়াতের আমল পরশ পাথরতুল্য কার্যকরী বলিয়া ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন।

আয়াতে হেজব

بسم الله الرحمن الرحيم ٥

١- ألم تر إلى الملإ من بني إسرائيل من بعد موسى
إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ط قال هل
عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ط قالوا وما لنا
ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ط
فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ط والله عليم
بالظالمين ٥ (قدير على ما يريد (৩বার করিয়া

٢- لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن
أغنياء م سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق لا ونقول
ذوقوا عذاب الحريق ٥ (قوى لا يحتاج إلى معين (৩ বার করিয়া

٣- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى ۞ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ○ (قَهَّارٌ لِّمَنْ طَغَى وَعَصَى ৩ বার করিয়া)

٤- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ۘ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۗ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ○ (قُدُّوسٌ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ৩ বার করিয়া)

٥- قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ۙ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۚ أَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○ (قَيُّومٌ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ الْقُوَّةُ ৩ বার করিয়া)

অর্থ ঃ—১। বনী ইসরাঈলের সর্দার ব্যক্তিগণের প্রতি কি তুমি লক্ষ্য কর নাই ? যখন তাহারা তাহাদের পয়গম্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে, আমাদের জন্য

একজন বাদশাহ নিযুক্ত করিয়া দিন, যেন আমরা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন যে— যদি তোমাদের প্রতি জেহাদ করা ফরয করা হয়, তবে তোমরা যে জেহাদ করিতে বিমুখ হইবে, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। তাহারা বলিয়াছিল— আমরা যখন নিজ বাসগৃহ ও সন্তানগণ হইতে বিতাড়িত হইয়াছি তখন আমরা কেন আল্লাহ্‌র দীনের জন্য যুদ্ধ করিব না ? তৎপর যখন তাহাদের জন্য জেহাদ ফরয করা হইল, তখন তাহাদের কয়েকজন ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল, বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যাচারীকে বেশ চিনিয়া থাকেন ;(আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছার উপর শক্তিমান)।—(সূরা বাক্বারা, ২৪৬ আয়াত)।

শানে নুযূল ঃ— এই আয়াতে ধর্মযুদ্ধে বিমুখ মুসলমানদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হযরত মূসা নবীর (আঃ) সময়ে ইসরাঈল বংশীয়গণের প্রতি যুদ্ধের আদেশ ও অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত অন্য সকলের যুদ্ধ হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার ঘটনার বর্ণনা করা হইয়াছে ; (শাম দেশে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল)।

অর্থ ঃ— ২। আর যাহারা আল্লাহকে দরিদ্র এবং নিজেকে ধনী মনে করিয়া থাকে, আল্লাহ তাহাদের এই (প্রলাপ) বাক্য শুনিয়া থাকেন, অনন্তর তাহারা যে নবীগণকে অযথা শহীদ করিয়াছে, তাহার সহিত তাহাদের এই (প্রলাপ) বাক্য আমলনামায় লিখিয়া রাখিতেছি, কেয়ামতের দিন তাহাদিগকে বলিব— এখানে দোযখের প্রদাহকারী শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর ; (আল্লাহ কোন সাহায্যকারীর মুখাপেক্ষী নহেন)। (সূরা আলে এমরান, ১৮১ আয়াত)।

শানে নুযূল ঃ— হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ্‌র নামে জেহাদ ও জনহিতকর কার্যে অর্থ ব্যয় করার উপদেশ দিতেন, ইহা শ্রবণে ইহুদীরা বিদ্রূপ করিয়া বলিত যে— তোমার আল্লাহ বোধহয় গরীব, নচেৎ তিনি মানুষের নিকট সাহায্য চাহিবেন কেন ? তাহাদের এইরূপ ধৃষ্টতার উত্তরে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে বলিয়া দিয়াছেন যে, এইরূপ ধৃষ্টতার জন্য কেয়ামতের দিন তাহাদিগকে ভয়ানক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। ইহুদীগণ কয়েক ঘন্টার মধ্যে অন্যায়ভাবে কয়েকজন নবীকে হত্যা করিয়াছিল, এই আয়াতে তাহাদের ঐ মহাপাপের উল্লেখ করা হইয়াছে।

অর্থ ঃ— ৩। (হে পয়গম্বর!) তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, তোমাদের হস্তসমূহ সংযত কর, নামায পড়, যাকাত দান কর। তৎপর যখন তাহাদের প্রতি জেহাদ ফরয করা হইল, তখন তাহাদের একদল

আল্লাহকে যেরূপ ভয় করে তাহা অপেক্ষা বেশী ভয় মানুষকে করিতে লাগিল এবং (হতাশ মনে) আল্লাহ্‌র নিকট বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের প্রতি জেহাদ ফরয করিলে কেন ? কেন আর কিছুদিনের জন্য আমাদিগকে অবকাশ দিলে না ? তুমি বলিয়া দাও যে, দুনিয়ার সুখ-সম্পদ নিতান্ত সামান্য, যে ব্যক্তি ধর্মভীরু তাহার জন্য পরকালই কল্যাণকর এবং যে স্থানে তোমরা তৃণ পরিমাণে অত্যাচারিত হইবে না ; (আল্লাহ উগ্র ব্যক্তি ও অনর্থক কার্যকারীর উপর শাস্তিদাতা)। (সূরা নেসা, ৭৭ আয়াত)।

শানে নুযূল ঃ— যে সমস্ত দুর্বলচিত্ত মুসলমান জেহাদের ভয়ে ভীত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল, এই আয়াতে তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, জেহাদে জীবন দান করা, নামায পড়া ও যাকাত দান করা পরকালের সুখ-সম্পদ লাভ করার একমাত্র উপায়। ধর্ম রক্ষার জন্যও ধন সম্পদ দান করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

অর্থ ঃ— ৪। অনন্তর [হে মুহাম্মদ (সাঃ)!] তুমি তাহাদিগকে আদমের দুই পুত্রের বর্ণনা কর, যখন তাহারা উভয়ে আল্লাহ্‌র নামে কোরবানী করিয়াছিল। তাহাদের একজনের কোরবানী গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু অপরজনের কোরবানী গৃহীত হয় নাই। সে (কাবীল) বলিয়াছিল, আমি তোমাকে বধ করিব। অপরজন (হাবীল) উত্তর দিয়াছিল—আল্লাহ কেবল ধর্মভীরুগণের কোরবানীই গ্রহণ করেন। তিনি পবিত্র, তিনি যাহাকে ইচ্ছা সৎ পথ দেখাইয়া থাকেন। (সূরা আলমায়েদা, ২৭ আয়াত)।

শানে নুযূল ঃ— হাবীল কাবীল নামক হযরত আদমের (আঃ) দুই পুত্র ছিল। তাহারা উভয়ে তাহাদের পরমা সুন্দরী ভগ্নী আকলিমাকে বিবাহ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই সমস্যা মীমাংসার জন্য হযরত আদম (আঃ) উভয় পুত্রকে মিনা পর্বতে যাইয়া আল্লাহ্‌র নামে কোরবানী করার জন্য আদেশ করেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দেন যে, যাহার কোরবানী আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করিবেন তাহার সহিতই আকলিমাকে বিবাহ দেওয়া হইবে ; (তৎকালে আপন ভগ্নী বিবাহ সিদ্ধ ছিল)। এই আদেশ পাইয়া উভয় ভ্রাতা মিনা পর্বতে উপস্থিত হন এবং প্রত্যেকে আল্লাহ্‌র নামে একটি ছাগল কোরবানী করেন ; হাবীলের কোরবানী কবুল হইল, কিন্তু কাবীলের কোরবানী কবুল হইল না, ইহাতে কাবীল ক্রোধান্ধ হইয়া হাবীলকে পাথর দ্বারা হত্যা করিয়া ফেলিল এবং হাবীলের মৃতদেহ কিরূপে গোপন করিবে তাহা স্থির করিয়া উঠিতে

পারিতেছিল না, তখন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কবরস্থ করার নিয়ম শিক্ষা দিবার জন্য কাক প্রেরণ করেন। একটি কাক অপরটিকে নিহত করিল ও ঠোঁট দ্বারা মটি খুঁড়িয়া মৃত কাকটিকে মাটিতে দাফন করিয়া রাখিল। ইহা দেখিয়া কাবীল হাবীলের মৃতদেহ কবরস্থ করিয়া রাখিল। পৃথিবীতে মাটিতে মানুষ দাফন করার ও মানুষ হত্যার ইহাই প্রথম ঘটনা।

অর্থ ঃ— ৫। জিজ্ঞাসা কর— আসমান-জমিনের প্রতিপালক কে ? বলিয়া দাও যে— আল্লাহ। তবে কি তোমরা তাঁহার পরিবর্তে অন্য অভিভাবক নির্ধারণ করিয়াছ? যাহারা নিজেদেরই লাভ ও ক্ষতির পরিবর্তন করিতে পারে না। তুমি বলিয়া দাও যে, অন্ধ ও চক্ষু বিশিষ্ট লোক কি সমতুল্য ; অথবা অন্ধকার ও আলোক সমান ? অথবা তাহারা এইরূপ অংশী উপাস্য স্থির করিতেছে যাহা তাহাদের ন্যায় সৃষ্ট, তাহারাই সৃজন করিয়া রাখিয়াছে ; অনন্তর তাহাদের জন্য কি সেইরূপ সৃষ্টি হইয়াছে ? তুমি বল, আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি পরাক্রান্ত ধ্বংসকারক ; (আল্লাহ চিরস্থায়ী, যাহাকে ইচ্ছা রিযিক ও শক্তি দান করিয়া থাকেন)। (সূরা রা'দ, ১৬ আয়াত)।

শানে নুযূল ঃ— মূর্তি উপাসকদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই আয়াত নাযিল হইয়াছে, ইহাতে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, অংশীবাদিতা অন্ধকারতুল্য ও তওহীদ আলোকের ন্যায় উজ্জ্বল ও সৎপথ প্রদর্শক। কল্পিত দেবদেবীর মূর্তি অসার ও অচেতন পদার্থ এবং মানুষের সৃজিত। আল্লাহই সকলকে সৃষ্টি করেন এবং তিনি সকল বস্তু ধ্বংস করার জন্য সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান।

পড়িবার বিশেষ নিয়ম ঃ— ব্রাকেটের মধ্যে লিখিত আয়াতগুলি তিন তিনবার পড়িবে। ফজর ও মাগরেবের সময় এই আয়াত ৬টি তিনবার পড়িলে শত্রু ও হিংসুক দমন করার জন্য পরশ পাথরতুল্য কার্যকরী হয় ; (ব্রাকেটের ভিতরের আয়াতগুলি দ্বারা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ শক্তি ও সেফাতের স্মরণ করা হয়)।

লোক তাবেদার করার তদবীর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ— বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম ; আল্লা তা'লু আলাইয়্যা ওয়া-তূনী মুসলেমীন।

অর্থ ঃ— পরম করুণাময় ও কৃপাশীল আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করিতেছি)। তোমরা আমার সম্মুখে গর্ব করিও না এবং আত্মসমর্পণ করিয়া আমার নিকট চলিয়া আস। আমাকে উন্নত কর ও খাঁটি মুসলমানের অন্তর্গত কর।

খাসিয়ত ঃ— এই দোয়া ৪০ বার পড়িয়া গোলাপ ফুলের উপর ফুঁক দিয়া যাহাকে শুঁকাইবে সে তাবেদার হইবে। সাবধান! নাজায়েয স্থানে এই আমল করিবে না।

খতমে তাহ্‌লীল

(বিপদমুক্তির খতম)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

উচ্চারণ ঃ— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই)।

১। সকল প্রকার রোগ, বিপদাপদ ও কঠিন মামলা-মোকদ্দমা হইতে উদ্ধার পাওয়ার পক্ষে এই কলেমার আমল অতি কার্যকরী। এই সকল উদ্দেশ্যের জন্য এই কলেমা সোয়া লক্ষবার পড়িতে হয়। রোগীর নিকট বসিয়া এইভাবে পড়িবে, যেন রোগী শুনিতে পায়। হাজার বার পড়া হইলেই রোগ আরোগ্যের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই খতমকে "খতমে তাহ্‌লীল" বলা হয়।

২। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন যে, যে কেহ এই কলেমা একলক্ষ পঁচিশ হাজার বার পড়িয়া মৃত ব্যক্তির রূহের উপর বখশিয়া দিবে, নিশ্চয় গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

খতমে জালালী

নদী ভাঙ্গন বা ঐরূপ কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধারকল্পে এই নাম সোয়া লক্ষ বার কাগজে লিখিবে ও সোয়া লক্ষ ময়দার আটার গুলী তৈয়ার করিবে, গুলী তৈয়ার করার সময় 'আল্লাহ' এই নাম মুখে বলিবে, তৎপর আল্লাহ্‌র নাম লিখিয়া কাগজগুলি একটি করিয়া গুলীর মধ্যে ভরিবে, যে গুলী তৈয়ার করিবে সে-ই কাগজ ভরিবে, তৎপর গুলীগুলি নদী বা যে পুকুরে মাছ থাকে তাহাতে ফেলিয়া দিবে। সকলেই পাক-ছাফ অবস্থায় ওযুসহ এই আমল করিবে। নতুবা হিতে বিপরীত হইতে পারে। এই আমল দ্বারা বিপদ উদ্ধার হইবে ও মতলব পূর্ণ হইবে,

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আল্লাহ তায়ালার নামসমূহ ২ ভাগে বিভক্ত– জালালী (তেজস্বী) ও জামালী (সৌন্দর্যময়)। "আল্লাহ" নাম জালালীর অন্তর্ভুক্ত ; এইজন্য ইহার খতমকে জালালী খতম বলা হয়।

খতমে খাজেগান

কঠিন পীড়া ও বিপদাপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য ও প্রত্যেক প্রকার মনের বাসনা, পরীক্ষা পাস ও চাকরী লাভ করিবার জন্য এই খতমটি অদ্বিতীয় ঃ—

১। সূরা ফাতেহা ৭০ বার, ২। দরূদ শরীফ ১০০ বার, ৩। সূরা আলাম নাশ্‌রাহ্‌ লাকা (৩০ পারা) ৭০ বার, ৪। সূরা এখলাস ১০০০ বার, ৫। পুনরায় সূরা ফাতেহা ৭ বার, ৬। পুনঃ দরূদ শরীফ ১০০ বার ও এই দোয়া ১০০ বার ঃ—

فَسَهِّلْ يَا إِلٰهِي كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ سَهِّلْ بِفَضْلِكَ يَا عَزِيْزُ

উচ্চারণ ঃ— ফাসাহ্‌হিল ইয়া ইলাহী কুল্লা সা'বিম্‌ বিহুর্‌মাতি সাইয়্যিদিল আবরারি সাহ্‌হিল বিফাযলিকা ইয়া আযীযু!

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! নেক্‌কারগণের সরদারের [হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)] সম্মানার্থে আমার প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করিয়া দাও, হে ক্ষমাশীল! তোমার দয়া দ্বারা সহজ করিয়া দাও।

يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ-ইয়া ক্বাযিয়াল্‌ হাযাত! অর্থ ঃ— হে আবশ্যকতা পূর্ণকারী! (১০০ বার)।

يَا كَافِيَ الْمُهِمَّاتِ— ইয়া কাফিয়াল মুহিম্মাত! অর্থ ঃ— হে বৃহৎ কাজ সমাধানকারী! (১০০)

يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ-ইয়া দা-ফিয়াল বালিয়্যাত! অর্থ ঃ— হে বিপদ প্রতিরোধকারী! (১০০)।

يَا مُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ— ইয়া মুজিবাদ্দা'ওয়াত! অর্থ ঃ— হে প্রার্থনা গ্রহণকারী! (১০০)

يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ — ইয়া রাফিয়াদ্দারাজাত! অর্থ ঃ- হে মর্যাদা বর্ধনকারী! (১০০ বার)।

يَا حَلَّالَ الْمُشْكِلَاتِ — ইয়া হাল্লালাল মুশকিলাত! অর্থ ঃ— হে বিপদ দূরকারী! (১০০ বার)

يَا غَوْثُ أَغِثْنِيْ وَأَمْدِدْنِيْ — ইয়া গাওসু আগিস্‌নী ওয়া আমদিদ্‌নী!

অর্থ ঃ— হে প্রার্থনা গ্রহণকারী! আমার প্রার্থনা গ্রহণ কর ও আমাকে সাহায্য কর! (১০০ বার)।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ — ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

অর্থ ঃ— নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র এবং আমরা আল্লাহ্‌র নিকটই ফিরিয়া যাইব। (১০০ বার)।

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ — দোয়ায়ে ইউনুস।

অর্থ ঃ— তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই। তুমি পরম পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি যুলুমকারী প্রতিপন্ন হইয়াছি। (১০০ বার)

সর্বশেষে দরূদ শরীফ একশত বার পড়িবে। এই পর্যন্ত খতম শেষ হইলে সকল নবী, রসূল, মোমেন মুসলমান ও চিস্তিয়া তরিকার পীর ও আওলিয়াগণের রূহ মোবারকের প্রতি এই খতম বখশিয়া দিবে, আল্লাহ্‌র নিকট মনের বাসনা কিম্বা বিপদের সম্বন্ধে মোনাজাত করিবে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহা মঞ্জুর করিবেন। পীর-পীরানগণের উপর দোয়া করা হয় বলিয়া এই খতমের নাম খাজেগান বা পীরান রাখা হইয়াছে। এই খতমের ফযীলত অদ্বিতীয় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

শীঘ্র বিবাহ হওয়ার তদবীর

যে ব্যক্তি প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখিয়া يَافَتَّاحُ (ইয়া ফাত্তাহু) অর্থ ঃ— হে মুক্তকারী আল্লাহ— এই নামটি ৪০ বার পড়িবে, আল্লাহ চাহে তো ৭০ দিনের মধ্যে বিবাহের পাত্র কিম্বা পাত্রী জুটিয়া যাইবে।

দ্বিতীয় তদবীর

(সূরা 'তা-হা' ১৬ পারা)

১। কোর্আনের সূরা 'তা-হা' লিখিয়া সবুজ রঙ্গের রেশমী কাপড়ে জড়াইয়া সংগে লইয়া যেখানে বিবাহের পয়গাম পাঠাইবে, সেখানে কৃতকার্য হইবে ; এই কাপড় সংগে রাখিয়া যাহাদের মধ্যে বিবাদ আছে তাহাদিগকে আপোষ করিতে বলিলে তাহারা আপোষ করিবে, আপোষ অস্বীকার করিতে পারিবে না। যে স্ত্রীলোকের বিবাহ হইতেছে না, এই সূরা লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া সেই পানিতে তাহাকে গোসল করাইলে সহজে বিবাহ হইবে।

এই সূরায় হযরত মূসা নবীর (আঃ) জীবনের বহু অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত হইয়া আল্লাহ্‌র কুদরত প্রকাশ করিয়াছে, সেইজন্য ইহার আমল দ্বারা কাজ সহজসাধ্য হয় ও অসাধারণ ফযীলত লাভ হয়। সোবেহ সাদেকের সময় এই সূরা পড়িলে নূতন নূতন রিযিক লাভ হয়, মনের বাসনা পূর্ণ হয়, মানুষের হৃদয় আকর্ষণ করা যায় ও শত্রুর উপর পরাক্রান্ত হওয়া যায় ; (এই সূরার অন্যান্য ফযীলত সূরা আর্‌রাহমানের ফযীলতের বর্ণনায় দেখুন)।

তৃতীয় তদবীর

এই আয়াত কাগজে লিখিয়া সংগে লইয়া বিবাহের পয়গাম পাঠাইলে পয়গাম মঞ্জুর হইবে।

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

অর্থ ঃ— [হে মুহাম্মদ (সাঃ)!] বল — সমস্ত গৌরব আল্লাহ্‌র নিকট, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রশস্ত, মহাজ্ঞানী, তিনি যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করিয়া বিশিষ্ট করেন। আল্লাহই কল্যাণ করার একমাত্র মালিক ও গৌরবান্বিত। সূরা আলে এমরান, ৭৩-৭৪ আয়াত)।

গলার কাঁটা নামাইবার তদবীর

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ٥

উচ্চারণ ঃ— ফালাও লা ইযা বালাগাতিল হুলকুম। (সূরা ওয়াকিয়া, ৮৩ আয়াত)।

অর্থ ঃ— অতঃপর (মৃত্যুর সময়) প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হইবে, তখন কেন উহা রোধ কর না?

খাসিয়াত ঃ— এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন যে, হে ভ্রান্ত মানব! তোমরা স্মরণ করিয়া দেখ, মৃত্যুর সময় তোমাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে, তখন তোমরা মুহূর্তের জন্যও মৃত্যু রোধ করিতে পারিবে না। সেই অবস্থায় তোমরা কেবল তাকাইয়া থাকিবে ও অনুতাপে চক্ষের পানি ফেলিবে। মানবের সেই মহা সঙ্কটের সময় তাহাদের আত্মীয়-স্বজন কোন সাহায্য করিতে পারিবে না। এই আয়াতে সেই সঙ্কট সময়ের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে ও ইহা দ্বারা প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে বলিয়া স্মরণ করা হয়, সেইজন্য ইহার বরকতে গলার কাঁটা নামিয়া যায়; (বহু পরীক্ষিত)।

এস্তেখারার নিয়ম

(ভবিষ্যৎ বিষয় স্বপ্নে অবগত হওয়া)

হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন যে— এস্তেখারা করা অতি সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি সাহাবাগণকে এস্তেখারা শিক্ষা দিতেন।

(১)

হযরত আলী (কার্রাঃ) বলিয়াছেন যে, স্বপ্নে কোন বিষয়ের ভালমন্দ জানিতে হইলে নিম্নোক্ত নিয়মে রাত্রে শয়ন করিবার পূর্বে দুই রাকাত করিয়া ছয় রাকাত নামায পড়িবে ঃ—

প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ওয়াশ্‌শামছে ৭ বার, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ওয়াল্লায়লে ৭ বার, তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ওয়দ্দোহা ৭ বার, চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইন্‌শেরাহ ৭ বার,

পঞ্চম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা তীন ৭ বার ও ষষ্ঠ রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ক্বদর ৭ বার। নামায শেষ হইলে কয়েকবার দরূদ শরীফ পড়িবে ও এই দোয়া পড়িয়া শুইয়া থাকিবে। তিন রাত্রের মধ্যে কেহ স্বপ্নে ভালমন্দ বলিয়া যাইবে। ৩ রাত্রের মধ্যে না হইলে ৭ম রাত্রে নিশ্চয়ই জানিতে পারিবে।

দোয়াটি এই

اَللّٰهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ وَّرَبَّ اِبْرَاهِيْمَ وَرَبَّ مُوْسٰى وَرَبَّ اِسْحٰقَ وَرَبَّ يَعْقُوْبَ وَرَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَرَبَّ مِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَعَزْرَائِيْلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالزَّبُوْرِ وَالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ اَرِنِىْ فِىْ مَنَامِىَ اللَّيْلَةَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ ٥

অর্থঃ— হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত ইস্‌হাক (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ), হযরত জিব্রাইল (আঃ), হযরত মিকাইল (আঃ), হযরত ইস্রাফীল (আঃ) ও হযরত আজাইল (আঃ) এর প্রতিপালক ও তৌরাত, ইঞ্জিল জাবুর ও কোর্‌আন অবতীর্ণকারী (আল্লাহ)! তুমি রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় যাহা তুমি আমা হইতে অধিকতর জ্ঞাত, তাহা আমাকে অবগত করাইয়া দাও।

দ্বিতীয় নিয়ম

এশার নামাযের পর এই আয়াত ১০০ বার পড়িবে ও আবশ্যকীয় বিষয় চিন্তা করিয়া শুইয়া থাকিবে। স্বপ্নে ভালমন্দ জানিতে পারিবে, এই আয়াত পড়িবার পূর্বে ও পরে কয়েকবার দরূদ শরীফ পড়িয়া লইবে।

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ٥

উচ্চারণ ঃ— সোবহানাকা লা এল্‌মা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আন্‌তাল আলীমুল হাকীম। (সূরা বাক্বারা, ৩২ আয়াত)

অর্থ ঃ— তুমি পরম পবিত্র, আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছ উহা ব্যতীত আমাদের কোন জ্ঞান নাই ; নিশ্চয় তুমি মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

শানে নুযূল ঃ— আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) কে পয়দা করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ফেরেশ্‌তাগণ তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন যে— আদম সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন নাই। আদম (আঃ) কে পয়দা করিলে পৃথিবীতে নানা প্রকার অশান্তি সৃষ্টি করিবে। তাহাদের এই প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাকে সমস্ত বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়া ফেরেশ্‌তাগণের সম্মুখে উপস্থিত করেন এবং ফেরেশ্‌তাগণকে সেইগুলির নাম বলিতে আদেশ করেন। ফেরেশ্‌তাগণ নাম বলিতে অসমর্থ হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট আরজ করিল যে—"হে প্রভু! আপনি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন ইহার বেশী আমাদের জ্ঞান নাই, আপনিই একমাত্র জ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।" আল্লাহ তায়ালা ভবিষ্যতের সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানবান, তাঁহার অগোচর কিছুই নহে স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, ফলে দয়া করিয়া তিনি ভবিষ্যত বিষয়ের অবগতি দিয়া থাকেন।

ন্যায্য মোকদ্দমায় জয়লাভের তদবীর

নিম্নোক্ত দোয়া দৈনিক ১১ শত বার, ১২ দিন পড়িলে মোকদ্দমায় জয়লাভ করা যায়।

يَا بَدِيْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيْعُ ۝

উচ্চারণ ঃ— ইয়া বাদিয়াল আজায়িবি বিল-খায়রি ইয়া বাদিউ।

অর্থ ঃ— হে আশ্চর্য বস্তুসমূহের প্রথম ও উত্তম সৃজনকারী! হে প্রথম সৃজনকারী! (খতমে ইউনুস ও দরূদে তুনাজ্জীনাও বিশেষ ফলপ্রদ)।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কিম্বা ভুল বিচার করার তদবীর

যদি কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে বলিয়া সন্দেহ হয় ; কিম্বা বিচারক ভুল বিচার করিবে বলিয়া ভয় হয়, তবে বিচারকের নিকট মোকদ্দমা পেশ হইবার সময় এই আয়াতগুলি ৭ বার পড়িবে।

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ

صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝ وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ— সুবহানাল্লাহি ওয়া তায়ালা আ'ম্মা ইউশ্‌রিকুন। ওয়া রাব্বুকা ইয়া'লামু মা তুকিন্নু সুদুরুহুম ওয়া মা ইউ'লিনূন। ওয়া হুআল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া লাহুল হামদু ফিল উলা ওয়াল আখিরাতি ওয়া লাহুল হুকমু ওয়া ইলাইহি তুরজাউন। (২০ পারা, সূরা ক্বাসাস, ৬৮ – ৭০ আয়াত)

অর্থ ঃ—১। আল্লাহ্‌ই পরম পবিত্র এবং তিনি অংশী স্থাপন হইতে উন্নত। ২। এবং তাহাদের মন যাহা গোপন করে ও যাহা প্রকাশ করে [হে মুহাম্মদ (সাঃ)] তোমার প্রভু তাহা জ্ঞাত আছেন। ৩। এবং তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তাঁহারই জন্য ইহ-পরকালের সমস্ত প্রশংসা এবং তাঁহারই আদেশ এবং তাঁহারই দিকে (সকলকে) ফিরিয়া যাইতে হইবে।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই আয়াতে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি সকলের অন্তরের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় জ্ঞাত আছেন এবং তিনিই আদেশ দেওয়ার একমাত্র মালিক, তাঁহার আদেশের উপর আর কাহারও আদেশ চলিতে ও কার্যকরী হইতে পারে না এবং তাঁহার আদেশ কখনও ভুল হইতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার এই সকল সেফাতের বর্ণনা করা হয় বলিয়া এই আয়াতের আমলের বরকতে বিচারকের ভুল-ভ্রান্তি ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার প্রমাদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

জেল হইতে বাঁচিবার তদবীর

কাহারও জেল হইবার আশঙ্কা হইলে নিজে বা অপর কেহ ৪০ দিন যাবৎ সূরা ইউসুফ পড়িবে। এই সূরায় হযরত ইউসুফ নবী (আঃ) এর জেল হইতে মুক্তি পাওয়ার ঘটনার বর্ণনা রহিয়াছে।

বাণ দফার তদবীর

কাহারও প্রতি বাণ প্রয়োগ করিলে এই আয়াত ৭ বার পড়িয়া পানিতে ফুঁক দিয়া রোগীকে গোসল করাইবে ও কতক পানি খাওয়াইয়া দিবে। ইন্‌শাআল্লাহ বিপদ দূর হইবে।

اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ*

উচ্চারণ ঃ— আম আবরামূ আমরান্ ফাইন্না মুবরিমূন।

অর্থ ঃ— তবে কি তাহারা কোন বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে ? কিন্তু আমিই নির্দিষ্টকারী।

আগুন নিভাইবার তদবীর

ঘরে আগুন লাগিলে হাতে মাটি লইয়া এই আয়াত ৭ বার পড়িয়া মাটিতে ফুঁক দিবে ও ঐ আগুনে নিক্ষেপ করিবে, ইন্‌শাআল্লাহ আগুন নিভিতে থাকিবে।

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ٥

উচ্চারণ ঃ— কুল্‌না ইয়া নারু কূনী বারদাওঁ ওয়া সালামান আলা ইব্রাহীম। (সূরা আম্বিয়া, ৬৯ আয়াত)

অর্থ ঃ— আমি (আল্লাহ) বলিয়াছিলাম— হে আগুন! শীতল হইয়া যাও এবং ইব্রাহীমের প্রতি শান্তি বর্ষণ কর।

শানে নুযূল ঃ— হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে নমরূদ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলে হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, আপনি বলুন, এখনই আপনাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাই। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এই কথা শুনিয়া উত্তর দেন যে, আমি আপনার নিকট কেন সাহায্যপ্রার্থী হইব ? যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন সেই পরওয়ারদেগারই আমাকে রক্ষা করিবেন। তাঁহার এই উত্তরে আল্লাহ পাক যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে খলীলুল্লাহ (আল্লাহ্‌র দোস্ত) বলিয়া সম্বোধন করেন। তদবধি তিনি খলীলুল্লাহ নামে জগতে পরিচিত হইতেছেন। নমরূদ যখন হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল— তখন আল্লাহ তায়ালা এই আদেশ দ্বারা আগুন নিভাইয়া দিয়াছিলেন। আগুন নিভিয়া যাওয়ার জন্য এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালার একটি আদেশ রহিয়াছে ও শেষ আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রতি শান্তি নাযিল হওয়ার কথা রহিয়াছে, এই সকল কারণে ইহার আমল দ্বারা আগুন নির্বাপিত হয় ও জ্বর (শরীরের তাপ) কমিয়া যায় ; (অন্যান্য তদবীর আসহাবে কাহ্‌ফের তফসীরে দেখুন)।

অন্যান্য ফযীলত ঃ— ১। সর্দি-গর্মির জ্বর হইলে এই আয়াত লিখিয়া তাবিয করিয়া গলায় বাঁধিয়া দিলে ইন্‌শাআল্লাহ জ্বর দূর হইবে।

২। এই আয়াতটি 'আখসারীন' শব্দ পর্যন্ত ৭ বার পড়িয়া সরিষার তৈলে ফুঁক দিয়া কাটা ঘায়ে লাগাইলে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

দ্বিতীয় তদবীর

ঘরে আগুন লাগিলে اَللّٰهُ اَكْبَرُ— আল্লাহু আকবার তকবীরটি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকিলে ইন্‌শাআল্লাহ আগুন নিভিয়া যাইবে।

স্বপ্নদোষের অতি সহজ ও উত্তম তদবীর

নিদ্রা যাওয়ার সময় হাত বুকের উপর রাখিয়া আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত পবিত্র নাম দুইটি ১৫০ বার পড়িয়া শুইয়া থাকিবে, পড়ার পর কথা বলিবে না, ইন্‌শাআল্লাহ স্বপ্নদোষ হইবে না।

اَلسَّمِيْعُ اَلْمُمِيْتُ—আস্‌সামীউল মোমিত। অর্থ ঃ— শ্রবণকারী ও সংহারক (আল্লাহ)।

তৃতীয় তদবীর

(সূরা নূহের আমল, ২৬ পারা)

১। সূরা নূহ্ পড়িয়া শুইলে স্বপ্নদোষ হইবে না।

২। এই সূরা একা বা বহু লোক মিলিয়া এক হাজার বার পড়িলে প্রবল শত্রুও দমিয়া যাইবে ও শত্রুপক্ষ ভীষণভাবে পরাজিত হইবে।

সূরা তারেকের আমল

সূরা তারেকের (৩০ পারা) প্রথম ১০টি আয়াত পড়িয়া শুইলে স্বপ্নদোষ হইবে না।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— সূরা নূহ্ ও সূরা তারেকের প্রথম ১০ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানবের সৃষ্টি রহস্যে নিহিত কুদরতের বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, মানুষ মাটি হইতে এবং সাক্ষাৎভাবে পানির ন্যায় বীর্য হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, এই সৃষ্টি রহস্য ভেদ করা মানুষের জ্ঞানের বহির্ভূত। এই বিষয় চিন্তা করিলে আল্লাহ তায়ালার অসীম শক্তি ও কুদরত মানুষের মনে ধাঁধা

লাগাইয়া দেয়, এইরূপভাবে মানুষের সৃষ্টি রহস্যের বর্ণনা হইয়াছে বলিয়া ও মানুষের বীর্যের মধ্যে আল্লাহ্র কুদরত নিহিত আছে বর্ণিত হওয়ায় আয়াতগুলির আমল দ্বারা স্বপ্নদোষ হইতে বীর্য রক্ষা পায়।

শিশুর কান্না নিবারণের তদবীর

ছোট শিশু বদ নজরের দোষে কাঁদিতে থাকিলে এই আয়াত ৭ বার পড়িবে; প্রত্যেকবার পড়িয়া একটি সূতায় গিরা দিবে। এইরূপ ৭টি গিরা দিবে ও সূতাটি শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিবে, কান্না থামিয়া যাইবে ও বদ নজর দূর হইবে।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۙ وَالْمَلٰۤئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

উচ্চারণ ঃ— শাহিদাল্লাহু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া ওয়াল মালায়িকাতু ওয়া উলুলু ইলমি ক্বায়িমাম বিল্‌ক্বিস্‌তি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল আযীযুল হাকীম।

(সূরা আলে এমরান, ১৮ আয়াত)

অর্থ ঃ— আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, নিশ্চয় তিনি ভিন্ন অন্য উপাস্য নাই এবং ফেরেশ্‌তাগণ ও জ্ঞানীগণ তাঁহার সুবিচার বিশ্বাস করেন এবং সেই মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তৌহীদের সাক্ষ্য দিতেছেন। তৌহীদের শক্তি বর্ণনা করা অসম্ভব, তৌহীদের বাণীর তেজে কান্না থামিয়া যায়।

বজ্রপাত হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায়

বিদ্যুৎ চমকাইতে থাকিলে এই আয়াত পড়িলে ইন্‌শাআল্লাহ নিরাপদে থাকিবে।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰۤئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۝

উচ্চারণ ঃ— ওয়া ইউছাব্বিহুর্ রা'দু বিহামদিহী ওয়াল মালায়িকাতু মিন খীফাতিহী। (সূরা রা'দ, ১৩ আয়াত)

অর্থ ঃ— অনন্তর মেঘ গর্জন প্রশংসার সহিত তাঁহার (আল্লাহ্র) পবিত্রতা বর্ণনা করে ও ফেরেশ্‌তাগণ ভয়ে তাঁহার যিকির করে।

শানে নুযূল ঃ— অবিশ্বাসীগণকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে বলিয়াছেন যে, যাহারা আল্লাহ্র শক্তি-মহিমা অবিশ্বাস করে, বজ্রপাত ও বজ্রধ্বনি তাহাদের চক্ষের সামনে আল্লাহ্র শক্তি ও মহিমার সাক্ষ্য দিতেছে, ইহাতে তাহাদের সাবধান হওয়া উচিত। বজ্রপাতের বর্ণনা দ্বারা আল্লাহর শক্তি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার বরকতে বজ্রপাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় তদবীর

বজ্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা হইলে এই দোয়াটি পড়িবে ঃ—

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ ۝

উচ্চারণ ঃ— আল্লাহুম্মা লা তাক্বতুলনা বিগাযাবিকা ওয়া লা তুহ্‌লিকনা বিআযাবিকা ওয়া আফিনা ক্বাব্‌লা যালেকা। (গোনিয়াতুত্তালেবীন)।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! তুমি তোমার অভিশাপ দ্বারা আমাদিগকে বধ করিও না এবং তোমার শাস্তি দ্বারা আমাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিও না, এই সমুদয় ঘটিবার পূর্বে আমাদিগকে রক্ষা কর।

পরীক্ষা পাসের তদবীর

এই দোয়াটি এক হাজার বার পড়িবে ও পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় লিখিয়া টুপির ভিতরে রাখিবে ও পড়িতে থাকিবে, ইন্‌শাআল্লাহ নিশ্চয় পাস হইবে ;(ইহা বিশেষ পরীক্ষিত)।

يَا اِلٰهَ الْعٰلَمِيْنَ يَا خَيْرَ النّٰصِرِيْنَ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاللّٰهُ خَيْرُ الْحَافِظِيْنَ - حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ - وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ - وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ— ইয়া ইলাহাল আ'লামীন ইয়া খায়রান্নাসিরীনা নাসরুম্ মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন ক্বারীব। ওয়া বাশ্‌শিরিল মু'মিনীনা ফাল্লাহু খায়রুল হাফিযীনা হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'য়মাল ওয়াকিল, নি'য়মাল মাওলা ওয়া নি'য়মান্নাসীর ওয়া মাঁই ইয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহি ফাহুয়া হাসবুহু ওয়াল্লাহুল মুস্‌তাআনু আলা মা তাসিফুন।

অর্থ ঃ— হে বিশ্বজগতের উপাস্য (আল্লাহ)! হে উত্তম সাহায্যকারী, আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য, আল্লাহ্‌র নিকট জয় ; এবং বিশ্ববাসীগণকে শুভ সংবাদ দাও যে, আল্লাহ্‌ই উত্তম রক্ষক। আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য অতি উত্তম কার্যকারক, শ্রেষ্ঠ মনিব ও উত্তম সাহায্যকারী। যাহারা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে আল্লাহই তাহাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারীদের জন্য আল্লাহ্‌ই সাহায্যকারী।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই দোয়া পাঠে আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপর নির্ভর করা হয়।

বিচারক সদয় হওয়ার তদবীর

বিচারক যাহার সহিত মতানৈক্যকারী ও ক্রুদ্ধ হয়, সে এই আয়াত পড়িয়া কিম্বা লিখিয়া বাজুতে বাঁধিয়া রাখিলে ইনশাআল্লাহ বিচারক সদয় হইবে—

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

(সূরা বাক্বারা, ১৩৭ আয়াত)

উচ্চারণ ঃ— ফাছাইয়াকফীকাহুমুল্লাহু ওয়া হুয়াস্‌ সামীউল আলীম।

অর্থ ঃ— শীঘ্রই আল্লাহ তাহাদের বিপক্ষে তোমাকে যথেষ্ট শক্তিশালী করিবেন এবং তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

শানে নুযূল ঃ— ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের কতকগুলি সামাজিক কুপ্রথা ছিল। যথা ঃ— জর্ডন নদীর পানিতে গোসল করা, পীত বর্ণের অথবা হলুদ রঙের পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি। মুসলমানগণের এরূপ কোন প্রথা ছিল না বলিয়া তাহারা গর্ব করিত। সেইজন্য আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলিয়া দিলেন যে, আল্লাহ্‌ই উত্তম বর্ণদাতা। যদি তাহারা গর্বভরে চলিয়া যায় তবে চিন্তা করার কোন কারণ নাই, যেহেতু তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বিপক্ষের উপর শক্তিশালী করিয়া দিবেন। এই আয়াতে শক্তিশালী করার একটি আশ্বাসবাণী থাকায় ইহার বরকতে উপরোক্ত ফযীলত লাভ হয়।

দ্বিতীয় তদবীর

সূরা মোয্‌যাম্মিল ও সূরা আর-রাহ্‌মান পড়িয়া হাকিমের নিকট গেলে সদয় ব্যবহার লাভ করা যায় ; (পাঞ্জ সূরায় বিস্তারিত তফসীর দেখুন)।

তৃতীয় তদবীর

এই আয়াত ৩ বার পড়িয়া নিজের উপর ফুঁক দিয়া হাকিমের সম্মুখে গেলে হাকিম সদয় হন —

اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

উচ্চারণ ঃ— আতাইনাহুম মিন আয়াতিম বাইয়্যিনাতিন্ ওয়া মাই ইউবাদ্দিল নি'মাতাল্লাহি মিম্ বা'দি মা জা-য়াত্‌হু ফাইন্নাল্লাহা শাদীদুল ইক্বাব।

অর্থ ঃ— আমি তাহাদিগকে (বনী ইস্‌রাইলকে) কত প্রকার প্রকাশ্য নিদর্শন প্রদান করিয়াছি ; অনন্তর যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সম্পদ আসার পর তাহা পরিবর্তন করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাহাকে ভীষণ শাস্তি দিয়া থাকেন।

শানে নুযূল ঃ— হযরত মূসা (আঃ) বহু অলৌকিক মা'জেযা দেখাইয়া আল্লাহর শক্তি ও কুদরতের নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন ঃ তথাপি ইহুদীগণ আল্লাহ্‌র অবাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের অবাধ্যতার দরুন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর নানা প্রকার গযব প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই আয়াতে তাহাদের এইরূপ গযবের অবস্থা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তায়ালা মুসলামনদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন ও কঠোর শাস্তির ভয় দেয়াইয়াছেন। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালার কঠোর শাস্তির কথা থাকায় ইহার খাসিয়তে বিচারক নম্রভাব ধারণ করেন।

বিচারকের দয়া আকর্ষণ করার আমল

١. كٓهٰيٰعٓصٓ - كُفِيْتُ ٢. حٰمٓ - عٓسٓقٓ - حُمِيْتُ

উচ্চরণ ঃ— ১। ক্বাফ, হা, ইয়া, আঈন, সোয়াদ; কুফীতু। (সূরা মরিয়মের আরম্ভ)। ২। হা, মীম; আঈন-সীন-ক্বাফ ; হামীতু। (সূরা শূরার প্রথম)।

বর্ণনা ঃ— ক্বাফ, হা, ইয়া, আঈন সোয়াদ এই ৫টি বর্ণযোগে সূরা মরিয়ম আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে — এই ৫টি বর্ণ আল্লাহ তায়ালার ৫টি নামের আদ্য অক্ষর। ইহা অনুমান মাত্র। আল্লাহ ব্যতীত কেহ ইহাদের অর্থ ও মর্ম অবগত নহে, এই অক্ষরগুলির বিশেষ শক্তি ও খাসিয়ত (ক্রিয়া) আছে।

২। হা, মীম, আঈন, সীন, ক্বাফ এই ৫টি বর্ণযোগে সূরা শূরা আরম্ভ হইয়াছে ; এই ৫টি অক্ষর আল্লাহ তায়ালার ৫টি নামের আদ্য অক্ষর বলিয়া অনুমান করা হয় ; ইহাদের বিশেষ শক্তি ও খাসিয়ত আছে।

খাসিয়ত ঃ— বিচারক ক্রুদ্ধ হইলে তাহার নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বে প্রথম ৩ বার বিসমিল্লাহ পড়িয়া ক্বাফ, হা, ইয়া, আঈন, সোয়াদ— এক একটি হরফ পড়িবে ও ডান হাতের এক একটি আঙ্গুল বন্ধ করিবে ও তৎপর 'কুফীতু' (অর্থাৎ আমি কামনা করিলাম) শব্দটি একবার পড়িবে ও তৎপর এইরূপ হা, মীম, আঈন, সীন ও ক্বাফ — এক এক হরফ পড়িবে। বাম হাতের এক একটি আঙ্গুল বন্ধ করিবে ও তৎপর 'হামীতু' (আমি রক্ষা করিলাম) শব্দটি ১ বার বলিবে। পুনরায় ক্বাফ, হা, ইয়া আঈন, সোয়াদ এক একটি হরফ পড়িবে ও ডান হাতের এক একটি আঙ্গুল খুলিতে থাকিবে। এইরূপে উভয় হাতের আঙ্গুল খোলা হইলে পর বিচারকের দিকে ফুঁক দিবে ও সন্তর্পণে ২ হাত খুলিয়া দেখাইবে। এই তদবীরে হাকিম ও জমিদার সদয় চক্ষে দেখিবেন।

দ্বিতীয় তদবীর

এই দোয়া ৭ বার পড়িয়া হাকিমের চেহারার দিকে ফুঁক দিলে ইন্‌শাআল্লাহ হাকিম সদয় হইবে।

يَا رَحْمٰنُ كُلِّ شَيْءٍ وَّرَاحِمَهٗ يَا رَحْمٰنُ *

উচ্চারণ ঃ— ইয়া রাহমানু কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া রাহিমাহু ইয়া রাহমানু।

অর্থ ঃ— হে সর্ববিষয়ের জন্য (আল্লাহ) অতি দয়াবান। হে দয়াবান, তুমিই সর্ববিষয়ে দয়ালু।

তৃতীয় তদবীর

সূরা নাবা (৩০ পারা) পড়িয়া কিম্বা লিখিয়া সঙ্গে রাখিয়া হাকিমের নিকট গেলে হাকিমের ক্রোধ নষ্ট হয় ; এই সূরায় আল্লাহ তায়ালার নানা প্রকার কুদরতের (শক্তির) বর্ণনা রহিয়াছে।

নৌকা, জাহাজ কিম্বা গাড়ীতে নিরাপদ থাকার তদবীর

নৌকা, জাহাজ কিম্বা গাড়ীতে উঠিবার পূর্বে এই আয়াত পড়িলে ইনশাআল্লাহ নিরাপদে থাকা যায়।

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا - اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

উচ্চারণ ঃ— বিসমিল্লাহে মাজ্‌রেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাব্বী লাগাফুরুর্‌রাহীম। (সূরা হুদ, ৪১ আয়াত)।

অর্থ ঃ— আল্লাহ্‌র নামেই ইহার গতি ও অবস্থান, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

শানে নুযূল ঃ— হযরত নূহ নবী (আঃ) মহাপ্লাবনের সময় জাহাজে উঠিবার পূর্বে এই দোয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার বরকতে তিনি তুফানের সময় নিরাপদ ছিলেন, এই দোয়া দ্বারা আল্লাহ তায়ালার দয়ার উপর নির্ভর করা হয়।

দ্বিতীয় তদবীর

নৌকা কিম্বা জাহাজে আরোহণ করিবার পূর্বে এই আয়াত পড়িলেও নিরাপদে থাকা যায়।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

উচ্চারণ ঃ— ওয়ামা ক্বাদারুল্লা হাক্কা ক্বাদরিহি, ওয়াল আরদু জামিয়ান ক্বাবযাতুহু ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ওয়াস্‌সামাওয়াতু মাতভিয়্যাতুম্ বিইয়ামিনিহী, সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আম্মা ইউশরিকুন। (সূরা যোমার, ৬৭ আয়াত)

অর্থ ঃ— অথচ আল্লাহকে যেরূপ সম্মান করা উচিত ছিল তাহারা সেরূপ উপযুক্ত সম্মান করে নাই ; বস্তুতঃ কেয়ামতের দিন সমস্ত ভূমণ্ডল তাঁহার মুষ্টির মধ্যে থাকিবে এবং আকাশসমূহ (একটি পাত্রের ন্যায়) তাঁহার দক্ষিণ হস্তে জড়ান থাকিবে। আল্লাহই পবিত্রতম ; তাহারা যে অংশী স্থির করে তিনি তাহা হইতে অতি উন্নত।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই আয়াতে কেয়ামতের দিনের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে ; আল্লাহ তায়ালার অসীম ক্ষমতা ও প্রতাপের উল্লেখ হইয়াছে এবং

তৌহীদের সত্যতা ও আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, দোজাহানে আল্লাহ্‌র শক্তির উপর কোন শক্তিই নাই। তাঁহার অসীম শক্তির বর্ণনার বরকতে পাঠকারী নিরাপত্তা লাভ করে।

আরোহণ করার জন্তু বশীভূত করার তদবীর

ঘোড়া, হাতী ইত্যাদি মনিবের অবাধ্য হইয়া পড়িলে কিম্বা পিঠে আরোহণ করিতে না দিলে এই আয়াত পড়িয়া ঐ জন্তুর কানে ফুঁক দিবে, ইন্‌শাআল্লাহ তাহারা বাধ্য হইবে ও দুষ্টামি করিবে না।

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ— আফাগায়রা দীনিল্লাহি ইয়াবগুনা ওয়া লাহু আসলামা মান ফিস্‌সামাওয়াতি ওয়াল আরদি তাওআঁও ওয়া কারহাওঁ ওয়া ইলাইহি ইউরজাউন। (সূরা আলে এমরান, ৮৩ আয়াত)

অর্থ ঃ— তবে কি তাহারা আল্লাহ্‌র দীন ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে ? এবং যাহা আকাশে ও ভূতলে আছে ইচ্ছা ও অনিচ্ছায় সকলেই তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইবে।

দ্বিতীয় তদবীর

سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ— সুবহানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্‌রিনীন।

(সূরা যোখ্‌রোফ, ১৩ আয়াতের শেষ অংশ)।

অর্থ ঃ— তিনিই পবিত্রতম, যিনি উহাদিগকে (চতুষ্পদ জন্তু) আমাদের আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়াছেন ; বস্তুতঃ আমরা এইরূপ করিতে সক্ষম নহি।

শানে নুযূল ঃ— এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, চতুষ্পদ জন্তু তাঁহার হুকুমেই মানুষের বশে আসিয়াছে এবং তিনি বলিয়াছেন যে, ইহাদের উপর চড়িবার পূর্বে এই আয়াত পড়িও। স্বয়ং আল্লাহ যাহা পড়িতে আদেশ দিয়াছেন তাহা হইতে উত্তম আর কি হইতে পারে ?

ঝড় তুফান হইতে রক্ষা পাইবার তদবীর

নদী বা সমুদ্রে ঝড়-তুফান উঠিলে এই আয়াত ২টি লিখিয়া পানিতে ফেলিয়া দিলে আল্লাহ্‌র রহমতে তুফান শান্ত হইয়া যাইবে।

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ أَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۝

(সূরা আন্‌ আ'ম, ৬৩ – ৬৪ আয়াত)

অর্থ ঃ— ১। জিজ্ঞাসা কর— ভূতল ও সমুদ্রের অন্ধকার হইতে কে তোমাদিগকে উদ্ধার করে ? যখন তোমরা তাঁহাকে বিনয় সহকারে ও গোপনে ডাকিয়া থাক যে, যদি তিনি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, তবে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞগণের অন্তর্ভুক্ত হইব।

২। তুমি বল, আল্লাহ্‌ই ইহা হইতে এবং সকল দুঃখ ও বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, তৎপরও তোমরা অংশীবাদিতা কর।

শানে নুযূল ঃ— আরবের অংশীবাদীরা গভীর সমুদ্রে বা অন্য কোন বিপদে পড়িলে তাহাদের দেব-দেবীর কথা ভুলিয়া আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইত ; আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলিয়া দিলেন যে, তুমি কাফেরগণকে জানাইয়া দাও যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তিনি তোমাদিগকে সাহায্য করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। এই আয়াত দ্বারা ঝড়, তুফান ও সামুদ্রিক বিপদের সময় আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের বিষয় বর্ণনা করা হয় বলিয়া ঝড় তুফানে তাঁহার রহমত লাভ করা যায়।

দ্বিতীয় তদবীর

তুফানের সময় এই দোয়া পড়িলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهٖ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهٖ ۝

উচ্চারণ ঃ— আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা উরসিলাত বিহী ওয়া আউযু বিকা মিন শাররিহা ওয়া মিন্‌ শাররি মা উরসিলাত বিহী।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট সর্ববিষয়ে মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি এবং যে সকল বস্তুর সহিত মঙ্গল প্রেরিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত বস্তুর মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। আর সমুদয় অমঙ্গলযুক্ত বস্তু হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

তৃতীয় তদবীর

প্রবলবেগে বাতাস বহিতে থাকিলে এই আয়াত অনেকবার পড়িলে বাতাসের বেগ কমিয়া যায় ও ইহা অনেকবার পড়িলে শত্রুর অত্যাচার হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ
الْخَبِيْرُ ۝

(সূরা আন্আম, ১০৪ আয়াত)

অর্থ ঃ— চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না ; অথচ তিনি সকল বস্তু দেখিতে পান, বস্তুতঃ তিনি সূক্ষ্মদর্শী অভিজ্ঞ।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, মানুষের চক্ষু আল্লাহকে দর্শন করিতে পারে না ; কিন্তু তিনি সকল বস্তু দেখিতেছেন। মানবের স্থূলদৃষ্টি স্থূল পদার্থ ব্যতীত কোন সূক্ষ্ম পদার্থ দেখিতে পায় না। আল্লাহ তায়ালার সকল শক্তিই বিজ্ঞানময়, মানুষের পক্ষে আল্লাহকে দর্শন করা দূরের কথা, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বাতাসকে পর্যন্ত দেখিতে পায় না। এই আয়াতে আল্লাহ্‌র শক্তি ও মহিমা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার দ্বারা বাতাসের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

সূরা বাক্বারা-এর শেষ দুইটি আয়াতের ফযীলত

হযরত জিব্রাইল (আঃ) হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলিয়াছেন যে— আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দুইটি নূর দিয়াছেন, যাহা পূর্বে কোন নবী প্রাপ্ত হন নাই ; ইহার একটি সূরা ফাতেহা, অপরটি সূরা বাক্বারা-এর শেষ দুইটি আয়াত।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۚ كُلٌّ

اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟
وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۟ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ
اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۭ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۭ رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ
وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

অর্থ ঃ— ১। তাঁহার প্রতিপালক হইতে যাহা নাযিল হইয়াছে রসূল তাহা বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাসীগণও সকলেই আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণের প্রতি, পয়গম্বরগণের প্রতি ও তাঁহার প্রেরিত কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস করে এবং আমরা তাঁহার রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না; তাহারা বলেন যে-- আমরা শুনিলাম ও স্বীকার করিলাম ; হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং আমরা তোমারই দিকে ফিরিয়া যাইব।

২। আল্লাহ কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না এবং যে যাহা উপার্জন করিয়াছে তাহা তাহারই জন্য সীমাবদ্ধ এবং যে যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা তাহার উপর বর্তাইবে। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমাদের ভুল বা ত্রুটি হয়, সে জন্য আমাদিগকে ধৃত করিও না। আমাদের পূর্বে যাহারা চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রতি যেরূপ কঠিন ভার দিয়াছিলে আমাদের উপর সেরূপ কঠিন ভার দিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! যাহা আমাদের শক্তির বাহিরে তাহা আমাদের উপর দিও না, আর আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উপর দয়া কর, তুমিই আমাদের একমাত্র মালিক, অতএব কাফের সম্প্রদায়ের উপর আমাদিগকে সাহায্য কর।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রিয় রসূল ও ঈমানদারগণের নিদর্শন বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মর্ম এই যে, যাহারা আল্লাহ্‌র রসূল ও নবীগণের ন্যায় তাঁহার অবতীর্ণ কোরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহ, ফেরেশ্‌তা ও রসূলগণকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহারাই প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমান। তাহাদের নিকট সকল নবীই সমান সম্মান ও ভক্তির পাত্র ; যদিও কোন কোন নবী ও রসূলকে আল্লাহ তায়ালা বিশেষরূপে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। শেষ আয়াতে ইহ-পরকালের মুক্তির জন্য সাহায্য প্রার্থনা আছে, এই আয়াত দুইটি ঈমানের স্তম্ভস্বরূপ, এই সকল বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিলে ঈমানদার হওয়া যায় না। এই আয়াত পাঠে নবী, রসূল, ফেরেশ্‌তা ও আসমানী কিতাবসমূহের সত্যতার সাক্ষ্য দেওয়া হয়, ফলে তাহাদের দোয়া লাভ হয়, আল্লাহ তায়ালার রহমত নাযিল হয় ও ইহপরকালের অশেষ কল্যাণ লাভ হয়।

ফযীলত ঃ— ১। প্রত্যেক রাত্রে এই আয়াত দুইটি পড়িয়া শুইলে চোর ও ডাকাতের আক্রমণ হইতে নির্ভয়ে থাকা যায়।

২। এই আয়াত দুইটি কোন পাক পাত্রে কালি দ্বারা লিখিয়া যে কূপে আবর্জনা বা নাপাক বস্তু নাই এবং যাহার পানি পরিষ্কার ও যাহাতে রৌদ্র প্রবেশ করে না এরূপ কূপের পানিতে ঐ লেখা ধুইয়া বাসিমুখে পানি খাইলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হয়, মনের গতি স্থির হয় ও শত্রুর অপকার হইতে নিরাপদ থাকা যায়।

৩। নিয়মিতভাবে প্রত্যহ আয়াতুল কুরসী ও এই আয়াত দুইটি পড়িলে কখনও অভাব-অনটন হয় না, ঋণ পরিশোধ হয়, শত্রুগণ ধ্বংস হয় ও মনের সকল বাসনা পূর্ণ হয় এবং বিপদাপদ দূর হয়।

৪। বিপদের সময় আয়াতুল কুরসী ও এই আয়াত দুইটি পড়িলে ইন্‌শাআল্লাহ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ হয়।

হযরত রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) নিজের আমল

(দোয়া কবুল হওয়ার অব্যর্থ আমল)

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) প্রত্যহ তাহাজ্জুদ নামাযের পর সূরা আলে এমরানের শেষ ১১টি আয়াত পড়িতেন। এই সময় আয়াতগুলি পড়িয়া আল্লাহ্‌র নিকট যে দোয়া চাহিবে তাহাই কবুল হইবে (কিন্তু বিষয়টি সৎ হওয়া চাই)।

আমাদের হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে যে আমল করিয়া গিয়াছেন তাহা অতি উত্তম তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই আয়াতগুলিতে কয়েকটি বিশেষ মোনাজাত রহিয়াছে, হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই মোনাজাতগুলি পড়িতেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

١- اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ٢- الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا
وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٣- رَبَّنَآ اِنَّكَ
مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ٤- رَبَّنَا
اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ق رَبَّنَا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ٥- رَبَّنَا
وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ
لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ٦- فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ
عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ج بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ج فَالَّذِيْنَ
هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا

وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهٰرُ ج ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ○ ٨ لَا يَغُرَّنَّكَ

تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ○ ٧ - مَتَاعٌ قَلِيْلٌ قف ثُمَّ مَأْوٰهُمْ

جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○ ٩ - لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَمَا عِنْدَ

اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ٭ ١٠ - وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ

وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لا لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ

اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط أُولٰٓئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ

الْحِسَابِ ○ ١١ - يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا

وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

অর্থ ঃ— ১। নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবী সৃজন ব্যাপারে ও দিবা-রাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানবানগণের জন্য (আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের) নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে।

অর্থ ঃ— ২। যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শায়িতাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি কৌশলের বিষয় চিন্তা করে এবং (বলিয়া থাকে) যে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইহা অনর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি মহাপবিত্র, অতএব আমাদিগকে দোযখের আগুন হইতে রক্ষা কর।

অর্থ ঃ— ৩। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিয়াছ বস্তুতঃ তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছ, আর সেখানে অত্যাচারীগণের কেহই সাহায্যকারী নাই।

অর্থ ঃ— ৪। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবানকারীকে [হযরত মুহাম্মদ সাঃ] ঈমানের দিকে আসিবার জন্য আহবান করিতে শুনিয়াছিলাম যে, আপন প্রতিপালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, এই কথাতেই আমরা ঈমান আনিয়াছি, অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আর আমাদের অমঙ্গলসমূহ (পাপ) দূর কর এবং ধার্মিক বান্দাগণের সহিত আমাদিগকে মৃত্যু দান কর।

অর্থ ঃ— ৫। আর হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের রসূলগণের মারফত (ভিন্ন ভিন্ন সময়ে) যে পুরস্কারের অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা আমাদিগকে দান কর এবং কেয়ামতের দিন আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিও না, নিশ্চয় তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না।

অর্থ ঃ— ৬। অনন্তর আমাদের প্রতিপালক প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন ও বলিলেন যে— আমি তোমাদের পুরুষ বা নারীগণের কাহারও কোন কৃতকর্ম বৃথা যাইতে দিব না। তোমরা পরস্পর এক শ্রেণীভুক্ত ; অতএব যাহারা আমার উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করিয়াছে, নিজ গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে ও আমার দীনের জন্য নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, জেহাদ করিয়াছে ও নিহত হইয়াছে, নিশ্চয় আমি তাহাদের অপরাধসমূহ (অমঙ্গল) মুছিয়া ফেলিব এবং নিশ্চয় তাহাদিগকে বেহেশ্‌তে দাখিল করিব, যাহার নিম্নে প্রস্রবণ প্রবাহিত থাকিবে ; আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ইহাই তাঁহাদের কাজের প্রতিদান এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভই উত্তম প্রতিদান।

শানে নুযূল ঃ— হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর নিকট একদিন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন যে, কোরআন শরীফের মধ্যে নারী জাতির প্রতি হিজরতের আদেশসূচক কোন আয়াত কি নাযিল হয় নাই ? এই প্রশ্নের উত্তরে এই আয়াত নাযিল হয় এবং জানাইয়া দেওয়া হয় যে, পুরুষ কিম্বা নারীগণের মধ্যে যে কেহ সৎকার্য করিবে আল্লাহ তাহার প্রতিফল প্রদান করিবেন।

অর্থ ঃ— ৭। তোমরা কাফেরগণের শহরে যাওয়ায় যেন তাহারা তোমাদিগকে প্রতারিত না করে ; (সে বিষয়ে সাবধান হও)।

অর্থ ঃ— ৮। (পৃথিবীর সুখ) যৎসামান্য সম্পদ, অনন্তর কাফেরগণের অবস্থান দোযখ—নিকৃষ্ট স্থান।

অর্থ ঃ— ৯। কিন্তু যাহারা আপন প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের জন্য বেহেশতের বাগান রহিয়াছে — যাহার নিম্নে নদী প্রবাহিত থাকিবে, তন্মধ্যে

তাহারা চিরকাল বাস করিবে, ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে নিমন্ত্রণ এবং যাহা আল্লাহ্‌র নিকটতম ধার্মিকগণের জন্য তাহাই উত্তম ; (কল্যাণকর)।

অর্থ ঃ— ১০। নিশ্চয়ই কিতাবিয়াগণের মধ্যে এমন লোক আছে, যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তোমার প্রতি যাহা (কোর্‌আন) নাযিল হইয়াছে আল্লাহ্‌র ভয়ে তাহা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহ স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে না (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রতি অবহেলার ভাব দেখায় না), তাহাদের জন্যই আপন প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রহিয়াছে, নিশ্চয় আল্লাহ শীঘ্র হিসাব গ্রহণকারী ; (এই প্রতিদানের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না)।

শানে নুযূল ঃ— ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের মধ্যে যাহারা কোনরূপ স্বার্থের প্ররোচনায় তওরাত, যাবুর ও ইঞ্জীলে বর্ণিত হযরত রসূল (সাঃ) এর নবুয়তের সত্যতা গোপন না করিয়া ইহা সরলভাবে প্রকাশ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, এই আয়াতে তাহাদের প্রতিফলের বর্ণনা রহিয়াছে।

অর্থ ঃ— ১১। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! (আল্লাহ্‌র পথে) ধৈর্যধারণ কর এবং পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু হও ও শত্রুর সহিত সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিও এবং আল্লাহকে ভয় কর, যেন (পরিণামে) তোমরা সুফল প্রাপ্ত হইতে পার।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই আয়াতগুলি সূরা আলে এমরানের শেষ ভাগে আলোচিত হইয়াছে। হাদীস শরীফে সূরা আলে এমরানের বহু ফযীলত বর্ণিত রহিয়াছে। সহী মোসলেম নামক প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হাশরের মহা বিচারের দিন এই সূরা পাঠকারীকে উদ্ধার করিবে। কেহ রাত্রিতে এই সূরা পড়িলে সমস্ত রাত্রিতে জাগিয়া এবাদত করার সওয়াব লাভ করিবে। কেহ শুক্রবারে এই সূরা পড়িলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকিবে। (সহী মোসলেম ও বোখারী শরীফ) এই আয়াতগুলি ঈমানের ভিত্তিস্বরূপ।

বর্ণনা ঃ— প্রথম আয়াতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার অনন্ত কুদরতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন যে, যাহাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি আছে, তাহারা বিশ্বসংসারের চতুর্দিকে আমার কুদরতের প্রতি লক্ষ্য করিলে অন্য কোন প্রমাণ ব্যতীতই আমার শক্তি ও কুদরত বুঝিতে পারিবে।

শূন্য পথে আলোকময় সূর্যের জগদ্ব্যাপী কিরণরশ্মি, পূর্ণ চন্দ্রের শান্তিময় জ্যোৎস্না ধারা, অসীম নীলাকাশের বুকে অগণিত তারকারাশির মৃদু হাসি, বিশাল পৃথিবীর বিপুল ঐশ্বর্য, গগনভেদী পর্বতমালা, অতলস্পর্শী সমুদ্র, জনমানবহীন গভীর অরণ্যানী, সহস্র যোজনব্যাপী মরুভূমির বালুকারাশি, অগণিত তরুলতা ও ফলফুলের অতুলনীয় শোভা-সৌন্দর্য, ষড়ঋতু ও দিবারাত্রির আশ্চর্যজনক পরিবর্তন, জীবন-মরণ রহস্য ও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কৌশলের অসীম বিচিত্রতার প্রতি মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে এই সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র শক্তি মহিমায় বিশ্বাস না হয় এমন কে আছে ? কেবলমাত্র সূর্য ও চন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও মহিমায় কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই দুইটি তাঁহার শক্তি ও কুদরতের উজ্জ্বল নিদর্শন। এই দুইটিকে আল্লাহ তায়ালা দুইটি প্রদীপরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া ইহারা একভাবে পৃথিবীতে আলো বিস্তার করিতেছে, ইহাদের কার্যে বাধা দিবার শক্তি কাহারও নাই ; নিশ্চয় ইহাদের একজন মালিক রহিয়াছে ; তিনিই আমাদের প্রভু আল্লাহ ; সেইজন্য আল্লাহ বলিতেছেন যে, এই সকল আমার মহিমার নিদর্শন, এইগুলির ভিতর দিয়া আমার চিন্তা কর, আমাকে উপলব্ধি করিতে পারিবে। আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীকে আমাদের জন্য প্রকাশ্য কোর্‌আনরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহকে কেহ দেখিতে পায় না, তাঁহার কুদরত বুঝিয়া তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, এই সকল কারণে এই আয়াতগুলিকে তৌহীদের ভিত্তিস্বরূপ ধরা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে বলা হইয়াছে যে, যাহারা এই সকল কুদরতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করে তাহারাই আল্লাহ্‌র কুদরত বুঝিয়া থাকে ও তাহারাই আল্লাহকে স্মরণ করে, নামায পড়ে, দোযখের আগুনকে ভয় করে, মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে। এইজন্য কোন কোন কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার কুদরতের বিষয় চিন্তা করাও একরূপ এবাদত। চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াত বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; এই দুই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, আমরা কাফেরগণের ন্যায় মা'জেযা দেখিবার জন্য ব্যস্ত হই নাই ; কিম্বা মা'জেযা দেখিয়াও ঈমানের পথ হইতে ফিরিয়া যাই নাই; বরং আমরা কেবল রসূলের (সাঃ) উপদেশবাণী শুনিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁহার রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। অতএব আল্লাহ! আমাদের এইরূপ সরল

বিশ্বাসের জন্য তুমি আমাদিগকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা কর ও তোমার স্বীকৃত নেয়ামতগুলি দান কর।

পূর্বকালে লোকেরা নবীগণের মা'জেযা ও নবুয়তের নির্দশন সাক্ষাৎভাবে দেখিয়াও তাহা বিশ্বাস করিত না, এমনকি তাহারা কোন কোন নবীকে হত্যা করিতে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করিত না। কিন্তু বর্তমান যুগের মুসলমানগণ পাক কোরআনের বাণী ও হযরত রসূল (সাঃ) এর পবিত্র হাদীসের উপদেশ শুনিয়াই আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁহার রসূলের প্রতি বিশ্বাস করিতেছে, ইহাই হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উম্মতগণের গৌরব। সেইজন্যই বলা হইয়াছে যে, তাহাদের মর্তবা অন্যান্য নবীগণের উম্মত হইতে বেশী, এইজন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া গণ্য হইবে। এখানে 'অতএব' শব্দটি দ্বারা সেই দাবী উত্থাপন করিলে আল্লাহ তায়ালার নিকট অমঙ্গল হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য ও স্বীকৃত নেয়ামতগুলি লাভ করার জন্য প্রার্থনা রহিয়াছে।

৬ষ্ঠ হইতে ৮ম আয়াত দ্বারা ইহা স্মরণ করা হয় যে, আল্লাহ কাহারও সৎ কাজকে বৃথা যাইতে দিবেন না ও যাহারা দীনের জন্য দেশত্যাগী হইয়াছে ও জেহাদ করিয়া জীবন বিসর্জন দিয়াছে তাহারা বেহেশ্‌তে দাখিল হইবে। অবিশ্বাসীগণের প্রবঞ্চনা হইতে মুসলমানগণকে সতর্ক করা হইয়াছে ও তাঁহাদের শোচনীয় পরিণাম বর্ণনা করা হইয়াছে। ৯ম আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার কথা স্মরণ করা হয়। ১০ম আয়াত দ্বারা আসমানী কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ও শেষ আয়াত দ্বারা ঈমানদারদের ধৈর্যশীল হওয়া এবং আল্লাহকে ভয় করার বিষয় স্মরণ করা হয়।

স্বপ্নে হযরত (সাঃ) এর যিয়ারত লাভের আমল

স্বপ্নযোগে হযরত রসূল (সাঃ) এর যিয়ারত লাভ হইলে সকল বিষয়ে মঙ্গল ও নেকবখ্‌তি লাভ হয়, যে ব্যক্তি স্বপ্নে তাঁহাকে দেখিবে সে নিশ্চয় বেহেশতে দাখিল হইবে। এই স্বপ্ন সত্য স্বপ্ন দর্শন ; কারণ শয়তান সকলের রূপ ধারণ করিতে পারিলেও হযরত রসূল (সাঃ) এর রূপ ধারণ করিতে পারে না। এই আমলের চেষ্টা করিতে হইলে মুখে দুর্গন্ধ হয় এমন কোন জিনিস খাইবে না। তামাক, বিড়ি, পিয়াজ, রসুন খাওয়া বন্ধ করিবে, মিথ্যা বলার অভ্যাস দূর করিতে হইবে ও আতর-গোলাপ ব্যবহার করিবে।

প্রথম তদবীর

মাগরেবের নামাযের পর এশার নামায পর্যন্ত ২ রাকাত করিয়া নফল নামায পড়িতে থাকিবে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর ৩ বার সূরা ইখলাস পড়িবে এবং এশার নামাযের পর পুনরায় ২ রাকাত নফল নামায পড়িবে ও সালাম ফিরাইয়া ৭ বার কলেমা তামজীদ পড়িয়া হাত উঠাইয়া এই দোয়া পড়িবে ঃ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا يَا اِلٰهَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ
يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ *

উচ্চারণ ঃ— ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুমু ইয়া যাল-জালালে ওয়াল-ইকরামি ইয়া আরহামার্ রাহিমীন, ইয়া রাহ্‌মানাদ্ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি ওয়া রাহীমাহুমা ইয়া ইলাহাল আওয়ালীনা ওয়াল আখিরীনা ইয়া রাব্বি ইয়া রাব্বি ইয়া রাব্বি ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহু।

অর্থ ঃ— হে চিরজীবী! হে চিরস্থায়ী, হে পরাক্রমশালী ও গৌরবময় ; হে দয়াময় ও পরাক্রমশীল ; হে ইহ-পরকালের দয়াময় এবং ইহ-পরকালের করুণাময় এবং সর্বপ্রথম ও সর্বশেষের উপাস্য! হে প্রতিপালক! হে প্রতিপালক! হে প্রতিপালক! হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! হে আল্লাহ!

তৎপর পাক বিছানায় ডান কাতে পশ্চিমমুখী হইয়া শুইয়া দরূদ শরীফ পড়িতে পড়িতে নিদ্রা যাইবে, আল্লাহর ফযলে স্বপ্নে তাঁহার দীদার লাভ হইবে, একদিনে না হইলে ক্রমাগত ৭ দিন এই আমল করিলে দর্শন লাভ করার কথা।

দ্বিতীয় তদবীর

তাছাউফের কিতাবে লিখিত হইয়াছে যে, রবিউল আউয়াল চাঁদ উঠিলে সন্ধ্যার পর ২ রাকাত নফল নামায এই নিয়মে পড়িবে — আলহামদুর পর সূরা ইখলাস ৩ বার করিয়া পড়িবে ; তৎপর এক হাজার বার দরূদ শরীফ পড়িবে, ইন্‌শাআল্লাহ রসূল (সাঃ) এর যিয়ারত লাভ হইবে।

তৃতীয় তদবীর

(দরূদ শরীফের অধ্যায় দেখুন)

শত্রুর উপদ্রব ও নির্যাতন দূর করার তদবীর

يَا عَزِيْزًا لْمَنِيْعِ الْغَالِبِ عَلٰى اَمْرِهٖ فَلَا شَيْءَ يَعْدِلُهٗ *

উচ্চারণ ঃ— ইয়া আযীযাল মানিয়ি'ল গালিবি আলা আমরিহি ফালা শাইয়া ইয়া'দিলাহু।

অর্থ ঃ— হে পরাক্রমশালী, কষ্টনিবারক, জয়ী, প্রত্যেক কাজে সর্বশ্রেষ্ঠ (আল্লাহ)! তোমার কাজের প্রতিশোধ লইবার কেহই নাই।

শত্রু দমন করার একটি পরীক্ষিত তদবীর

এই দোয়া ওযু, বে-ওযু প্রত্যেক অবস্থায় অধিক সংখ্যায় পড়িবে ও মনে মনে ধারণা করিবে যে, একখানা পাথর শত্রুর বুকে নিক্ষেপ করিতেছি। ইহাতে শত্রু দুর্বল হইয়া যাইবে ও কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ *

উচ্চারণ ঃ— আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআ'লুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া নাঊযু বিকা মিন্ শুরুরিহিম।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ। আমরা তাহাদের গলা (শব্দ) বন্ধ করিতেছি এবং তাহাদের সর্বাধিক অনিষ্ট হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

শত্রুর মুখ বন্ধ করার তদবীর

এই আয়াতগুলি পড়িলে ও লিখিয়া বাজুতে রাখিলে শত্রুর মুখ বন্ধ হয়।

(١) اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ ○ (٢) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ○

(٣) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

উচ্চারণ ঃ— আল্‌ইয়াওমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম। (সূরা ইয়াসীন, ৬৫ আয়াত)।

২। ওয়ালা ইউ'যানু লাহুম ফাইয়া'তাযিরূন। (সূরা মোরসালাত, ৩৩ আয়াত)।

৩। সুম্মুম বুকমুন উমইউন ফাহুম লা ইয়ারজিউন, ফাহুম লা ইয়াক্বিলুন। (সূরা বাক্বারা, ১৮ আয়াতের অংশবিশেষ।)

অর্থ ঃ— ১। আজ আমি তোমাদের মুখের উপর মোহর মারিয়া দিব।

শানে নুযূল ঃ— আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে বলিয়াছেন যে, তিনি হাশরের দিন পাপীদের মুখ বন্ধ করিয়া দিবেন, তাহাদের হাত পা তাহাদের কার্যের সাক্ষ্য দিবে।

অর্থ ঃ— ২। এবং তাহারা আপত্তি করিলেও তাহাদিগকে কথা বলিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না।

শানে নুযূল ঃ— আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে বলিয়াছেন যে, পাপীগণকে হাশরের বিচারের দিন আপত্তি করার জন্য সুযোগ দেওয়া হইবে না।

অর্থ ঃ— ৩। (তাহারা) বধির, বোবা ও অন্ধ, অতএব তাহারা ক্ষান্ত হইবে না ও তাহারা বুঝিবে না।

শানে নুযূল ঃ— এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা অবিশ্বাসীগণের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। অবিশ্বাসীগণের আত্মা এত কলুষিত হইয়া যায় যে, সদুপদেশ শুনিতে পায় না, তাহারা বোবা ও অন্ধের ন্যায় হইয়া যায়। আয়াতগুলির মধ্যে মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়ার আল্লাহ তায়ালার কঠোর আদেশ রহিয়াছে, সে জন্য ইহার তাসিরে এই আমল দ্বারা শত্রুর মুখ বন্ধ হইয়া যায়।

মসিবতের দোয়া

হযরত রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মসিবতের সময় এই দোয়া পড়িবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মসিবত হইতে রক্ষা করিবেন।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ○ اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِيْ

فَاْجُرْنِيْ فِيْهَا وَاَبْدِلْنِيْ مِنْهَا خَيْرًا ○

উচ্চারণ ঃ— ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। আল্লাহুম্মা ইনদাকা আহতাসিবু মুসিবাতী ফাআজিরনী ফীহা ওয়া আবদিল্‌নী মিন্‌হা খায়রা।

অর্থ ঃ— আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং আল্লাহ্‌র দিকে নিশ্চয়ই প্রত্যাবর্তন করিব ; হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আমার সমুদয় বিপদের দায়িত্ব অর্পণ করিলাম। তুমি আমাকে উহা হইতে মুক্তি দাও ও তৎপরিবর্তে আমার উপর মঙ্গল অবতীর্ণ কর।

চোরের ভয় দূর করার ও ঝগড়া নিবারণ করার তদবীর

বিছানায় শুইয়া এই আয়াত ২টি পড়িলে চোর-চোট্টার ভয় থাকে না ও দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া হইতেছে দেখিলে আয়াত ২টি পড়িলে যে অনর্থক ঝগড়া করিতেছে সে চুপ হইয়া যাইবে।

اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ٥ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ٥

অর্থ ঃ— নিশ্চয় আমি তাহাদের কাঁধসমূহে শিকল রাখিয়াছি, পরে ইহাদের কণ্ঠনালীর উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে; সে জন্য ইহাদের মাথা উঁচু হইয়া রহিয়াছে এবং আমি তাহাদের সামনে একটি ও পিছনে একটি প্রাচীর রাখিয়াছি, তৎপর আমি তাহাদিগকে এরূপভাবে আবৃত করিয়া দিয়াছি যাহাতে তাহারা দেখিতে না পায়। (সূরা ইয়াসীন, ৮—৯ আয়াত)

শানে নুযূল ঃ— এই আয়াতে অবিশ্বাসীগণের প্রকৃতি ও পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন যে, অবিশ্বাসীরা সত্য ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না; কারণ, তাহাদের স্কন্ধে অজ্ঞতা ও অহঙ্কারের শিকল জড়ানো রহিয়াছে, তাহা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া সমগ্র গলদেশ বেষ্টন করিয়া গাল পর্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে; তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে অবিশ্বাস ও সন্দেহ প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; সেজন্য তাহারা সত্য বিষয় দেখিতে পায় না। এই আয়াত ২টিতে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, তাহারা (অজ্ঞতার) শিকলের দরুন নড়িতে পারে না; আল্লাহ্র এই কালামের মর্মানুসারে উপরোক্ত ফযীলত হয়।

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির অবস্থা জানার তদবীর

নিরুদ্দেশ ব্যক্তি জীবিত আছে কি মরিয়া গিয়াছে তাহার বিষয় জানিতে হইলে রাত্রে ওযু করিয়া পাক কাপড় পরিবে ও তৎপর কেবলার দিকে মুখ করিয়া ডান পাশে শুইয়া সাতবার করিয়া সূরা ওয়াশ্শামসি, সূরা ওয়াল্লাইলি, সূরা ওয়াত্তীনে ও সূরা ইখলাস পড়িবে ও তৎপর এই দোয়াটি পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اَرِنِىْ فِىْ مَنَامِىْ كَذَا وَكَذَا وَاجْعَلْ لِّىْ فَرَجًا وَّمَخْرَجًا وَّاَرِنِىْ فِىْ مَنَامِىْ مَا اَسْتَدِلُّ بِهٖ عَلٰى اِجَابَةِ دَعْوَتِىْ ٥

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! (আমাকে দিলের বিষয়টি) নিদ্রাযোগে জানাইয়া দাও এবং আমার প্রার্থিত বিষয়ের ফলাফল খোলাসা করিয়া নিদ্রাযোগে জানাইয়া দাও। তৎপর নিম্নোক্ত নক্শাটি শুইবার সময় মস্তকের নীচে রাখিবে ; ৭ দিনের মধ্যে ইহা জানিতে পারিবে। (ইহা বিশেষ পরীক্ষিত)।

ص	م	ل	ا
ا	ص	م	ل
ل	ا	ص	م
م	ل	ا	ص

নক্শার বর্ণনা ঃ— আরবী প্রত্যেক অক্ষরের একটি তা'সির আছে, দুই বা অধিক অক্ষর একত্র হইলে ভিন্ন ভিন্ন তা'সির বর্তে। এই অক্ষরগুলি অন্যান্য আরবী অক্ষরের সহিত কোরআনে লাওহে মাহ্ফুজে অঙ্কিত রহিয়াছে।

মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিবার তদবীর

ইমাম হাসান বসরী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, এশার পর বেতের নামায পড়িয়া ৪ রাকাত নফল নামায পড়িবে, প্রত্যেক রাকাতে আল্হামদুর পর সূরা তাকাছোর পড়িবে, তৎপর শুইয়া এই দোয়া পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اَرِنِىْ فُلَانًا عَلَى الْحَالَةِ الَّتِىْ هُوَ عَلَيْهَا ٥

উচ্চারণ ঃ— আল্লাহুম্মা আরিনী ফুলানান আলাল হালাতিল্লাতী হুয়া আলাইহা।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তি যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দাও। 'আরিনী ফুলানান' শব্দের স্থলে মৃত ব্যক্তির নাম বলিবে, আল্লাহ্র ফযলে কয়েক দিন এই আমল করিলে স্বপ্নে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

সূরা তাকাছোরের (৩০ পারা) ফযীলত ঃ— এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মানুষ এই সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া থাকে ; কিন্তু সত্বরই মানুষ জানিবে যে, এইরূপভাবে মৃত্যুকে ভুলিয়া তাহারা ভুল করিয়াছে। এই সূরায় মানুষের মৃত্যুর বর্ণনা আছে বলিয়া ইহার আমল দ্বারা মৃত্যু রহস্যে আল্লাহ তায়ালার কুদরতের আভাস পাওয়া যায়।

কুষ্ঠ রোগের তদবীর

ইবনে কোতাইবাহ বর্ণনা করিয়াছেন, একজন গলিত কুষ্ঠ রোগী কোন এক কামেল ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কষ্টের কথা নিবেদন করিলে সেই কামেল ব্যক্তি এই আয়াতটি পড়িয়া গলিত স্থানে থুথু দিয়া দিলেন ; আল্লাহ্‌র ফযলে কয়েকদিনের মধ্যে তাহার ঘা ভাল হইয়া গেল।

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

উচ্চরণ ঃ— ওয়া আইয়্যুবা ইয নাদা রাব্বাহু আন্নী মাস্‌সানিয়াদ দুররু ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমীন।

অর্থ ঃ— এবং আইয়্যুব তাঁহার প্রতিপালককে আহবান করিয়াছিল যে, হে প্রভু! আমাকে রোগ যন্ত্রণায় স্পর্শ করিয়াছে এবং তুমিই অনুগ্রহকারীগণের মধ্যে অধিকতর অনুগ্রহশীল। (সূরা আম্বিয়া, ৮৩ আয়াত)

শানে নুযূল ঃ— এই দোয়া পড়িয়া হযরত আইয়্যুব নবী (আঃ) গলিত কুষ্ঠ রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই আয়াত পাঠ দ্বারা হযরত আইয়্যুব নবী (আঃ) এর উপর আল্লাহ্‌ তায়ালার অসীম দয়ার স্মরণ করিয়া তাহার শরণাপন্ন হওয়া যায় ; সেইজন্য ইহার বরকতে এইরূপ ফযীলত লাভ হয়। কুষ্ঠ রোগীর পক্ষে সর্বদা এই আয়াত পড়া কল্যাণজনক

পাথরী রোগের তদবীর

হযরত ইবনুল কালবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতগুলি লিখিয়া ধুইয়া পানি খাইলে প্রস্রাবের রাস্তা দিয়া পাথরী বাহির হইয়া যায় ঃ —

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ○ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ○ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ○ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ○

(২৭ পারা, সূরা ওয়াকেয়া ৫—৬ আয়াত, ২৯ পারা, সূরা হাক্কা, ১৪—১৬ আয়াত)

অর্থ ঃ— ১। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি। ২। এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে। ৩। তখন ইহা (পর্বত) নিক্ষিপ্ত ধুলার ন্যায় হইয়া যাইবে। ৪। এবং পৃথিবী ও পর্বতসমূহ উত্তোলন করা হইবে। তৎপর উহাকে একত্রে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে। ৫। তৎপর সেই দিন মহাসংঘটন (কেয়ামত) ঘটিবে। ৬। এবং সেই দিন আকাশ ফাটিয়া বিকল হইয়া যাইবে।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— ১ম আয়াতে (তাসমিয়ার) আল্লাহ্‌ তায়ালার দয়া ও করুণার বর্ণনা হইয়াছে ও পরবর্তী আয়াতগুলিতে কেয়ামতের দিন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতসমূহের যে অবস্থা হইবে তাহার বর্ণনা রহিয়াছে, এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলিতেছেন যে, ঐ মহা ঘটনার দিন তাঁহার হুকুমে আকাশ ফাটিয়া বিকল হইয়া যাইবে ও পৃথিবী এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ ধুলার ন্যায় হইয়া যাইবে। ইহাতে চূর্ণ হইয়া যাওয়ার আল্লাহ্‌ তায়ালার একটি আদেশ থাকায় ইহার তা'সিরে পাথর চূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া যায়।

প্রস্রাব খোলাসা হওয়ার তদবীর

পাথর ব্যতীত অন্য কোন কারণে প্রস্রাব বন্ধ হইলে এই আয়াত লিখিয়া ধুইয়া পানি খাইলে খোলাসা হইয়া যায় —

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○

(সূরা বাক্বারা, ৬০ আয়াত)

অর্থ ঃ— "আর যখন মূসা (আঃ) আপন সম্প্রদায়ের জন্য পানির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন আমি বলিয়াছিলাম যে— তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরের উপর আঘাত কর। তাহা হইতে বারটি ঝর্ণার উৎপত্তি হইল, লোকেরা নিজ নিজ ঘাট চিনিয়া লইল, (তৎপর আদেশ হইল) তোমরা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত জীবিকা আহার কর এবং পৃথিবীতে শান্তি ভঙ্গ করিও না।"

শানে নুযূল ঃ— একদা হযরত মূসা (আঃ) ইহুদীগণকে সঙ্গে লইয়া মরুভূমি অতিক্রম করার সময় পানির অভাবে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি নিরুপায় হইয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট পানির জন্য প্রার্থনা করিলেন, তাঁহার প্রার্থনা কবুল হইল এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে, তোমার হাতের লাঠি দ্বারা পাথরের উপর আঘাত কর। হযরত মূসা (আঃ) পাথরের উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করা মাত্র সেখানে বারটি ঝর্ণার সৃষ্টি হইল ও ইহুদীগণের বারটি সম্প্রদায় এক একটি ঝর্ণায় তাহাদের ঘাট নির্দিষ্ট করিয়া লইল। এই ঘটনা তাঁহার নবুওতের অন্যতম মা'জেযা। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালার কুদরতে মরুভূমিতে ঝর্ণা সৃষ্টি হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি যদি শক্তি ও কুদরতের বলে মরুভূমিতে পাথর হইতে আলৌকিকভাবে ঝর্ণা সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে মানুষের শরীর হইতে তাঁহার কুদরতে আবদ্ধ প্রস্রাব বাহির করিয়া দেওয়া অত্যন্ত সহজ কাজ। এই আয়াতে পাথর হইতে ঝর্ণা হইয়া আল্লাহ তায়ালার কুদরতের উল্লেখ হওয়ার বরকতে প্রস্রাব খোলাসা হয়।

পক্ষাঘাত (অর্ধাঙ্গ) রোগের তদবীর

বিসমিল্লাহসহ সূরা যিলযালাহ (৩০ পারা) চীনা মাটির বাসনে লিখিয়া পানিতে ধুইয়া ২০ দিন পানি খাওয়াইলে ইন্‌শাআল্লাহ রোগ আরোগ্য হইবে।

শানে নুযূল ঃ— এই সূরার প্রথম আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র অসীম শক্তিবলে কেয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হইবে ও দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই দিন পৃথিবী তাহার সমস্ত ভার ফেলিয়া দিয়া ভারমুক্ত হইয়া যাইবে। এই সূরায় এইভাবে আল্লাহ তায়ালার অসীম শক্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেই জন্য এই সূরার বরকতে ভারমুক্ত হইয়া যাওয়ার আল্লাহ্‌র আদেশে ইহার আমল দ্বারা পক্ষাঘাত রোগীর শরীরে অবশতাজনিত ভার দূর হইয়া যাইবে।

অত্যাচারী ও জালেম লোকদিগকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার তদবীর

নিম্নোক্ত আয়াতগুলি কোন যবৃহে করা হালাল পশুর পুরাতন হাড়ের উপর লিখিয়া সেই হাড় চূর্ণ করিয়া অত্যাচারী লোকের ঘরে কিংবা আড্ডায় ফেলিয়া দিলে তাহারা জব্দ হইবে ও তাহাদের দল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ

حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ○ فَقُطِعَ

دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(৭ পারা, সূরা আনয়াম, ৪৪—৪৫ আয়াত)

অর্থ ঃ— ১। তৎপর তাহাদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল; তখন আমি তাহাদের জন্য সকল বিষয়ের (সকল প্রকার পার্থিব পুরস্কার) দরজা খুলিয়া দিয়াছিলাম ও যে সকল পুরস্কার তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে তাহারা পরিতুষ্ট হইল, তখন আমি তাহাদিগকে একত্রে আক্রমণ করিলাম, অনন্তর তাহারা নিরাশ হইয়া পড়িল।

অর্থ ঃ— ২। আর যালেম (অত্যাচারী) সম্প্রদায়ের মূল কাটিয়া দেওয়া হইল, অতএব বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

শানে নুযূল ঃ এই আয়াতে পূর্বকালের অবিশ্বাসী ও অত্যাচারী সম্প্রদায়ের শোচনীয় পরিণামের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা তখন আল্লাহ্‌র আদেশ ও রসূলগণের উপদেশ ভুলিয়া গিয়া বিপথগামী হইতেছিল, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদিগকে সৎপথে আনিবার জন্য তাহাদের প্রতি অনুগ্রহের দরজা খুলিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করিয়া ধন-সম্পদ, শিক্ষা-সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা এইরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়াও আল্লাহ্‌র রাস্তা ভুলিয়া গিয়া অবিশ্বাসী ও নাস্তিক হইয়া পড়িল। অবশেষে তাহারা আল্লাহ্‌র ভীষণ কোপে পড়িয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ পাপে তাহাদের মূল কর্তিত হইয়াছিল; অর্থাৎ তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই আয়াতে অত্যাচারী সম্প্রদায় আল্লাহ তায়ালার গযবে ধ্বংস হইয়া যাওয়ার বর্ণনা রহিয়াছে। বিশেষতঃ ইহাতে আল্লাহ তায়ালার গযব নাযেল হওয়ার বর্ণনা থাকায় এই আয়াত দুইটি অত্যাচারী ধ্বংস করার শক্তি লাভ করিয়াছে।

সর্ববিষয়ে মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার উৎকৃষ্ট আমল

গোসল করিয়া বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রোযা রাখিবে, শুক্রবার দিন আসরের নামাযের পূর্বে কেবলামুখী হইয়া বসিবে ও সূরা ইয়াসীন ১ বার পড়িবে ও তৎপর সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াতগুলি হরিণের ঝিল্লির (পরদা)

উপর (অনুরূপ অন্য হালাল জন্তুর চামড়ার উপর) পরহেজগার আলেমের দোয়াতের কালি দ্বারা লিখিবে, তৎপর ঐ চামড়া সঙ্গে রাখিয়া আসরের নামায আদায় করিবে ও ইহা হাতে রাখিয়া সূরা কাহাফ পড়িবে; ঐ চামড়া সঙ্গে রাখিলে মনের বাসনা পূর্ণ হইবে।

আয়াতগুলি এই

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ হইতে بِغَيْرِ حِسَابٍ পর্যন্ত।

(১৮ পারা, সূরা নূর, ৫ রুকু, ৩৫—৩৮ আয়াত)

অর্থ ঃ— ১। আল্লাহ আসমান ও পৃথিবীর নূর (জ্যোতি) স্বরূপ, তাঁহার নূরের দৃষ্টান্ত ঃ যেমন একটি তাক রহিয়াছে, তাহার উপর একটি প্রদীপ একখণ্ড কাঁচের ফানুসের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে; কাঁচটি এইরূপ উজ্জ্বল যেন ইহা একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং (সেই প্রদীপ) জয়তুন নামক কল্যাণকর বৃক্ষের (তৈল) দ্বারা আলোকিত, যাহার পূর্ব বা পশ্চিম নাই (যাহা দ্বারা সর্বদিক আলোকিত), যাহার তৈল আগুনে স্পর্শ না করিলেও নিজ হইতেই জ্বলিয়া উঠে; বস্তুত ইহা যেন নূরের উপর নূর রহিয়াছে, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় নূর দ্বারা পথ দেখাইয়া থাকেন এবং তিনি মানুষের জন্য উপমা দিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন (যেন তাহারা বুঝিতে পারে) এবং তিনি সকল বিষয়ে জ্ঞানবান।

২। ঐ সকল গৃহ (মসজিদসমূহ) যাহাকে আল্লাহ সম্মান করিতে আদেশ দিয়োছেন, যাহার মধ্যে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হয়, তন্মধ্যে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহারই প্রশংসা বর্ণনা করা হয়।

৩। অনন্তর সেই সকল লোক যাহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় করার সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে, নামায পড়ে ও যাকাত দান করে, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় তাহাদিগকে এই সকল কাজ হইতে বিরত করিতে পারে না। কেননা, তাহারা সেই দিবসের (কেয়ামতের) ভয় করে। যে দিন (ভয়ে) সকলের প্রাণ ও চক্ষু ঘুরিয়া যাইবে।

৪। (তাহারা এই আশায় এবাদত করিয়া থাকে) যেন আল্লাহ তাহাদের কৃতকর্মের উত্তম পুরস্কার দান করেন এবং নিজ অনুগ্রহে দ্বিগুণ দান করেন, অনন্তর আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ এই পবিত্র আয়াত চারিটিতে আল্লাহ তায়ালার নূর, তাঁহার এবাদত ও মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহার অনুগ্রহের বর্ণনা রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার নূরের বর্ণনা করা অসম্ভব, উদাহরণ দ্বারা না বুঝাইলে সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মানুষ আল্লাহ্‌র নূরের ধারণা করিতে পারিবে না বলিয়া আরবদেশের তৎকালীন জয়তুন তৈলের সর্বোৎকৃষ্ট আলোর উপমা দিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার নূরের কোন তুলনা নাই ও হইতে পারে না। নূরের উপর নূর অর্থ এই যে, আমরা যতই উৎকৃষ্টতম ও উজ্জ্বলতম জ্যোতির সমষ্টির কল্পনা করি না কেন, তাহার তুলনায় আল্লাহ্‌র নূর অসীম ও অতুলনীয়। মানবের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ইহার ধারণা করিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার নূর অতি পবিত্র ও মহাগৌরবান্বিত নেয়ামত। যে আয়াত মোবারকের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নূরের বর্ণনা রহিয়াছে, ইহা হইতে ফযীলতের বিষয় আর কি হইতে পারে? এবং ইহার আমল দ্বারা যে মনের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? সূরা ইয়াসীন ও কাহাফের ফযীলত যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

ঈমান ঠিক রাখার আমল

ঈমান ঠিক রাখার জন্য এই দোয়া নামাযের পর ও অন্যান্য সময় কয়েকবার পড়িতে হয়। হযরত রসূল (সাঃ) ইহা শেষ রাতে পড়িতেন। অর্থ বুঝিয়া ও ছিদক দিলে এবং নেক নিয়তে পড়িবে।

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ قَلِّبْ عَلٰى دِيْنِكَ ٥

উচ্চারণ ঃ— ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি কাল্লিব আ'লা দীনিকা।

অর্থ ঃ— হে মনের গতি পরিবর্তনকারী (আল্লাহ)! আমার মনকে তোমার সত্য ধর্মের উপর স্থির কর।

জাহেরী ও বাতেনী তত্ত্ব লাভ করার জন্য সর্বদা এই দোয়া পড়িবে ইহার ফল সত্বরই অনুভব করা যায়

يَا عَلَّامَ الْغُيُوْبِ فَلَا يَفُوْتُ شَيْءٌ مِّنْ حِفْظِهٖ ٥

উচ্চারণ ঃ— ইয়া আল্লামাল গুইউবি ফালা ইয়াফুসু শাইউম্ মিন হিফ্‌যিহি।

অর্থ ঃ— হে অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী আল্লাহ! তোমার জ্ঞান হইতে কোন বিষয় অজ্ঞাত থাকিতে পারে না।

হাজত (বাসনা) পূর্ণ হওয়ার আমল

হযরত শেখ নিজামুদ্দিন আওলিয়া (রহঃ) বলিয়াছেন যে, কেহ কোন মাকছুদ হাসিল করিতে চাহিলে ফজরের নামাযের পর নিম্নলিখিতরূপে অযিফা পড়িবে।

শুক্রবার ঃ— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু— হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই।

শনিবার ঃ— ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহীমু— হে করুণাময়, হে দয়াশীল!

রবিবার ঃ— ইয়া ওয়াহেদু, ইয়া আহাদু— হে একক, হে এক (আল্লাহ)

সোমবার ঃ— ইয়া ছামাদু, ইয়া ফারদু— হে অন্যের অপ্রত্যাশী, হে অদ্বিতীয়!

মঙ্গলবার ঃ— ইয়া হাইয়্যু, ইয়া ক্বাইয়্যুমু— হে চিরজীবী, হে চিরস্থায়ী!

বুধবার ঃ— ইয়া হান্নানু, ইয়া মান্নানু— হে নম্রকারী, হে কোমল অন্তঃকরণময়!

বৃহস্পতিবার ঃ— ইয়া যালজালালে ওয়াল ইক্‌রাম— হে প্রতাপশালী ও গৌরবময়!

১০০ বার করিয়া পড়িবে। যদি শীঘ্র হাসিল করিতে চায়, তবে ১০০০ বার করিয়া পড়িবে। এই নামগুলি দ্বারা আল্লাহ তায়ালার কয়েকটি বিশেষ সেফাতের বর্ণনা করা হয়; সেইজন্য ইহাদের যিকির দ্বারা তাঁহার বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ লাভ হয়।

কাযায়ে হাজত নামায

(বাসনা পূর্ণ হওয়ার নামায)

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) বলিয়াছেন যে, নিম্নোক্ত নিয়মে কাযায়ে হাজতের নিয়তে ২ রাকাত নামায পড়িলে আল্লাহ তায়ালা মনের বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। যথা ঃ—

জুময়ার রাত্রে গোসল করিয়া পাক-ছাফ কাপড় পরিবে ও ২ রাকাত নামায পড়িবে। প্রথম রাকাতে আলহামদুর পর সূরা কাফেরূন ১০ বার, দ্বিতীয় রাকাতে আলহামদুর পর সূরা এখলাস ১১ বার পড়িবে ও সালাম ফিরাইয়া দরূদ শরীফ ১০ বার পড়িবে। তৎপর নিম্ন দোয়া ১০ বার পড়িবে।

১— سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ○

অর্থ ঃ— আল্লাহ তায়ালা পবিত্র ও তাঁহার জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ; তাঁহার সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি বা সামর্থ্য নাই, তিনি উন্নত ও মহীয়ান।

(২). رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ (১০ বার)

উচ্চারণ ঃ— রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা আযাবান্নার। (সূরা বাক্বারা, ২০১ আয়াত)

অর্থ ঃ— হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে ইহলোকে ও পরলোকে কল্যাণ দান কর এবং দোযখের শাস্তি হইতে রক্ষা কর।

তৎপর নিজের বাসনা সম্বন্ধে মোনাজাত করিবে।

মনের বাসনা পূরণের একটি পরীক্ষিত আমল

নিম্নোক্ত নিয়মে কোরআন শরীফের ৭ মঞ্জিল খতম করিয়া যে কোন দোয়া করা যায় তাহা কবুল হয়।

শুক্রবার ঃ— সূরা বাক্বারা হইতে সূরা মায়েদা পর্যন্ত।

শনিবার ঃ— সূরা আন্‌আ'ম হইতে সূরা তওবা পর্যন্ত।

রবিবার ঃ— সূরা ইউনুস হইতে সূরা তা'হা পর্যন্ত।

সোমবার ঃ— সূরা আম্বিয়া হইতে সূরা ক্বাসাস পর্যন্ত।

মঙ্গলবার ঃ— সূরা আন্‌কাবুত হইতে সূরা সা'দ পর্যন্ত।

বুধবার ঃ— সূরা যোমার হইতে সূরা আর-রাহমান পর্যন্ত।

বৃহস্পতিবার ঃ— সূরা ওয়াক্বেয়া হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িবে।

খতম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় যাইয়া মোনাজাত করিবে।

ঈমানের সহিত মৃত্যু হওয়ার আমল

যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর (অপর পৃষ্ঠায় লিখিত) মোনাজাত পড়িবে ঈমানের সহিত তাহার মৃত্যু হইবে।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ۝

উচ্চারণ ঃ— রাব্বানা লা তুযিগ্ কুলুবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাব্ লানা মিল্লাদুন্কা রাহমাতান ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহ্হাব। (সূরা আলে ইমরান, ৮ম আয়াত)

অর্থ ঃ— হে আমার প্রতিপালক! আমাদিগকে সরল পথ দেখাইবার পর আমাদের হৃদয় বক্র (কুটিলতাপূর্ণ) করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদের প্রতি রহমত নাযিল কর, নিশ্চয় তুমি প্রচুর দানকারী।

স্ত্রী–পুত্র দীনদার হওয়ার আমল

প্রত্যেক নামাযের পর এই দোয়া একবার পড়িলে স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণ দীনদার হয়।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝

উচ্চারণ ঃ— রাব্বানা হাব লানা মিন্ আয্ওয়াজিনা ওয়া যুর্‌রিইয়াতিনা কুর্‌রাতা আইউনিওঁ ওয়াজ্আ'লনা লিল মুত্তাক্বীনা ইমামা। (১৯ পারা, সূরা ফুরক্বান্, ৭৪ আয়াত)

অর্থ ঃ— হে আমার প্রতিপালক! আমাদিগকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণ হইতে নয়নের তৃপ্তি দান কর এবং তাহাদিগকে সংযমীগণের অগ্রবর্তী কর।

অবাধ্য সন্তান বাধ্য হওয়ার তদবীর

এই দোয়া প্রত্যেক নামাযের পর পড়িলে পুত্র-কন্যাগণ বাধ্য ও অনুগত হয়; ইহা পড়িবার সময় 'যুর্‌রিয়্যাতি' শব্দ উচ্চারণকালে পুত্র-কন্যাকে স্মরণ করিবে।

وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

উচ্চারণ ঃ— ওয়াসলিহ্ লী ফী যুররিইয়াতি ইন্নী তোবতো ইলাইকা ওয়া-ইন্নী মিনাল মোসলেমীন। (সূরা আহকাফ, ১৫ আয়াত)

অর্থ ঃ— এবং আমার জন্য আমার সন্তানগণের মধ্যে প্রীতি দান কর; নিশ্চয় আমি তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি এবং নিশ্চয় আমি মুসলমানদের অন্তর্গত।

মনের চঞ্চলতা দূর করার তদবীর

প্রত্যেক নামাযের পর এই আয়াত ১১ বার পড়িলে মনের চঞ্চলতা দূর হয়।

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۝

অর্থ ঃ— অনন্তর তুমি ও তোমার সহিত যাহারা তওবা করিয়াছে যাহা আদেশ করা হইয়াছে তাহাতে স্থির থাক এবং ফিরিয়া যাইও না।

শানে নুযূল ঃ— এই আয়াতে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ পাক মানুষকে বলিয়াছেন যে, তোমরা পরকালে নিজ নিজ কর্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে; অতএব তোমাদের উপর যাহা আদেশ করা হইয়াছে তাহাতে স্থির (অটল) থাক। এই আয়াতে স্থির থাকার আদেশ রহিয়াছে; সুতরাং ইহার আমল দ্বারা মন আল্লাহ্‌র পথে স্থির থাকে।

মনের কুভাব দূর করার তদবীর

ইমাম গায্যালী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, জনৈক বুযর্গ ব্যক্তি এক পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিয়া আসক্ত হইয়া পড়েন, সমস্ত রাত্রি কুভাবের তাড়নায় তাঁহার নিদ্রা হয় নাই। অবশেষে রাত্রে দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি তাঁহাকে এই আয়াতগুলি পড়িয়া শরীরে ফুঁক দিতে আদেশ করিতেছে। তিনি প্রাতে ওযু করিয়া এই আয়াতগুলি পড়িয়া শরীরে ফুঁক দিতেই তাহার মনের কুভাব দূর হইয়া গেল।

১। يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝

(১৩ পারা, সূরা ইব্রাহীম, ২৭ আয়াত)

২- يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ○

(সূরা আনফাল, ১৫ আয়াত)

অর্থ ঃ— ১। যাহারা পার্থিব ও পরকালের প্রতি সুদৃঢ় বাক্যে ঈমান স্থাপন করিয়াছে আল্লাহ তাহাদিগকে ঈমানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবেন এবং আল্লাহ অত্যাচারীগণকে ভ্রান্ত করেন এবং আল্লাহ্‌র যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকেন।

২। হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কাফের সৈন্যগণের সম্মুখীন হও তখন তাহাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না; (পলাইও না)।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ প্রথম আয়াতে ঈমানের উপর কায়েম রাখার জন্য আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার রহিয়াছে ও ২য় আয়াতে ঈমানদারগণের ধর্মযুদ্ধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়ার জন্য নসিহত রহিয়াছে। এই সকল বিষয়ের বর্ণনা থাকায় এই আয়াতগুলির আমল দ্বারা ঈমান দৃঢ় হইয়া মনের কুভাব দূর হয়।

পাগলা কুকুরের কামড়ের অপকারিতা নষ্ট করার তদবীর

সূরা তারেকের (৩০ পারা) শেষ ২টি আয়াত প্রত্যহ একটি রুটির উপর লিখিয়া খাওয়াইবে। এইরূপে ৪০ দিন খাওয়াইলে কুকুরের বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

(১৭২ পৃষ্ঠায় সূরা তারেকের ফযীলত দেখুন)

সঙ্গম শক্তি ও শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার আমল

যে ব্যক্তি প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর (কামাই না করিয়া) **يَا قَوِيُّ يَا مَتِينُ** (ইয়া কাভিয়্যু, ইয়া মাতীনু) আল্লাহ তায়ালার শক্তিসূচক এই নাম দুইটি একত্রে ১৩০ বার পড়িবে, আল্লাহ্‌র রহমতে তাহার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে ও আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তাহার উপর মদদ (সাহায্য) নাযিল হবে। হিংসুক শত্রুগণ তাহাকে দেখিলে ভয় পাইবে; তাহার অলসতা, দুর্বলতা, ক্ষীণতা ও ভীরুতা দূর হইবে ও সঙ্গম শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। যদি আরও বেশী শক্তি বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে তবে ২২৬ বার কিংবা এক হাজার বার পড়িবে।

শবে ক্বদরের নামাযের ফযীলত

আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, শবে ক্বদরের রাত্রিটি হাজার মাসের রাত্রি অপেক্ষা সম্মানিত। রমযান মাসের ২৭শা রাত্রিই শবে ক্বদর। (৮৩ পৃষ্ঠায় সূরা ক্বদরের তফসীরে বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন)।

মকসুদোল কাসেদীন নামক কিতাবে লিখিত হইয়াছে যে, এই রাত্রে ১০০ রাকাত নফল নামায পড়িতে হয়, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ক্বদর (ইন্না আনযালনা) তিনবার ও সূরা ইখলাস ১০ বার পড়িতে হয়। ঐ কিতাবে আরও আছে যে, ঐ রাত্রে ফজর হওয়া মাত্র ৪ রাকাত নফল নামায পড়িতে হয় ও প্রত্যেক রাকাতে সূরা ক্বদর ৩ বার ও সূরা ইখলাস ৫০ বার পড়িতে হয়। কোন ব্যক্তি এইরূপে ৪ রাকাত নফল নামায আদায় করিয়া সেজদায় যাইয়া "সোবহানাল্লাহ" তসবীহ্‌ ৪১ বার পড়িয়া আল্লাহ্‌র নিকট যাহা চাহিবে তাহাই লাভ করিতে পারিবে।

জুময়ার নামাযের ফযীলত

জুময়ার নামাযের ফযীলত (উপকারিতা) ও শুক্রবারের ফযীলত সম্বন্ধে পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণনা রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সূরা জুময়ার ৯ম আয়াতে বলিয়াছেন ঃ—

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِن يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ○

(সূরা জুময়া, ৯ আয়াত)।

অর্থ ঃ— হে ঈমানদারগণ! শুক্রবারে যখন জুময়ার নামাযের জন্য আহবান করা হয় (আযান দেওয়া হয়) তখন আল্লাহ্‌র স্মরণে সত্বরতা কর, ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর—যদি তোমরা জ্ঞাত হইয়া থাক।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— হযরত রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন — শুক্রবার সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন এবং ঐ দিনের জুময়ার নামাযে মানুষের জন্য অশেষ কল্যাণ রহিয়াছে। প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের পক্ষে ইহা ফরযে-আইন (অবশ্য কর্তব্য)। অনেকে

মনে করিয়া থাকে যে, কাজ-কর্ম ত্যাগ করিয়া জুময়ার নামায পড়িলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, কিন্তু এই আয়াতে আল্লাহ তাঁহার খাস কালামে বলিতেছেন ঃ—

"তোমরা জুময়ার নামাযের জন্য কাজ-কর্ম বন্ধ করিবে, কারণ ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণ আনয়ন করিবে।" তিনি এই প্রসঙ্গে এই সূরার শেষ আয়াতে বলিতেছেন যে, "আমিই রিযিকদাতা।" তিনি ইহা দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, জুময়ার নামায পড়িলে সময় নষ্ট হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এই আয়াতের মর্মানুযায়ী পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে ব্যবসায়ী রীতিমত জুময়ার নামায আদায় করে তাহার ব্যবসায়ে উন্নতি হয়। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় জুময়ার নামায ত্যাগ করে তাহার অন্তর অন্ধ হইয়া যায় ও সে মোনাফেকের অন্তর্ভুক্ত হয়।

তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত

আল্লাহ পাক কোর্‌আনে সূরা বনী ইসরাইলের ৭৯ আয়াতে বলিয়াছেন ঃ—

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ○

অর্থঃ— এবং রাত্রির একাংশে তৎসহ (কোরআন পাঠের সঙ্গে) তাহাজ্জুদ পাঠ কর, ইহা তোমার জন্য অতিরিক্ত, শীঘ্রই তোমার প্রতিপালক তোমাকে মাকামে মাহমুদ (প্রশংসিত স্থান) দান করিবেন।

শানে নুযূল ঃ— রাত্রিতে সুখময় নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌র এবাদত করার অর্থে তাহাজ্জুদ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। হযরত রসূল (সাঃ) এর জন্য ইহা অতিরিক্ত অথবা নফল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি প্রত্যহ ফরয নামাযের ন্যায় তাহাজ্জুদ পড়িতেন, এমনকি রাত্রিতে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার পবিত্র পদদ্বয় ফুলিয়া উঠিত।

মাকামে মাহমুদ ঃ— হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাশরের ময়দানে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে যে স্থানে দাঁড়াইয়া উম্মতগণের জন্য শাফায়াত করিবেন সেই সম্মানিত স্থানকে 'মাকামে মাহমুদ' অর্থাৎ প্রশংসিত স্থান বলা হয়। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মানবের পক্ষে ঐ স্থানে দাঁড়াইবার সৌভাগ্য হইবে না। অন্যের

গোনাহের জন্য সুপারিশ করিতে হইলে নিজে নিষ্পাপ হইতে হয়, আমাদের হযরত রসূল (সাঃ) নিষ্পাপ ছিলেন, তিনি জীবনে এমন গোনাহ করেন নাই যাহার জন্য হাশরের দিন তাঁহাকে আল্লাহ পাকের নিকট শরমেন্দা হইয়া মাথা নত করিতে হইবে। মানব-স্বভাবজনিত দুর্বলতা হেতু কোন সময় অজ্ঞাতসারে ভুল করিলেও তিনি সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া মাফ করাইয়া লইয়াছেন। উপরোক্ত আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, তিনি তাহাজ্জুদ নামাযের এওয়াজে (বদলে) এই ফযীলত লাভ করিয়াছেন।

ফযীলত ঃ— সমস্ত জগৎ যখন সুখ নিদ্রায় মগ্ন, তখন আল্লাহ্‌র বান্দা তাহার সুখময় নিদ্রা ছাড়িয়া আলাহ্‌র নামে তাঁহারই এবাদতে দাঁড়াইয়া যায়, এহেন এবাদতের ফযীলত ও প্রতিদান যে কি আছে, তাহা আল্লাহই জানেন। আল্লাহ-প্রেমিকের ইহাই মূল সাধনা, ইহাই তাঁহার প্রেমের খাঁটি নিদর্শন ও মিলনের জন্য এবাদতমুখী হইয়া উঠে, মানুষকে রূহানী জগতে লইয়া যায় ও আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে, রাত্রির নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য ও নিদ্রিত সৌন্দর্যের অপূর্বভাব— এই মুহূর্তে মানুষ আল্লাহ ছাড়া কাহাকেও আপন মনে করে না, রাত্রির গভীরতা পরজগতের গভীরতম রহস্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহাজ্জুদ নামাযের মাহাত্ম্য এইখানেই।

১। যে ব্যক্তি সর্বদা তাহাজ্জুদ নামায পড়িয়া থাকে তাহার সাংসারিক কাজ সহজসাধ্য হয়, স্বাস্থ্য অটুট থাকে ও উন্নতির পথ সুগম হয়।

২। তাহাজ্জুদ নামাযের পর যে দোয়া করা হয় তাহা সহজে কবুল হয়, ঐ সময় আল্লাহ্‌র রহমতের দরজা খোলা থাকে।

৩। কামালিয়াত লাভ করার ইহাই প্রথম সোপান।

৪। এই নামায মানুষের মনকে নম্র করে ও অপকর্ম করার ইচ্ছা দূর করে। এরশাদোত্তালেবীন নামক কিতাবে লিখিত আছে যে, নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদ নামায আদায়কারীর কবর হইতে বেহেশ্‌ত পর্যন্ত নিম্নোক্ত ১৩ জন সঙ্গে থাকিবেন।

১। হযরত আদম সফিউল্লাহ (আঃ)। ২। হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ)। ৩। হযরত মূসা কালিমুল্লাহ (আঃ)। ৪। হযরত ঈসা রূহুল্লাহ (আঃ)। ৫। আকায়ে নামদার সরদারে দোজাহান মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ)। ৬। সাইয়্যিদিনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ৭। সাইয়্যিদিনা হযরত ওমর

ফারুক (রাঃ)। ৮। সাইয়্যিদিনা হযরত ওসমান গনী (রাঃ)। ৯। সাইয়্যিদিনা হযরত আলী (কাঃ)। ১০। হযরত জিব্রাঈল (আঃ)। ১১। হযরত মিকাঈল (আঃ)। ১২। হযরত আয্‌রাঈল (আঃ)। ১৩। হযরত ইস্রাফীল (আঃ)।

তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সময় ও নিয়ম

১। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হইতে সোব্‌হে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত এই নামায পড়ার সময়।

২। সুন্নতের নিয়তে দুই রাকাত করিয়া ১২ রাকাত এবং কমপক্ষে ৪ রাকাত নামায পড়িতে হয়।

ওয়াজ ও বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধির আমল

বক্তা ও ওয়ায়েজগণ বক্তৃতা কিংবা ওয়াজ আরম্ভ করার পূর্বে সূরা তা'হার ২৫—২৮ আয়াত ৪টি একবার কিংবা তিনবার পড়িয়া লইলে মনে এক অপূর্ব শক্তির উদয় হয় ও সম্মুখে অসংখ্য লোক থাকিলেও কোন ভয় আসে না। হযরত মূসা (আঃ) এই আমলের বরকতে ফেরাউনের ন্যায় দুর্দান্ত যালেম বাদশাহের নিকটও তাবলীগ (সত্যের বাণী প্রচার) করিতে সাহস ও শক্তি পাইয়াছিলেন।

(১১০ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত তফসীর দ্রষ্টব্য)।

হযরত লোকমানের উপদেশ

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ط

(২১ পারা, সূরা লোকমান, ১৯ আয়াতের ১ম অংশ)।

অর্থ ঃ— এবং তুমি স্বীয় ব্যবহারে মধ্যপথ অবলম্বন কর ও স্বীয় স্বর নিম্ন কর ; (চেচাঁইয়া কথা বলিও না)।

হযরত লোকমান ঃ— হযরত লোকমান তাঁহার সময়ের একজন প্রসিদ্ধ হাকীম ও মহাজ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞতার খ্যাতি সমগ্র পৃথিবীতে জনশ্রুতিতে পরিণত হইয়াছে। তিনি যে সকল উপদেশ বাণী রাখিয়া গিয়াছেন আজও তাহা ইসলামী শরীয়তে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ঐ উপদেশগুলি বর্ণিত হইয়া পাক কোর্‌আনে তাঁহার নামানুসারে সূরা

লোকমান নাযিল হইয়াছে। তিনি তাঁহার পুত্রকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন উপরোক্ত উপদেশটি উহাদের অন্যতম। এই আয়াত হইতে জানা যায় যে, কোন কাজে মাঝামাঝি পথ (না অত্যন্ত বেশী না অত্যন্ত কম) অবলম্বন করাই শ্রেয়। আল্লাহ তায়ালাও এই নিয়মে কাজ করা পছন্দ করেন। তিনি পাক কোরআনে বলিয়াছেন—যাহারা কোন বিষয়ে সীমা অতিক্রম করে আমি তাহাদিগকে পছন্দ করি না। কোর্‌আনে বর্ণিত তাঁহার অন্য উপদেশগুলি এই ঃ—

১। আল্লাহ্‌র সহিত অংশী স্থির করিও না। ২। পিতামাতাকে ভক্তি করিবে, তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে। ৩। পাপকার্য যদি সরিষা পরিমাণ ছোটও হয় এবং ইহা কোন পাথরের ভিতরেও থাকে তথাপি তাহা হইতে বিমুখ হইবে, যেহেতু আল্লাহ পাক সূক্ষ্মদর্শী ও অভিজ্ঞ, হাশরের ময়দানে তিনি ইহাও ধরিয়া ফেলিবেন, বিশেষতঃ ছোট ছোট পাপকার্য হইতেই মাত্রা বাড়িতে থাকে। ৪। নামায প্রতিষ্ঠিত করিবে; (নিয়মিতরূপে)। ৫। সৎ বিষয়ে আদেশ ও অসৎ বিষয়ে নিষেধ করিবে। ৬। হঠকারিতার সহিত চলাফেরা করিবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আত্মাভিমানীদিগকে ভালবাসেন না। নম্রভাবে কথা বলিবে। (সূরা লোকমান)।

দশ প্রকার লোকের দেহ পচিবে না

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিম্নলিখিত দশ প্রকার লোকের দেহ কবরে পচিবে না ঃ— ১। পয়গম্বর, ২। শহীদ, ৩। আলেম, ৪। গাজী (ধর্ম-যোদ্ধা), ৫। কোর্‌আনে হাফেজ, ৬। মোয়ায্‌যিন। ৭। সুবিচারক বাদশাহ বা সরদার, ৮। সূতিকা রোগে মৃত রমণী, ৯। বিনা অপরাধে যে নিহত হয়, ১০। শুক্রবার যাহার মৃত্যু হয়। (দাকায়েক, ৮৮ পৃঃ)

মন্তব্য ঃ নূতন শহর পত্তন করার সময় বহুদিন পূর্বে মৃত ব্যক্তিগণের এমন বহু লাশ পাওয়া যায়।

আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ

নিম্নলিখিত ১০ জন পুণ্যাত্মা বেহেশতে যাইবেন বলিয়া তাঁহারা পৃথিবীতেই শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহারাই "আশারায়ে মুবাশশারাহ" (শুভ সংবাদ প্রাপ্ত দশ জন) নামে খ্যাতি।

১। সাইয়্যিদিনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), ২। সাইয়্যিদিনা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), ৩। সাইয়্যিদিনা হযরত ওসমান গনী (রাঃ),

৪। সাইয়্যিদিনা হযরত আলী (কাঃ), ৫। সাইয়্যিদিনা হযরত তালহা (রাঃ), ৬। হযরত যুবাইর (রাঃ), ৭। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আওফ্ (রাঃ), ৮। হযরত সা'দ ইব্‌নে আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ), ৯। হযরত সাঈদ ইব্‌নে যায়েদ (রাঃ), ১০। হযরত আবি ওবায়দা ইব্‌নুল জার্‌রাহ (রাঃ)।

দশটি পশুর সৌভাগ্য

হযরত মুকাতিল (রাঃ) এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, নিম্নলিখিত ১০টি জন্তু বিশেষ কারণে বেহেশ্‌তে স্থান লাভ করিবে। যথা ঃ—

১। হযরত সালেহ (আঃ) এর উষ্ট্রী, ২। হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্‌র মেষ, ৩। হযরত ঈসমাইল যবীহুল্লাহ্‌র দুম্বা, ৪। হযরত মূসা কলিমুল্লাহ্‌র গাভী, ৫। হযরত ইউনুছ (আঃ) কে যে মাছে গিলিয়াছিল উহা। ইহা সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকির করিত, ৬। হযরত সোলায়মান (আঃ) এর পিপীলিকা, ৭। হযরত ওযাইর নবী (আঃ) এর গাধা, ৮। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উষ্ট্রী, ৯। বিলকিসের হুদহুদ পাখী ও ১০। আসহাবে কাহাফের কুকুর। (দাকায়েক, ৯৬ পৃষ্ঠা)।

হযরত রসুল্লাহ (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী (এরশাদ) সমূহ

আক্বায়ে নামদার সরদারে দোজাহান হযরত রসূলে করীম (সাঃ) আখেরী জমানায় পৃথিবীর অবস্থা ও কেয়ামতের লক্ষণ সম্বন্ধে যে এরশাদ ফরমাইয়া গিয়াছেন, তাহা আজ প্রায় ১৪ শত বৎসর পর বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে। এই এরশাদসমূহ মেশকাত শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। যথা ঃ—

১। সমাজের নেতাগণ সর্বসাধারণের মালামাল আত্মসাৎ করিবে, ২। মানুষ আমানতের মাল লুটের মালের ন্যায় মনে করিবে, ৩। যুলুম মনে করিয়া লোকে যাকাত দেওয়া বন্ধ করিবে, ৪। পিতামাতাকে কষ্ট দিবে ও তাঁহাদের আদর-যত্নে উদাসীন থাকিবে। ৫। আত্মীয়কে বর্জন করিয়া দূরবর্তীকে আত্মীয় মনে করিবে, ৬। সমাজের নেতাগণ প্রকাশ্য মজলিসে নাচ-গান করিবে, ৭। অত্যাচারের ভয়ে মানুষকে সম্মান করিবে, ৮। মসজিদের ভিতরে উচ্চবাক্য ও বাজে কথা বলিবে, ৯। গায়িকাগণ প্রকাশ্য মজলিসে নাচ-গান করিবে, ১০। নূতন নূতন বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার হইবে, ১১। নেশার দ্রব্য হালাল দ্রব্যের ন্যায় নিঃসংকোচে ব্যবহার হইবে, ১২। নূতন নূতন আলেমগণ পূর্বকালের মোহাদ্দেস ও ফকীহগণকে নির্বোধ বলিবে, ১৩। পুরুষগণ স্ত্রীলোকের ইঙ্গিতে চলিবে, ১৪। অর্থ উপার্জনের জন্যে

দীনি এলেম শিক্ষা করিবে, ১৫। নিত্য-নূতন বিপদাপদ ও বালা-মসিবত আসিবে, ১৬। মানুষের আকার পরিবর্তন হইতে থাকিবে, ১৭। নূতন ব্যাধি দেখা দিবে, ১৮। মানুষ দুনিয়ার পরিবেশে আকৃষ্ট হইবে, ১৯। দীনি এলেম লোপ পাইবে (এলেম থাকিবে, কিন্তু আমল উঠিয়া যাইবে) ও ২০। স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে।

কেয়ামতের লক্ষণসমূহ

১। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলেকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, স্ত্রীগণ বেপর্দা ও বেহায়া-ভাবে চলিবে, ২। সম্মানের ও অর্থ উপার্জনের জন্য বিদ্যা শিক্ষা করিবে, জ্ঞানের জন্য নহে। ৩। মুসলমানগণ গান-বাজনায় লিপ্ত হইবে ও পরকাল ভুলিয়া যাইবে, ৪। ৩০ জন মিথ্যাবাদী নবী বলিয়া দাবী করিবে, ৫। বিধর্মীগণ ইসলাম ধ্বংস করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে, ৬। মুসলমানগণ ইসলামী বিধান অমান্য করিবে, ৭। কখনও অনাবৃষ্টি কখনও অতিবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হইতে থাকিবে, ৮। নানা প্রকার মারাত্মক ব্যাধির আবির্ভাব হইবে ও নূতন নূতন চিকিৎসার উদ্ভব হইবে, ৯। বিধর্মীগণের প্রভাব ও যশ বৃদ্ধি পাইবে ও তাহারা কোরআন মিথ্যা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবে, ১০। মানুষের লজ্জাশীলতা ও মায়া-মমতা হ্রাস পাইবে, ১১। প্রত্যেক জিনিসের স্বাদ, ঘ্রাণ ও বরকত কমিতে থাকিবে, ১২। মানুষ আল্লাহ তাঁয়ালার খেয়াল ভুলিয়া অকাজে ও আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকিবে। ১৩। অত্যাচার ও অবিচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে। ধূর্তামি, দাগাবাজি, চালবাজি, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা করা বাহাদুরী মনে করিবে। ১৪। কমজাত লোকের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইবে ও শরীফগণ তাহাদের লাঞ্ছনা ভোগ করিবে। ১৫। লোকেরা কোরআনের তাযীম করিতে অবহেলা করিবে, ১৬। মানুষের আয়ু কমিয়া আসিবে, ১৭। চরিত্রহীন লোকেরা সমাজের নেতা হইবে, ১৮। জেনা করা গোনাহ বলিয়া মনে করিবে না ও হায়া (লজ্জা) উঠিয়া যাইবে, ১৯। ধনীরা গরীবদেরকে ঘৃণা করিবে ও ১০। লোকেরা দাসী- বান্দীদের সঙ্গে জেনা করিবে।

আলেমের প্রতি মুসলিম সমাজ

শ্রদ্ধেয় আলেমগণ নায়েবে রসূল অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর প্রতিনিধি পদবীতে ভূষিত। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারা তাহাই। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর পবিত্র ইসলামের মর্যাদা ও প্রচার অক্ষুণ্ণ রাখার

গুরুভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহারা অহোরাত্র প্রচার কার্য চালাইয়া সমাজের নিকট ইসলামকে জাগ্রত রাখিতেছেন। তাঁহাদের হেদায়েত (প্রচার) বন্ধ হইয়া গেলে সমাজ গোমরাহির পথ ধরিয়া চলিবে ও ইসলাম লোপ পাইতে থাকিবে। পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে আলেমের সমাদর করিবে সে যেন স্বয়ং আকায়ে নামদার সরদারে দোজাহান হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর সম্মান করিল। ইসলামের বাহক হিসাবে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর পরেই তাঁহাদের স্থান। কথিত আছে, আলেমের দেহ কবরে পচে না। তাঁহাদের চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পায় ও তাঁহাদের সংস্রবে থাকিলে অনেক গোনাহ মাফ হইয়া যায়।

যেখানে আলেমের মাহ্‌ফিল (মজলিস) হয় সেখানে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত নাযিল হয়। এমন অনেক সময় দেখা গিয়াছে, যে স্থানে আলেমের অনাদর হইয়াছে, সেই স্থানে নানা প্রকার বালা-মসিবতের আবির্ভাব হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ আলেমের মাহ্‌ফিল দেশের বালা-মসিবত, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দূর করে। ইসলামকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে আলেমের সম্মান ও আদর-যত্ন করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে কর্তব্য। সমাজের নিকট তাহাদের মর্যাদা ও দাবী অগ্রগণ্য।

কিরূপ ব্যক্তি আলেমরূপে সম্মান লাভ করিতে পারে এই অফুরন্ত তর্কে প্রবেশ না করিয়া ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যিনি আলেম নাম ধরিয়া ইসলাম প্রচার করিতেছেন মোটামুটিভাবে তাঁহাকেই আলেমরূপে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিলে সমাজের কর্তব্য শেষ হইবে এবং হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি পরোক্ষভাবে সম্মান দেখান হইবে। বর্তমান যুগের আলেমগণের আদর্শ ধরিয়াই চলিতে হইবে।

পৃথিবীতে আশ্চর্য বিষয় কি

মানুষ দেখিতেছে, তাহার সম্মুখে প্রত্যহ কত লোক ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তবু তাহার নিজের মৃত্যুর স্মরণ হয় না। যাহাতে মনে মৃত্যুর কথা জাগরূক থাকে সে জন্য মাঝে মাঝে কবর যিয়ারত করা উচিত। কবর যিয়ারত করা অতিশয় সওয়াবের কাজ। ইহাতে নিজেরও নেকী হাসেল হয় এবং মৃত ব্যক্তিরও উপকার হয়। ইহাতে মৃত্যুর কথা স্মরণ হইয়া মনের কাঠিন্য দূর হয়। সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ থাকিলে মানুষ সহজে গোনাহর কাজে লিপ্ত হইতে পারে না।

কবরস্থানে উপস্থিত হইয়া এইরূপভাবে সালাম পড়িতে হয়

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ - يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ ۝

উচ্চারণ ঃ— আস্‌সালামু আইলাইকুম ইয়া আহ্‌লাল কুবূর, ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম আন্‌তুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আছার।

অর্থ ঃ— হে কবরবাসীগণ! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক এবং আল্লাহ আমাদিগকে ও তোমাদিগকে মাফ করুন। তোমরা আমাদেরই এক সম্প্রদায়ভুক্ত ও আমরা তোমাদের নিদর্শনস্বরূপ এই পৃথিবীতে রহিয়াছি।

তৎপর আলহামদু ১ বার, সূরা ইখলাস ৭ বার ও দরূদ শরীফ ৭ বার পড়িয়া মৃত ব্যক্তিগণকে বখশিশ করিবে।

اَلْاِسْلَامُ—ইসলাম

ইসলাম অর্থ শান্তি, ইহা সালাম শব্দেরই রূপান্তর। শান্তি অর্থ মনের নির্দোষ সোয়াস্তি, ইহ-পরকালের নিশ্চিন্ততা, মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আচার-ব্যবহার ও আদান-প্রদানে স্নেহ, মমতা ও শান্তিজনক সাম্যভাব এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও এবাদতের স্বাভাবিক ইচ্ছা বুঝায়।

বেহেশত ও দোযখের আবশ্যকতা

ইসলামী মূলনীতিতে (আকিদা) আমরা সর্বশক্তিমান, ন্যায়বিচারক, সর্বগুণাধার ও কর্মফলদাতা এক লা শরীক আল্লাহকে চিরজীবী রূপে দেখিতে পাই। আল্লাহকে ন্যায়বিচারক ও কর্মফল দাতারূপে বিশ্বাস করা হয় বলিয়াই মন্দ কাজের শাস্তির ভয় ও সৎ কাজের পুরস্কারের আশায় মুসলমানের জীবন সুশৃঙ্খল হয়, ঈমান পুষ্টি লাভ করে ও মজবুত হয়। পাপ পুণ্যে সাজা ও পুরস্কার আছে বলিয়াই বেহেশত-দোযখ সৃষ্টির আবশ্যকতা হইয়াছে। ইহা না থাকিলে মানুষ বেপরোয়া হইয়া দায়িত্বহীন জীবন যাপন করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। দুনিয়া অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ও পাপের লীলাভূমি হইয়া যাইত। পরকালে ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের বিশ্বাসই মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠন করে ও নিয়ন্ত্রিত করে। আখেরাতে বিশ্বাসী একজনের নৈতিক চরিত্র যে ধরনের হয়, আখেরাতে অবিশ্বাসীজনের ইহার বিপরীত হয়। আখেরাতে

বিশ্বাসই মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দের পার্থক্য সৃষ্টি করে ও বিবেককে শক্তিশালী করে। বেহেশত-দোযখ না থাকিলে পরকালের বিচারের কোন আবশ্যকতাই থাকিত না, অন্য কোন ধর্মে বেহেশ্ত-দোযখের সঠিক বর্ণনা নাই। এই ক্ষুদ্র কিতাবে বেহেশ্তের অসীম ক্রমবর্ধমান অফুরন্ত সুখ-সম্পদের ও দোযখের ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নহে, কেবল বেহেশত দোযখের নামগুলি দেওয়া হইল ঃ-

আট বেহেশ্ত

১ দারুল খোলদ, ২। দারুল মাকাম, ৩। দারুস্ সালাম, ৪। আদন, ৫। দারুল ক্বারার ৬। দারুন্নাঈম, ৭। জান্নাতুল-মাওয়া, ৮। জান্নাতুল ফেরদৌস।

সাত দোযখের নাম

১। লাজা, । ২। হোতামা, ৩। ছায়ীর, ৪। ছাক্বার, ৫। জাহীম ৬। হাবীয়া ও ৭। জাহান্নাম।

আ'রাফ

বেহেশ্ত দোযখের মধ্যবর্তী স্থানকে 'আ'রাফ' বলা হইয়াছে। যাহারা দোযখে নিপতিত হইবে না ; অথচ বেহেশ্তেও প্রবেশের উপযোগী নয় তাহারাই এখানে অবস্থান করিবে। (সূরা আ'রাফ, ৪৬ আয়াত)

শ্রেষ্ঠ কে — মানুষ, না ফেরেশতা

অনেকে মনে করিয়া থাকে, ফেরেশ্তা বুঝি মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ ; তাহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ফেরেশ্তাগণ কখনও মানুষের গৌরব ও মর্যাদা লাভ করিতে পারে না ; যেহেতু ফেরেশ্তাগণের আহার-নিদ্রার প্রয়োজন হয় না, জীবিকার জন্য তাঁহাদের ব্যস্ত থাকিতে হয় না, অভাব-অনটন, রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট, সমাজসেবা ও পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণ মুক্ত। এরূপ বেপরোয়া বলিয়াই তাঁহারা অহোরাত্র আল্লাহ্র এবাদত ও হুকুম তামিলে লিপ্ত থাকিতে পারে। আর মানুষ এই মায়াময় সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ থাকিয়া জটিলতাপূর্ণ জীবনে আপদ-বিপদ, অভাব-অনটন, রোগ-শোক ও দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া আপন পরিবারের ভরণ-পোষণ ও সমাজ সেবা এবং আল্লাহ্র এবাদত করে—তবে ফেরেশ্তা শ্রেষ্ঠ হইল কিসে ?

ফেরেশ্তাগণ আল্লাহ্র কুদরত ও লীলা-খেলা সাক্ষাৎভাবে দেখিয়া থাকেন আর মানুষ গায়েবানা আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও তাঁহার এবাদত করে। মানুষকে প্রতি মুহূর্তে শয়তানের ধোকায় ঈমানের পরীক্ষা দিতে হয়, ফেরেশ্তার সেই বালাই নাই। শয়তানের পরীক্ষায় তাঁহাদের ঈমান টেকসই করিতে হয় না। একবার বাবেল শহরে হারূত-মারূত দুই ফেরেশ্তা ঈমানের পরীক্ষায় ফেল হইয়া প্রমাণ করিয়াছে যে, ফেরেশতা মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ নয়। শয়তান-ধাবিত মানুষের সরল প্রাণের একটি সেজদা কোটি কোটি ফেরেশ্তার অগণিত সেজদা হইতেও উত্তম, অতি উত্তম। মানুষ শ্রেষ্ঠ বলিয়াই আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) কে সেজদা করিবার জন্য ফেরেশ্তাগণকে আদেশ করিয়াছিলেন, তাই তিনি ফেরেশ্তাগণকে বাদ দিয়া মানুষকে আপন খলীফা (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করিয়া আশরাফুল মখলুকাতরূপে (সৃষ্টির সেরা) সৃষ্টি করিয়াছেন।

সবার উপরে মানুষ, তাঁহার উপরে আল্লাহ, তাঁহার উপরে আর কেহই নাই।

পৃথিবীর সহিত মানুষের সম্পর্ক

এই পৃথিবী মানুষের পক্ষে একটি পুল স্বরূপ। পুলের উপর দিয়া মানুষ কেবল চালিয়া যায়, ইহাতে কেহ বাস করে না। সেইরূপ এই পৃথিবীতেও কেহ স্বাধীন-ভাবে বাস করে না। সামান্য কয়েকদিন অবস্থান করিয়া পরকালের দিকে চলিয়া যায়। এই মহা নীতিবাক্যটি ফতেপুর সিক্রির ফটকে আরবী ভাষায় লিখিত রহিয়াছে।

আল্লাহ ও রসূল

হযরত রসূল করীম (সাঃ) আল্লাহ তায়ালার সৃজিত বিশিষ্ট নূরে সৃষ্টি। সূর্য ও সূর্যের কিরণ যেরূপ এক নহে, অথচ সূর্যের কিরণ সূর্য হইতে ভিন্নও নহে — আল্লাহ্র সহিত হযরত রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) সম্পর্কটিও এইরূপ।

হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) উক্তি

হযরত ইব্রাহীম আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কোন্ কারণে আল্লাহ পাক আপনাকে খলীল (পরম বন্ধু) বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ? তিনি বলিলেন যে, তিনটি কারণে ঃ— ১। আমি আল্লাহ্র আদেশকে অপরের আদেশের উপর প্রাধান্য দেই। ২। আমি সকল বিষয়ে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করি ও রিযিকের জন্য কোন ভাবনাই করি না। ৩। সকাল-সন্ধ্যায় মেহমান ছাড়া আহার করি না। (মোনাকোহাত)

কোর্‌আন মতে মধুর গুণ

شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ — মানবের জন্য ঔষধ (কোর্‌আন)

আবহমান কাল হইতে মধু ঔষধরূপে ব্যবহার হইয়া আসিয়াছে। ইহা মানব দেহের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও সর্বরোগ বিনাশক ঔষধ এবং উপাদেয় খাদ্যও বটে। মধু এত উপকারী বলিয়াই যাহাতে মানব সমাজ মধুর ব্যবহার ভুলিয়া না যায়, সেজন্য পাক কোর্‌আনে মধুর গুণের বর্ণনাসহ "সূরা নহল"(মধুমক্ষিকা) নামক একটি সূরা নাযিল হইয়াছে। মধু মানবের দৈহিক রোগের ঔষধ বলিয়া পাক কোর্‌আনে বিশেষ আখ্যা লাভ করিয়াছে। ইহা মধুর বিশেষ গুণের প্রমাণ। মধু সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক কোর্‌আনে বলিয়াছেন যে —

"এবং তোমার প্রতিপালক মধুমক্ষিকাকে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যে, পর্বতমালা ও বৃক্ষসমূহ এবং উচ্চস্থানে মধুচক্র নির্মাণ কর। উহাদের উদর হইতে বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট পানীয় নির্গত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মানব সমাজের জন্য ঔষধ রহিয়াছে। নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীল সমাজের জন্য (আল্লাহ্‌র কুদরতের) নিদর্শন রহিয়াছে।" (সূরা নহল, ৬৮ ও ৬৯ আয়াত)।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক মানবকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, মধু মানব দেহের জন্য ঔষধ। মধুমক্ষিকার মধ্যে সহজাত প্রেরণা সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ তায়ালা নিজে এই ঔষধের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা কোন মানুষের বা কবিরাজ, হেকিম ও ডাক্তারগণের সৃষ্ট ঔষধ নহে।

মধুর সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, মধু সর্বপ্রকার রোগের ঔষধ হওয়ার গুণ লাভ করার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। মৌচাকে লক্ষ লক্ষ মধুমক্ষিকা থাকে। উহারা নানা প্রকার অসংখ্য গাছের ফুল হইতে ফুলের নির্যাসরূপ রস আহরণ করিয়া থাকে এবং ঐ সকল নির্যাস মধুমক্ষিকার পেটে অবস্থিত একপ্রকার জারক রসের সহিত মিশ্রিত হয়। গাছের পূর্ণ বৃদ্ধির সময় ফুল ফুটিয়া থাকে ও ফুলের মধ্যে গাছের নির্যাস অর্থাৎ ভাইটামিন (খাদ্যপ্রাণ) সঞ্চিত হয়। এইরূপে এক ফোঁটা মধুর মধ্যে বিভিন্নরূপ অসংখ্য গাছের বিভিন্ন প্রকার শক্তিসম্পন্ন ভাইটামিন আসিয়া একত্রিত হয় ; তৎপর মধুমক্ষিকার উদরে সঞ্চিত শক্তিশালী জারক রস মিশ্রিত হইয়া মধুর আকার ধারণ করে।

মানবদেহের জন্য যত প্রকার ভাইটামিন আবশ্যক তাহার ১২ আনা মধুর মধ্যে বর্তমান। চিকিৎসাশাস্ত্র মতে মধু অপেক্ষা শক্তিশালী ভাইটামিনযুক্ত আর কোন পদার্থ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় নাই। তাই মধু অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইলে ঐ সকল দ্রব্যের গুণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। সেই জন্যই বেশীর ভাগ হেকিমী ও কবিরাজী ঔষধের সঙ্গে মধু মিশ্রিত করিয়াই সেবন করার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। মধুর আর একটি গুণ এই যে, ইহা পানিকে ভীষণভাবে শোষণ করিয়া লয়। চিকিৎসকগণ এইজন্যই মধুকে পানির চুম্বক বলিয়া মনে করে। মানুষের মগজ দুর্বল ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে বার্ধক্য উপস্থিত হয়। মানুষের মাথার মগজের উপর একটি পর্দা আছে। মগজ ও পর্দার মধ্যে ফাঁকা আছে, তন্মধ্যে এক প্রকার জলীয় পদার্থ সর্বদা বাষ্পের আকারে সঞ্চিত থাকে, এই বাষ্পীয় পদার্থটি মানুষের মগজকে ধীরে ধীরে দুর্বল ও ক্ষয় করিয়া থাকে। ইহা মানুষকে বার্ধক্যের পথে ঠেলিয়া দেয়। কিন্তু যাহারা নিয়মিতভাবে মধু সেবন করে তাহাদের মস্তিষ্কের ঐ বাষ্পীয় পদার্থ ক্রমে ক্রমে মধু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শোষিত হইয়া যায়। মধুর মধ্যে যে চিনি আছে তাহা অন্যান্য চিনির ন্যায় ক্ষতিকর নহে, সেজন্যই মধুর মধ্যে নিহিত চিনিকে মধু-শর্করা নাম দিয়া কবিরাজগণ আলাদা পর্যায়ে ফেলিয়াছেন।

মধু সর্বশ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর খাদ্যও বটে। মধুর আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহা সঙ্গমশক্তিকে বর্ধিত করিয়া স্থিতিশীল ও অটুট রাখে। নিয়মিত মধুসেবী ব্যক্তির কখনও ধাতুদৌর্বল্য রোগ হয় না। বাজীকরণের কোন ঔষধই মধু ব্যতীত প্রস্তুত হইতে পারে না, ইহা বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করে। সেইজন্যই বোধ হয় সঙ্গম-শক্তিশালী ব্যক্তিকে কবিরাজী ভাষায় মধুকর বলা হয়।

মধুমক্ষিকা মানুষের জন্য এমন একটি উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য ও মহৌষধ সৃষ্টি করে বলিয়াই মধুমক্ষিকা নিধন করা হাদীছ শরীফে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। মধু মানবসৃষ্ট কোন ঔষধ নহে, ইহা আল্লাহ প্রদত্ত একটি বিশেষ নেয়ামত।

৪টি অভ্যাস অবলম্বন করিলে মৃত্যু ব্যতীত কোন রোগে আক্রমণ করিবে না

১। সর্বদা নিয়মিত মধু সেবন করা। ২। সর্বদা নিয়মিত নামায পড়া। ৩। দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা হইতে মনকে মুক্ত রাখা , (আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখিলেই দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা লাঘব হইয়া যায়)। ৪। সর্বপ্রকার জেনা বর্জন করা।

সাধ্যানুসারে প্রত্যেকের পক্ষে অন্ততঃ মাঝে মাঝে মধু সেবন করা উচিত।

দশম অধ্যায়

নামাযের ফযীলত

আল্লাহ পাক কোর্‌আন মজীদে প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল আমার এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। (সূরা যারিয়াত, ৫৬ আয়াত) প্রায় সকল জাতির মধ্যেই স্রষ্টার উপাসনা (এবাদত) করা ধর্ম বিধানের অন্তর্ভুক্ত। যে জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিক চর্চার অভাব সে জাতিই প্রকৃত নির্ধন। পাক কোর্‌আনের অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে যে—

اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۝

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ ۝

অর্থ ঃ— হে মুহাম্মদ (সাঃ)! তোমার উপর যে পবিত্র কিতাব (কোর্‌আন) নাযেল হইয়াছে তাহা পড় এবং নামায কায়েম কর, নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা ও দুষ্কার্য প্রতিরোধকারী। (সূরা আনকাবুত, ৪৫ আয়াত) এখানে কোর্‌আন পাঠ করার পরেই আল্লাহ নামায কায়েম (প্রতিষ্ঠিত) করার জন্য আদেশ করিয়াছেন। নিয়মিতভাবে মনোযোগ সহকারে অযুর সহিত পাঁচবার নামায সম্পন্ন করা মুসলমানের জন্য ফরয (অবশ্য কর্তব্য)। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, শেরক ও কুফরী প্রভৃতি কবীরা (বৃহত্তম) গোনাহ ব্যতীত নামায মানুষের দৈনন্দিন অন্যান্য গোনাহ (অপরাধ) সমূহের ক্ষমাকারী ও সংশোধক। ফলতঃ যাহারা নিয়মিতভাবে আল্লাহ্‌র স্মরণে নামায পড়িয়া থাকেন তাঁহারা যে অশ্লীলতা ও অপকর্মে লিপ্ত হইতে পারেন না তাহা প্রত্যক্ষ সত্য ; এইজন্য নামায ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ রোকন বা কল্যাণকর এবাদত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। নামায বেহেশতের চাবি ও সকল এবাদতের মূল ভিত্তি, ঈমানদারগণের জন্য মে'রাজ ; (আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়ার উপায়)। নামায ব্যতীত কেহই অলী আল্লাহ্‌র দরজায় পৌঁছিতে পারে না। হাশরের দিন সর্বপ্রথমেই নামাযের হিসাব হইবে। আল্লাহ্‌র সহিত ইনসানের রূহের (আত্মার) সংযোগ সাধনই নামাযের উদ্দেশ্য, আল্লাহ্‌র ধ্যান ও স্মরণই নামাযের প্রাণ, প্রাণহীন নামাযে কোন ফায়দা হাসিল (লাভ) হয় না ; বরং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি অর্জন করে, এরূপ নামাযীর অবস্থা সূরা

মাউনে (৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) বর্ণিত হইয়াছে। পাক কোর্‌আনে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন যে,— আমার স্মরণের জন্য নামায পড়। (সূরা তা'হা, ১৪ আয়াত) আঁ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন যে, যে নামাযে আল্লাহ্‌র স্মরণ হয় না, সে নামাযের দিকে আল্লাহ দৃষ্টিপাতও করেন না। যে নামাযে মন আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হয়, কেবল সেই নামাযই পরকালের পাথেয় স্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি দীনতা ও নম্রতার সহিত যথানিয়মে নামায আদায় করে, তাহার নামায আরশ পর্যন্ত উত্থিত হয়। বর্ণিত আছে যে, হযরত আলীর (কার্রাঃ) দেহে তীরবিদ্ধ হইলে তাহা তাঁহার নামাযের সময়ই বাহির করা হইয়াছিল। তাঁহার মন নামাযে এমনভাবে মগ্ন ছিল যে, তিনি কোন কষ্টই অনুভব করেন নাই। মৃত্যু ও কবর আযাবের কথা চিন্তা করিলে মন আল্লাহ্‌র প্রতি রুজু হয়। আঁ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন যে, তৌহীদের পর আল্লাহ পাক বান্দাকে নামায অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই দান করেন নাই ; যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করিয়াছে, সে ইসলাম ধ্বংস করিয়াছে, যেখানে নামায নাই সেখানে ইসলাম নাই।

দাঁড়াইয়া রুকু করিয়া অবশেষে শরীরের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মাথাকে মাটিতে লুটাইয়া সেজদায় পড়িয়া আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণপূর্বক তাঁহার দয়া প্রার্থনা করার যে বিধান নামাযে রহিয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে এবাদতের এমন ব্যবস্থা নাই। আর কোন ধর্মই মানবতার সহিত আল্লাহ্‌র সংযোগ সাধনের সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থার নির্দেশ দিতে পারে নাই। জনৈক ইউরোপীয় দার্শনিক বলিয়াছেন যে, মুসলমানগণ তাঁহাদের নামাযে সমস্ত শরীর ও মন নিয়োগ করে বলিয়া তাঁহাদের প্রার্থনা (দোয়া) অত্যন্ত জোরালো হয়।

কোন শক্তির নিকট নতিস্বীকার করা আল্লাহ্‌র সেফাতের বহির্ভূত। সে জন্যই তাঁহার শক্তি ও দয়ার নিকট নতিস্বীকার করিয়া নামায পড়া তাঁহার নিকট পছন্দনীয় ও গ্রহণীয় হয়। নামাযের মাধ্যমে তাঁহার সাহায্য লাভ করা সহজসাধ্য হয়। সেজন্যই আল্লাহ নির্দেশ দিয়াছেন যে— যে কোন বিপদ আরম্ভ হইলে ধৈর্যের সহিত নামায পড়। (সূরা বাক্বারা, ৪৫ আয়াত) বিপদ-আপদে নামায দ্বারা আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সমস্ত পয়গম্বরই নামাযের আশ্রয় লইতেন।

দেহ, মন ও বাক্য সংযোগে যে এবাদত তাহা কেবল নামায দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও আঁ হযরত (সাঃ) কখনও নামায ত্যাগ করেন নাই।

নামাযের ফযীলতের বর্ণনা ঃ- আল্লাহ পাক প্রত্যেক সৎ কাজের জন্য ইহ-জগত ও পরকাল উভয় স্থানেই পুরস্কার ও সুফল নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, সৎকাজ দ্বারা পরকালে পুরস্কার ও সুফল লাভ করা ভবিষ্যতের ব্যাপার ; ইহা মানব চক্ষুর অগোচর, সাক্ষাৎভাবে কেহই পরলোকের ফলাফল দেখিতে পারে না এবং দেখাইয়াও দিতে পারে না। ইহা ঈমান বা বিশ্বাসের বিষয়। নেক কাজ দ্বারা এ জগতে ফল লাভ না হইলে কেবল ভবিষ্যতে বিশ্বাস করিয়া মানুষ নেক কাজের প্রতি আকৃষ্ট হইত না, কিংবা বেশী দিন লিপ্ত থাকিতে পারিত না। মানুষের স্বভাব— "নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য ফাঁকি।" মানুষকে আল্লাহ পাক এই স্বভাব দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া কোর্‌আনেও উল্লেখ হইয়াছে। (৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) মানুষ এই স্বভাবের অধীন বলিয়াই আল্লাহ পাক নেক কাজের সুফল এ জগতেও দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কিতাবে ইহকালের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধেই বিশেষভাবে বর্ণনা করার ইহাই প্রধান কারণ। নেক কাজ দ্বারা ইহকালেও সুফল লাভ হইলে পরকালেও সুফল লাভ হওয়ার বিষয় সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। কোন লোকই ইহা অস্বীকার করিতে পারে না যে, নেক কাজ দ্বারা কোন না কোন সময় কোন ফায়দা লাভ করে নাই, তবুও মানুষ সৎ কাজের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়ার কারণ তাহার ঐ স্বভাব। ঐ স্বভাবের জন্যই মানুষ ভবিষ্যতকে অগ্রাধিকার দিতে কুণ্ঠিত হয়। আবার এ কথাও সত্য যে, এই স্বভাবের জন্যেই জগৎ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। মানুষের স্বভাবে ইহার অভাব ঘটিলে হয়ত পার্থিব উন্নতি ব্যাহত হইতে পারে কিন্তু ইহা সত্য যে, ইহকাল ক্ষণস্থায়ী ও পরকাল অসীম অনন্ত চিরস্থায়ী। একটি আশু-বর্তমান, অপরটি চিরবিদ্যমান।

নামাযে সঙ্গম-শক্তি সংযত হইয়া স্থিতিশীল ও বিকার শূন্য হয়

রসায়ন বিজ্ঞানের একটি সূত্র এই যে, সাধারণ নিয়মে কঠিন পদার্থ উত্তপ্ত করিলে প্রথমে ইহা তরল হয় এবং এই বাষ্প বাতাসে মিশিয়া যায়; কিন্তু আয়োডিন, নিশাদল ইত্যাদি পদার্থে তাপ দিলে তরল না হইয়া

একেবারে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। আবার কতকগুলি পদার্থ আছে (যথা বরফ) তাহাকে তাপ দিলে প্রথমে তরল হয় ও পরে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। আবার কোন কোন অবস্থায় তরল না হইয়া একেবারে বাষ্প হইয়া বাতাসে মিশিয়া যায়। এই শেষোক্ত অবস্থাকে রসায়ন বিজ্ঞান উর্ধ্বপাতন বলে। মানুষের কামশক্তিকে এই সূত্র অনুসারে যৌনসঙ্গমে স্বাভাবিকভাবে প্রয়োগ না করিয়া এবাদতে, আধ্যাত্মিক সাধনায় ও কল্যাণকর কার্যে প্রয়োগ করা যায়। অর্থাৎ যৌনশক্তিকে নিম্নস্তরের কার্য হইতে উর্ধ্বস্তরের কার্যে নিয়োগ করা যায়। দেহের মধ্যে এইরূপ শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে ; মানুষের মধ্যে যে সকল প্রবৃত্তি আছে তাহার মধ্যে কামশক্তিই বেশী প্রবল ও দুর্দমনীয়। আমাদের ধর্ম ও সভ্যতায় প্রবৃত্তির (নফ্‌সের) যে সকল রিপুকে সর্বাপেক্ষা বেশী দমন করার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কামই প্রধান; কিন্তু আমরা কামকে দমন করিতেও পারি নাই বা দূর করিতেও পারি নাই, আবার সম্পূর্ণরূপে কামকে দমন করাও বাঞ্ছনীয় নহে। তাহাতে মানব জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্যই ইসলামী শরীয়তে বিবাহকে উৎসাহ দান করা হইয়াছে। মধ্য যুগে যে খৃষ্টধর্মে বৈরাগ্যের ও আত্ম-নিপীড়নের ধুঁয়া উঠিয়াছিল, তাহারা শেষ পর্যন্ত ইহার তাল সামলাইতে না পারিয়া কেহ পাগল হইয়াছিল, নচেৎ কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়া আপন নির্বুদ্ধিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল। আবার কেহ কেহ কাম জ্বালা দমন করিতে লিঙ্গচ্ছেদ করিয়াছিল। সেইজন্য বিশ্বনবী (সাঃ) মুসলমান নর-নারীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, যে বিবাহকে অস্বীকার করে সে আমার কেহ নয়। (হাদীস)

পার্থিব কাম যাহার যত বেশী, আল্লাহ প্রেম (এশ্‌কে এলাহী) তাহার অনুপাতে তত বেশী হইয়া থাকে। কেবল কামের খোলসটা বদলাইয়া পাত্র পরিবর্তন করিলেই আল্লাহ প্রেমিক হওয়া যায়, ইতিহাসে এইরূপ বহু নজীর রহিয়াছে। তায্‌কেরাতুল আওলিয়ায় উল্লিখিত অন্যতম তাপস হযরত আবদুল্লাহ (রহঃ) জনৈক রূপসী রমণীর প্রতীক্ষায় সমগ্র রজনী বরফের উপর কাটাইলে পর সোবেহ্ সাদেকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া যায়; নিমিষে তিনি কামের খোলস বদলাইয়া বিভুপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠেন।

কামশক্তিকে সম্পূর্ণ দমন না করিয়া উহার উগ্রতাকে ভিন্ন পথে চালিত করিয়া নিঃশেষ করাই উত্তম পথ। বর্তমান যুগের যৌন-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই

যে—দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য ও জগতের সভ্যতার অগ্রগতি প্রভৃতি কামশক্তিরই রূপান্তরের ফল। মানুষের কামশক্তির কতকাংশ স্বাভাবিকভাবে ব্যয়িত না হইয়া উর্ধ্বপাতনের নিয়মে আল্লাহ্‌র আরাধনা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প ইত্যাদির কাজে নিয়োজিত হইয়া ঐ সকল বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। এই সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করার উপায় নাই; যেহেতু কোন কামশক্তিহীন লোক আজ পর্যন্ত উচ্চাঙ্গের কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক কিংবা সাহিত্যিক হইতে দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ দেখা যায় যে—অঙ্কশাস্ত্র, দর্শন কিংবা বিজ্ঞানের জটিল বিষয়ে কতক্ষণ গভীর চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে সাময়িকভাবে কামভাব দমিত হইয়া যায়। গ্রীক দার্শনিকগণ পুরুষের অণ্ডকোষকে প্রতিভার আধার বলিয়া মনে করিতেন। আবু সিনা প্রমুখ আরব্য হেকিমগণও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। বাড়তি কামশক্তি ও কামভাব নামাযের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হইয়া যায় বলিয়া নামাযী লোকের মধ্যে যৌনবিকৃতি সৃষ্টি হইতে পারে না। এইজন্যই হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রকৃত নামাযী লোক জেনাকার হয় না। যৌন বিকৃতি থাকে না বলিয়া নামাযী লোকের যৌনশক্তি ক্রমবিকাশ পায় ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। তদুপরি যৌনবিকৃতি না থাকার দরুন নামাযী লোকের চেহারায় আভা ফুটিয়া উঠে। অনেকে ইহাকে নূর (জ্যোতিঃ) বলিয়া ধারণা করে। যৌন-স্বাস্থ্যের জন্য নামায ও ওযু টনিকের কাজ করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ওযুর প্রয়োজনীয়তা ঃ— ওযু নামাযের জন্য অপরিহার্য। ওযু ব্যতীত নামায হয় না। মানুষের যৌনশক্তি স্নায়ু ও মস্তিষ্কের সুস্থতা ও শক্তির উপর নির্ভর করে। শরীরের যে সকল অংশে স্নায়ু শেষ হইয়াছে তাহাই বেশী অনুভূতিশীল ও স্পর্শকাতর, যেমন হাত পায়ের শেষভাগ, মুখের মধ্যে জিহবা ও ঠোঁট, নাক ও চক্ষু এই সকল অংশগুলি ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধৌত করিলে সজীব হইয়া উঠে ; সংগে সংগে স্নায়ুর অন্যান্য অংশ ও মস্তিষ্কে সতেজ ভাব সৃষ্টি করিয়া শক্তিশালী করে। ওযু শরীরে টনিকের কাজ করে। ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকে যে, ভাল করিয়া ওযু করার পর শরীর হালকা বোধ হয় ও মনে স্ফূর্তি ও উদ্যমের উদয় হয়। শরীরের শেষ ভাগগুলি অনুভূতিশীল বলিয়াই মানুষ জিহবা দ্বারা খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করে, ঠোঁট দ্বারা চুমু খায়, হাতের আঙ্গুল দ্বারা পেলবিত নারীদেহের স্পর্শ সুখ উপভোগ করে, চক্ষু দ্বারা সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া পুলকিত হয় ; নাক দ্বারা সুগন্ধ উপভোগ করে। অভিজ্ঞতা হইতে জানা

গিয়াছে যে, যাহারা প্রত্যেক নামাযের পূর্বে ওযু করিয়া লয় তাহাদের কামশক্তি দীর্ঘস্থায়ী ও সবল হয়। বোধ হয় এইজনাই ইসলামী শরীয়তে নির্দেশ আছে যে, স্ত্রীসঙ্গমের পূর্বে ওযু করিয়া লওয়া উত্তম। প্রত্যক্ষ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে সঙ্গম ক্রিয়া বেশ একটু বিলম্বিত হয়। ওযু দ্বারা স্নায়ু সবল হইয়া মস্তিষ্কের কাম কেন্দ্রকে উদ্দীপ্ত করিয়া অনেক ক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গম ক্রিয়ায় নিযুক্ত রাখিতে পারে। যে কেহ পরীক্ষা করিলেই ইহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারেন ; নামায ও ওযু দ্বারা মস্তিষ্ক সতেজ হয়, ক্লান্তি দূর হয়, শরীরের বর্ধিত তাপ সরিয়া যায় ; স্নায়ু ও চুলের গোড়া শক্ত হয়, পা ধৌত করিলে শরীরের রক্ত চলাচল সহজ হইয়া হৃৎপিণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি হয়। সেজন্যই নামাযী লোকেরা সাধারণতঃ হৃদরোগ, রক্তের চাপজনিত ব্যাধি ও বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয় না। নামায শৃংখলার সহিত যথাসময়ে সাংসারিক কাজ করার অভ্যাস গঠন করে, স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি করে, বুদ্ধির সুস্থিরতা আনয়ন করিয়া মনের চাঞ্চল্য দূর করে ও চিন্তা-ভাবনাকে লাঘব করিয়া দেয়। বে-নামাযী লোক আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল হইতে পারে না। আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীলতা অনেক মানসিক রোগকে প্রতিরোধ করে ও কামশক্তির প্রধান শত্রু দুর্ভাবনাকে হ্রাস করে। জামাতের নামায মনের সাহস বৃদ্ধি করে। জামাতের নামাযে ২৭ গুণ ফযীলত বেশী বলিয়া হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে।

নামায মানসিক রোগের প্রতিষেধক ঃ— কয়েক বৎসর পূর্বে করাচীতে পাকিস্তান মেডিক্যাল সমিতির এক সভায় আমেরিকার মানসিক রোগের চিকিৎসাবিদ অধ্যাপক হার্বার্ট আরবান বলেন যে, "ভরতীয় উপমহাদেশে ও এশিয়ার সর্বত্র মানসিক রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।" সম্প্রতি জাতিসংঘের রিপোর্টেও একথা স্বীকার করা হইয়াছে। তিনি ইহার কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে,"বর্তমান যুগের সমাজ ব্যবস্থায় সৃজিত অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, অশান্তি, দুর্ভাবনা ও আশা নিরাশার প্রতিঘাত ও নিরাপত্তার অভাব ইহার কারণ।" এই সকল লক্ষণ মানুষকে পাগল করিয়া না দিলেও সামাজিক দিক দিয়া অপ্রয়োজনীয় করিয়া তোলে। মানুষ দক্ষতা, যোগ্যতা ও কার্যক্ষমতা হারাইয়া সমাজের বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। কেবল পাগল

হইলেও মানসিক রোগ হইয়াছে এমন নহে, দেহের ব্যাধি যেমন ব্যাধি মনের ব্যাধিও সেরূপ ব্যাধি। দেহ সুস্থ না থাকিলে যেরূপ মন সুস্থ থাকে না, তেমনি মন সুস্থ না থাকিলে দেহও সুস্থ থাকে না। কাজেই দেহের ব্যাধি ও মনের ব্যাধি উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে মানসিক ব্যাধিও যে একটা ব্যাধি এবং ইহাও দেহের ব্যাধি হইতে কম ক্ষতিকর নয়, তাহা একরকম চিন্তাই করা যায় না। বিখ্যাত জার্মান মানসিক রোগের চিকিৎসক ডাঃ ব্রিল ও আমেরিকার হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও মানসিক রোগের চিকিৎসক বহু গবেষণা ও ব্যবসাগত অভিজ্ঞতা হইতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ ও ভয় মানুষের অর্ধেকের বেশী রোগের কারণ এবং কর্ম, বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র এবাদত ব্যতীত দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও ভয় দূর হইতে পারে না। বোতলের ঔষধ বা ইনজেক্‌শনে ইহাদের প্রতিকার সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌র এবাদত ও স্মরণ মানুষের মনকে প্রশস্ত, সমৃদ্ধিশালী করিয়া জীবনকে উদ্দেশ্যপূর্ণ, তৃপ্তিময় ও আশান্বিত করে, দুর্ভাবনা ও ভয়কে দূরে ঠেলিয়া দেয়। তাহারা দ্বিধাহীন চিত্তে বলিয়াছেন যে, পাকস্থলীর ঘা, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, পাগল হওয়া, বহুমূত্র, রক্ত চাপজনিত ব্যাধি ও হৃদ-রোগ ইত্যাদি কঠিন ব্যাধিসমূহ ধর্মপরায়ণ লোককে সাধারণতঃ আক্রমণ করে না। মনের অবস্থা শরীরের উপর বিশেষ ক্রিয়া করিয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মনে অত্যধিক ভয়ের উদয় হইলে মুখের ক্ষারধর্মী লালা একেবারে শুকাইয়া যায়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, প্রমাণের কোন আবশ্যক নাই। দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তায় পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের ভাগ বেশী মাত্রায় সৃষ্টি হইয়া যেরূপ পাকস্থলীর উপর স্তরে ঘা সৃষ্টি করে, তদ্রূপ দুর্ভাবনার জন্য রক্তের চাপ ও তাপের তারতম্য ঘটে, শরীরের অক্সিজেন রক্তে নিহিত শর্করা (চিনি) জ্বালাইতে সক্ষম হয় না এবং অদগ্ধ চিনি প্রস্রাবের সহিত বাহির হইয়া যাইতে বাধ্য হয়, ইহাই বহুমূত্র রোগের প্রধান কারণ ; এই একই কারণে শরীরের রক্ত চলাচল নিয়মিতভাবে না হওয়ার দরুন রক্ত চাপ বৃদ্ধিজনিত ব্যাধি ও হৃদরোগের উৎপত্তি হইয়া শরীরের স্নায়ুগুলি ক্রমে ক্রমে শিথিল ও দুর্বল হইয়া যায়।

ডাঃ ফার্ল তাঁহার রচিত "আত্মার সন্ধানে বর্তমান মানব" নামক ইংরেজী পুস্তকের ২৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, "আমি অসংখ্য মানসিক রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি কিন্তু যাহারা ধর্মভাবাপন্ন হইতে পারে নাই, তাহাদের কেহই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে নাই।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "ধর্মভাবই মানুষকে জীবনীশক্তি দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।"

দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও ভয়ের উপর নামাযের প্রভাব ঃ— মনে দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা ও ভয় উদয় হইলে মানুষ স্বভাবতই নিজেকে নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় মনে করে এবং এই ভাব ইহাদের তীব্রতাকে আরও বাড়াইয়া দেয়, কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ্‌র ধ্যানে নামাযে দাঁড়ায়, তখন মনে এই ভাবের উদয় হয় যে, সে নিঃসঙ্গও নহে, নিঃসহায়ও নহে—তাহার উপর একজন শক্তিমান সাহায্যকারী দয়াময় বিরাজ করিতেছেন। নিমিষে তাহার মনে তাওয়াক্কোল বা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতা জাগিয়া উঠে। আল্লাহ পাক কোর্‌আনে বলিয়াছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্ভরশীল লোকদিগকে ভালবাসেন। (সূরা আলে এমরান, ১৫৯ আয়াত) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে আল্লাহই তাহার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বীয় কার্য সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন। (সূরা তালাক, ৩ আয়াত) সেজন্যই নামাযে সাহস বৃদ্ধি পায়, নামাযে লোক বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করিতে সক্ষম হয় ও আত্মহত্যা করে না। নামাযের সময় উর্ধ্বে হাত উঠাইতে হয়, তাহাতে ফুস্‌ফুস্ প্রশস্ত হয়। রুকু পাকস্থলীকে সবল করিয়া হজমে সাহায্য করে। সেজদার সময় ঘাড়, মুখমন্ডল ও মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহিত হয়, নামাযে একাগ্রতা হাসেল হয়। নামায নম্রতা ও দীনতা শিক্ষা দেয়, মনের অহংকারকে চাপাইয়া রাখে। বর্তমান যুগের মানসিক রোগের চিকিৎসকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মানুষের মনে এমন কতগুলি দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষোভ থাকে যাহা অন্যের নিকট প্রকাশ না করিলে তাহা লাঘব হয় না। বিশেষ করিয়া মেয়েলোকেরা অন্যের নিকট যে পর্যন্ত তাহাদের দুঃখ-কষ্ট বিনাইয়া বিনাইয়া বর্ণনা করিতে না পারে, সে পর্যন্ত তাহারা ক্ষান্ত হয় না। শেষ পর্যন্ত ফিরিস্তিসহ মনের দুঃখ-কষ্ট বর্ণনা করিতে পারিলেই তাহাদের দুঃখ লাঘব হইয়াছে মনে করে, ফলতঃ লাঘব হইয়াও যায়। কিন্তু কোন কোন লোক জীবনে এমন লজ্জাজনক জঘন্য অপকর্ম করিয়া থাকে যে, তাহা অন্যের নিকট কিছুতেই প্রকাশ করিতে পারে না। ঐ সকল অপকর্মের গ্লানি ও অনুশোচনা অজ্ঞাতসারে মনে নানা প্রকার বিকার সৃষ্টি করিয়া দুরারোগ্য

ব্যাধির সূত্রপাত করে, (যেমন, কেহ যদি তাহার গুরুজনের সহিত জেনা করিয়া থাকে) কিন্তু নামাযের সময় অকপটে ঐ সকল অপরাধ আল্লাহ্‌র নিকট স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাওয়া যায়, তাহাতে মনে আশার সঞ্চার হয় ও সোয়াস্তির ভাব উদয় হয়। মানুষ স্বভাবতঃ চঞ্চল; (গতিশীল)

একই ধরনের কাজে অনেকক্ষণ লিপ্ত থাকা মানুষের স্বভাব নহে। নামাযের মাধ্যমে কর্মধারা পরিবর্তনের যে সুযোগ পাওয়া যায়, অন্য কোন কাজে তাহা হয় না। সেজন্যই হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, নামাযে উদ্যম বৃদ্ধি হয়, কাজ সহজসাধ্য হয়, স্বাস্থ্য অটুট থাকে, জীবনী শক্তি অযথা ক্ষুণ্ন হয় না, নামাযী লোক সংক্রামক ব্যাধি হইতে অব্যাহতি পায় ও তাহাদের সন্তান-সন্ততি বলিষ্ঠ হয়। নামায শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে, সেজন্য নামাযী লোককে শীঘ্র বার্ধক্যে আক্রমণ করে না। রুকু ও সেজদা এই ভারসাম্য রক্ষা করে। নামাযে অধিকাংশ বালা মসিবত দূর হয়, নামায আত্মাকে নির্মল, শান্তিপূর্ণ ও শক্তিশালী করিয়া আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করিতে থাকে।

নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত ডাঃ ক্যারল বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র উপাসনায় মনে যেরূপ শক্তি ও উদ্যমের সৃষ্টি হয়, অন্য কিছুতেই তাহা হয় না। তিনি বলিয়াছেন যে, "ডাক্তার হিসাবে আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, যে রোগ কোন ঔষধে আরোগ্য হয় নাই, তাহা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনায় অনায়াসে দূর হইয়া গিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা বিফলে গিয়াছে এমন কোন ঘটনা আমার জানা নাই।" বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে যে, "আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা অসাধ্য সাধন করিতে পারে।" নামাযের মধ্যে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছা বর্তমান আছে, তাহা না হইলে কেহই নামায পড়িত না। নামাযের সৃজনীশক্তি মানব শরীরের গঠনমূলক কার্যে ও আত্মার উন্নতি সাধনের জন্য যে কিরূপ অবশ্যক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভব নহে।

নামায আয়ু বৃদ্ধি করিয়া রিযিক স্থিতিশীল করে ঃ— আল্লাহ পাক একাধিক বার কোর্‌আনে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, আমি প্রত্যেক নেক কাজের জন্য দশ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত পুরস্কার ও সুফল দিব। সময় মানুষের অমূল্য ধন। মানব জীবন সময়েরই সমষ্টি। প্রত্যেক দিন নামাযে যে সময় ব্যয় হয় অঙ্গীকার মূলে নামাযী ব্যক্তি এই সময়ের জন্যে কর্তব্যের নিয়মে অন্ততঃ দশ গুণ সময় নিজের আয়ুর সংগে যোগ পাওয়ার অধিকারী হয়। এই নিয়মে আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আল্লাহ কাহারও নিকট কোন বিষয়ে ঋণী বা করজদার থাকিতে পারেন না ; কারণ, তাঁহার এক নাম 'ইয়া নাফেউ' অর্থাৎ হে

সুফলদাতা! আবার নামাযে যে সময় ব্যয় হয় তাহার আর্থিক পূরণ হিসাবে আল্লাহ পাক নামাযীর রিযিক বৃদ্ধি ও নিয়মিত করিয়া দেন, অর্থাৎ নামাযীর জীবনে এমন কখনও হয় না যে, একদিন প্রচুর আহার পাইল এবং তারপর উপবাস করিতে হইল। আয়ু বৃদ্ধির সংগে রিযিকের যে নিঃসন্দেহ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা খুলিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, নামায মানুষের যৌনশক্তি বৃদ্ধি করে। যৌনশক্তির সহিত মানুষের আয়ুর একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকেরাও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। মানব শরীরে সর্বদা দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি বিরাজ করিতেছে। একটি শক্তি শরীরকে রক্ষা করিয়া রাখিতেছে ও অপরটি প্রতিকূল শক্তি—সর্বদাই শরীরকে বিনাশ করার চেষ্টা করিতেছে। শরীরে আঘাত পাইলে যে ব্যথা পাওয়া যায়, ইহা ধ্বংসকারী শক্তিরই কাজ। সঙ্গম শক্তির এই ধ্বংসকারী শক্তিকে দুর্বল করিয়া রাখার ক্ষমতা আছে, ইহাই সঙ্গম শক্তিশালী ব্যক্তি দীর্ঘায়ু লাভ করার প্রধান কারণ। যাহারা পরকাল ও পরকালের পাপ পুণ্যের বিচার সম্বন্ধে সন্দিহান তাহারাই নামাযে গাফেল হইয়া থাকে। তাহাদের সম্বন্ধে ইসলামের চতুর্থ খলীফা শেরে খোদা হযরত আলীর (কার্রাঃ) একটি উপদেশমূলক ঘটনা বর্ণনা করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব।

একদিন হযরত আলী (কার্রাঃ) কোন এক কাফেরের সংগে তর্কস্থলে বলিয়াছিলেন যে, তুমি বলিতেছ যে, পরকাল বলিয়া কিছুই নাই, যদি তাহা সত্য হয়, তবে তুমিও বাঁচিবে আমিও বাঁচিব, কিন্তু যদি তাহা না হইয়া আমি যে বলিতেছি, পরকালও আছে এবং পরকালে পাপ পুণ্যের বিচারও আছে ; তাহা যদি সত্য হয় তবে আমি বাঁচিব কিন্তু তুমি বাঁচিতে পারিবে না। যাহারা মনে করে যে, পরকালে শাস্তি হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, তাহাদের বুদ্ধিমানের মত এই ঘটনা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া সতর্ক হওয়া উচিৎ।

আমি (গ্রন্থকার) বাংলাদেশের কয়েকটি জিলায় অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, বিগত ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে কোন প্রকৃত নামাযী লোকের প্রাণহানি হয় নাই।

একাদশ অধ্যায়

কোর্‌আন ও পর্দা-তত্ত্ব

পর্দা প্রথা ইসলামের একটি বিশেষ অবদান। ইসলামী যুগের পূর্বে ইহার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ইহা ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য। অন্য কোন ধর্মে পর্দার এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। ইসলামী ভিত্তিতে সৃজিত বাংলাদেশে বে-পর্দার যে ঢেউ উঠিয়াছে তাহা রোধ করিতে হইলে পর্দা সম্বন্ধে কোর্‌আন ও হাদীস শরীফে যে সব আদেশ ও নিষেধ জারি রহিয়াছে তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য বুঝিতে হইবে এবং নর-নারীর যৌনশক্তি বিকাশের দ্বারা, কামশক্তির স্বরূপ ও নর-নারীর চারিত্রিক পার্থক্য বিজ্ঞানের ভিত্তিতে তলাইয়া দেখিতে হইবে। বস্তুতঃ যৌন আবেদনের প্রভাব, উৎকট কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থের অদম্য স্পৃহা নর-নারীর দৈহিক গঠন বিন্যাস, মানসিক ও চারিত্রিক পার্থক্যজনিত স্বাভাবিক আকর্ষণের উপর ভিত্তি করিয়াই পর্দা প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। কোর্‌আন ও হাদীস অন্ধ কামশক্তির স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করা ও ইহাকে ইহার যথার্থ সীমার মধ্যে পাহারায় রাখার যে ব্যবস্থা দিয়াছে ইহাই পর্দা।

জীবন মাত্রই কামজ। কামকে এড়াইয়া কেহ পৃথিবীতে আসিতে পারে না। স্ত্রী-পুরুষের কামনার ভিতর দিয়াই মানব জাতির অনন্ত প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। মানুষের প্রবৃত্তিসমূহের মধ্যে কামই সবচেয়ে দুর্দমনীয়, বিবেকহীন ও অন্ধ। আল্লাহ্‌ পাক কোর্‌আনে পর্দা সম্বন্ধে যে সকল আদেশ ও নিষেধ জারি করিয়াছেন ও মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তিনি কামকে মোটেই বিশ্বাস করেন নাই—তাই তিনি কামকে পর্দার আড়ালে পাহারায় রাখার ব্যবস্থা দিয়াছেন। মানুষের স্বভাব সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাক কোর্‌আনে বলিয়াছেন যে—"নিশ্চয় মানুষ অত্যাচারী ও বিশ্বাসঘাতক।" (সূরা ইব্রাহীম) প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ্‌র সংগে বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া বেহেশ্‌তে গন্দম (নিষিদ্ধ ফল) ভক্ষণ করিয়াছেন। মানব জাতি তাঁহারই সন্তান-সন্ততি ; সুতরাং মানুষের মধ্যে ঐ ভাব থাকা মোটেই

বিচিত্র নহে। এই বাণী দ্বারা আল্লাহ্‌ পাক মানুষকে মানব-মন সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। অন্ধ ও বিবেকহীন কাম যাহাতে অতর্কিতে ইহার স্বভাব চরিতার্থ করার সুযোগ না পায়, তাহার সতর্কতামূলক প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে আল্লাহ পাক কোর্‌আনে নির্দেশ দিয়াছেন যে, "হে মোমেনগণ! যতক্ষণ তোমরা অনুমতি না পাও এবং গৃহের মালিকের নিকট হইতে তেমাদের সালামের প্রত্যুত্তর না পাও, ততক্ষণ নিজ গৃহ ব্যতীত অপরের গৃহে প্রবেশ করিও না।" (সূরা নূর, ২৭ আয়াত)।

স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় পারস্পরিক যৌন আকর্ষণ তাহাদের দেহ ও মনে যে আলোড়ন ও স্পন্দনের সৃষ্টি করে তাহা হইতেই জেনার (ব্যভিচারের) সূত্রপাত হয়। নারীদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইলে তাহার কু-ফল চিন্তা করিয়া জার্মান দার্শনিক নীটশে বলিয়াছেন যে, "নারীকে পুরুষের সাথে মেলামেশার অবাধ সুযোগ দিলে মেয়েদের প্রজনন শক্তি শীঘ্রই নিস্তেজ হইয়া যাইবে, ফলে এমন একদিন আসিবে, যে দিন পৃথিবী হইতে মানব বংশ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।"

জেনা প্রতিরোধ করাই পর্দার উদ্দেশ্য। অবাধ গতিতে জেনা চলিতে থাকিলে মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তাহার কারণ এই যে, নারী-দেহ এইরূপে গঠিত যে, স্ত্রী যৌনাঙ্গে একই সঙ্গে দুই বা ততোধিক পুরুষের বীর্য নিক্ষিপ্ত হইলে এক প্রকার বিষের সৃষ্টি হয়। এই বিষের প্রভাবে শুক্রকীট বিনষ্ট হইয়া যায় ও গনোরিয়া, সিফিলিস ইত্যাদি মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়। সকল দেশে ও সকল জাতির মধ্যেই নারীর সতীত্ব রক্ষার যে চেষ্টা, ইহার মূলে রহিয়াছে এই বৈজ্ঞানিক রহস্য (ইসলামী শরীয়তে বিধবা ও তালাকী নারীর পক্ষে ইদ্দত পালন করার যে বিধান আছে, তাহাও এই বৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত)। কেবল স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ যৌন-মিলন হইলেই জেনা হয় তাহা নহে, কামভাবে উত্তেজিত হইয়া পরনারী বা পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করিলে, কিংবা ঐ বিষয়ে কুচিন্তা বা কুভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও জেনা হয় । সে জন্যই হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক চক্ষু জেনাকারী এবং তাই পরনারীর প্রতি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পৃথিবীতে কোন বস্তুরই বিনাশ নাই, রূপান্তর আছে মাত্র। চিন্তারও বিনাশ নাই, কু-ভাবনা ও কু-চিন্তা মানুষের অচেতন মনে পড়িতে পড়িতে জমা হইতে থাকে। এই অচেতন মনই অজ্ঞাতসারে সচেতন মনের আড়ালে

থাকিয়া মানুষকে চালাইয়া থাকে। এই অচেতন মনই তাহার আসল স্বভাব বা চরিত্র। তাই কু-চিন্তার ফল পরিণামে মারাত্মক হয়। এই সকল কু-ভাবনা মানবদেহের সূক্ষ্ম কোষগুলিকে বিকৃত ও বিষাক্ত করিয়া নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি করে। কোরআন-হাদীসে এই প্রকার জেনা হইতেও রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে নর-নারীকে একে অপরের দৃষ্টির বাহিরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকার কু-চিন্তা ও কু-ভাবনা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোরআনের শেষ ভাগে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় লাভের প্রার্থনা রহিয়াছে। (৩০ পারা, সূরা নাস)।

আমেরিকার অন্যতম মানসিক রোগের চিকিৎসক ডাঃ এডওয়ার্ড বর্গলার বলেন যে, "প্রত্যেক মানুষের মনের আড়ালে একটি আত্মধ্বংসকারী উপাদান অতি সঙ্গোপনে অবস্থান করিতেছে, ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষ সচেতন নহে। অনেক সময় ইহার প্রভাবে মানুষ অজানা কারণে মানসিক অস্বস্তি ও তদহেতু নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিতে ভুগিয়া থাকে। এই মারাত্মক উপাদানই স্নায়ুবিক বিকৃতি ও দুর্বলতার মূল কারণ। কু-চিন্তা ও কু-ভাবনা ঐ উপাদানকে আরও শক্তিশালী করে। একমাত্র কু-চিন্তা ও কু-ভাবনা প্রতিরোধ চেষ্টা দ্বারাই ইহার ক্রিয়াকে নিস্তেজ ও দমন করা যাইতে পারে।" সোজা কথায় বলা যাইতে পারে যে, পর্দাপ্রথা দ্বারাই কু-চিন্তা ও কু-ভাবনাকে দমন করিয়া দূরে রাখা যায়। নারীদের উদ্দেশ্যে কোর্আনে বর্ণিত হইয়াছে যে, "তোমরা (নারীগণ) গৃহে অবস্থান কর। বর্বর যুগের সৌন্দর্য প্রদর্শনের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করিও না।" (সূরা আহযাব ২৩, আয়াত)।

বেপর্দার কারণ ঃ— নারীর দৈহিক গঠন, বুদ্ধি ও চরিত্রগত পার্থক্য সম্বন্ধে পুরুষের সঠিক জ্ঞানের অভাব, স্ত্রী-পুরুষের কর্মক্ষেত্রের স্বাভাবিক বিভিন্নতার আবশ্যকতা অস্বীকার, পর্দাপ্রথার জাতীয় উপকারিতা ও বেপর্দার অপকারিতা, ভ্রান্ত ধারণা, নারীকে পুরুষ কিরূপে ও কিভাবে দেখিতে চায় তাহার স্থিরতার অভাব, পুরুষের দাইয়ুছ (১) অর্থাৎ লাম্পট্যপ্রবণ মনোভাব, কোর্আন ও হাদীসের প্রতি ঔদাসীন্য ও সন্দেহজনক মনোভাব হইতে বেপর্দার সৃষ্টি হইয়াছে।

---

(১) যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর নিকট পর পুরুষের যাতায়াত আপত্তিজনক মনে করে না, তাহাকে শরীয়তের ভাষায় দাইয়ুছ বলে। দাইয়ুছ কখনও বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না। (হাদীস)

পবিত্র কোর্আনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইতেছে যে, "পুরুষগণ নারীর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। যেহেতু (আল্লাহ) তাহাদের মধ্যে একের উপর অন্যকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।" (সূরা নেসা, ৩৪ আয়াত) দৈহিক দিক হইতে নারী যে পুরুষ অপেক্ষা অনেক দুর্বল, নারীর অবলা নামই তাহার প্রমাণ। স্ত্রী-পুরুষের দেহগত গঠনবিন্যাস এবং জনন-যন্ত্রের পার্থক্য যখন আছে, তখন তাহাদের বোধশক্তি, কর্মশক্তি, চিন্তাধারা, যৌনাবেগ ও বুদ্ধির মধ্যেও পার্থক্য থাকিবে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। স্ত্রী-পুরুষের মনও একই ধাতে গঠিত নয়। এই সকল পার্থক্য আছে বলিয়াই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ রহিয়াছে। মস্তিষ্কগত পার্থক্যের মধ্যে বঙ্গ-ভারতে পুরুষের কপালসহ মগজের ওজন গড়পড়তায় ৪২৭ গ্রাম ও স্ত্রীলোকের মগজের ওজন ২৮০ গ্রাম। পার্থক্যটি বেশ সুস্পষ্ট। মগজের ঘনত্বেরও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। নারী দেহ ও মন স্থিতিশীল, পুরুষের দেহ মন গতিশীল। স্থিতিশীলতার গুণ আছে বলিয়াই নারীগণ সাধারণতঃ একজন পুরুষ লইয়াই জীবন কাটাইতে পারে। অবস্থার বিবর্তনে পুরুষ যেরূপ চঞ্চল হইয়া উঠে নারীগণ সেরূপ হয় না। যে কোনও পরিবেশে নারীগণ অতি সহজে নিজকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে। মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, পুরুষের বুদ্ধির বিকাশ আছে; নারীর বুদ্ধির বিকাশ নাই— বিস্তার আছে মাত্র। অর্থাৎ পুরুষের বুদ্ধি গুণে বাড়ে, নারীর বুদ্ধি গুণে বাড়ে না। নারী যে প্রকৃতির বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহাই কেবল বিস্তার লাভ করে। সোজা কথায় নারীর বুদ্ধির মধ্যে সৃজনীশক্তির অভাব থাকে। সে জন্যই নারীগণ কোন মৌলিক গবেষণা করিয়া পুরুষের ন্যায় সফলতা লাভ করিতে পারে না। তাই নারীগণ ভাল অভিনেত্রী হইতে পারে কিন্তু উচ্চাঙ্গের কবি, দার্শনিক কিংবা বৈজ্ঞানিক হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বনবী (সাঃ)ও বলিয়াছেন যে, "নারীর বুদ্ধি, কর্মশক্তি পুরুষের চেয়ে কম"। (হাদীস) অতএব নারী পুরুষের সমকক্ষ হওয়ার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। নারী পুরুষের সমানও নয়, উপরেও নয় এবং পুরুষের চেয়ে হীনও নয়, একে অপরের পরিপূরক— নারী পুরুষের সহচরী ও অর্ধাঙ্গিনী। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই প্রভু, মূল্যে ও মর্যাদায় তাহারা উভয়ই সমান। যে দিন নারী তাহার নিজ সীমানা অতিক্রম করিয়া পুরুষের সীমনায় পা দিয়াছে সেদিনই সমান আসনের প্রশ্ন উঠিয়াছে। নারী জাতি পুরুষের নৈতিক চরিত্রের ভারসাম্য রক্ষা করে। সেইজন্য আঁ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন যে, "নারীগণ আমার আদরের বস্তু।" ইউরোপের ভিয়েনা শহরের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ও ভিয়েনা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক

ডাঃ অসওয়াল্ড সোয়ার্জ তাঁহার 'যৌন মনোবিজ্ঞান' নামক ইংরেজী পুস্তকের ১৭১ পৃষ্ঠায় যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম এই যে, "পুরুষের বুদ্ধি খোলে ঘরের বাহিরে তাহার কর্মক্ষেত্রে ও কারখানায় ; নারীর বুদ্ধি থাকে ঘরের কোণে। তাই তাহারা পুরুষের মত সংগঠন কার্য করিতে সক্ষম নয়। তাহাদের সমিতি, ক্লাব বা লাইব্রেরী একটি হাস্যাস্পদ ব্যাপার। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা তাহাদিগকে অন্যান্য গুণ যথা — ধৈর্য, উপস্থিত বুদ্ধি, মায়া-মমতা ইত্যাদির গুণ বেশী মাত্রায় দিয়া অন্যান্য গুণাভাবের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিয়াছেন।"

নারীদেহের উপর বেপর্দার ক্রিয়া ঃ— নারীর দেহ অম্লীয় ও চুম্বকধর্মী এবং পুরুষের দেহ ক্ষারীয় ও বিদ্যুৎধর্মী। নারীদেহ অম্লীয় (এসিড প্রধান) বলিয়াই তাহাদের প্রস্রাবের সঙ্গে কিছু কিছু অম্ল (এসিড) নির্গত হইয়া যায়। সেজন্য তাহাদের প্রস্রাব একটু ঝাঁজাল গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই অম্ল পূরণ করার প্রবৃত্তি হেতু তাহারা সময়ে-অসময়ে এমন কি রাত্রিতেও অম্ল খাইয়া থাকে। আবার অম্লের প্রভাবই তাহাদের দেহের পেলবতার কারণ, অম্লত্বই আমাদের নারীত্ব, সৌন্দর্য ও লাবণ্যের ভিত্তি। ইহারই প্রভাবে তাহারা সাধারণতঃ বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয় না। অপরদিকে পুরুষের শরীর ক্ষারীয় বলিয়া তাহাদের প্রস্রাবের সঙ্গে কিছু কিছু মিষ্ট জাতীয় ক্ষার (এলকালি) নির্গত হইয়া যায়। ইহা পূরণ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হেতু তাহারা ক্ষার জাতীয় মিষ্ট খাদ্য খাইতে চায়। এই ক্ষারের ক্ষতির দরুনই পুরুষের মধ্যে বহুমূত্র রোগের আধিক্য দেখা যায়। অম্লের সহিত ক্ষারের একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ বা টান রহিয়াছে। বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাকে 'এফিনিটি' বলা হয় ; এই আকর্ষণ এত তীব্র ও সূক্ষ্ম যে, তাহা রোধ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই কেহ অপরকে অম্ল (টক) খাইতে দেখিলে অনায়াসে ও অজ্ঞাতসারেই মুখ হইতে ক্ষারধর্মী লালা বাহির হইয়া আসে। ইহা ধ্রুব সত্য যে, ক্ষারধর্মী দেহ ও অম্লধর্মী দেহের মধ্যে একটি প্রাকৃতিক আকর্ষণ আছে। ক্ষারের আর একটি স্বভাব বা গুণ এই যে, ইহা অম্লের সংস্পর্শে আসিলে অম্লের কার্যকারিতা নষ্ট করিয়া দেয়, যাহাকে রসায়নশাস্ত্রে নিরপেক্ষীকরণ বা 'নিউট্রলীজেশন' বলে ; সেইজন্য অনাবৃত অম্লধর্মী ও চুম্বকধর্মী নারীদেহের উপর বিভিন্ন পুরুষের ক্ষারধর্মী ও বিদ্যুৎধর্মী দেহের প্রতিফলন ঘন ঘন

হইতে থাকিলে নারীদেহের অম্লত্ব ও চুম্বকত্ব নষ্ট হইয়া যায় এবং আস্তে আস্তে নারীদেহ পুরুষালী আকারবিশিষ্ট হইয়া 'মর্দারূপ' ধারণ করে। নানা জাতীয় পুরুষদেহের ঘন ঘন প্রতিফলন নারীদেহের সূক্ষ্ম ও কোমল কোষগুলির উপর যে সংঘাত নিক্ষেপ করে, তাহা শরীরের প্রত্যেকটি কোষ, এমন কি নারীর ডিম্বকোষকে পর্যন্ত সূক্ষ্ম 'এটমিক' ক্রিয়া দ্বারা বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে ও নারীদেহের অম্লত্ব, চুম্বকত্ব, পেলবতা ও গন্ধ নষ্ট করিয়া দেয়। অম্লত্ব ও চুম্বকত্ব নষ্ট হইলে নারীদেহ ক্ষারধর্মী ও বিদ্যুৎধর্মী হইয়া মর্দারূপ ধারণ করে বলিয়াই বোধ হয় হাদীস শরীফে পর্দানশীন মেয়েদিগকে বে-পর্দা মেয়েদের নিকট ঘেঁষিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

প্রতিফলনের ক্রিয়া যে কত অন্তর্ভেদী ও সূক্ষ্ম, বর্তমান যুগে রঞ্জন-রশ্মি (এক্স-রে) আবিষ্কারের পর ইহার বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। নারীদেহের কোষগুলি কোন কোন সময় বিশেষতঃ গর্ভধারণকালে এত দুর্বল হইয়া পড়ে যে, তখন ইহারা কোন পুরুষদেহের প্রতিফলন ক্রিয়া রোধ করার শক্তি একেবারে হারাইয়া ফেলে ; এমন কি ঐ সময় কোন পুরুষের দেহের শক্তিশালী প্রতিফলন জরায়ু ভেদ করিয়া গর্ভস্থ সন্তানের উপর পর্যন্ত ছাপ ফেলিতে সমর্থ হয়। তাই সময় সময় দেখা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ই চরিত্রবান হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের সন্তানটি অপর কোন এক পুরুষের চেহারাবিশিষ্ট হইয়াছে, ইহা প্রতিফলন ক্রিয়ারই ফল। এই প্রকার প্রতিফলন ক্রিয়া প্রতিরোধের ব্যবস্থা হিসাবে কোন কোন হিন্দু ও মুসলমান পরিবার তাহাদের মেয়েদিগকে গর্ভাবস্থায় পুরুষের নিকট যাইতে দেয় না। তবে স্ত্রীলোকগণ তাহাদের পিতা, ছেলে, চাচা, মামা, ভাগিনা, ভাতিজা, দুধ-ভাই প্রভৃতি কয়েকজন নিকট আত্মীয়কে দেখা দিতে পারে বলিয়া কোর্‌আনে বিধান রহিয়াছে। এই বিষয়টি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। এই সকল নিকট আত্মীয়গণকে দেখা দিলে নারীদেহের চুম্বক ও অম্লত্ব নষ্ট হওয়ার বা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ এই সকল নিকট আত্মীয়গণের দেহ-কোষ, শরীরের ক্ষুদ্রতম অংশ, যাহা দ্বারা শরীর গঠিত — প্রায় এক জাতীয় ও একই ধর্মী। পদার্থ বিজ্ঞানের একটি সূত্র এই যে, এক জাতীয় কিংবা একই ধর্মী পদার্থ পরস্পরকে আকর্ষণ করে না, যেমন

দুই টুকরা কাগজ একই ধর্মী বলিয়া ইহাদের মধ্যে কোন আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না, সেইজন্য দুই খণ্ড কাগজ একত্রে জোড়া লাগাইতে হইলে অন্যধর্মী 'আঠার' আবশ্যক হয়, আবার পানির সহিত 'আঠার' বিকর্ষণ রহিয়াছে। পানি লাগাইলে আঠার আকর্ষণীয় শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। হিন্দু ধর্মে স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার ইহাই মূল কারণ। ইসলামী শরীয়তে নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও এরূপ বিবাহকে উৎসাহিত করা হয় নাই। স্বামী-স্ত্রীর যৌন আকর্ষণের তীব্রতা না থাকিলে সন্তান-সন্ততি সুগঠিত, স্বাস্থ্যবান, মেধাবী ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে না, ইহা সকল জাতির যৌনবিজ্ঞানীগণের সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত। পবিত্র কোরআনেও ইহার আভাস রহিয়াছে।

(সূরা আবাসা, ১৯ আয়াত ও সূরা তারেকের ৬ আয়াতের মর্ম দ্রষ্টব্য)।

নারীর সৌন্দর্য ও লজ্জা ঃ— অম্লত্ব ও চুম্বকত্ব হারাইয়া নারীদেহ মর্দা হইয়া গেলে তাহাদের সৌন্দর্য ও নারীত্বের হানি ঘটে। নারীর সৌন্দর্যই তাহার প্রধান গুণ, ইহাই তাহার নারীত্ব। সৌন্দর্য অর্থে শরীরের রং বুঝিলে ভুল হইবে। নারীর সৌন্দর্য অর্থ স্বাস্থ্যবতী, দীপ্তিময়ী, সুগঠিত দেহ। নারীর সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার অর্থ শরীরের প্রত্যেকটি কোষময় ডিম্বকোষের গঠন ও গুণ বিকৃত হইয়া যাওয়া। যে নারীদেহ সুগঠিত নয় তাহার সন্তান-সন্ততিও সুগঠিত ও মেধাবী হইতে পারে না। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রতিভাবান ব্যক্তিই সুন্দরী নারীর সন্তান। নারীর সৌন্দর্যহানি বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নারী-সৌন্দর্য সমাজের অমূল্য সম্পদ ; ইহা কেবল উপভোগের বস্তু নয়। এই সম্পদ নষ্ট হইলে সমাজকে একদিন তাহার মূল্য সুদে আসলে দিতে হইবে। নারীর সৌন্দর্য ও যৌন আকর্ষণ রক্ষা করার জন্য পর্দার আবশ্যকতা রহিয়াছে। পুরুষের জন্য কোন পর্দার আবশ্যকতা নাই এইজন্য যে, নারীদেহের মত পুরুষের দেহ চুম্বকধর্মী ও অম্লধর্মী নয় বলিয়া তাহাদের উপর অন্য কোন দেহের প্রতিফলন হইতে পারে না। এইসব কারণেও আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোর্আনে নারীদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমরা যখন বাহিরে যাইবে, তখন শরীর ঢাকিয়া কিংবা বোরখা পরিধান করিয়া যাইবে (সূরা আহযাব, ৫৯ আয়াত)। কাপড় প্রতিফলনকে রোধ করিয়া থাকে। চুম্বকধর্মী দেহের উপর যে বিদ্যুৎধর্মী দেহের

প্রতিফলন হয় এবং এই দুই জাতীয় দেহের মধ্যে যে আকর্ষণ আছে তাহা আলোচনা করা বাহুল্য। ইহা সকলেই অবগত।

বেহেশতের পর্দা ঃ— অপরের দৃষ্টির বাহিরে ও মানব নয়নের অগোচরে এককভাবে নারী ভোগের ইচ্ছা পুরুষের একটি সহজাত ধর্ম। ইহাতে পুরুষের যৌবন জীবনের পুলক, আনন্দ, সার্থকতা ও পৌরুষের উপলব্ধি হয়। সেইজন্য পুরুষের নিখুঁত যৌনানন্দের জন্যও পর্দার আবশ্যকতা রহিয়াছে। পুরুষের সচেতন মন পর্দাকে উস্কানি দিলেও তাহার অবচেতন মনে সর্বদা এই ভাব প্রচ্ছন্নভাবে থাকে যে, গন্ধে যেমন অর্ধ ভোজন হয়, দর্শনেও সেইরূপ অর্ধরমণ (সঙ্গম) হয়। পুরুষের এই ভাবধারার জন্যই বোধ হয় সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ পাক কোর্আনে জানাইয়া দিয়াছেন যে, "বেহেশ্তে সুলোচনা সুন্দরী হুরগণ নিজ নিজ তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করিবে।" (সূরা আর্-রাহমান, ৭২ আয়াত)।

বেপর্দার জন্য দায়ী কে ঃ— পুরুষের লজ্জা স্বাভাবিক। ইহার মাপকাঠি আছে, স্থায়িত্বও আছে। কিন্তু নারীর লজ্জা উঠানামা করে। নারীর লজ্জা কোন্ ডিগ্রীতে থাকিবে, সামাজিক ব্যবস্থা তাহা নির্দেশ করিয়া দেয়। যে নারী কিছুদিন পূর্বে গ্রামে থাকাকালে বোরখা পরিয়া বাহিরে যাইতে ইতস্ততঃ করিত, সেই নারীই আজ শহরে আসিয়া 'আধুনিকা সাজিয়াছে'। 'আধাদিগম্বর বেশে স্বামীসঙ্গ ছাড়াই মোটর ড্রাইভারকে পিছনের ছিটে বসাইয়া নিজে গাড়ী হাঁকাইয়া ডেম কেয়ার মনোভাব লইয়া পুরুষের ক্লাবে ঢুকিতেছে। নারীর লজ্জা স্বাভাবিক নয় বলিয়াই নারী সমাজের তালে তালে নাচিতে দ্বিধাবোধ করে না।

পুরুষের যাহা কিছু আছে ; তার সবকিছু নারীরও আছে — নাই শুধু ব্যক্তিত্ব। তাই নারী নিজের সম্পর্কে কখনও কিছু ভাবিতে পারে না। পুরুষের নিকট হইতে সে নিজের সম্পর্কে শুনিতে চায়, জানিতে চায়। পুরুষ তাহাকে যে ভাবে চিত্রিত করে সে বিশ্বাস করে, সে তাই ; তাহার বেশী নয়, কমও নয়। পুরুষ তাহাকে যেভাবে দেখিতে চায় সেভাবেই সে থাকিতে ভালবাসে। নারীর ষ্টাইল প্রীতিতেও পুরুষের ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়। এই ব্যক্তিত্ব নাই বলিয়াই এককভাবে জীবন যাপন করার সুযোগ থাকিলেও নারী এককভাবে জীবন কাটাইতে পারে না, তাহাকে একজনের হইয়াই থাকিতে হয়। হতভাগ্য পুরুষ নারীকে কোন্ রূপে ও

কোন্ ষ্টাইলে যে দেখিতে চায় তাহা আজ পর্যন্ত ঠিক করিয়াই উঠিতে পারে নাই। পুরুষ যুগে যুগে শিল্প, সাহিত্যে ও কাব্যের ভিতর দিয়া নারী সৌন্দর্যের স্তুতি গাহিয়াছে। নারীর কেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ের আঙ্গুলের নখ পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গ নিয়া কল্পনার ফানুস উড়াইয়াছে, এমন কি ইরানের পুরুষ কবি দেওয়ান হাফেজ তাঁহার প্রেয়সীর গালে একটি তিলের বদলে সেকালের অমরাপুরী, সমরকন্দ ও বোখারাকে বিলাইয়া দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কল্পনার এত ফানুস উড়াইয়াও পুরুষ ঠিক করিতে পারে নাই, নারীর কোন্ রূপে সে মুগ্ধ। নারীকে সে যেরূপে রাখিয়াছে নারী যুগে যুগে সেইরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। এই চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মিলাইতে না পারিয়াই একদিকে ব্যর্থ নর সুন্দরী নারীর পায়ে সব কিছু ঢালিয়া দিয়াছে ; আবেগ বিহ্বল চিত্তে নারীর মহিমা কীর্তন করিয়াছে, আবার অন্যদিকে 'ছলনাময়ী' বলিয়া তাহাকে তিরস্কারও করিয়াছে। এই হিসাব মিলাইতে না পারিয়াই যে লজ্জা নারীর ভূষণ ও ঈমানের অঙ্গ বলিয়া বিশ্বনবী (সাঃ) তাঁহার পবিত্র হাদীসে প্রচার করিয়াছেন, পুরুষ সেই লজ্জাকে উড়াইয়া দিয়া নারীকে হেরেম হইতে বাহিরে আনিয়া খেলার মাঠে নামাইয়াছে, পর পুরুষের সামনে বক্তৃতামঞ্চে উঠাইয়া দিয়াছে, নৃত্য-গীতের আসরে ঠেলিয়া দিয়াছে, নাইলন-সিফনের 'আধারাখি আধাঢাকি' পোশাকে সাজাইয়া 'আধাদিগম্বরী' বেশে পুরুষের ক্লাবে ভর্তি করিয়া দিয়াছে, 'ফুটানিকা ডিব্বা' (ভেনেটি ব্যাগ) হাতে তুলিয়া দিয়া রাস্তায় ছাড়িয়া দিয়াছে। এইজন্য দায়ী পুরুষ ও তাহার লম্পট মন—নারী নহে।

কেহ কেহ এই ধারণা করিয়া থাকেন যে, মেয়েদের পর্দা জাতীয় উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ। কিন্তু মুসলিম জাতির সুবর্ণ যুগে মুসলিম নারী বে-পর্দা জীবন যাপন করিয়াছে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ নাই, বরং যে হেরেম পর্দার শ্রেষ্ঠ প্রতীক — তাহা মুসলিম সভ্যতারই অবদান। হিন্দু সভ্যতার যুগে হিন্দু নারীগণ পর্দা ছাড়িয়া দিয়াছে ইতিহাস এ কথাও বলে না ; বরং তাহারা যে পর্দা প্রথার সমর্থক ছিল, বর্তমান হিন্দু নারীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবগুণ্ঠন (ঘোমটা) তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আবার অনেকের ধারণা এই যে, পর্দা ত্যাগ করিয়াই ইউরোপ এতটা উন্নত হইতে সক্ষম হইয়াছে। মধ্যযুগে এবং ইহার কিছুদিন পর পর্যন্তও ইউরোপের নারীগণ যে পর্দানশীন

ছিল, বর্তমান মিশনারী সিষ্টারদের আজানুলম্বিত পোশাক তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক সভ্যতা ও কৃষ্টির পতনের পূর্বে তাহার সমাজে নানা প্রকার অনাচার ও বিকৃত রুচির সৃষ্টি হয়। বর্তমান যুগে বিভিন্ন সমাজে যে বে-পর্দা প্রথা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা তাহার বিকৃত পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে।

প্রাকৃতিক কারণে শীতপ্রধান দেশে নারীদেহের উপর পুরুষদেহের প্রতিফলন তীব্র হইতে পারে না, কারণ স্থান-কালভেদে আবহাওয়ার পার্থক্যের জন্য রাসায়নিক ও অন্যান্য পদার্থের ক্রিয়ার মধ্যে তারতম্য ঘটে ; কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নারীদেহের উপর বে-পর্দার ক্রিয়া যে তীব্র ও ক্ষতিকর তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। সুসন্তানের জননী, দীর্ঘজীবী ও কর্মদক্ষ হইতে হইলে নারীগণকে সার্বিকভাবে সুগঠিতদেহী ও পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী হইতে হইবে, ইহা সর্ববাদিসম্মত ও জীববিজ্ঞান-তত্ত্বভুক্ত। নারীর শক্তি, মাতৃত্ব, প্রতিভা ও সৌন্দর্য তাহার নারীত্বে নিহিত ; পুরুষের অনুকরণে নয়। আমাদের সমাজে মেয়েদের এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।

হাদীস

১। হযরত নবী করীম (সঃ) বলিয়াছেন ; স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য গোপন রাখার বস্তু, সৌন্দর্য বলিতে স্ত্রীলোকের সমস্ত শরীর বুঝায়।

২। যে স্ত্রী কিম্বা পুরুষ একে অন্যের প্রতি ইচ্ছাপূর্বক কু-দৃষ্টি করে তাহার চক্ষুতে গলিত সীসা ঢালিয়া দেওয়া হইবে।

৩। দাইয়ুছকে ৫০০ বৎসরের দূরত্ব হইতে দোযখে ফেলিয়া দেওয়া হইবে, তাহার জন্য বেহেশত হারাম।

৪। বেগানা স্ত্রী-পুরুষের নির্জনে উঠাবসা ও চলা-ফেরা হারাম। শয়তান তাহাদের সঙ্গী হয়।

রোযা

মাহে রমযানের ৩০ দিন রোযা রাখা ইসলামের পাঁচটি মূল ফরযের (রোকন) একটি। মাহে রমযান একটি মোবারক মাস, ঈমানদার মুসলমান এই মাসের প্রতীক্ষায় দিন কাটায়, আসমানী কিতাবসমূহের সহিত রমযান মাসের বিশেষ সম্বন্ধ আছে । কারণ, প্রায় সমস্ত আসমানী কিতাবই এই মোবারক মাসে নাযিল হইয়াছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ছহীফা এই মাসের ১০ই তারিখে নাযিল হয়, হযরত দাউদের (আঃ) যবুর কিতাব এই মাসের ১৮ই তারিখে নাযিল হয়, হযরত মূসার (আঃ) তৌরাত কিতাব এই মাসের ৬ই তারিখে নাযিল হয়, হযরত ঈসার (আঃ) ইঞ্জীল কিতাব এই মাসের ১৩ই তারিখে নাযিল হয়, আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব কোর্‌আন মজীদ, ফোরকানে হামীদ এই মাসেই লাওহে মাহফুয হইতে হযরত জিব্রাঈলের (আঃ) নিকট গচ্ছিত হয় এবং এই মাসের ২৭শে রাত্রি লাইলাতুল ক্বদরে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সর্বপ্রথম সূরা 'আলাক' আঁ হযরতের (সাঃ) উপর নাযিল করেন। এই রাত্রের এবাদত হাজার মাসের এবাদত হইতেও উত্তম, এই রাত্রে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রহমতের দুয়ার খুলিয়া দেন। ইহার ফযীলত এত বেশী বলিয়াই দুনিয়ার মুসলমান এই রাত্রিব্যাপিয়া আল্লাহ্‌র এবাদতে মশগুল থাকেন। এই মাসে কোর্‌আন তেলাওয়াতে নেকী অন্য মাসের চেয়ে অনেক বেশী। এই মাসের নফল নামায অন্য মাসের সত্তরটি ফরয নামাযের সমতুল্য। পাক কোর্‌আনে আল্লাহ পাক বলিতেছেন যে, আমি তোমাদিগকে ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বারা পরীক্ষা করিব এবং আমি সবরকারীগণের সঙ্গে আছি। আঁ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন যে, রোযা সবরের অর্ধেক, আর সবর ঈমানের অর্ধেক। আরবীতে রোযাকে সওম বলে, সওম অর্থ বিরত থাকা (মন্দ কাজ ও লোভ হইতে)। রোযা মুসলমানের জন্য একটি কঠোর সাধনা, ইহার পুরস্কার বেহেশ্‌ত।

রোযার ফযীলত

১। বেহেশ্‌তের ৮টি দরজা আছে, একটির নাম রাইয়ান (তৃপ্তি), এই দরজা দিয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করিবে একমাত্র রোযাদারগণ।

২। প্রকৃত রোযাদারদের পূর্ববর্তী সমস্ত গোনাহ্ মাফ হইয়া যায়।

৩। রোযাদারের জন্য দুইটি আনন্দ রহিয়াছে, একটি ইফতারের সময় ও অপরটি আখেরাতে আল্লাহ পাকের দীদার লাভের সময়।

৪। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ পাকের নিকট মেশ্‌ক (কস্তুরী) হইতেও বেশী সুগন্ধময় ও মনোরম বোধ হয়।

৫। রোযাদারের নিদ্রা, এবাদত ও তাহার চুপ থাকা তসবীহ স্বরূপ গণ্য হয়।

৬। রোযার মধ্যে হালাল বস্তু হইতে পরহেজ (বর্জন) করার ফলে হারাম বস্তু ও হারাম কাজ ত্যাগ করা এবং আল্লাহ্‌র আদেশ এবং নিষেধ পালন করা সহজ হয়। রোযা মানুষকে বদ মেজাজ হইতে বিরত রাখে।

৭। আল্লাহ পাক বলিয়াছেন যে, আদম সন্তানের নেক আমলের সওয়াব দশ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত দেওয়া হয়, কিন্তু রোযার অবস্থা সেইরূপ নয়, রোযা খাছ আমার জন্য, রোযাদার কেবল আমার খুশীর জন্য কামনা, বাসনা ও পানাহার ত্যাগ করিয়া রোযা রাখে, সেইজন্য আমি নিজে ইহার প্রতিদান দিব।

রোযার নেকী প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের (সরকারের নিকট কর্মচারীদের বেতনের কতকাংশ কর্তিত হইয়া যে তহবিলে জমা থাকে তাহা) কাজ করে, এই ফাণ্ডের আমানতি টাকা যেরূপ দেনার দায়ে ক্রোক হয় না ; তদ্রূপ রোযাদারের উপর কাহারও কোন দাবী-দাওয়া থাকিলে তাহার রোযার নেকী কর্তন করিয়া ইহার কাফ্‌ফারা দেওয়া হইবে না, কারণ রোযা খাছ আল্লাহ্‌র জন্য।

৮। রোযা ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাস দূর করে, যেহেতু রোযার দিনে রোযাদার গোপনে পানাহার করিলে কাহারও টের পাওয়ার উপায় নাই ; কিন্তু রোযাদার তাহা করে না।

৯। ধনী লোকেরা রোযার সময় গরীব লোকের ক্ষুধার কষ্ট প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করার সুযোগ পায়।

১০। আল্লাহ নিজে রোযাদার, তিনি পানাহার হইতে মুক্ত। রোযাদারও দিনের বেলায় পানাহার হইতে বিরত থাকেন, রোযার মাসে। আল্লাহ তায়ালার ছামাদিয়াতের (অভাবহীনতার) ফয়েজ (শক্তি) রোযাদারের উপর বর্তে, তারই ফলে রমযান মাসে রোযাদারের রিযিক বৃদ্ধি হয়।

১১। যে ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতার করায়, সে ব্যক্তি রোযাদারের সমতুল্য নেকী লাভ করে, কিন্তু তাতে রোযাদারের নেকী হ্রাস হয় না।

১২। সংসারের অজস্র দাবী মিটাইয়া, অঢেল খাদ্য সামগ্রী সম্মুখে রাখিয়া প্রলোভন পায়ে ঠেলিয়া রোযাদারগণ সুদীর্ঘ একমাস কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখে, শুষ্ক মলিন মুখ লইয়া ক্লান্ত দেহে নিজ নিজ কাজ করে। আল্লাহ পাক ফেরেশ্‌তাগণকে ডাকিয়া বলেন— দেখ, আমার বান্দা কেবল আমার খুশীর জন্য কত সবর ও ত্যাগ করিয়াছে, আল্লাহ্‌র করুণা সিন্ধু তখনই উথলিয়া উঠে, খুশীতে বান্দার গোনাহ মাফ করিয়া দেন।

১৩। খাওয়ার লোভ বড় লোভ, এই লোভ সংবরণ করা জীবনের বড় সংযম। রোযা রূহকে শক্তিশালী করে, বিচার শক্তি ও স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি করে। রোযা কফ রোগ দূর করে।

পাঁচটি কাজে রোযার সওয়াব নষ্ট হয়

১। মিথ্যা বলা। ২। গীবত। ৩। চোগলখুরী। ৪। মিথ্যা কছম খাওয়া। ৫। পরনারীর প্রতি কু-দৃষ্টি করা।

আঁ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, যে রোযাদার মিথ্যা কথা ও অসৎ কাজ ছাড়িতে না পারে তাহার রোযায় আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নাই। হযরত আলী (কার্রাঃ) বলিয়াছেন, যে রোযায় অনর্থক কাজ ও কথা হইতে নিবৃত্তি নাই ও সংযম নাই, সে রোযায় কোন ফায়দা (লাভ) নাই। একদিকে উপবাস অন্যদিকে পাপ কাজ ও সংযমহীন জীবন যাপন ; এইরূপ রোযার স্থান ইসলামে নাই। উপবাস ও রোযা এক নয়।

রোযা আয়ু বৃদ্ধি করে ঃ— ডাক্তার ক্লাইভ মেকক্ মানবজীবন দীর্ঘায়ু করার একটি নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তত্ত্বটি নতুন একথা বলা চলে না। ইসলামী শরীয়তে ইহার সুনির্দিষ্ট বিধান রহিয়াছে। তত্ত্বটি এই—প্রাণীদেহ যতদিন বাড়িতে থাকে ততদিন বার্ধক্য আসিতে পারে না। শরীরের বর্ধন থামিয়া গেলেই ক্ষয় আরম্ভ হইয়া বার্ধক্য উপস্থিত হয়, সুতরাং বার্ধ্যক্যের সূচনা থামাইয়া রাখিতে হইলে শরীরের বৃদ্ধি যাহাতে ধীর গতিতে চলিতে থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। কচ্ছপ দীর্ঘজীবী, এরা ১০০ বৎসর বাঁচিতে পারে। কারণ এদের দেহ দীর্ঘকাল যাবৎ মন্থর গতিতে বাড়িতে থাকে। মানুষের মত ২৫ বৎসরেই এদের দৈহিক বৃদ্ধি শেষ হয় না। রোযার উপবাস ব্যতীত

শরীরের বৃদ্ধিকে ধীরগতিসম্পন্ন করার কোন ব্যবস্থা নাই। ডাঃ মেকক্ ইঁদুর নিয়া পরীক্ষা করিয়া ইহার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে দীর্ঘ জীবন লাভ করার জন্য খাওয়ার প্রয়োজন খুব বেশী নয়। "বেশী বাঁচবি ত কম খা" প্রবচনটি সত্য।

রোযার দৈহিক উপকারিতা

বৎসরে একটানা রোযা কেবল মানুষের আত্মারই উৎকর্ষ সাধন করে না, মানবদেহের উপরও উহার প্রচুর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। এক মাসের উপবাসে দেহের বিপুল পরিবর্তন হয়, তৎসঙ্গে সংযম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন সহজ ব্যাপার নয় ; শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রাসায়নিক উপাদান বায়ু পিত্ত, কফ ও রক্তের ঘন্টায় ঘন্টায় অজ্ঞাতে পরিবর্তন হইতে থাকে। প্রতিনিয়ত রোযাদারের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, রক্ত চলাচল, মূত্রগ্রন্থি ও যকৃতের (লিভার) ক্রিয়া ও রক্তের নানাবিধ উপাদানের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। সারা বৎসর শরীরে যে জৈব বিষ (টক্সিন) জমা হয়, সিয়ামের আগুনে এক মাসের মধ্যে তাহা পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া রক্ত বিষমুক্ত হয়। আল্লাহ বলিয়াছেন, "আন তাছুমূ খায়রুল লাকুম ইন্‌কুন্‌তুম তা'লামুন।" (রোযার কি উপকার ইহা যদি তোমরা জানিতে)!

রোযা ও বহুমূত্র

বহুমূত্র রোগ বাধা দেওয়ার পক্ষে রোযার উপবাস অমোঘ ঔষধ। এই রোগের টের পাওয়া মাত্র কয়েক দিন রোযা রাখিলে এবং রোযার সময় (রাত্রিতে) প্রচুর পানি পান করিলে রক্তে ও প্রস্রাবে চিনির ভাগ কমিয়া আসে ও রক্তে ক্ষারের ভাগ বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের প্রবীণ চিকিৎসক, অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডাঃ মোহাম্মদ হুসেন সাহেব ইত্তেফাক পত্রিকার মারফতে জানাইয়া দিয়াছেন যে, যাহারা আজীবন নিয়মিতভাবে রোযা পালন করে, সাধারণতঃ তাহারা বাত, বহুমূত্র, অজীর্ণ, হৃদরোগ ও রক্তচাপজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় না। সপ্তাহে একদিন রোযা পালন করা বহুমূত্র রোগীর পক্ষে উপকারী, রোযার উপবাসে খাদ্যের সমতা রক্ষা হয় ও পাকস্থলী কিছুকালের জন্য বিরাম লাভ করে, রোযাদারের অজীর্ণ না হওয়ার ইহাই কারণ।

হজ্ব

পবিত্র মক্কা শরীফ

কাল ও স্থিতির অতীত, অদ্বিতীয় নিরাকার লা শরীক আল্লাহ্‌র এবাদতখানা এই পবিত্র ভূমিতে সে নিশানের নিশানরূপে দেদীপ্যমান। হাবীবে খোদার জন্মস্থান এইখানে, বাইবেলে বর্ণিত ইসমাঈল ও ইসমাঈল বংশের নিদর্শনস্বরূপ হাজ্‌রে আসওয়াদ পাথরখানা সংস্থাপিত এইখানে। আত্মত্যাগের প্রতিমূর্তি হযরত ইসমাঈলের (আঃ) সমাধিস্থল এইখানে অবস্থিত। নিঃসহায়া ব্যথিত হৃদয় নির্বাসিতা ইসমাঈল জননী হযরত হাজেরার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমতের স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ পবিত্র সলিলা জমজম কূপ ও ছাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয় এইখানেই বিরাজমান। এইখানের মারওয়া উপত্যকা হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) এশ্‌কে এলাহীর অদ্বিতীয় কীর্তিস্থল, এখানকার আরাফা ভূমি আদম-হাওয়ার মিলনস্থল। পবিত্রতা ও মাধুর্যের জগতে ইহা অদ্বিতীয়। এই স্থানই মুসলিম জাহানের হজ্ব সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইবার স্থান, ইহা মক্কায় অবস্থিত। ইহা জগদ্বাসীর প্রতি আল্লাহ্‌র রহমতের নিদর্শন ও নাজাত লাভের উপায়। এখানে পবিত্রতার অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। ভৌগোলিক হিসাবেও কা'বা সমস্ত পৃথিবীর মধ্যস্থল, সুদূর বেহেশ্‌তের সহিত মাটির পৃথিবীর সংযোগ, বিশুদ্ধ তৌহীদ, বিশ্ব মানবতা, আত্মত্যাগ, এই সকলের প্রতীক এই কা'বা শরীফ। সমগ্র জগতের ইহা মিলন কেন্দ্র। হযরত আদমের (আঃ) তথা সমগ্র মানব জাতির ইহাই আদি আবাস ভূমি। ইহা আল্লাহ্‌র রহমতের স্থান, রোজ কেয়ামত পর্যন্ত ইহা পবিত্র ও নিরাপদ থাকিবে। পবিত্র মক্কা শরীফে কবরস্থান হওয়া মুসলমানের সারা জীবনের অভিলাষ।

জাতির বন্ধন ও সংগঠন শক্তি একটি কেন্দ্রের উপর নির্ভর করে। কেন্দ্রের বলেই জাতীয় জীবন স্থিরতা লাভ করে, অমর হয়। কা'বা গৃহ আমাদের জাতীয় জীবনের কেন্দ্র ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রস্রবণ, ইহার জমজমের পবিত্র পানিতে আমাদের জাতীয় জীবন উর্বর হয়। যে জাতির কেন্দ্র ও লক্ষ্য নাই, সে

জাতি! ইহুদী জাতির পতন থেকে একটি শিক্ষা গ্রহণ কর। যে দিন তাহাদের

জাতীয় কেন্দ্র তাহাদের হাতছাড়া হইয়াছে, সেদিন থেকেই তাহাদের সংগঠন শক্তি নষ্ট হইয়াছে। মুসলিম জাতি তাহাদের এই একক কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে কেহ তাহাদের পতন রোধ করিতে পারিবে না, তখন আল্লাহ্‌র রহমত তাহাদের উপর হইতে সরিয়া যাইবে, মুসলিম জাহানের জাতীয় রাজধানী (দারুস সালতানাত) এই কা'বা। বাৎসরিক পবিত্র হজ্ব এই কেন্দ্রকে স্থিতিশীল ও স্থায়ী করিয়া রাখিয়াছে। তাই হজ্বের এত মাহাত্ম্য ও ফযীলত। কা'বা শরীফ ও হজ্ব মুসলিম জাহানের এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হওয়ার প্রেরণা দিয়া চলিয়াছে। দুনিয়ার সর্বত্র মুসলিমগণ বিক্ষিপ্তভাবে থাকিলেও তাহাদের মন-প্রাণ ও লক্ষ্য কা'বা গৃহের দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে।

কাবা গৃহের সৃষ্টি রহস্য

চতুর্থ আসমানের উপর আকীক পাথরের তৈয়ারী 'বায়তুল মা'মুর' নামে একটি পবিত্র মসজিদ রহিয়াছে। ফেরেশ্‌তাগণ এই মসজিদে আল্লাহ্‌র এবাদত করেন। হযরত আদম (আঃ) বেহেশ্‌ত হইতে দুনিয়ায় আসিলে আল্লাহ্‌র এবাদত করার জন্য একটি মসজিদের জন্য প্রার্থনা করেন, আল্লাহ্‌র আদেশে ফেরেশ্‌তাগণ বায়তুল মা'মুরের নূরানী নক্‌শা (আলোকময় প্রতিবিম্ব) দুনিয়ার মধ্যস্থলে ফেলিয়া দেন। হযরত আদমের (আঃ) পুত্র হযরত শীস (আঃ) ঐ নকশার অনুকরণে ঐ স্থানে একটি মসজিদ তৈয়ার করেন, ইহাই আমাদের বায়তুল্লাহ (আল্লাহ্‌র ঘর)। হযরত নূহ নবীর (আঃ) তুফানের সময় কা'বা ঘরের কতকাংশ মাটির নীচে চাপা পড়িয়া যায়, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) ইহা পুনঃ নির্মাণ করেন, কা'বা গৃহ দুনিয়ার সর্বপ্রথম মসজিদ।

হাজ্‌রে আসওয়াদ

হাজ্‌রে আসওয়াদ (কাল পাথর)—কা'বা গৃহের দক্ষিণ কোণে তিন হাত উঁচু একটি পাথরের মেহরাব খোদিত আছে, ইহার ভিতরেই এই বেহেশতী

চুম্বন করেন। কথিত আছে, এইরূপ চুম্বনের ফলে তাহাদের গোনাহ মাফ যায়।

শানে নুযূল ঃ— তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই পাথরখানা হযরত আদমের সঙ্গে বেহেশ্‌ত হইতে দুনিয়ায় প্রেরিত হয় এবং উহা কোরেশ পাহাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। কা'বা পুনঃ নির্মাণের সময় হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) আদেশে হযরত ইসমাঈল (আঃ) ইহাকে কোরেশ পাহাড় হইতে আনিয়া কা'বা গৃহে স্থাপন করেন। প্রথমে ইহা দুধের মত সাদা ছিল, কালক্রমে গোনাহ্‌গার লোকদের চুম্বনের ফলে কালোবর্ণ ধারণ করে। এই পাথরখানা বেহেশ্‌তেরই একটি স্মৃতিচিহ্ন, ইহাকে চুম্বন করিলে সে চুম্বন এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে না ; ইহাকে অতিক্রম করিয়া বহু স্তরের মধ্য দিয়া আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হইয়া যায়। ইহা কা'বার সঙ্গে বেহেশ্‌তের যোগসূত্রের একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দু। যুগ-যুগান্তরের কোটি কোটি ভক্তের প্রেম চুম্বন ইহাতে পঞ্জীভূত হইয়াছে। এই প্রস্তর আল্লাহ্‌র প্রতি বিক্ষিপ্ত প্রেমের কেন্দ্রভূমি।

খাসিয়ত ঃ— এই পাথরের একটি বিশেষ গুণ এই যে, হজ্বের সময় এই পাথর চুম্বন করিলে যাহার স্বভাবের মূলে সৎ স্বভাব বর্তমান তাহার সৎ স্বভাব স্পষ্ট ও প্রকাশিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সে অধিকতর সৎ হইতে থাকে এবং যাহার স্বভাবের মূলে অসৎ স্বভাব বর্তমান তাহার সেই স্বভাব প্রকাশিত হইতে থাকে। অর্থাৎ সে বেশী অসৎ হইতে থাকে। তাই দেখা যায়, অনেক হাজী বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বেশী পরহেজগার ও সৎ হইয়া পড়ে, আবার কোন কোন হাজী বেশী অসৎ হইয়া থাকে।

মাকামে ইব্রাহীম ঃ— এই পবিত্র স্থানটিতে দাঁড়াইয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) কা'বা শরীফ পুনঃ নির্মাণ করেন, ইহা দোয়া কবুল হওয়ার স্থান।

হজ্ব

হজ্ব ইসলামের চতুর্থ রোকন (স্তম্ভ)। সারা জীবনের এবাদতের সৌন্দর্য, আমলের শেষ স্তর ও ইসলামের পরিপূর্ণতা। আঁ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন— যে বিনা কারণে স্বেচ্ছায় হজ্ব না করিয়া মরে, সে ইহুদী ও নাসারা হইয়া মারা যায়। সক্ষম স্বাধীন মুসলমান পুরুষের প্রতি জীবনে একবার হজ্ব করা ফরয। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, পবিত্র হজ্ব পৃথিবী ও ইহার সমুদয় পদার্থ হইতে

উত্তম। দুর্বল ও নারীগণের হজ্ব জেহাদতুল্য। হাজীগণ বাড়ী ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তাঁহারা আল্লাহ্‌র নিকট যাহা প্রার্থনা করেন তাহা কবুল হয়, কারণ তাঁহারা আল্লাহ্‌র অতিথি। হাজীগণের গোনাহ মাফ হইয়া যায়। আঁ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন যে, এমন কতকগুলি গোনাহ আছে, যাহা আরাফাতের ময়দানে একবার না দাঁড়াইলে মাফ হয় না। হাজীগণ যখন লাব্বায়েক (হাজির আছি) অর্থাৎ হে পরওয়ারদিগার গাফুরুর্ রাহীম! আজ তোমার গোনাহগার বান্দা সমস্ত গোনাহ্‌র বোঝা মাথায় লইয়া তোমার দরবারে হাজির। মাফ করিয়া দাও মাবুদ আমার সব গোনাহ, আমি যে আজ তোমার অতিথি । তখন আল্লাহ্‌র করুণা-সিন্ধু উথলিয়া উঠে ; তিনি বান্দার গোনাহ মাফ করিয়া দেন। হাজী অর্থ-হজ্ব সমাধাকারী, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ আরাফাতের ময়দানে ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তাই হাজীগণ হাজী পদবী ব্যবহার করিয়া আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করেন। এই পদবী তাঁহাদিগকে ঠিক পথে চলার প্রেরণা দেয়। এইখানেই হাজী পদবীর গৌরব ও সার্থকতা। যাঁহারা হজ্ব সমাধান করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, একথা মনে রাখিলে তাঁহারা জীবনে আর কখনও গোনাহ ও অসৎ কাজ করিতে পারেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হাজীকে মাফ করা হয় এবং সে যাহার জন্য মাফ চায় তাহাকেও মাফ করা হয়। আল্লাহ বলিয়াছেন, যাহাদের হজ্ব কবুল করি নাই, তাহাদের গোনাহও আমি ঐ হাজীগণের উছিলায় মাফ করিয়া দেই, যাহাদের হজ্ব কবুল করা হয় ; (এহইয়া)। হজ্ব কখনও বিফলে যায় না।

১। আল্লাহ্‌র দোস্ত ৩ জন, যথা— হাজী, গাজী ও ওমরাকারী । (হাদীস)

২। হাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে সালাম কর, তাহার সহিত মোসাফাহা কর ও দোয়া করিতে বল । (হাদীস)

হজ্বের সৌভাগ্য লাভের উপায়

হযরত ইমাম জাফর ছাদেক (রাঃ) বলিয়াছেনঃ– যে ব্যক্তি ما شاء الله (মাশা-আল্লাহ — আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন) এই ইসম শরীফ একই সময় একহাজার বার পড়িবে, ইন্‌শাআল্লাহ সেই ব্যক্তি হজ্ব না করিয়া পরলোক গমন করিবে না।

যাকাত

যাকাত ইসলামের পঞ্চম রোকন (ভিত্তি)। মালদার মুসলমানের জন্য ইহা ফরয। যাকাত অর্থ বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা। যাকাত ব্যতীত নামায কবুল হয় না। যাকাত নামাযের পরিপূর্ণতা। পাক কোর্‌আনে ৮২ বার যাকাতের আদেশ উল্লেখ হইয়াছে। যেখানেই নামাযের কথা উল্লেখ আছে সেখানেই যাকাতের কথাও উল্লেখ হইয়াছে। যাকাত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করে ও দীন-দরিদ্রের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করে এবং ইসলামী সমাজ বন্ধন দৃঢ় করে।

আল্লাহ যাহাকে ধন-দৌলত দিয়াছেন সে যাকাত আদায় না করিলে পরকালে তাহার ধন-দৌলত বিষধর সর্প হইয়া দুই গাছি মালার মত তাহার গলদেশ বেড়িয়া দংশন করিবে ও বলিতে থাকিবে — "আমি তোমার যাকাত না দেওয়া ধন-দৌলত, আমি তোমার যাকাত না দেওয়া মাল।" (বোখারী)

কৃপণতা মহাপাপ, কৃপণতা ও লোভ মানুষের আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা নষ্ট করে। যাকাত দেওয়ার অভ্যাস কৃপণতা ও লোভ দূর করে। যাকাত দেওয়া ধন-সম্পত্তি দৈব দুর্ঘটনায় নষ্ট হয় না। (ইহাদের মধ্যে নিরাপত্তার গ্যারান্টি আছে) বরং যাকাত দেওয়া ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়। কোর্‌আন পাকে আল্লাহ পাক জানাইয়া দিয়াছেন যে ঃ—

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ - فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ٥

অর্থ ঃ— এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যাকাতস্বরূপ যাহা দান কর, ফলতঃ তাহাই দ্বিগুণতর বর্ধিত হয় ; (সূরা রোম, ৩৯ আয়াত)। এইখানে আল্লাহ পাক যাকাত দেওয়া ধন-সম্পত্তি বর্ধিত করিয়া দেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। হযরত আলী (কার্রাঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক কোর্‌আনে যে সকল অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা সকল মানুষের জন্যই নেয়ামতস্বরূপ । দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির আশ্রয় নিয়া থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী নহেন ; (সূরা আলে এমরান ৯ আয়াত) । আল্লাহর এইরূপ গ্যারান্টি(নিশ্চয়তা) থাকা সত্ত্বেও যদি কেহ যাকাতকে জরিমানা দেওয়া মনে করে ও দরিদ্র হইয়া যাওয়ার আশংকায় যাকাত দিতে কুণ্ঠিত হয়, তবে ইহা শয়তানের গোপন প্ররোচনা ও আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নহে বলিয়া মনে করিবে। মানুষ

অনেক সময় সত্য জিনিস জানিয়াও তাহাতে সন্দেহ করিয়া বসে, তাহার প্রকৃতি তাহাকে অনেক সময় কল্পনা ও খেয়াল দ্বারা বিশ্বাস হইতে সরাইয়া রাখে। মৃত দেহে প্রাণ থাকে না , অথচ কেহ রাত্রিতে মৃত দেহের নিকট থাকিতে রাজী নয় ; কৃপণ আবেদ হইলেও বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যাকাত সম্বন্ধে আর কিছুই বলা নিষ্প্রয়োজন।

তাওয়াক্কুল

(আল্লাহ্‌র উপর ভরসা)

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ٥

অর্থ ঃ— যে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে তিনিই তাহার জন্য যথেষ্ট ; (সূরা তালাক, ৩ আয়াত)। অন্যের উপর ভরসা না করিয়া আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করাকেই তাওয়াক্কুল বলে। তৌহীদজ্ঞান হইতেই আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতার জ্ঞান আসে, তৌহীদের ভিত্তির উপর তাওয়াক্কুল প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্‌ই সকল শক্তির উৎস ও তিনি একমাত্র প্রভু, এই জ্ঞান না হইলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতা আসিতে পারে না। যে ব্যক্তি জগতের কার্যাবলীর মধ্যে অপর কাহারও ক্ষমতা দেখিতে পায়, তাহার তাওয়াক্কুল আসিতে পারে না। মানুষের মধ্যে ক্ষমতা বলিয়া যাহা দেখা যায় উহা তাহার নিজস্ব নহে, আল্লাহ্‌র অমোঘ ক্ষমতা মানুষের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, মানুষ আল্লাহ্‌র ক্ষমতা প্রবাহের একটি মধ্যবর্তী স্থান মাত্র, তিনি নানা কৌশলে সেই ক্ষমতা মানুষের মধ্যে জন্মাইয়া দিয়াছেন। বাতাসে গাছ নড়ে কিন্তু গাছের কোন ক্ষমতা বা ইচ্ছা নাই, মানুষের অবস্থা তদ্রূপ। তাওয়াক্কুল মনের একটি উন্নত অবস্থা, ইহা ঈমানের ফল। আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যতই পরিপক্ক হয়, ততই আমাদের তাওয়াক্কুল বর্ধিত হয়। আল্লাহ্‌র একত্ব ও তাঁহার দয়ার উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলেই তাওয়াক্কুলের পূর্ণতা জন্মে, তাঁহার উপর অটল বিশ্বাস জন্মিলে মসিবতে অস্থিরতা আসে না। তাওয়াক্কুল থাকিলেই ইনসান আল্লাহ্‌র উপর সেরূপ নির্ভর করে, যেরূপ অবোধ শিশু নিতান্ত অসহায় অবস্থায় একমাত্র নিজ মাতার উপর নির্ভর করে, সে মা ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানে না। ক্ষুধা তৃষ্ণা সর্বাবস্থায় শুধু মা মা করিয়া কাঁদে, তখন সে ভাবে, মা ব্যতীত তাহার

উপায় নাই। আল্লাহ পাক কোর্আনে বলিয়াছেন— যদি তোমরা মোমেন হও, তবে আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর। (সূরা মায়েদা, ১৩ আয়াত) ;

হাদীসে উক্ত হইয়াছে — যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আশ্রয় চায় আল্লাহ তাহার সকল কার্য সমাধা করিয়া দেন, আল্লাহই তাহার যথেষ্ট সহায় ; কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়ার আশ্রয় লয় আল্লাহ তাহাকে দুনিয়ার সহিত ছাড়িয়া দেন। আল্লাহ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকল আশ্রয় ছাড়িয়া কেবল আমার আশ্রয় লইয়াছে, সমগ্র ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও আমি তাহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিব। আল্লাহ আমাদের সহায়, যিনি তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হন আল্লাহ তাহার সকল দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেন, যখন আমরা বুঝি তিনি সর্বেসর্বা, তখনই তাঁহার উপর নির্ভরতা আসে, কেবল মুখে মুখে আল্লাহ্র একত্ব স্বীকার করিলে তাওয়াক্কুল জন্মে না। আঁ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন—যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিতে পার তবে তিনি এমন অজানা স্থান হইতে রিযিক দিবেন যাহা তোমরা ধারণাও কর নাই, যেরূপ তিনি পক্ষীগণকে দিয়া থাকেন। সকালে পক্ষীগণ অভুক্ত অবস্থায় বাসা ছাড়িয়া যায় এবং সন্ধ্যায় ভর্তিপেটে সানন্দে বাসায় ফিরিয়া আসে।

কাজ না করিয়া কেবল কাজের ফলের জন্য আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা তাওয়াক্কুল নয়। নিয়মিতভাবে কাজ করিবে ও তাবেদারী করিবে, কেবল কাজের ফলের জন্য আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিবে, ইহাই তাওয়াক্কুল। ক্ষেত্রে ফসল বপন না করিয়া ফসল পাওয়ার আশায় আল্লাহ্র দয়ার উপর ভরসা করিয়া থাকা তাওয়াক্কুল নয়, ইহা এক প্রকার ধৃষ্টতা, ইহা দ্বারা আল্লাহকে তাঁহার কুদরতের বলে ফসল দেওয়ার জন্য আহবান করা ব্যতীত আর কিছু নহে, এরূপ তাওয়াক্কুল নিষিদ্ধ।

হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) তাওয়াক্কুল

কাফেরগণ যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে চড়কে বাঁধিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং তিনি বাতাসের ভিতর দিয়া অগ্নিকুণ্ডে পড়িতেছিলেন তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ভয়ত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন— এই সময় আমি কি

আপনার কোন সাহায্য করিতে পারি ? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উত্তর করিলেন— আপনার নিকট হইতে কোন সাহায্য লওয়ার প্রয়োজন নাই ; আল্লাহ্ই আমার পক্ষে যথেষ্ট সহায়। আল্লাহ্র আদেশে নিমিষে আগুন নিভিয়া গেল। কথিত আছে, ঐ দিন পৃথিবীর সমস্ত আগুন নিভিয়া গিয়াছিল। হযরত দাউদ নবীর (আঃ) প্রতি আল্লাহ পাক অহী পাঠাইয়াছিলেন যে, "হে দাউদ! যে ব্যক্তি সকল আশ্রয় ছাড়িয়া কেবল আমার আশ্রয়ে মাথা ঝুঁকাইয়াছে, সমস্ত দুনিয়া তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও আমি তাহাকে সমস্ত বিপদ ও সঙ্কট হইতে রক্ষা করিব।"

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের অপূর্ব তাওয়াক্কুল

১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট শাহজাহান হুকুম দিলেন— বলখ আর বদখশান রাজ্য দখল করতে হবে, মোগলবাহিনী এগিয়ে চলল মধ্য এশিয়ার দিকে — সেনাপতি শাহজাদা আওরঙ্গজেবের অধীনে বিশাল মোগলবাহিনীর পদভারে কেঁপে উঠল দিগ্‌দিগন্ত। বোখারার বাদশাহ্ আবদুল আজিজ খান পথ রোধ করে দাঁড়ালেন, বিনা যুদ্ধে অগ্রগতি অসম্ভব, বাদশাহ আবদুল আজিজের অগণিত সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল মোগলবাহিনীর উপর। প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ হল, আওরঙ্গজেব নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে পড়লেন সৈন্য পরিচালনার জন্য, যুদ্ধ চলেছে অবিরাম গতিতে, তাজা রক্তস্রোত বয়ে চলেছে দিকে দিকে, অগণিত মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। যোহরের নামাযের সময় হয়েছে অনেকক্ষণ, হঠাৎ আওরঙ্গজেব নেমে পড়লেন হাতীর পৃষ্ঠ থেকে, আল্লাহ্র উপর ভরসা করে দাঁড়িয়ে গেলেন জায়নামাযে। মোগল সেনাপতিকে ঘায়েল করার এই অপূর্ব সুযোগ, আত্মহারা হয়ে উঠল বিপক্ষ ; ঝাঁকে ঝাঁকে অগণিত তীর, বর্শা, গোলাগুলি শন্ শন্ করে ছুটে চলল আওরঙ্গজেবের দিকে, কিন্তু সব ব্যর্থ। হাওদার চতুর্দিকে অসংখ্য গোলাগুলি, তীর, বর্শা উঁচু হয়ে উঠল, কিন্তু একটিও হাতী বা জায়নামায স্পর্শ করল না, নির্বিকার চিত্তে ধীরে ধীরে সেজদা দিয়ে চলেছেন আওরঙ্গজেব, মোনাজাতের পর তিনি অক্ষত দেহে হাওদায় উঠে পড়লেন। বাদশাহ আবদুল আজিজ খান স্বচক্ষে দেখে চমকে উঠে বললেন— মৃত্যুকে অবলীলাক্রমে তুচ্ছ করে আল্লাহ্র নিয়মিত এবাদতে যাঁর এত নিষ্ঠা, আল্লাহ্র উপর যাঁর অটল ভরসা,

তাঁকে পরাজিত করা কোন দিন সম্ভব হবে না। এই যুদ্ধে আমাদের সর্বনাশ হবে, রক্তক্ষয়ের আর প্রয়োজন নাই, সন্ধি চাই আমি আওরঙ্গজেবের সঙ্গে। বর্তমান জামানায় ইহা তাওয়াক্কুলের চরম দৃষ্টান্ত।

আওরঙ্গজেব — (সিংহাসনের সৌন্দর্য) ঃ- এই তাপস সম্রাট দিল্লীর বাদশাহ শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র ; ১৬১৮ খৃঃ মালাবারের নিকট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট, তাঁহার পুরা নাম হাফেজ আবু জাফর মোহাম্মদ মুহিউদ্দিন আওরঙ্গজেব আলমগীর। তিনি কোর্‌আনে হাফেজ ও বিখ্যাত আলেম ছিলেন। ইসলাম ধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল, তিনি কঠোর শরীয়তপন্থী বাদশাহ ছিলেন এবং ভোগবিলাস বর্জন করিয়া ফকিরের ন্যায় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়াও যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও তিনি নামায কাযা করেন নাই। এইজন্যই বোধ হয় তিনি কোন যুদ্ধে আহত হন নাই। তিনি দিনে একবার আহার করিতেন, নিজের পরিশ্রমলব্ধ আয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। সপ্তাহে চারি দিন রোযা রাখিতেন, সমস্ত রমযান মাস আল্লাহ্‌র এবাদতে মসগুল থাকিতেন, বৎসরে চল্লিশ দিন নির্জনে আল্লাহ্‌র এবাদত করিতেন ; রাত্রিতে মাত্র তিন ঘন্টা ঘুমাইয়া অবশিষ্ট রাত্র আল্লাহ্‌র এবাদতে কাটাইতেন। সারা রাত্র রুকু ও সেজদায় লিপ্ত থাকার দরুন তাঁহার সুদীর্ঘ দেহখানা সম্মুখ দিকে হেলিয়া গিয়াছিল। সেইজন্য লোকেরা তাঁহাকে 'জিন্দা পীর' বলিয়া ভক্তি করিত, তাঁহারই তত্ত্বাবধানে দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফেকাহর সুবৃহৎ কিতাব "ফতোয়ায়ে আলমগীরী" লিখিত হয়।

তৎকালে দিল্লীর শাহী দরবার বাদশাহ কর্তৃক সময়ের জন্য নাট্যশালায় পরিণত হইত ও শাহী দরবারে সেজদা প্রথার প্রচলন ছিল ; আওরঙ্গজেব ঐ সকল শরীয়ত বিরোধী প্রথা বন্ধ করিয়া দেন। তাঁহার রাজত্বকালে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু হইতেছে তাঁহার সুবিচার। এক সময় তিনি সফরকালে এক বাগানে অবস্থান করেন। বাগানের পার্শ্বে এক বুড়ি বাস করিত। তাহার বাড়ীর পার্শ্বে বাগান হইতে পানি আসার একটি নর্দমা ছিল। সরকারী লোকেরা তাহা বন্ধ করিয়া দেন। বাদশাহ আলমগীর ইহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাত পানি ছাড়িয়া দিতে আদেশ করেন। রাত্রিতে যখন তিনি খাস মহলে বসিলেন, তখন পনরটি সোনার মোহর আবুল খায়েরের হাতে দিয়া বলিলেন — যে, এইগুলি বুড়িকে দিয়া আমার পক্ষ হইতে ক্ষমার প্রার্থনা জানাইও।

এক পত্রে তিনি নিজে লিখিয়াছেন যে, বিচারকালে তিনি শাহজাদাগণকে সাধারণ লোকের ন্যায় মনে করেন। তিনি আল্লাহ্‌কে এত ভয় করিতেন যে, আল্লাহ্‌র ভয়ে তাঁহার শরীরের কোমলতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পুত্র কামবখসকে চিঠি লিখিয়াছিলেন যে— আজ আমি বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ, শরীর একান্ত দুর্বল, যখন জন্মিয়াছিলাম তখন কত লোক ও কি ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যই না ছিল। আজ দুঃখ হয়, কেন সমস্ত জীবন আল্লাহ্‌র এবাদতে না কাটাইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছি। আমার জীবন বৃথাই গেল। জীবনের উজ্জ্বল দিনগুলি চলিয়া গিয়াছে, আছে শুধু অস্থি, চর্ম আর কঙ্কাল, আজ আমি একা, অসহায়, অস্থির ও বিমূঢ় চিত্ত, যাইবার সময় পাপের বোঝা মাথায় লইয়া চলিলাম, আল্লাহ্‌র উপর আমার বিশ্বাস আজও অক্ষুণ্ণ আছে, তথাপি গোনাহের ভাবনায় মন অবসন্ন। আমি জানি না, আমি কে, আমি কোথায় যাইতেছি, আমার এই পাপদেহের কি অবস্থা ঘটিবে? আমি এখন পৃথিবীর প্রত্যেককে বিদায় দিব। হে আমার পুত্রগণ! দেখিবে, যেন আল্লাহ্‌র বান্দাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা না হয় এবং তাহার হত্যার অপরাধ যেন এই গোনাহ্‌গারের উপর আসিয়া না পড়ে। আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে সমর্পণ করিলাম, এক্ষণে আমি তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লইলাম— আচ্ছালামু আলাইকুম। এর একটু পরেই এই মহান সম্রাট ৮৯ বৎসর বয়সে ১৭০৭ খৃঃ দৌলতাবাদে আল্লাহ্‌র অসীম রহমতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া ইস্তেগফার পড়িতে পড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার পূর্ব নির্দেশমত রওজা নামক স্থানে বিনা আড়ম্বরে সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহার দাফন করা হয়। আওরঙ্গজেব মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফা। এই জিন্দাপীরের আবির্ভাব না হইলে আজ হয়ত বঙ্গ-ভারতের বুকে ইসলামের কোন চিহ্নই থাকিত না।

হযরত শেখ সাদীর (রহঃ) অমর বাণী ঃ— তিনি বলিয়াছেন যে, "আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) ছাড়া দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার আর কোন ঔষধ নাই।" দুর্ভাবনা মস্তিষ্কের স্নায়ু-কেন্দ্রকে বিকৃত করিয়া এক প্রকার ক্ষয়কারী তীব্র বিষ সৃষ্টি করে, তাহাতে কঠিন রোগের সৃষ্টি হয়, সমস্ত দেহ নিস্তেজ ও পঙ্গু হইয়া পড়ে, আয়ু ক্ষয় হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায় ও অবশেষে পুরুষত্বহীন হয়।

নিরাপদে এরোপ্লেন (হাওয়াই জাহাজ)
ভ্রমণের অব্যর্থ আমল

বর্তমান যুগে এরাপ্লেন ভ্রমণের যেরূপ বহুল প্রচলন হইয়াছে, সেইরূপ এরোপ্লেন ভ্রমণে দুর্ঘটনাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্য কোন কিতাবে এরোপ্লেন ভ্রমণের দুর্ঘটনা হইতে নিরাপদ থাকার কোন আমল লিখিত হয় নাই, তাহার কারণ, তৎকালে এরোপ্লেন আবিষ্কারই হয় নাই। বহু অনুসন্ধান ও গবেষণার পর পাক কোরআন হইতে এই মূল্যবান ও নিতান্ত জরুরী আমলটি বাহির করা হইয়াছে, ৫নং আয়াতটি প্রত্যক্ষভাবে আকাশে ভ্রমণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত রহিয়াছে।

আমলের নিয়ম ঃ— ওযুর সহিত এরোপ্লেনে উঠিয়া পাক কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াত ও ইসমগুলি ৩ বার পড়িয়া শরীরে ফুঁক দিবে, ইনশাআল্লাহ এরোপ্লেনে কোন দুর্ঘটনা হইবে না। নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌছিতে পারা যাইবে। এই আমলের কার্যকারিতায় কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না, কারণ স্বয়ং আল্লাহ পাক এই আমলের নির্দেশ করিয়াছেন। প্রত্যেক এরোপ্লেন ভ্রমণকারী নর-নারীর এই আমলের আশ্রয় গ্রহণ করা নিরাপদ। ইহা তাহাদের পক্ষে আল্লাহ প্রদত্ত অমূল্য নির্দেশ।

١- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٢- بِسْمِ اللهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا

اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٣- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -

٤- وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ -

٥- اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ

اِلَّا اللهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ٦- يَا رَحْمٰنُ

يَا رَحِيْمُ - يَا حَفِيْظُ - يَا قَدِيْرُ يَا حَىُّ - يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ○

উচ্চারণ ঃ— ১। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ২। বিসমিল্লাহে মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাব্বী লাগাফুরুর রাহীম। ৩। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। ৪। ওয়াক্বোর রাব্বি আনজিলনি, মুনজালাম মুবারাকাওঁ ওয়া আন্‌তা খায়রুল মুন্‌জেলিন। ৫। আলাম ইয়ারাও ইলাতত্বায়রি মুছাখ্‌-খারাতিন ফি জাওভ্যিস্‌ সামায়ে মা ইউমসেকুহুন্‌না ইল্লাল্লাহ, ইন্না ফি জালিকা লা আয়াতিল লেকাউমিই ইউ'মেনুন। ৬। ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহীমু, ইয়া হাফীজু, ইয়া ক্বাদিরু, ইয়া হাইয়্যু ; ইয়া জালজালালে ওয়াল একরাম।

অর্থ ঃ—১। করুণাময় দয়াশীল আল্লাহ্‌র নামে। ২। আল্লাহ্‌র নামেই ইহার (নূহ নবীর জাহাজের) গতি ও স্থিতি, নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সূরা হুদ, ৪১ আয়াত)

শানে নুযূল ঃ— হযরত নূহ্‌ নবী (আঃ) ভয়াবহ মহাপ্লাবনের সময় তাঁহার লোকজনকে আল্লাহ্‌র নামে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলিয়া জাহাজে উঠিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্‌র নামের মহিমায় ইহার গতি ও স্থিতি নিরাপদ হইবে ; যেহেতু আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। এই নামের বরকতে তাহারা জাহাজে নিরাপদ ছিলেন।

অর্থ ঃ— ৩। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।

শানে নুযূল ঃ— সেই মহাপ্লাবনের সময় জাহাজে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহ্‌ পাক নূহ্‌ নবীকে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, জাহাজে উঠিয়া আমার প্রশংসা করিও ; পাক কোরআনে এই আয়াত বর্ণিত হইয়াছে ; (সূরা মো'মেনূন, ২৮ আয়াত) । এই নির্দেশ অনুসারে আলহামদু বলার আবশ্যকতা রহিয়াছে।

অর্থ ঃ— ৪। এবং বলিও— হে প্রতিপালক! আমাকে মঙ্গলজনক স্থানে অবতীর্ণ করাও এবং তুমি শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী। (সূরা মো'মেনুন, ২৯ আয়াত)

শানে নুযূল ঃ— আল্লাহ্‌ পাক হযরত নূহ্‌ নবীকে (আঃ) তুফানের সময় জাহাজে উঠিয়া এইভাবে প্রার্থনা করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন এবং তিনি এইভাবে প্রার্থনা করিয়া জাহাজ হইতে নিরাপদে ভূতলে অবতীর্ণ

হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আঁ হযরত (সাঃ) মদীনা শরীফে উট হইতে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হওয়ার সময় এই আয়াত ৪ বার পড়িয়াছিলেন।

অর্থ ঃ— তাহারা কি পক্ষীকুলের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে না যে, তাহারা আকাশ মার্গের অধীনে রহিয়াছে। আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই তাহাদিগকে (সুউচ্চ আকাশ পথে) স্থির রাখিতে পারে না। নিশ্চয়ই ইহাতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য (আল্লাহ্‌র কুদরতের) নিদর্শন রহিয়াছে। (সূরা নহল, ৭৯ আয়াত)

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্‌র অনুপম অনুগ্রহ ও সৃষ্টি-কৌশল ব্যতীত এই সকল নগণ্য পক্ষীগণ কিছুতেই সুদূর উচ্চে শূন্য পথে পৃথিবীর শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে প্রতিরোধ করিয়া উড্ডীয়মান হইয়া স্থির থাকিতে পারিত না। এই আয়াতে শূন্য পথে আকাশে পক্ষীগণকে নিরাপদ ও স্থির রাখার আল্লাহ্‌র কুদরতের বর্ণনা রহিয়াছে, ইহা পড়িয়া আল্লাহ্‌র ঐ কুদরতের স্মরণ করা হয় এবং নিজেকে নিঃসহায় মনে করিয়া শূন্য পথে নিরাপদ ও স্থির থাকার জন্য আল্লাহ্‌র কুদরতের নিকট আত্মসমর্পণ করা হয়, যাহার ফলে আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হয় এবং এরোপ্লেন ভ্রমণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত রহিয়াছে।

অর্থ ঃ— ৬। হে দয়াময়, হে করুণাশীল, হে রক্ষাকর্তা, হে শক্তিশালী, হে চিরজীবী, হে প্রতাপশালী ও গৌরবান্বিত! এই কয়টি আল্লাহ্‌র বিশেষ গুণবাচক নাম। এই পবিত্র নামগুলির শক্তি মহিমা অসীম, এই নামগুলি আমলের শেষভাগে যুক্ত হওয়ায় আমলটি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই আমল করিয়া এরাপ্লেনে উঠিলে মনের বল বাড়িয়া যায় ও মনে ভয়ের উদয় হয় না। (ভাবসহ কপিরাইট সংরক্ষিত)

তওবা

(আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা)

গোনাহ্‌র জন্য আল্লাহ্‌র নিকট লজ্জিত হইয়া পুনরায় গোনাহ (পাপ কার্য) না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়াকে তওবা (ক্ষমা প্রার্থনা) বলে। কেয়ামত পর্যন্ত তওবা করার দরজা খোলা থাকিবে। আল্লাহ পাক কোরআন মজীদে বলিয়াছেন ঃ—

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ ٥

অর্থ ঃ— নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারীকে ভালবাসেন ; (সূরা বাকারা, ২২৪ আয়াত)। তিনি আরও বলিয়াছেন— হে মো'মেনগণ! যদি কল্যাণ চাও তবে তওবা কর ; (সূরা নূর, ৩১ আয়াত)। আঁ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ—

اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ ٥

(তওবাকারী আল্লাহ্‌র প্রিয় বন্ধু)

মানুষমাত্রই কিছু না কিছু গোনাহ করিয়া থাকে, কেবল পয়গম্বরগণ গোনাহ হইতে মুক্ত রহিয়াছেন। (হাদীস)

১। আল্লাহ্ বলিয়াছেন — হে আদম সন্তান! যখনই তুমি আমাকে ডাক ও আমার দিকে ফিরিয়া আস, তখনই আমি তোমার গোনাহ মাফ করিয়া দেই, যদিও তোমার গোনাহ আকাশ স্পর্শ করে। অতঃপর যদি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে মাফ করি। যদি তুমি দুনিয়াভরা গোনাহ লইয়া আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও, আমি ঐ পরিমাণ ক্ষমাসহ তোমার নিকট উপস্থিত হই। আমি কাহারও পরওয়া করি না। (তিরমিযি, মেশ্‌কাত) আমার দয়া তোমার পাপের চেয়ে বড়। (ছগির)

২। আঁ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি প্রত্যহ একশতবার তওবা করি, তোমরাও আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর।

৩। যে ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাহাকে প্রত্যেক সঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন এবং যেখান হইতে সে আশা করে না সেখান হইতে তাহাকে জীবিকা দান করে।

৪। যে ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করে, সে কখনও বিপদগ্রস্ত হয় না। যদিও সে প্রতিদিন ৭০ বার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গোনাহ করে ; আল্লাহ্ বিশ্বাসী বান্দাকে তওবা দ্বারা পরীক্ষা করেন। মানব-সন্তান পাপী, পাপীদের যাহারা তওবা করে তাহারাই উত্তম।

৫। আঁ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, কোরআনের এই আয়াত অপেক্ষা আমার নিকট প্রিয় আর কিছুই নাই— হে আমার সীমাতিক্রমকারী বান্দাগণ! আমার

রহমত হইতে নিরাশ হইও না, নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত গোনাহ মাফ করেন, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময় ; (সূরা যোমার, ৫৩ আয়াত)

৬। আঁ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন—ঐ পরওয়ারদেগারের কছম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ—যদি তোমরা গোনাহ করিয়া তওবা না করিতে তবে আল্লাহ তোমাদিগকে বিলুপ্ত করিয়া এরূপ অন্য এক কওম (সম্প্রদায়) সৃষ্টি করিতেন, যাহারা গোনাহ করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করিত, অতঃপর আল্লাহ পাক তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিতেন।

৭। যাহারা গোনাহকে ছোট মনে করে, তাহাদের গোনাহ মাফ হয় না, (মেয়েলোকদের তওবা বা দোয়া শীঘ্র কবুল হয়, কারণ তাহাদের রিযিক হালাল, স্বামী যেভাবেই রোজগার করুক তাহাদের পক্ষে তাহা হালাল)।

তওবা করিতে অনিচ্ছার কারণ

১। বর্তমান যুগে অধিকাংশ লোক সংশয়বাদী, কোরআন ও পরকাল সম্বন্ধে অনেক সন্দিহান।

২। পাপ ও লোভের আকর্ষণ বর্তমান জামানায় এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, মানুষ আনন্দ-সুখে মগ্ন থাকিতে চায়, লোভ বৃদ্ধি পাওয়ায় লোভ ত্যাগ করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে ও পরকালের ভয় চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

৩। পরকালের সুখ সম্পদকে মানুষ পরহস্তে ধন ও অঙ্গীকার বলিয়া মনে করে ; আর দুনিয়ার সুখ ভোগকে নগদ টাকার মত দেখিয়া পাগল হয়।

৪। দীর্ঘ সূত্রতা—তওবা করার ইচ্ছা আছে, এখন নয়, পরে তওবা করিব। কখনও মনে করে, এই সুখ করিয়া সাধ মিটাইয়া লই, কাল থেকে আর এ কাজ করিব না, মরণের আগে একবার তওবা করিলেই ত চলিবে।

৫। অনেকে আল্লাহ্‌র রহমতের উল্টা অর্থ করে ও আল্লাহ্‌র রহমতের উপর অন্যায়ভাবে নির্ভর করে, আবার কেহ মনে করে, গোনাহ করিলেই যে শাস্তি পাইতে হইবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ? আল্লাহ ত দয়া করিয়া ক্ষমা করিয়াও দিতে পারেন, তিনি যে গাফুরুর রাহীম ; (ক্ষমাশীল, দয়াময়)।

৬। মুখে মুখে তওবা করিলে তাহা দ্বারা কোন ফায়দা হয় না, আন্তরিকতার সহিত অকপট মনে তওবা না করিলে তাহা গৃহীত হয় না।

তওবাতুন নাছুহা

বহুদিন আগের কথা। এক তরুণ যুবক কু-মতলবে স্ত্রীলোকের বেশ ধরিয়া শাহী হেরেমে বাঁদীর কাজে নিযুক্ত হয়। একদিন বাদশাহ্‌র বেগমের একটি মূল্যবান হার চুরি হইয়া যায়। বাদশাহ্‌র হুকুমে সমস্ত বাঁদীগণের শরীর তল্লাশীর ব্যবস্থা হয়। হেরেমের সমস্ত বাঁদীগণকে একত্রে দাঁড় করানো হয়। স্ত্রীলোক বেশধারী যুবকটি তাহার স্বরূপ নিশ্চিতভাবে ধরা পড়িবে, সেই ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল ! তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, রক্ত শিথিল হইয়া আসিল ; কারণ তাহার স্বরূপ ধরা পড়িলে মৃত্যু অনিবার্য। সে খাঁটি মনে তওবা করিল, এইরূপ কাজ সে আর কখনও করিবে না। প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। আর একজন বাঁদীর তল্লাশী শেষ হইলেই তার পালা, ভয়ে সে অস্থির হইয়া অকপট মনে আল্লাহ্‌কে ডাকিতে লাগিল। আল্লাহ তাহার তওবা কবুল করিলেন। তাহার পূর্ববর্তী বাঁদীর নিকট হইতে চুরি যাওয়া হারখানা বাহির হইয়া পড়িল, যুবকটি বাঁচিয়া গেল। কোরআনে অকপট তওবাকে "তওবাতুন নাছুহা" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ; (সূরা তাহরীম, ৮ম আয়াত)। উপরোক্ত ঘটনা অকপট ও আন্তরিক তওবার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। মুসলিম জগতে এই ঘটনা তওবাতুন নাছুহা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

তওবার ফযীলত ঃ— তওবা অভিমানীর অভিমান দূর করে, মনের অহংকারকে বিনয়ে পরিণত করে। পাপ চিন্তা হইতে মনকে নিবৃত্ত রাখে। আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় ও ভরসার সৃষ্টি করে। তওবা বান্দা ও মা'বুদের সম্বন্ধ ঠিক রাখে। মানুষ আল্লাহ্‌র নিকট তওবা না করিলে তৌহীদ জ্ঞান নষ্ট হইয়া যাইত, এইসব কারণে আল্লাহ পাক তওবাকারীকে ভালবাসেন এবং তাহাকে নানাভাবে সাহায্য করেন, অকপট মনে তওবা করিলে নিশ্চয় আল্লাহ তাহা গ্রহণ করেন, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহা না হইলে মানুষ নিরাশ হইয়া গোনাহ হইতে বিরত হইত না ; (তওবার অন্যান্য ফযীলত ১৪১ পৃঃ দ্রঃ)।

হাদীস ঃ— যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত এস্‌তেগফার পড়ে তাহার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে, যদিও সে জেহাদ হইতে পলায়ন করিয়া থাকে।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ۝

উচ্চারণ ঃ— আস্তাগফেরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যাল ক্বাইউমু ওয়া আতুবু ইলাইহে।

অর্থ ঃ— চিরজীবী চিরস্থায়ী আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, সেই আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ও তাঁহার দিকে ফিরিয়া আসিতেছি।

ভালবাসা

স্ত্রীর ভালবাসা আল্লাহ্‌র নিয়ামত

আল্লাহ্‌ পাক কোরআনে বলিয়াছেন যে ঃ—

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

অর্থ ঃ— এবং আল্লাহ্‌র কুদরতের অন্যতম নির্দশন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন— তোমরা যেন তাহাদের নিকট হইতে শান্তি লাভ করিতে পার এবং তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়াছেন ; নিশ্চয়ই ইহাতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন রহিয়াছে ; (সূরা রোম, ২১ আয়াত)।

এইখানে বলা হইয়াছে যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মূলে রহিয়াছে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি, ইহার অভাব হইলে দাম্পত্য জীবন শান্তিময় ও সুখের হইতে পারে না। এই সম্পর্ক সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র অনন্ত সৃষ্টি মহিমার অনুপম নির্দশন বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভালবাসার দান

স্বামীর প্রতি ভালবাসা, স্বামীসেবা ও অনুক্ষণ স্বামীসঙ্গ নারীদেহের সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য অটুট রাখার শ্রেষ্ঠ উপাদান। তাহাদের পক্ষে স্বামীসঙ্গ, স্বামীসেবা, স্বামীর প্রতি ভালবাসার চেয়ে উত্তম টনিক (রসায়ন) আর নাই। অনুক্ষণ স্বামীসঙ্গ ও স্বামীর প্রতি ভালবাসা (আকর্ষণ) তাহাদের অতিরিক্ত যৌন আবেগকে নিঃশেষ করিয়া যৌনজীবন বিকারশূন্য, স্থিতিশীল ও দীর্ঘস্থায়ী করে, দেহের সৌন্দর্য, লাবণ্য, সুষমা বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে, স্বামীসেবাজনিত সুখ নারীদের পক্ষে উপাদেয় বস্তু। একজন স্বামীসঙ্গ বর্জিত স্ত্রী ও আর একজন স্বামী-সঙ্গিনী স্ত্রীর দেহ লাবণ্য ও মানসিক স্বচ্ছতার মধ্যে স্পষ্টভাবে পার্থক্য ধরা পড়ে ; স্বামীসেবাজনিত পুলক আনন্দ তাহাদের দেহ-মনকে সঞ্জীবিত রাখে। এই সুখ, আনন্দ ও পুলকজাত মৃদু শিহরণ তাহাদের দীর্ঘায়ু দান করে, এই পুলক শিহরণের

মধ্যে তাহাদের দেহের দীপ্তির বিকীরণ হয় ভাল, এই পুলক শিহরণ কঠোর পরিশ্রমেও তাহাদের ক্লান্তির অনুভূতি দূর করে।

আল্লাহ পাক নারীদেরকে সেবাধর্মী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদের স্বামীসেবার মধ্যে গর্বমিশ্রিত পুলক-আনন্দ লুকাইয়া থাকে, তাই তাহারা স্বামীকে অন্ততঃ গৃহ-গণ্ডির মধ্যে তাহাদের মুখাপেক্ষী করিয়া রাখার বিধিমত চেষ্টা করে। নারীগণ প্রমাণ করিতে চায় যে, পুরুষ তাহাদের না হইলেই চলিবে না— ওগো আমায় এক গ্লাস পানি দাও, চশমাটা কোথায় আনিয়া দাও ইত্যাদি ফাই-ফরমাইশের মধ্যে স্ত্রীলোকগণ বিব্রত হইয়া উঠিলেও কচিৎ বিরক্ত বা রুষ্ট হয়। বাহিরে রোষের ভাব দেখাইলেও ভিতরে সন্তোষ ঝলমল করে। পুরুষ জাতির পদে পদে অবলা নারীর সেবা ও সাহায্য ছাড়া চলে না। দেখিয়া তাহারা মনে মনে করুণার হাসি হাসে, গর্বমিশ্রিত পুলক আনন্দ ভোগ করে, এইখানেই স্বামীসেবার সুখ ও সার্থকতা। অনেক পুরুষ নারী চরিত্রের এই রহস্যটি ধরিতে পারে না। সেবাজনিত আনন্দ উপভোগ করে বলিয়াই নারীগণ পাড়াপড়শীর বিবাহ উৎসবে যেমন আন্তরিকতার সহিত যোগ দেয়, তেমনি দেয় তাহাদের ফাতেহার আয়োজনে। তাহারা রোগীর সেবা করে একেবারে নিঃস্বার্থ হইয়া নয় ; তার মধ্যে তাহারা উন্মাদনা পায়, নূতনত্ব পায়।

অপরপক্ষে, স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা, ঘৃণা ও ভালবাসার অভাব তাহাদের সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যহীন করে, পরমায়ু কমাইয়া দেয়। ইং ১৯৫৩ সনের ৮ই জুন তারিখে আমেরিকার হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক বহু গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, পরস্পর ভালবাসা যে কেবল মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করে তাহা নহে, ইহা মানুষের নৈতিক, দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রচুর উন্নতি করে। ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হিংসা মানুষের মনে অশান্তির সৃষ্টির করিয়া দেহ-মনকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া তোলে। দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা যেরূপ পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের (পাকস্থলীতে অবস্থিত একপ্রকার তীব্র এসিড) মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া পাকস্থলীর উপর স্তরে ক্ষতের সৃষ্টি করে, তদ্রূপ হিংসা, ঘৃণা ও বিদ্বেষজনিত অশান্তি মানবদেহ ধ্বংসকারী জৈববিষ (টক্‌সিন) বৃদ্ধি করিয়া দেহ, কোষ, পেশী ও স্নায়ুকে দুর্বল এবং ব্যাধিগ্রস্ত করিতে থাকে এবং শরীরের বলসাম্য নষ্ট করিয়া দেয়, ইহা জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত। ইসলামী শরীয়তে ঘৃণা, হিংসা ও বিদ্বেষ বর্জন করার নির্দেশ রহিয়াছে।

অনুসন্ধানে প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি হইলে তাহাদের একজন বিশেষ করিয়া চুম্বকধর্মী ও স্থিতিশীল দেহধারী স্ত্রীকে অচিরেই সংসার হইতে বিদায় নিতে হয় অথবা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া জীবন কাটাইতে হয়। আনন্দময় ও শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য ভালবাসা অপরিহার্য বলিয়াই আল্লাহ পাক কোরআনে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ভালবাসাই দাম্পত্য জীবনের সুখের ভিত্তি।

ভালবাসা একটি শক্তি ঃ— ভালবাসা একটি সাময়িক প্রাণচাঞ্চল্য নয় ; বরং ইহা একটি গঠনমূলক শক্তি ও জীবন্ত উৎস। এই শক্তি ও উদ্যমের অন্তর্নিহিত ধারা ও চলিষ্ণু প্রভাব আমাদের দেহ-মনে কাজ করিতে থাকে এবং ধীরে ধীরে আমাদের অলক্ষ্যে সমস্ত জৈবিক ও মানবিক প্রবণতাকে নবরূপ দিতে থাকে। একমাত্র ভালবাসাই এই উদ্যম ও শক্তিকে স্থায়ী করিতে সক্ষম, ভালবাসা ক্ষণকালীন জিনিসকে চিরকালীন করে, ভালবাসা জড়িত যৌনসঙ্গম অতিরিক্ত কর্মশক্তির সঞ্চার করে, স্বামী-স্ত্রীর যৌন জীবনকে প্রতিদিন পুনর্জীবন দান করে এবং নূতন করিয়া রস সঞ্চার করে, এরূপ প্রতিটি যৌনমিলন একটি নূতন দাম্পত্য জীবন প্রতিষ্ঠার সমতুল্য, ভালবাসা স্বামী স্ত্রীকে তারল্যমণ্ডিত করে ও বার্ধক্য দূরে ঠেলিয়া রাখে ও তাহাদের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি করে। যেখানে ভালবাসার অভাব সেখানে স্বামী-স্ত্রীর জীবনতরী ভাসিয়া চলে না— গুন টানা যায়। ভালবাসাহীন যৌনমিলন বার্ধক্য আনয়ন করে ; (আবু সিনা)। মানুষ সৌন্দর্যপ্রিয়, ভালবাসা সৌন্দর্য উপভোগের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ইহা নারীদেহে রূপের ঢেউ তুলিয়া পুরুষকে চঞ্চল করে, রূপ যৌবনের ঝলক তুলিয়া পুরুষকে কামনামত্ত করে, বিহবল পুরুষ নির্বিকারে আত্মদান করিতে উদগ্রীব হয়।

স্বাস্থ্য লাভে ভালবাসার দান

ভালবাসার মধ্য হইতে খাদ্যের ভিটামিনের (খাদ্যপ্রাণ) এ, বি, সি, ডি, সব গুণ আহরণ করার বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে, শারীর বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান তাহা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। মনে যদি আনন্দ-স্ফূর্তি

থাকে তাহা হইলে দেহের প্রতিটি যন্ত্র আনন্দময় হইয়া কাজ করে, তাহাতে দেহগত কোন রোগজীবাণু দেহে প্রবেশ করিতে চাহিলেও প্রবেশাধিকার পায় না। মনের আনন্দ-স্ফূর্তি এক প্রকার টনিক বিশেষ, ইহা মানব দেহের জৈবরস (হরমোন) বৃদ্ধি করে ও জৈব বিষকে নষ্ট করে। মনের আনন্দেই মানুষ দীর্ঘায়ু লাভ করে, মনকে আনন্দময় করিয়া রাখার যোগ্যতা ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন বস্তুতে নাই। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার মধ্য দিয়া যে মৃদু আলোড়নের সৃষ্টি হয়, সেই আলোড়নের অনুভূতি কেউ প্রকাশ করিতে না পারিলেও এই অব্যক্ত অনুভূতি পরম মাদকতাময়। ইহার কল্যাণে দেহের প্রতিটি গ্রন্থি স্নায়ু সজীব হইয়া জাগ্রত থাকে ও তৎপর হয়।

ভালবাসার ভিত্তি ঃ— ভালবাসা হঠাৎ ও আলাদা সৃষ্টি নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি পরিকল্পনার মধ্যেই ইহা জড়িত রহিয়াছে। বিশ্বজগৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ নামক দুইটি বিপরীত শক্তির বলে প্রতিনিয়ত চলিতেছে, এই দুইটি বিপরীত শক্তির আবশ্যকতা রহিয়াছে। এই দুই শক্তির সমন্বয়ে যাবতীয় পদার্থের বলসাম্য, ভারসাম্য, স্থিতিসাম্য সৃষ্টি হইয়া জগত চলিতেছে। বিপরীত বিকর্ষণ শক্তি না থাকিলে তাহা সম্ভব হইত না, একমাত্র আকর্ষণ শক্তির একটানা শক্তিতে সমস্ত পদার্থ একত্রে জড় হইয়া যাইত। আকর্ষণ অর্থ নিকটে টানিয়া আনা, অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থের যে গুণ বা শক্তি দ্বারা অন্য পদার্থকে পরস্পরের অভিমুখে টানিয়া আনে তাহা। বিকর্ষণ অর্থ দূরে ঠেলিয়া দেওয়া, ইহা আকর্ষণের বিপরীত শক্তি। এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এড়াইয়া জগতের কোন বস্তু টিকিতে পারে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ ও বিকর্ষণের খেলা চলিতেছে। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ নাই এমন কোন বস্তু জগতে নাই। ক্ষুদ্রতম পরমাণুর মধ্যেও আকর্ষণ বা বিকর্ষণ আছে, স্থিতিবল ও গতিবল আছে, ইহা ছাড়া কোন বস্তু টিকিতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুর এক বা একাধিক পদার্থের সহিত আকর্ষণ বা বিকর্ষণ আছে, আঠার সহিত কাগজের আকর্ষণ আছে, সেইজন্য আঠা দিয়া দুই খণ্ড কাগজ একত্রে জোড়া লাগান যায়, আবার আঠার সহিত পানির বিকর্ষণ আছে, সেইজন্য পানি লাগিলে আঠা সরিয়া যায় ও কাগজ আলাদা হইয়া পড়ে। এই আকর্ষণ, বিকর্ষণ, বিদ্যুৎ, চুম্বক ইত্যাদি আল্লাহর মহাশক্তির বিভিন্ন

প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি সকল শক্তির উৎস, সকল আকর্ষণ বিকর্ষণের মূল কারণ। মহাবিশ্বের অগণিত পৃথিবী, চন্দ্র, তারকারাজি, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি বলেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট থাকিয়া প্রতিনিয়ত পরস্পরে দূরত্ব ঠিক রাখিয়া পলকের মধ্যে সংঘর্ষ এড়াইয়া নিজ নিজ কক্ষে আবর্তন ও বিবর্তন করিতে সক্ষম হইতেছে। এই আকর্ষণকে বিজ্ঞানের ভাষায় মহাকর্ষণ বলে। আবার যে আকর্ষণ বলে পৃথিবীতে অবস্থিত পদার্থসমূহ পৃথিবীর আবর্তন ও বিবর্তনের সময় স্থানচ্যুত হয় না ও উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত বস্তু পৃথিবীতে পতিত হইতে বাধ্য হয়, ইহাই স্যার আইজাক নিউটনের আবিষ্কৃত মহাকর্ষণ শক্তি ; কিন্তু তাঁহার এই আবিষ্কারের প্রায় হাজার বৎসর পূর্বেই ইহা পাক কোর্‌আনে আবিষ্কৃত হইয়া থাকায় তাঁহার আপেল ফল মাটিতে পড়ার গল্পটি অসার হইয়া গিয়াছে। পাক কোর্‌আনে আল্লাহ পাক জানাইয়া দিয়াছেন যে, পৃথিবীকে আমি মাধ্যাকর্ষণরূপে সৃষ্টি করিয়াছি। (সূরা মোরছালাত, ২৫ আয়াত) এই আকর্ষণ প্রত্যেক পদার্থের মধ্যভাগে হয় বলিয়া ইহাকে মাধ্যাকর্ষণ বলা হয়, এই আকর্ষণের অভাব হইলে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ স্থানচ্যুত হইয়া চুরমার হইয়া যাইত। কেয়ামতের দিন হযরত ইস্রাফীল (আঃ) তাঁহার সিঙ্গায় ফুঁক দিয়া আকর্ষণটি নষ্ট করিয়া দিবেন এবং আকর্ষণের অভাবে প্রত্যেক পদার্থের অণু পরমাণুগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া তুলার মত উড়িয়া যাইবে। ভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ বা টান আছে তাহাকে আসক্তি বলে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে আকর্ষণ বা আসক্তি তাহারই নাম ভালবাসা এবং তাহাদের মধ্যে যে বিকর্ষণ তাহাই ঘৃণা।

আকর্ষণ বা বিকর্ষণের স্বাভাবিক গুণ

আকর্ষণের মধ্যে গঠনমূলক শক্তি ও বিকর্ষণের মধ্যে ধ্বংসকারী শক্তি জড়িত রহিয়াছে, অর্থাৎ দুইটি পদার্থের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ বা টান থাকিলে পদার্থ দুইটি পরস্পরের গঠন অটুট রাখিতে সাহায্য ও পোষকতা করে, এই বৈজ্ঞানিক নিয়মেই ভালবাসা স্ত্রীকে লাস্যময়ী ও বিকশিত সুঠামদেহী করিতে সাহায্য করে, পর-পুরুষের প্রতি রূপজ মোহের বিকার নষ্ট করে, কিন্তু বিকর্ষণ থাকিলে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য নষ্ট হইতে থাকে।

আকর্ষণ একটি অনমনীয় শক্তি

স্ত্রী-যৌনাঙ্গ অসুন্দরই নয় বিশ্রীও বটে— এই অঙ্গটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হয় বলিয়া হাদীসে উল্লেখ হইয়াছে ; কিন্তু স্ত্রী-যৌনাঙ্গের সহিত পুরুষের চক্ষের কোষগুলির আকর্ষণ এত তীব্র ও অনমনীয় যে, ইহার বিশ্রী দৃশ্য উপেক্ষা করিয়া ও হাদীসের সাবধানবাণী অমান্য করিয়া পুরুষগণ এই অঙ্গটির প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে চায় ও করিয়াও থাকে। আকর্ষণ কোন বাধা নিষেধ গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নয়।

সন্তানের উপর স্বামী স্ত্রীর ভালবাসার প্রভাব

পৃথিবীর সকল যৌন বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, স্বামী-স্ত্রী ভালবাসার মধ্যে যে সন্তান হয় তাহা প্রফুল্ল চিত্ত, সুস্থদেহী, বুদ্ধিমান, উদারচেতা, উৎসাহী, বলিষ্ঠ ও কর্মবীর হয়।

বৈজ্ঞানিক কারণ ঃ— পুরুষের শুক্রকীট ও নারী-ডিম্বের মিলনের ফলেই সন্তান হয়। পুরুষের প্রত্যেকটি শুক্রকীট ও নারীর ডিম্বাণুর মধ্যে ২৪টি করিয়া বর্ণধাম (Chromosomes) থাকে। এই বর্ণধামগুলির মধ্যে জাতিগত সাধারণ রূপ, গুণ ও স্বভাবের অসংখ্য বীজ বর্তমান থাকে।

নর-নারীর সঙ্গমের পর উভয় পক্ষের বর্ণধামগুলি ঠিকভাবে পরিস্ফুট হইয়া মিলিত হইলেই সন্তান স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ ও সুন্দর হয়। এই মুহূর্তে স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসাজাত আকর্ষণ বর্ণধামগুলিকে উদ্দীপিত করিতে থাকে, তাহাতে তাহারা যথার্থভাবে পরিস্ফুটিত হয়, স্বামী-স্ত্রীর জাতীয় ও নিজস্ব গুণগুলি সন্তানের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। তাই অনেক সময় দেখা যায় নিতান্ত দুর্বল ও মিনমিনে স্বামী-স্ত্রীর মিলনেও তেজস্বী, সুদেহী ও প্রতিভাশালী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহা স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসারই ফল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা থাকিলে সন্তান গর্ভে থাকাকালেও পিতামাতার ভালবাসাজাত আকর্ষণ মাতৃদেহের প্রতিটি কোষকে প্রতিনিয়ত উদ্দীপিত রাখে এবং ইহার প্রতিক্রিয়া গর্ভস্থ সন্তানের দেহকোষকে উন্নত করিতে থাকে।

মানবিক প্রেম ও আল্লাহ প্রেমে অদলবদল ঃ— ঘনীভূত ভালবাসাকেই প্রেম বলে, মানবীয় প্রেম কখনও দেহাতীত হইতে পারে না। যৌন আবেদন, যৌন আকর্ষণ মানবীয় প্রেমের মূল উৎস। মর্তলোকে কামবর্জিত প্রেম সম্ভব নয়। নর-নারীর মধ্যে দেহাতীত প্রেম অসম্ভব, প্রেমকে বন্ধুত্ব বলা যাইতে পারে। মানুষ

স্বাভাবিক অবস্থায় আকারহীন কিছুর প্রতি প্রেম নিবেদন করিতে পারে না, দেহকে কেন্দ্র করিয়া হয়ত পরে দেহাতীতে যাইতে পারে ; কিন্তু প্রেমের মূল্য যে যৌন প্রয়োজনেই সৃষ্টি হইয়াছে একথা অস্বীকার করা যায় না, যদি দেহকে কেন্দ্র করিয়া প্রেম না হইবে তবে বিরহে কষ্ট হয় কেন ?

কামনার প্রেম আল্লাহ প্রেমের মহাসঙ্গমে মিলিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু দাম্পত্য প্রেমের তীর্থেই আল্লাহ প্রেমের জয়যাত্রা শুরু হয়। প্রেম অনেকটা ঐশ্বরিক প্রেম বলিয়াই মানুষ প্রকৃত প্রেমের অধিকারী হয়, যে প্রেমের শেষ পরিণতি আলাহ প্রেমে না পৌঁছায় সে প্রেম নিরর্থক। প্রেমের মূলে রহিয়াছে কাম, কামের নিম্নগতিও আছে ঊর্ধ্বগতিও আছে। কাম ঊর্ধ্বগতি লাভ করিলেই প্রেম, শুধু পাত্রের তফাৎ, প্রকৃতি ও অনুভূতিতে বিশেষ তফাৎ নাই।

যদি কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে মনে-প্রাণে ভালবাসে, তাহা হইলে তার মধ্যে যে রূহানী শক্তি নিহিত তাহা স্বামীর দেহাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, রূহানী শক্তি (আত্মিক শক্তি) সেই শুভ কাজটির ভার গ্রহণ করে, এই পবিত্র ভালবাসা হয়ত একদিন মানুষকে আল্লাহপ্রেমে জাগ্রত করিতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা আল্লাহ্‌র পবিত্রতম আমানত ; ইহা অশ্লীল নয়, ইহা মনের গহীন কোণের একটি নূর (আলো)। দাম্পত্য প্রেম আল্লাহ প্রেমে পৌঁছিবার প্রথম সোপান, তাই বিশ্বনবী (সাঃ) বলিয়াছেন— যে বিবাহকে অস্বীকার করে সে আমার কেহ নহে।

প্রিয় নবীর পথ ছাড়িয়া কেহ কোনদিনও জীবনের কাম্য (গন্তব্য) স্থানে পৌঁছিতে পারিবে না। (সা'দী)

ভালবাসার জৈবিক ভিত্তি

শারীর বিজ্ঞান ও যৌনবিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, যৌন সঙ্গমে স্ত্রী তাহার যৌনাঙ্গ দ্বারা স্বামীর নিক্ষিপ্ত বীর্যে নিহিত মূল্যবান কেলসিয়াম ফসফেট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থ শোষণ করে, তাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় ও নারীত্বের বিকাশ লাভ হইয়া দেহ-লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। নারী যৌনাঙ্গ দ্বারা পুরুষের শুক্র শোষণ একটি স্বাভাবিক ব্যাপার, ইহা বন্ধও করা যায় না এবং ইহা বন্ধ করিলে ক্ষতি ছাড়া লাভও হয় না। অপর দিকে নারী যৌনাঙ্গের মধ্যে যে কামরস বর্তমান রহিয়াছে তাহার মধ্যে প্রচুর শক্তিশালী চুম্বকধর্মী পরমাণু (Ultra magnetic particles) বর্তমান থাকে, পুরুষগণ ঐ পরমাণু লিঙ্গ দ্বারা শোষণ করিয়া নিজ চুম্বকধর্মী শক্তি অর্জন করিয়া বলশালী হয় ও পৌরুষ অর্জন করে, তাহাতে তাহাদের স্নায়ুগুলি শক্তিশালী ও কার্যক্ষম হইতে থাকে।

এই দুই প্রকার শোষণের ফলে স্বামী-স্ত্রীর দেহের মধ্যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণের সৃষ্টি হয়, উভয় দেহে স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি হয়, উভয় দেহের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয়, এমন কি উভয় দেহের গন্ধের মধ্যে অসামাঞ্জস্য থাকিলে তাহাও দূর হইয়া যায়। এই শোষণ স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসাকে স্থিতিশীল করে, এই জৈব আকর্ষণ স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান, ইহা তাহাদের সকল সমস্যা ও অনৈক্য দূর করিতে সাহায্য করে। যে সকল স্বামী-স্ত্রী একত্রে জীবন যাপন করার সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত তাহারা অভিশপ্ত। তাহাদের মধ্যে এই প্রকার জৈব আকর্ষণ বা ভালবাসা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ ঘটিতে পারে না এমন নহে, এমন কি এই সকল দম্পতির সন্তান-সন্ততিও অন্য ধরনের হয়। সুষ্ঠু ও নিয়মিত যৌন সঙ্গমের অভাবে মানুষের কর্মশক্তি, উদ্যম, সৃজনশীল প্রতিভা নষ্ট হইয়া যায়।

যৌনশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভা কেবল ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। এই সম্পদ নষ্ট হইলে গোটা জাতিকেই একদিন তার মূল্য দিতে হয়। প্রত্যেক দেশের সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী ও শ্রমিকগণ যাহাতে সপরিবারে বসবাস করিতে পারে, সেই ব্যবস্থা থাকা উচিত। জাতীয় জীবনে একবার যৌন-বিশৃংখলা উপস্থিত হইলে সে জাতিকে রক্ষা করা যায় না। যৌবনের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া গ্রীক ও রোমানগণ ধ্বংস হইয়াছিল, তাহাদের অবস্থা হইতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

ভালবাসার শত্রু

বেপর্দা প্রথা ও নর-নারীর অবাধ মেলামেশার চেয়ে ভালবাসার বড় শত্রু আর নাই। নর-নারীর অবাধ মেলামেশায় নিজ স্বামী বা স্ত্রীর রূপ-সৌন্দর্য ও গুণগুলি চাপা পড়িয়া যায় এবং পর-পুরুষ পর-নারীর রূপ-গুণগুলি চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠে, তাতে নিজ স্বামী-স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা হ্রাস পাইতে থাকে।

স্বামীর প্রতি ঘৃণায় দৈহিক বিদ্রোহ ঃ— যে স্বামী-বিরাগিনী স্ত্রী আসলে স্বামীকে ভালবাসে না, মনে মনে ঘৃণা করে— ঐ ঘৃণার দৈহিক প্রকাশ হয় অরুচি, অজীর্ণ, মাথা-ধরা ও বমন। স্বামীর প্রতিহিংসা লইবার প্রবৃত্তি তাহার অবচেতন মন হইতে নির্গত হইয়া শরীরে নানা উপসর্গের সৃষ্টি করে।

ভালবাসার মধ্যে থাকে সহজ আনন্দ, ইহা দাম্পত্য জীবনের ফাও লাভ। কেবল স্বার্থের জন্যে যে ভালবাসা তাহা ছলনামাত্র, তবু ভালবাসায় স্বার্থের কিছু মিশ্রণ থাকিলেও ইহা উপস্থিত দাম্পত্য জীবনের একটি অমূল্য সম্পদ। শুধু পানি দিয়া দই তৈয়ার করা যায় না—একথা সত্য। মনের স্বাস্থ্যের জন্য ভালবাসা কল্যাণকর, ইহা মনকে নীচতা হইতে দূরে রাখে। ভালবাসা স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের দোষগুলি ঢাকিয়া রাখে ও গুণগুলিকে বড় করিয়া দেখা। কাহাকেও ভালবাসার অর্থ দোষ-গুণসমেত একটা অখণ্ড মানুষকে ভালবাসা।

দরিদ্রতা

আঁ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন— যে সময় লোকেরা ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় করিতে তৎপর হইবে, দালান-কোঠা এমারত তৈয়ার করিতে উৎসাহিত হইবে এবং সংগে সংগে দরিদ্রদিগকে দরিদ্রতার জন্য ঘৃণা করিতে থাকিবে, তখন চারি প্রকার বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে —১। দুর্ভিক্ষ, ২। সরকারের অত্যাচার, ৩। বিচারকের অন্যায় বিচার, ৪। বিধর্মী ও শত্রুগণের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি। (কিমিয়ায়ে সাআদত)

বিজ্ঞান ও আল্লাহ্‌র কুদরত

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডঃ আইনস্টাইন বলিয়াছেন— যে অনন্ত উর্ধ্বতর শক্তি আমাদের ভঙ্গুর ও দুর্বল মনের কাছে সামান্য মাত্রায় নিজের শক্তিকে বিকশিত করিয়া থাকে, মাথা নত করিয়া শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার অসীম কুদরতের প্রশংসা করাই আমার ধর্ম। সমগ্র বিশ্বচরাচরের প্রকাশিত সর্বোচ্চ বিচারশক্তিসম্পন্ন সেই অসীম শক্তির অস্তিত্বের প্রতি গভীর বিশ্বাসই আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। মানুষের বিজ্ঞানের জ্ঞান যতই উন্নত ও শক্তিশালী হউক না কেন, আল্লাহ্‌র অনন্ত জ্ঞানের অণুমাত্রও মানবগণ ধারণা করিতে সক্ষম নয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান কোন্ জিনিস কিভাবে হয় এবং কেন হয়, তাহা বলিতে পারে না। তবে কোন্ পদার্থের কি গুণ আছে তাহা অনেকটা বলিতে পারে, ইহার বেশী বিজ্ঞানের কোন হাত নাই।

অর্শ রোগের তদবীর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يَا رَحِيْمَ كُلِّ صَرِيْخٍ وَّمَكْرُوْبٍ يَا رَحِيْمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖٓ اَجْمَعِيْنَ ○

উচ্চারণ ঃ— বিসমিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহীম। ইয়া রাহীমু কুল্লি ছারিখিওঁ ওয়া মাকরূবিন ইয়া রাহীমু ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা খায়রি খাল্‌কিহী মোহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমাঈন।

অর্থ ঃ— পরম করুণাময়, দয়াশীল আল্লাহ্‌র নামে। ফরিয়াদকারী ও বিপদগ্রস্তের প্রতি দয়াবান, মেহেরবান এবং আল্লাহ তায়ালা তাহার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ), তাঁহার সন্তান-সন্ততি ও ছাহাবীগণের সকলের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

নিয়ম ঃ— সোমবার অথবা শুক্রবার দিন এই দোয়া কাগজে লিখিবে ; অতঃপর মোম গলাইয়া একটু কাপড়ে লাগাইবে এবং এই দোয়া লিখিত কাগজটি সেই মোম লাগানো কাপড়টিতে জড়াইয়া অর্শ রোগীর কোমরে বাঁধিয়া দিবে। ইন্‌শাআল্লাহ নিরাময় হইবে ; (আমালে কোরআনী)।

গলা ফুলার তদবীর

শনিবার অথবা শুক্রবার দিন এই পবিত্র দোয়াটি কাগজে লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া দিলে ইন্‌শাআল্লাহ গলা শীঘ্র নিরাময় হইবে ; (আমালে কোরআনী)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِيَ اللّٰهُ لِيَ اللّٰهُ هُوَ يُوْكَعُ فِي اللَّوْحِ ○

উচ্চারণ ঃ— বিসমিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহীমি লিয়াআল্লাহু লিয়াআল্লাহ হুয়া ইউকাউ ফিল্‌লাওহি।

অর্থ ঃ— পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে ; আমার জন্য আল্লাহ আছেন, আমার জন্য আল্লাহ আছেন, লৌহ-মাহফুজে (নিজ লিপিতে) সুদৃঢ়।

আল্লাহ আটটি অভ্যাস বড়ই ঘৃণা করেন

১। ধনীর কৃপণতা। ২। দরিদ্রের অহঙ্কার। ৩। রমণীর লজ্জাহীনতা। ৪। বৃদ্ধের ব্যভিচার ও সংসারাসক্তি। ৫। যুবকের অলসতা। ৬। রাজা-বাদশার অত্যাচার। ৭। সাধুর অহঙ্কার। ৮। নামাযীর লোক দেখানো নামায।

৯ প্রকার লোকের দোয়া কবুল হয় ঃ— ১। বাপের দোয়া। ২। মোছাফেরের দোয়া। ৩। মজলুমের দোয়া (অত্যাচারিত ব্যক্তি), যে পর্যন্ত না প্রতিশোধ লওয়া হয়। ৪। হাজীর দোয়া, যে পর্যন্ত না ঘরে ফিরিয়া আসে। ৫। জেহাদকারীর দোয়া, যে পর্যন্ত সে জেহাদ হইতে ক্ষান্ত না হয়। ৬। রোগীর দোয়া, যে পর্যন্ত না আরোগ্য লাভ করে। ৭। সুবিচারক বাদশাহ ও হাকিমের দোয়া। ৮। রোযাদারের ইফতারের সময়ের দোয়া। ৯। এক ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে অন্য ভাইয়ের দোয়া।

স্ত্রীলোকের দোয়া সহজে কবুল হয়, কারণ তাহাদের রিযিক হালাল, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর ভরণপোষণ করা ওয়াজেব। স্বামী যেভাবেই রোজগার করুন, সাধারণতঃ স্ত্রীর পক্ষে তাহা হালাল, রিযিক হালাল না হইলে দোয়া কবুল হয় না।

দোয়া কবুল হওয়ার সময় ঃ— ১। বৃষ্টি পড়ার সময়ের দোয়া, ২। আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া, ৩। শুক্রবারের দোয়া, ৪। তাহাজ্জুদ নামাযের সময়ের দোয়া।

শহীদ

শহীদ ছাড়াও আরও সাত শ্রেণীর লোক শহীদ। ১। যাহারা কলেরা রোগে মারা যায়। ২। যাহারা পানিতে ডুবিয়া মরে। ৩। যাহারা পিঠের বেদনায় মারা যায়। ৪। যাহারা বসন্ত রোগে মারা যায়। ৫। যাহারা আগুনে পুড়িয়া মরে। ৬। যাহারা দেয়াল, ছাদ বা বৃক্ষ চাপা পড়িয়া মারা যায়। ৭। সন্তান প্রসবের সময় যে স্ত্রী মারা যায়।

হাদীসের অমর বাণী

১। পরামর্শ করিয়া কাজ করিবে, ইহাতে মনে বল বৃদ্ধি পায় ও মস্তিষ্ক শক্তিশালী হয়।

২। ছেলের জন্য পিতার দোয়া কখনও বিফলে যায় না।

৩। পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিলে অন্য সব গুনাহ মাফ করেন ; এই অপরাধের জন্য তিনি পৃথিবীতেই ইহার শাস্তি দিয়া থাকেন।

৪। আত্মীয়-স্বজনকে দান করা ও তাহাদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখা আয়ু ও রিযিক বৃদ্ধির সহজ উপায়।

৫। যখন তুমি দরিদ্রকে দেখিতে পাও, তাহাকে তোমার জন্য দোয়া করিতে বল। নিশ্চয়ই তাহাদের দোয়া ফেরেশতাগণের দোয়ার সমতুল্য।

রূহানী জগত

কোন কোন মুক্ত রূহের (আত্মার) ক্ষমতা অসাধারণ, ইহা স্থান ও কালের বেড়ির বহির্ভূত, যখন যেরূপ ইচ্ছা দেহ ধারণ করিতে পারে, মানুষকে উপদেশ দিতে পারে, ভবিষ্যতের খবর দিতে পারে এবং কোন বস্তুও দান করিতে পারে, নিজে অদৃশ্য থাকিয়া অপরের সাহায্য করিতে পারে। ইহা এত সূক্ষ্ম যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ইহাকে বাধা দিতে পারে না, কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের পাল্লায় ইহা ধরা পড়ে না ; কারণ ইহা আল্লাহ্‌র শক্তি, যাহা আদম সন্তানের মধ্যে ফুৎকার করিয়া দিয়াছেন, তাহাছাড়া আর কিছু নয়, সেইজন্য রূহের অস্তিত্ব একই সময় বিভিন্ন স্থানে উপলব্ধি করা যায়। এই শক্তির বলেই হযরত বড়পীর সাহেব (রহঃ) একই সময় তিন শত সাগরিদের বাড়ীতে দাওয়াত রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। একটি রেডিও যন্ত্র হইতে শব্দ উচ্চারিত হওয়া মাত্র পৃথিবীর মানুষের তৈয়ারী লক্ষ লক্ষ রেডিও যন্ত্র একই সময়ে বাজিয়া উঠিতে পারে, তবে মানুষের 'রূহ', যাহা আল্লাহ্‌র খাস শক্তি, তাহা সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া একই সময়ে সর্বত্র উপস্থিত থাকিতে পারিবে না কেন ? এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন ; এই বিপুল রূহানী শক্তি বলেই আঁ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, নামাযের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমি বেহেশ্‌ত ও দোযখ দেখিতে পাইলাম। এই শক্তির বলেই হযরত ইয়াকুব (আঃ) কেনানে বসিয়া হযরত ইউসুফের (আঃ) পিরহানের খোশবু পাইয়াছিলেন। এই শক্তির বলেই মোমেনগণ মৃত্যুকালে হুরগণকে দেখিতে পান।

হযরত আলীর (কার্রাঃ) অমূল্য বাণী

আঁ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন—আমি জ্ঞানের শহর এবং হযরত আলী সেই শহরের দ্বার।

১। আগুনের শেষ, ঋণের শেষ, রোগের শেষ ও শত্রুর শেষ থাকিলে ভবিষ্যতে বিপদ ঘনাইয়া আসিতে পারে।

২। নিম্নলিখিত কারণে রাজ্যের পতন হয় ; (ক) যখন রাজ্যের ক্ষমতা অযোগ্য লোকের হাতে চলিয়া যায় ; (খ) যখন জনসাধারণ নীতিভ্রষ্ট হইয়া আইনকে ফাঁকি দিতে থাকে ; (গ) যোগ্য ব্যক্তিকে শাসনক্ষমতা হইতে সরাইয়া রাখিলে ; (ঘ) শাসকগণ ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিলে ; ঙ) দেশ হইতে সুবিচার চলিয়া গেলে, কারণ সুবিচারে রাজ্য স্থায়ী হয়; সুবিচারকের কোন বন্ধুর পরামর্শের আবশ্যক হয় না ; (এই উপদেশগুলি অফিসে বাঁধাইয়া রাখার যোগ্য)।

হযরত আলীর (কার্রাঃ) অমূল্য উপদেশ

শত্রু নিরুপায় হইলে তাহার প্রতি অধিক অনুগ্রহ করিও না, কারণ সুযোগ পাইলে সে তোমাকে ছাড়িবে না। শত্রুগণ শত্রুতা সাধনে (সমস্ত কৌশল) ব্যর্থ হইলে তাহারা বন্ধুত্বের ভান করে। মনে রাখিও, তোমার শত্রুর শত্রু তোমার বন্ধু, আর তোমার শত্রুর বন্ধু তোমার শত্রু। যে বিপদের সময় নিরপেক্ষ থাকে, তাহাকে কখনও বন্ধু মনে করিও না।

হযরত শেখ সাদীর (রহঃ) উপদেশ

১। বিড়ালকে স্নেহ করিলে কোলে উঠে।

২। বানরকে স্নেহ করিলে মাথায় উঠে।

৩। মিথ্যাবাদীর স্মরণশক্তি অধিক।

৪। পরীক্ষা ভিন্ন কিছু বিশ্বাস করিও না।

৫। স্ত্রীলোককে কখনও বিশ্বাস করিও না।

৬। বল অপেক্ষা কৌশল শ্রেষ্ঠ ও কার্যকরী।

৭। তিন জনের নিকট কখনও গুপ্ত কথা বলিও না —(ক) স্ত্রীলোক, (খ) শত্রু (গ) জ্ঞানহীন মূর্খ।

৮। সকল কাজে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করিও।

৯। না শিখিয়া ওস্তাদি করিও না।

১০। কোন কাজেই নিশ্চিত হইও না।

১১। পথের সম্বল অন্যের হাতে রাখিও না।

১২। ইহ-পরকালে যাহা আবশ্যক তাহা যৌবনে সংগ্রহ করিও।

বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۝

অর্থ ঃ— নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক পাপীকে ভালবাসেন না ; (সূরা নেসা, ১০৭ আয়াত)।

বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপ, পাক কোরআনে বিশ্বাসঘাতক পাপী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) তাঁহার নিকট আমানতী গন্দম বৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল খাইয়া মা 'হাওয়া'সহ বেহেশ্‌ত হইতে বিতাড়িত হইয়া দুনিয়ায় পতিত হন। দুইশত বৎসর বহু কান্নাকাটির পর অবশেষে ১২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত মোনাজাতের ফলে আরাফাতের ময়দানে গুনাহ হইতে মুক্তি লাভ করেন। সুতরাং হযরত আদমের বংশধর হিসাবে মানুষের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ নিহিত রহিয়াছে। বিশ্বাসঘাতকতা মানুষের প্রথম অপরাধ, সেইজন্যই হযরত আলী (কার্রাঃ) মানুষকে ষোল আনা বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

শেরশাহ মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ বাদশাহ ছিলেন ; ন্যায়বিচারে তিনি নওশেরোয়া, সুলতান মাহমুদ ও আওরঙ্গজেবের সমকক্ষ ছিলেন। তিনি কাহারও প্রতি অবিচার করিয়াছেন, ইতিহাসে এমন কোন ঘটনার উল্লেখ নাই।

নিজের পুত্রকেও তিনি অপরাধের জন্য ক্ষমা করেন নাই। তিনি ইসলামের খাঁটি সেবক ছিলেন, শরীয়তের কোন আদেশ লংঘন করেন নাই। তাঁহার এত সদগুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি একবার বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছেন। ১৫৪৩ খৃঃ ফতেহ মালেকা নামক এক ধনী মহিলা নিতান্ত বিপদে পড়িয়া ৩০০ মণ সোনা, বিপুল জওহরাত ও মণি-মুক্তা লইয়া শেরশাহের আশ্রয়প্রার্থী হন। আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া শেরশাহ তাঁহাকে আশ্রয় দেন, কিন্তু পরে সমস্ত সোনা ও ধনরত্ন আত্মসাৎ করিয়া মালেকাকে নামে-মাত্র দুইটি পরগণা দিয়া বিদায় দেন। মালেকা আল্লাহ্‌র নিকট বিচার রাখিয়া চলিয়া যান। ১৫৪৫ খৃঃ শেরশাহ কালিন্দর দুর্গ অবরোধ করেন — দুর্গ জয় হয়, এই সময় হঠাৎ বারুদের স্তূপে আগুন লাগিয়া শেরশাহ শোচনীয়রূপে পুড়িয়া গিয়া শিবিরে নীত হন কিন্তু দুর্গ বিজয়বার্তার পরক্ষণেই তিনি জান্নাতবাসী হন। ২২শে মে তারিখে সাসারামে

তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। বর্তমানে তাঁহার মাজার শরীফ বিহার প্রদেশের একটি জিয়ারতগাহ।

ইতিহাসে এইরূপ বহু নজির রহিয়াছে, বাংলার মীরজাফর কুষ্ঠ রোগে ভুগিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন, তাহার পুত্র মিরন প্রাতঃকালে বিনামেঘে বজ্রপাত হইয়া পুর্ণিয়ার নিকটবর্তী এক পাহাড়ের নিকট মৃত্যুবরণ করেন। নিশ্চিতভাবে প্রতিটি মানুষ বিশ্বাসঘাতকতার ফল ভোগ করিবে।

আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র ভয়

আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র ভয় মানুষের পার্থিব ও রুহানী জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করে। এই বিশ্বাস ও ভয়ই মানুষের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যজ্ঞান সজাগ রাখে।

আল্লাহ্‌র ভয় ও বিশ্বাস না থাকিলে পৃথিবীর সমুদয় সভ্যতা চুরমার হইয়া জগত ধ্বংস হইয়া যাইত। কোরআনের নির্দেশ — আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আশার সহিত আল্লাহ্‌কে আহ্বান কর ; (সূরা আ'রাফ, ২৬ আয়াত)।

১। যবুর কেতাবে লেখা আছে, আল্লাহকে ভয় করাই জ্ঞানের আরম্ভ। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাহার আয়ু বৃদ্ধি করেন।

২। আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় মানুষের স্নায়ুকে শক্তিশালী করে, সেজন্যই ঈমানদারগণ সাহসী হয়, মানুষের প্রতি তাহাদের ভয় কম থাকে। আল্লাহ্‌র ভয় জীবনের উৎস।

সুখী হওয়ার উপায়

আদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত দার্শনিক ও জ্ঞানী আলেমগণ বলিয়াছেন যে, জীবনে সুখী হওয়ার জন্য প্রচুর অর্থ ও উপকরণগত প্রাচুর্যের প্রয়োজন হয় না। উপকরণের এক অংশ বিশেষেই মানুষ সুখী হইতে পারে,— অতিরিক্ত উপকরণ দুর্ভোগ ও অশান্তি বৃদ্ধি করে। এই কয়টি উপকরণই সুখের মূল — অটুট স্বাস্থ্য, নির্ভেজাল যৌনশক্তি, মনোমত স্ত্রী, সন্তোষ, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা, আবশ্যকীয় খাদ্য, আল্লাহ্‌র এবাদত। আয়ারল্যাণ্ডে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সে দেশে যাহারা সরল জীবন যাপন করে ও যাহারা ধার্মিক তাহারাই সুখী।

দ্বাদশ অধ্যায়

(বিবিধ প্রসঙ্গ)

আল্লাহ্‌র অজ্ঞাতে ও তাঁহার ইচ্ছার বাহিরে কিছু হওয়া অসম্ভব

হযরত খিজির আলাইহিচ্ছালাম ও পলাশীর যুদ্ধ

কোন দেশ বা জাতির অধিকাংশ লোক যখন আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া স্বার্থপর, চরিত্রহীন, ইহকালসর্বস্ব ও নাফরমান হইয়া পড়ে এবং গোটা দেশের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়, তখন ধার্মিক ও সৎ লোকের মনোবেদনায় আকাশে বাতাসে কম্পন উপস্থিত হইয়া আল্লাহ্‌র আরশ স্পর্শ করে, তখন আল্লাহ্‌র অদৃশ্য হস্তের পরশ সংহার মূর্তিতে প্রকাশিত হয়। সাধারণ মানুষ ইহার কোন কারণ খুঁজিয়া না পাইলেও আল্লাহওয়ালা মানুষ আল্লাহ্‌র কুদরত বুঝিতে পারেন। আল্লাহ্‌র দেওয়া প্রত্যেকটি মসিবত একটি নেয়ামত।

১৭৫৭ খৃঃ ২১শে জুন তারিখে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ যখন নৌবহর লইয়া ভাগীরথীর উপর দিয়া পলাশী ময়দানে বাঙ্গালার শেষ নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে যাইতেছিল, পথে পলতা নামক স্থানে বিখ্যাত কামেল অলী হযরত শাহ সাহেব হাত উঠাইয়া তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকেন। মুসলমানগণ ইহা দেখিয়া হায় হায় করিতে থাকেন এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শাহ সাহেব উত্তর দেন যে, আমি দোয়া না করিয়া কি করিব ? দেখিলাম হযরত খিজির (আঃ) ক্লাইভের নৌবহরের আগে আগে বিজয় পতাকা ধারণ করিয়া যাইতেছেন।

পলাশীর মাঠে যুদ্ধের সময় কেন বৃষ্টি হইল, নবাবের বারুদ কেন ভিজিয়া গেল, বিপুল সৈন্য ও যুদ্ধসম্ভার থাকা সত্ত্বেও নবাব কেন পরাজিত হইলেন ? ইতিহাসে ইহার গবেষণার অন্ত নাই। নবাব সিরাজউদ্দৌলার জন্য আক্ষেপ ও মীরজাফরকে অভিশাপ দেওয়া ছাড়া এই পরাজয়ের প্রকৃত কারণ কেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে নাই ; (তৌহীদের মর্মবাণী ৬১-৬২ পৃঃ)।

এই যুদ্ধের তিন বৎসর পর ১৭৬১ খৃঃ দুই লক্ষ দুর্ধর্ষ মারহাট্টা সৈন্য তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে আহমদ শাহ আবদালীর ৪০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সম্মুখীন হয়, কয়েক ঘন্টার মধ্যে আছরের নামাযের পূর্বেই মারহাট্টা বাহিনী সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া ভারতে হিন্দুশক্তি চিরতরে ধ্বংস হয়।

সে সময় ভারতের মুসলমানদের অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, দিল্লীর বাদশাহ মারহাট্টাগণের ভয়ে দিন কাটাইতেছিলেন, ইংরেজদের মত প্রবল শক্তির আবির্ভাব না হইলে সমগ্র ভারত হিন্দু শিখগণের করতলগত হওয়া অবধারিত ছিল। অবশেষে তাহারা ইংরেজ শক্তির নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। পলাশীর যুদ্ধ ও পানিপথের যুদ্ধ দুইটি আলাদা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এই দুই যুদ্ধ আল্লাহ্‌র একই পরিকল্পনার পরিণতি, পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজগণ পরাজিত হইলে, পানিপথের যুদ্ধে মারহাট্টাগণ জয়লাভ করিলে ভারতে ইসলামের চিহ্ন থাকিত কিনা সন্দেহ। ইংরেজগণ ভারতে মুসলমানদের বিপুল ক্ষতি করিয়াছে সত্য কিন্তু ইসলামকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করিয়াছে এমন কোন প্রমাণ নাই।

পৃথিবীতে সহস্র প্রকার গরমিল দেখা গেলেও তার মধ্যেই বিরাট মিল রহিয়াছে এবং সেই মিলের রহস্য আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জ্ঞাত নহেন— তাঁহার নিকটই অজ্ঞাত রহস্যের চাবিকাঠি রহিয়াছে। কোরআনে লেখা রহিয়াছে— এমন কোন গাছের পাতা পড়ে না যাহা আল্লাহ অবগত নহেন। মাটির তলায়, নিবিড় আঁধারের বুকে যে শস্যকণা পড়িয়া রহিয়াছে তাহার খবরও তিনি রাখেন। সীমাহীন সাগরের বুকে, দিগন্ত বিস্তৃত বালুকারাশির মধ্যে যাহা আছে ও অনন্ত আকাশের উপর যে অগণিত তারকারাজি রহিয়াছে, তাহার খবরও তিনি রাখেন ; (সূরা আনয়াম, ৫১ আয়াত)।

আল্লাহ্‌র এক নাম জাহের (প্রকাশ্য) ও আর এক নাম বাতেন, অপ্রকাশ্য (গোপনীয়)। তাঁহার করুণা ও কুদরতের (শক্তির) স্ফুরণ বিশ্ব প্রকৃতিতে, মানব সমাজে অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য দুইভাবেই ঘটিয়াছে। তাঁহার রহমত আধা প্রকাশিতভাবে অহরহ কাজ করিয়া যাইতেছে। মানুষ যখন জ্ঞানের অহঙ্কারে আল্লাহ্‌র কুদরতকে নিজের জ্ঞানের আয়ত্তাধীনে ভাবিয়া ব্যাখ্যা করিতে বসে, তখনই গোমরাহীর সৃষ্টি হয় এবং মানুষ অধঃপতিত হয়। মানুষের বুদ্ধি তাকে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আগাইয়া লইয়া যাইতে পারে, সীমার বাহিরে যাওয়ার শক্তি কাহারও নাই। সেজন্যই দেখা যায়, মহাবুদ্ধিমান ব্যক্তিও উন্নতির মধ্যপথে হঠাৎ বুদ্ধির জালে জড়াইয়া ধ্বংস হয়, ইহাই আল্লাহ্‌র কুদরত,

ইহাকে না মানিয়া উপায় নাই। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও পরিকল্পনার বাহিরে কিছু হওয়া অসম্ভব, পলাশীর যুদ্ধ ও তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধও তাঁহার পরিকল্পনার বাহিরে হয় নাই।

হযরত খিজির (আঃ) ঃ— খিজির অর্থ সবুজ বর্ণ। যেখানে তিনি এবাদত করেন সেস্থান সবুজ বর্ণে সুশোভিত হয়, এইজন্যই তিনি খিজির নামে পরিচিত। কথিত আছে, তিনি কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকিবেন। হযরত খিজির (আঃ) হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) দোয়ার বরকতে এলমে লাদুন্নী (ভবিষ্যত সম্বন্ধে জ্ঞান) ও দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছামত অদৃশ্য থাকিয়া মুহূর্তের মধ্যে দূরদূরান্তরে অবাধ বিচরণ করার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ কাজে তিনি আল্লাহ্‌র দূতরূপে কাজ করিয়া থাকেন। হযরত মূসা (আঃ) মহাজ্ঞানী তেজস্বী নবী ছিলেন, আল্লাহ্‌র আদেশে তাঁহাকেও আল্লাহ্‌র কুদরত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার জন্য হযরত খিজিরের নিকট যাইতে হইয়াছিল। কোর্‌আনের সূরা কাহাফে সেই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যবসা বাণিজ্যে ধন বৃদ্ধির কারণ

আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলিয়াছেন যে, মানুষের উপার্জনের দশ ভাগের নয় ভাগ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে রহিয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য তিনি প্রচুর উৎসাহ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সৎ ব্যবসায়ীগণ বেহেশ্‌তে আমার সংগে একত্রে থাকিবেন ; (হাদীস)। ক্রমাগত দরিদ্রতা মানুষকে কাফেরের পর্যায়ে নিয়া যাইতে পারে।

আল্লাহ পাক কোর্‌আনে বলিয়াছেন

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

অর্থ ঃ— যদি তোমরা ঈমানদার মোমেন হও, তবে আল্লাহ্‌র দেওয়া অবশিষ্ট তোমাদের জন্য কল্যাণকর ; (সূরা হূদ, ৮৬ আয়াত)। এই আয়াতটি হযরত শোয়েব নবীর (আঃ) উম্মত সামুদ জাতির স্বভাব উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে। সামুদ জাতির লোকেরা ঠগবাজি করিত। তাহারা ব্যবসা বাণিজ্যে

মাপে ও ওজনে কম দিত এবং লইবার সময় বেশী লইয়া মানুষকে ঠকাইয়া লাভবান হইতে চেষ্টা করিত ; তাহাদের এই জঘন্য অপরাধের জন্য আল্লাহ পাক ভূমিকম্প নাযিল করিয়া সামুদ জাতিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক ব্যবসা বাণিজ্যে লাভকে 'বাকিয়াতুল্লাহ্' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বাকিয়াতুল্লাহ্ অর্থ আল্লাহ্‌র দেওয়া কল্যাণকর অবশিষ্ট। যাহা আল্লাহ্‌র দেওয়া ও কল্যাণকর তাহাতে বরকত (বর্ধন) নিশ্চয়ই রহিয়াছে, আল্লাহ অপর কোন কাজের লাভকে এরূপ বলেন নাই।

ব্যবসা ও ব্যবসালব্ধ ধন-সম্পত্তি স্থায়ী হওয়ার উপায়

১। সৎভাবে ঈমান ঠিক রাখিয়া ব্যবসা কর, ২। যাকাত দেও, নতুবা ব্যবসা স্থায়ী হইবে না ; ইতিমধ্যেই অর্ধেকের বেশী কালোবাজারী সর্বস্বান্ত হইয়া পথে বসিয়াছে। "হালাল ব্যবসা করা এবাদত স্বরূপ" ; (হাদীস)। এই হাদীসটি সর্বদা মনে রাখিবে।

মুসলমানদের অবনতির কারণ

অনেকের বিশ্বাস নামায, রোযা ও আল্লাহ্‌র এবাদত ছাড়িয়া দেওয়ার ফলে মুসলমানগণ দরিদ্রতা ও অবনতির কবলে পড়িয়াছে। যদি তাহাই হইত, তবে যে আমেরিকা দেশে সাধারণতঃ জেনা (ব্যভিচার) পাপকার্য বলিয়া গণ্য হয় না এবং যেখানে আল্লাহ্‌র এবাদতের ছায়া মাত্র অবশিষ্ট নাই এবং যে রাশিয়া দেশে বহু পূর্বেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া আল্লাহ্‌কে উচ্ছেদ করা হইয়াছে, সে আমেরিকা ও রাশিয়া আজ ধনে, বলে ও ঐশ্বর্যের চরম সীমায় পৌছিত না। পার্থিব উন্নতির কারণ অন্যরূপ।

কারণ ঃ—

১। মানব জীবনে দুইটি দায়িত্ব পাক কোর্‌আনে নির্দেশিত হইয়াছে। প্রথমটি হক্কুল্লাহ্ অর্থাৎ মানুষের উপর আল্লাহ্‌র যে সকল দাবী রহিয়াছে তাহা। আল্লাহ্‌র এবাদত করা ও তাঁহার আদেশ পালন করা। আল্লাহ্‌র দাবী (হক) পূরণ করিতে ত্রুটি করিলে ইহার ফল পরকালে ভোগ করিবে, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তাহা ক্ষমা করিয়া দিতে প্যারেন।

২। দ্বিতীয়টি হক্কুল এবাদ অর্থাৎ মানুষের প্রতি মানুষের যে সকল দাবী ও পাওনা রহিয়াছে তাহা। আল্লাহ পাক অপরের দাবী ও পাওনা নষ্ট করাকে জুলুম (অত্যাচার) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি অন্যের দাবী ও পাওনা প্রদান করে না বা নষ্ট করিয়া দেয়, আল্লাহ তাহাদের অপরাধ

ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত অত্যাচারিত বা পাওনাদার ব্যক্তি ক্ষমা না করে। এই জাতীয় অপরাধ বিচারের বিষয়, আল্লাহ্‌র ক্ষমা করার বিষয় নহে। শহীদগণ সকল গোনাহ্ হইতে মুক্তি লাভ করেন, কিন্তু তাহারাও ঋণের দায় হইতে মুক্তি পাইবেন না ; (হাদীস)।

আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচার না থাকিলে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া দুনিয়া অচল হইয়া যাইত, তাঁহার ন্যায়বিচারের উপরই দুনিয়া স্থির রহিয়াছে। হায়াত মউত, রিযিক সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র হাতে রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি ন্যায়বিচারের সহিত যথাস্থানে ইহা বিতরণ করেন, ধন-সম্পদ বিতরণে তাঁহার নিকট কোন জাতিভেদ নাই। তিনি কোরআনে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, যাহারা সৎকাজ করে তাহারা পুরস্কার লাভ করিবে। হাদীস শরীফে মুসলমানের পক্ষে অপর মুসলমানের তিনটি জিনিস হারাম (নিষিদ্ধ) বলিয়া ঘোষিত হইয়ছে—মুসলমানের রক্ত (জীবন), ধন-সম্পত্তি ও সম্মান।

মানুষের পক্ষে অপরের ধন হরণ করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া ক্ষতি করা, খুন, চুরি, ডাকাতি, প্রবঞ্চনা, শঠতা, ঘুষখোরী, কালোবাজারী, অবিচার ইত্যাদি করিয়া অপরের ধন-সম্পত্তি হস্তগত করা কিম্বা নষ্ট করা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। মুসলিম দেশে অহরহ এইসব ব্যাপকভাবে চলিতেছে। আমেরিকা, রাশিয়া ও অন্যান্য দেশে এইসব জঘন্য অপরাধের কার্য কচিৎ সংঘটিত হয় ; ইহাই তাহাদের পার্থিব উন্নতির প্রধান কারণ।

এইরূপ হওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণ

১। মুসলিম জাতির মধ্যে বিরোধী ধারার প্রচুর রক্ত মিশ্রণ হইয়াছে, সমাজে অবাধে রক্ত মিশ্রণ হইতে থাকিলে বিরোধী ধারার রক্ত সর্বক্ষণ সংঘর্ষণ হইয়া পরস্পরের প্রতি সংসক্তি ; আকর্ষণ ও টান (সব জাতির রক্ত পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া একজোটে থাকার শক্তি) নষ্ট হইয়া সহানুভূতি, জাতীয়তাবোধ ও একতা নষ্ট হইয়া যায়। আঁ হযরত (সাঃ) যে 'কুফু' অর্থাৎ সমান শ্রেণী ও জাতিতে বিবাহ করার নির্দেশ দিয়াছিলেন, মুসলমানগণ তাহা নির্বিচারে ভঙ্গ করিয়া রক্ত মিশ্রণ ঘটাইয়াছে।

২। দুনিয়ার সব মুসলিম দেশগুলি গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে অবস্থিত রহিয়াছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্যের তাপের তীব্রতা হেতু সেসব দেশে মানুষের মস্তিষ্ক পরিপক্ক হইবার পূর্বেই দেহ পরিপক্ক হইয়া উঠে, ইহার প্রতিক্রিয়ার ফলে মস্তিষ্ক ও দেহের মধ্যে ভারসাম্য (সামঞ্জস্য) নষ্ট হইয়া মনে চঞ্চলতা ও ধৈর্যহীনতা উপস্থিত হয়, রাতারাতি বড় হওয়ার দুর্দমনীয়

আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, এই প্রবল আঙ্ক্ষার তাড়নায় মানুষ পরের হক নষ্ট করার জন্য অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে।

৩। ধীরস্থিরতা, ধৈর্যশীলতা ও শান্ত মেজাজ শীতপ্রধান এলাকার মানুষের মধ্যে রহিয়াছে। সূর্যের তাপ এক প্রকার উত্তেজক শক্তি। শীতপ্রধান দেশে সূর্য তাপের তীব্রতা না থাকায় সেসব দেশের মানুষের মস্তিষ্ক কম উত্তেজিত হয় এবং মস্তিষ্কের কোষগুলিতে অল্প কম্পন অনুভূত হয়, সেজন্য সেসব দেশের মানুষ বিজ্ঞানের সাধনায় কৃতকার্য হয় বেশী।

অন্যের হক নষ্ট করার দায় (পাপ) হইতে মুক্তি পাওয়ার একটি তদবীর

১। অন্যের হক ও দাবী নষ্ট করা অমার্জনীয় অপরাধ, অত্যাচারিত বা হকদারের নিকট হইতে ক্ষমা না পাওয়া পর্যন্ত এ পাপের দায় হইতে মুক্তি পাওয়া একরূপ অসম্ভব।

২। অত্যাচারিত, প্রতারিত ও বঞ্চিত হকদার ব্যক্তির মৃত্যু হইয়া থাকিলে বা তাহার ঠিকানা জানা না থাকিলে কিছু দান-খয়রাত করিয়া ইহার সওয়াব তাহার নামে বখশিয়া দিবে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের মত ইহা তাহার নামে জমা হইয়া থাকিবে। হাশরের ময়দানে সূক্ষ্ম বিচারের সঙ্কটময় মুহূর্তে এই সওয়াব কোটি কোটি টাকা হইতেও মূল্যবান ও সাহায্যকারী হইবে। হকদার ব্যক্তি ঐ সওয়াব পাইবার জন্য এত লালায়িত হইবে যে, সে তাহার দাবী সন্তুষ্ট চিত্তে মাফ করিয়া দিবে ; এরূপ আশা করা উচিত। ইহা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা নাই।

বিবাহ ও নারীর মর্যাদা

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ ○

অর্থ ঃ— বিবাহ করা আমার সুন্নত, যে আমার সুন্নত ছাড়িয়া দেয়, সে আমার কেহ নয় ; (হাদীস)।

বিবাহের আবশ্যকতা ও গুণ

বিবাহ করা উত্তম এবাদত, মানসিক দুঃখ নিবারক, শান্তিদায়ক ও ধর্মের সহায়ক। হযরত আলী (কার্রাঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ মানুষকে যে সকল সম্পদ দান করিয়াছেন তন্মধ্যে ঈমানের পর সতী স্ত্রী অপেক্ষা আর কিছু নাই। মানুষের মধ্যে এমন কঠিন গোনাহ্ রহিয়াছে, যাহা পরিবার প্রতিপালনের কষ্ট সহ্য করা ব্যতীত অন্য কিছুতেই মাফ হয় না ; (হাদীস)।

বিবাহিত ব্যক্তির এক রাকাত নামায অবিবাহিত ব্যক্তির সত্তর রাকাত নামায হইতে উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, কোন আবেদের এবাদত বিবাহ ব্যতীত পূর্ণ হয় না, বিবাহ ধর্ম সাধনাকে পূর্ণতা দান করে।

আল্লাহ্‌র সাধক আল্লাহ্‌র ধ্যানে কল্পনালোকে আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত ধাওয়া করিয়া হয়রান হইয়া যখন মাটির পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে, প্রেমিক স্ত্রীর প্রেম সিঞ্চিত একটি চুম্বন তাহাকে পুনঃ সাধনা পথে বহাল করার জন্য দেহ-মনে শক্তি ও উদ্যম সঞ্চার করিয়া দিতে পারে। তাই আল্লাহ্‌র রসূল ঠিকভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, যে বিবাহকে অস্বীকার করে সে আমার কেহ নয়।

বিবাহের গুণ

১। বিবাহ দেহ-মন সতেজ করে। ২। বিবাহ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আমোদ-প্রমোদও বটে। ৩। বিবাহিত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি, চাতুর্য ও দক্ষতা অব্যাহত থাকে ও চরিত্র অটুট থাকে। ৪। বিবাহিত লোক প্রথমে চিন্তা করে ও তৎপর বিবেচনার সহিত কাজ করে এবং তাহাদের জীবন দায়িত্বশীল হয়। ৫। যৌন-জীবনকে সুষ্ঠু, স্থিতিশীল ও বিকারহীন রাখার জন্য বিবাহ একটি সুসম্পন্ন জীবনধারা। ৬। বিবাহের পর দেহের ওজন বৃদ্ধি হয় ও মানুষের প্রতি দয়ামায়া বৃদ্ধি হয়। ৭। বিবাহ দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর দেহ প্রচুর বিকাশ লাভ করে। ৮। বিবাহ মানব জীবনকে পরিস্ফুটিত করে। ৯। পুরুষ দেহ ক্ষারধর্মী ও বিদ্যুৎধর্মী এবং নারীদেহ অম্লধর্মী ও চুম্বকধর্মী, এই বিভিন্ন প্রকার দেহের পরস্পর সান্নিধ্যে ও ঘর্ষণে যে রাসায়নিক বৈদ্যুতিক ক্রিয়া চলিতে থাকে, তাহাতে উভয় দেহ উন্নত হয় ও দেহের গন্ধ উন্নত হইয়া বিকাশ লাভ করে। ১০। বিধবাদের দেহ সংকুচিত হয় ও দেহ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ১১। বিবাহিত লোক অবিবাহিত লোকের চেয়ে দীর্ঘায়ু হয়। ১২। স্ত্রী-পুত্র ও পরিবারের জন্য ত্যাগ করিতে করিতে মানুষ অবশেষে আল্লাহ্‌র জন্যও নিজ সুখ ত্যাগ করিতে শিখে, অতএব বিবাহ কল্যাণকর।

"কুফু" মান্য করিয়া বিবাহ করিবে

আঁ হযরত (সাঃ) 'কুফু' মান্য করিয়া বিবাহ করার নির্দেশ দিয়াছেন। কুফু অর্থ সমান আর্থিক, সামাজিক, জাতি ও বংশে বিবাহ করা। জামাতা যেন ঘর জামাই হইতে প্রলুব্ধ না হয়, কিংবা উচ্চ শিক্ষালাভে সাহায্য পাওয়ার আশায় শ্বশুরের অপছন্দ কন্যাকে উদ্ধার না করে। শালা, শ্বশুরের মার্বেল পাথরঘেরা বাড়ী, তাহাদের অর্থ, মূল্যবান গহনা, গৃহসজ্জা, মোটর গাড়ীর গর্ব যাহারা করে

তাহারা আসলে অপছন্দ স্ত্রীকে ভালবাসে না, তাকে খাতির করে ও ভয় করে। এরূপ স্ত্রীগণ প্রায়শঃ দেমাগী হয়, স্ত্রীর দেমাগী ব্যবহারে স্বামীর হীন ও ভীরু মনোভাব সৃষ্টি হইয়া তাহার যৌনশক্তিকে স্তিমিত করিয়া দিতে থাকে। আস্তে আস্তে তাহার যৌনশক্তির সক্রিয়তা নষ্ট হইয়া হ্রাস পাইতে থাকে, এরূপ স্বামী-স্ত্রীর সন্তানগণ প্রতিভাহীন, মিনমিনে স্বভাবের হয়। আমাদের দেশের বেদে সম্প্রদায় তার প্রমাণ, তাদের পুরুষগণ স্ত্রীর রোজগারের উপর নির্ভর করে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুলেও কোন প্রতিভাশালী ও তেজস্বী লোক জন্মে নাই। শিক্ষিত যুবকের চরিত্র ছাড়া গর্ব করার আর কিছুই নাই। সম্প্রতি শিক্ষিত যুবকের এই ভাবধারার পরিবর্তন হইতেছে—লক্ষণ ভাল।

অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের সহিত বিবাহ

অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে স্বামীরূপে বরণ করার মধ্যেও অসুবিধা আছে। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে তাদের অনেকেই বিবাহিত জীবনে ফেল করে বরং যাহারা মাঝামাঝি রকমের ভাল, বেশ চটপটে, পাঁচ জনের সঙ্গে সহজে মিশিতে পারে ; তারা বিবাহিত জীবনে বড় একটা ফেল করে না। পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাওয়া আর বিবাহিত জীবনে সফলতা লাভ করা আলাদা জিনিস। অতএব যেসব মেয়ে উচ্চ শিক্ষিত বা ডিগ্রীধারী স্বামী লাভ করিতে পারে নাই ; তাহাদের পক্ষে আফ্সোস করার কোন কারণ নাই।

কিরূপ স্ত্রী কাম্য

ইংরেজ জন্মনিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মেরী ম্যাকুলে মন্তব্য করিয়াছেন যে, আপনি যদি সুশীলা স্ত্রী চান, তবে উচ্চ শিক্ষিতা মেয়ে বিবাহ করিবেন না। এমন একটি মেয়ে বিবাহ করিবেন যাহার উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ নাই। যে মেয়ে জ্ঞানপিপাসু নহে, সে প্রেমময়ী হইবে। অল্প শিক্ষিত মেয়েদের পক্ষে বিবাহ ও সন্তান কামনা ছাড়া অন্য কোন কামনাই থাকে না, সুতরাং সে বিবাহকে অধিক মর্যাদার চোখে দেখিয়া থাকে ও বিবাহিত জীবনকে স্বাভাবিক জীবন বলিয়া গ্রহণ করে ; উচ্চ শিক্ষার ফলে নারীগণ সমালোচনার মনোবৃত্তি লাভ করে এবং বিবাহিত জীবনকেও সমালোচনার চোখে দেখিয়া থাকে। সাধারণ মনোবৃত্তিসম্পন্ন বালিকার নারীসুলভ সব গুণই থাকে। উচ্চ শিক্ষিতা মেয়েরা সবসময় জাহাঁবাজ হইয়া উঠে ; (লণ্ডন, ২১শে মে, ১৯৫৩ ইং)।

মেয়েদের মগজের ওজন ও পরিমাণ পুরুষের চেয়ে অনেক কম। দীর্ঘ-মেয়াদী পুরুষালী কলেজী শিক্ষার চাপ তাহাদের হালকা মগজে বেশী পড়িয়া তাহাদের দেহে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া নারীত্বের হানি ঘটিতে থাকে ; বিজ্ঞানীগণ ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

সতী নারীর মহিমা

১। পাক কোরআনে আল্লাহ্ পাক সতী নারীর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, যে স্ত্রী ফরয কাজ ঠিক রাখিয়া সতীত্ব বজায় রাখে তাহার পুরস্কার মুক্তি আর বেহেশত।

২। মহাজ্ঞানী নবী হযরত সোলায়মান (আঃ) বলিয়াছেন যে, সতী স্ত্রী মুক্তা হইতেও মূল্যবান ; রূপলাবণ্য মিথ্যা, সৌন্দর্য অসার, কিন্তু যে স্ত্রী আল্লাহকে ভয় করে সে প্রশংসনীয়।

৩। হযরত আবু সোলায়মান দারানী (রাঃ) বলিয়াছেন যে — সতী স্ত্রী এ জগতের জিনিস নয়, পরকালের সৌভাগ্যের উপকরণ।

৪। সতী নারীর দোয়া অতি সহজে কবুল হয়।

অসতী নারী আল্লাহ্র গজব

১। অসতী নারী আল্লাহ্র অভিশাপ ছাড়া আর কিছু নয়।

২। আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন যে, অসতী নারীকে বিবাহ করিও না — সে বৃদ্ধ হইবার পূর্বে তোমাকে বৃদ্ধ করিবে ; অসতী নারীর দেহে বিভিন্ন পুরুষের বিভিন্নধর্মী শুক্র শোষিত হইয়া তীব্র জৈব বিষ (Toxin) সৃষ্টি হয়। এই বিষ স্বামীর দেহে শোষিত হইয়া তাহার দেহকোষ ক্ষয় হইতে থাকে ও দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বার্ধক্যের দিকে আগাইতে থাকে। অসতী নারীর দেহগন্ধ বিকৃত হয়, সূক্ষ্ম গন্ধ অনুভূতিশীল পুরুষগণ দেহগন্ধ দ্বারা সতী অসতী নারী চিনিতে পারে। গৃহে অসতী নারী থাকিলে সংসার অবনতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। জেনা ও আর্থিক সচ্ছলতা একত্রে থাকে না ; (হাদীস)।

নারীর অযত্ন জাতীয় উন্নতির অন্তরায়

দেখা যায়, যে সমাজে নারীর অযত্ন, নিদারুণ পরিশ্রম, চিকিৎসা ও অন্ন বস্ত্রের অভাব, সে সমাজে নারীর সৌন্দর্য তত অল্প ও ততোধিক ক্ষণস্থায়ী। যে সমাজে নারীর হীনতা ও অযত্ন বর্তমান সে সমাজে পুরুষগণ বরং দেখিতে ভাল, কিন্তু রমণীরা এত কদাকার ও কুৎসিত যে, তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না।

সমাজে নারীর স্থান নামিয়া আসিলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই আয়ু কমিয়া আসে, সেজন্যই অসভ্য ও অর্ধ সভ্য জাতির মানুষ স্বল্পায়ু হয়। সমাজে নারীর স্থান নামিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের স্থান আপনা আপনিই নামিয়া আসে, পূর্ব বাংলাতে কোন কোন মুসলিম সমাজে এই অবস্থাটি বর্তমান। জাতীয় স্বার্থ ও অগ্রগতির জন্য নারীগণকে সযত্নে রাখা আবশ্যক।

স্ত্রীকে দান করার ফল

১। স্ত্রীকে দান করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, আয়ু বৃদ্ধি হয় ও যৌবন স্থির থাকে।

২। স্ত্রীকে সঙ্গম সুখে তুষ্ট করা উত্তম সদকা; (হাদীস)।

হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, সঙ্গম সুখ উপভোগের সময় মানুষ যে পুলক আনন্দ উপভোগ করে তাহা বেহেশ্‌তী নমুনা। সঙ্গম সুখে যে অপার্থিব পুলক শিহরণ, মাধুরী, বেগ ও সরলতা রহিয়াছে তাহা দুনিয়ার অন্য কোন সুখ ভোগে নাই।

৩। নারী-দেহে সঙ্গম সুখের আনন্দ অতি গভীর হয়। এই সুখ-আনন্দ উপভোগ করার সময় আল্লাহ্‌র প্রদত্ত এই সুখের শোকরিয়া আদায় করিয়া নিজ স্বামী বা পিতামাতার জন্য যে দোয়া করে তাহা কখনও বিফলে যায় না।

স্ত্রীলোকের দোয়া অতি সহজে কবুল হয়

দিল্লীর বাদশাহ্‌ হুমায়ুনের সহিত শেরশাহের যুদ্ধ চলাকালীন হুমায়ুনের স্ত্রী বেগ বেগমকে বহু মহিলাসহ বন্দী অবস্থায় শেরশাহের নিকট উপস্থিত করা

হয়। শেরশাহ্‌ তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। বেগ বেগম প্রাণ ভরিয়া শেরশাহের জন্য দোয়া করেন। এই দোয়ার বরকতে শেরশাহ্‌ দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

কারণঃ— রিযিক হালাল না হইলে দোয়া কবুল হয় না, স্বামী যেভাবেই রোজগার করুক স্ত্রীর পক্ষে সাধারণতঃ তাহা হালাল।

স্ত্রীর উপর স্বামীর হক (দাবী)

আঁ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি যদি আল্লাহ ছাড়া আর কাহাকেও সেজদা করিতে আদেশ করিতাম তবে স্বামীকে সেজদা করার জন্য স্ত্রীকে আদেশ করিতাম; (আবু দাউদ)। ইহার পর স্বামীর হক সম্বন্ধে আর কিছু বলা বাহুল্য।

স্বামীর উপর স্ত্রীর হক (দাবী)

১। স্বামী স্ত্রীর সমান অনুরাগ ব্যতীত পরিবারের সুখ শান্তি ও জৌলুস বজায় থাকে না।

২। স্বামীর কর্কশ বাক্য, রূঢ় ব্যবহার, অবহেলা, অত্যধিক অপরিচ্ছন্নতা, অহঙ্কার, প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা স্ত্রীর রূপ-যৌবন নষ্ট করিয়া দেয়।

৩। যে স্বামী তাহার স্ত্রীকে হেকারতের (অবজ্ঞার) চক্ষে দেখে, জীবনে তাহার সুখ-শান্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

৪। একাধিক স্ত্রী থাকিলে সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা কোর্‌আনের নির্দেশ।

রাজনৈতিক কারণেও ধর্মীয় শিক্ষা আবশ্যক

স্কুল কলেজে ইসলামী শিক্ষার অভাবে এদেশের মুসলমানদের মধ্যে নৈতিক ও পরকাল সম্বন্ধে সংশয়বাদী মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষের খাদ্যে যেরূপ ভারসাম্য (Balance) থাকা আবশ্যক অর্থাৎ দেহের উন্নতির জন্য সবরকম (খাদ্যপ্রাণ) ভাইটামিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়, তদ্রূপ শিক্ষা ক্ষেত্রেও ভারসাম্য থাকা আবশ্যক। ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে জাতীয় চরিত্রে এককেন্দ্রিকতা নষ্ট হয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ খেয়াল খুশীমত তাহাদের আদর্শ ও চরিত্র গঠন করিতে তৎপর হয়, পরিণামে জাতীয়তা ও জাতীয় একতাবোধ

নষ্ট হইয়া বিভেদ সৃষ্টি হয়। দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায় যে, একই ধর্মাবলম্বী গরিষ্ঠ জনসংখ্যা দ্বারা দেশ শাসিত হয়।

জাতীয়তা ও জাতীয় একতাবোধ বহাল রাখার জন্য আজও বিলাতে শিক্ষার প্রতিটি স্তরে বাইবেল শিক্ষা ও চর্চার ব্যবস্থার রহিয়াছে। আমাদের সরকার বিষয়টি ভাবিয়া দেখিবেন বলিয়া আশা রাখি।

আল্লাহ্‌র উপর ভরসার ফল

হযরত শেখ সাদী (রহঃ) তাঁহার অমর গ্রন্থ গুলিস্তাঁয় একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। বহুদিন আগে ইরানের এক বাদশাহ্‌ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। অনেক চিকিৎসা হইল কিন্তু রোগ আরোগ্য হইল না। অবশেষে শাহী দরবারের প্রধান হেকীম ব্যবস্থা দিলেন যে, একটি বালকের পিত্তকোষ দিয়া ঔষধ তৈয়ার করিয়া খাওয়াইলে বাদশাহ্‌ বাঁচিতে পারেন। কিন্তু সেই বালকের গায়ের ও চুলের রং সোনালী হইতে হইবে ও চক্ষের তারা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইতে হইবে।

বাদশাহ্‌র লোকজন বহু চেষ্টার পর এরূপ একটি বালকের সন্ধান পাইয়া তাহাকে বাদশাহের দরবারে লইয়া আসিল। সে ছিল এক কৃষকের ছেলে। বাদশাহ্‌ তাহার পিতা-মাতাকে টাকা পয়সা দিয়া ছেলেটিকে ক্রয় করিয়া লইলেন। বাদশাহ্‌র প্রধান কাজী ফতোয়া দিলেন যে, বাদশাহ্‌র প্রাণ রক্ষার জন্য একজন প্রজার প্রাণ নাশ করা যাইতে পারে। বাদশাহ্‌ ছেলেটিকে বধ করার জন্য জল্লাদকে হুকুম দিলেন। ছেলেটি আকাশ পানে চাহিয়া রহিল। বাদশাহ্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলে কেন ? ছেলেটি উত্তর দিল, বাপ মা প্রাণের সহিত সন্তানকে স্নেহ মমতা করে, বিচারক সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করে, বাদশাহ্‌ প্রাণপণে প্রজাকে রক্ষা করে, কিন্তু আমার পিতা-মাতা সামান্য টাকার লোভে আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছেন, বিচারক বিনা অপরাধে আমার প্রাণনাশের

ফতোয়া দিয়াছেন এবং স্বয়ং বাদশাহ আমার প্রাণ বধের হুকুম দিয়াছেন। এখন আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ায় আমার আশ্রয়স্থল রহিল না। তাঁহার উপর নির্ভর করিলাম, দেখি তিনি কি করেন। এই বলিয়া হাত উঠাইয়া আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করিল —

"পেশে কেহ্‌ রব আওয়ায জে'দস্তাত ফরিয়াদ্‌
হাম পেশে তু আজ দস্তে তু গার খাহাম দাদ।"

অর্থ ঃ— ইহাই বিধান যদি খোদা তোমার।
তোমার কাছেই চাই তোমার বিচার।

বালকের কথা শুনিয়া বাদশাহ্‌র চক্ষে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন— এই নির্দোষ বালককে বধ করিয়া আমার জীবন রক্ষা করিতে চাই না, আল্লাহ যাহা করেন তাহাই হউক। বাদশাহ্‌ মূল্যবান পোশাক পরাইয়া ও টাকা পয়সা দিয়া বালকটিকে ছাড়িয়া দিলেন। আল্লাহ্‌র রহমতে সেইদিন বিনা চিকিৎসায় বাদশাহ আরোগ্য লাভ করেন ;(সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী)। আওরঙ্গজেবের তাওয়াক্কুল ২৮৫ পৃঃ বর্ণিত হইয়াছে।

বর্তমান যুগের মানুষ ও পরকাল

মানুষ সংশয়বাদী, পরকাল সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দিহান, পরকাল থাকিতেও পারে বা না-ও থাকিতে পারে। যদি না থাকে তবে তো ভাবনার কারণই নাই, আর যদি অবশেষে পরকাল বাহির হইয়া পড়ে তবে দশ জনের যে দশা হইবে আমারও তাহাই হইবে, এত আগে চিন্তা করিয়া বর্তমান সুখ মাটি করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না— এরূপ ভাব।

আল্লাহ পাক কোর্‌আনে বলিয়াছেন, তোমরা সন্দেহের সহিত বিশ্বাস করিয়া থাক। মানুষের দুইটি স্বভাব ও আল্লাহ্‌র একটি গুণ হইতে এই ভাবের উদ্ভব হইয়াছে।

১। মানুষকে চঞ্চল প্রকৃতি দিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে ; (সূরা মাআরেজ, ১৯ আয়াত)। এই স্বভাবের জন্য মানুষ এক বিষয়ে অনেকক্ষণ স্থির ও আকৃষ্ট থাকিতে পারে না। আল্লাহ্‌র কুদরতের চাক্ষুষ নিদর্শন সূর্য ও চন্দ্র মানুষের

১। গোপন দান আল্লাহ্র গজব প্রতিরোধ করে ও অপমৃত্যু রোধ করে। পরকালে গোপনে দাতা আল্লাহ্র আরশের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করিবে ;(সূরা বাকারা, ২৭১ আয়াত)।

২। প্রকাশ্য দানে ধন ও সম্মান বৃদ্ধি হয়।

৩। অনাত্মীয় ও গরীবকে দান করিলে ধন বৃদ্ধি হয়।

৪। আত্মীয়কে দান করা ঈমানের অংশ এবং ইহাতে ধন ও আয়ু বৃদ্ধি হয়।

৫। মুছাফিরকে দান করিলে মুস্কিল আছান হয়। (মুছাফিরগণ আল্লাহ্র আশ্রিত)।

৬। ঋণগ্রস্তকে দান করিলে সচ্ছলতা লাভ হয়।

৭। পিতামাতাকে দান করিলে সমধিক মর্যাদা লাভ হয় ও মনের বহু আশা পূর্ণ হয়।

৮। গরীব বিধবাকে দান করিলে আল্লাহ্র বিশেষ রহমত লাভ হয় এবং এমন মর্যাদা লাভ হয় যাহা কখনও কল্পনা করা যায় না ; (গরীব বিধবা এতিমের পর্যায়ভুক্ত)। জীবনে কোন সঙ্কট উপস্থিত হয় না।

৯। যে নারী লজ্জাবশতঃ দানপ্রার্থী হয় না তাহাকে দান করিলে সঙ্কট উদ্ধার হয়, (লজ্জা রক্ষার ফল)।

১০। সর্বোৎকৃষ্ট দান গরীব আত্মীয় এতিমকে দান করা।

১১। বিদ্যা শিক্ষার্থীকে দান করা অতি উত্তম, ইহাতে দীন দুনিয়ার বিশেষ মঙ্গল হয়।

কাজের নিয়ম

১। যখন পার্থিব কাজে লিপ্ত হইবে তখন মনে করিবে কেয়ামত পর্যন্ত তোমার মৃত্যু নাই, আর যখন আখেরাতের কাজে লিপ্ত হইবে তখন মনে করিবে হযরত আজরাঈল (আঃ) তোমার পিছনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

২। বিলম্বে ও ধীরচিত্তে কাজ করা আল্লাহ্র স্বভাব, কারণ তিনি হালীম অর্থাৎ ধৈর্যশীল, ধীরস্থির ও অচঞ্চল। নেক চালচলন, কাজে ধীরতা ও সকল অবস্থায় মধ্যপথ অবলম্বন করা নবুয়তের $\frac{১}{২৪}$ ভাগ । অভিজ্ঞতা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাড়াতাড়ি কাজ করিলে বিশৃংখলা উপস্থিত হয় ও কাজে সফলতা লাভ হয় না। তাড়াতাড়ি করা শয়তানের স্বভাব।

৩। পাঁচটি কাজ তাড়াতাড়ি করা সুন্নত। (৫৬ পৃঃ দ্রঃ)

নবীগণের জন্ম তারিখ ও আয়ু

হযরত আদম (আঃ) হইতে মুহাম্মদের (সাঃ) হিজরত পর্যন্ত নবীগণের জন্ম, তারিখ। মুসলিম ঐতিহাসিক তাবারী ইব্নে খলদুন হইতে গৃহীত ও তওরাত দ্বারা সমর্থিত।

হবুতি সন ঃ— হযরত আদমের (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণের বৎসরকে হবুতি সন বলা হয়।

১। হযরত আদমের (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ হবুতি — ১লা সন

২। হযরত শীস (আঃ) এর জন্ম হবুতি — ১৩০ সন

৩। হযরত নূহ্ (আঃ) এর জন্ম হবুতি — ১০৫৬ সন

৪। হযরত সাম (আঃ) এর জন্ম হবুতি — ১৫৫৬ সন

তাঁহার নাম হইতে শাম (সিরিয়া) নামকরণ হইয়াছে।

৫। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জন্ম হবুতি — ১৯৮৭ সন

৬। হযরত ইসহাক (আঃ) এর জন্ম হবুতি — ২০৮৭ সন

৭। হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর জন্ম হবুতি — ২১৪৭ সন

তাঁহার পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

৮। হযরত মূসা (আঃ) এর জন্ম হবুতি — ২৪১২ সন

৯। হযরত দাউদ (আঃ) এর জন্ম হবুতি — ৩১০৯ সন

১০। হযরত সোলাইমান (আঃ) এর জন্ম হবুতি — ৩১৪৯ সন

১১। হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম হবুতি — ৪০০৪ সন

হিব্রু বাইবেল অনুসারে হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) হিজরত পর্যন্ত ৫৯৯২ বৎসর গণনা করা হয় ও পারসিকদের মতে ৪১৮০ বৎসর গণনা করা হয়।

নবীগণের আয়ু

হযরত আদম (আঃ)	৯৩০ বৎসর	হযরত আইউব (আঃ)	১৪০ বৎসর
হযরত শীস (আঃ)	৯১২ বৎসর	হযরত মূসা (আঃ)	১২০ বৎসর
হযরত নূহ্ (আঃ)	১৪০০ বৎসর	হযরত ইউশা (আঃ)	১১০ বৎসর
হযরত হূদ (আঃ)	৪৬৪ বৎসর	হযরত দাউদ (আঃ)	৭০ বৎসর
হযরত ইব্রাহীম (আঃ)	১৩৫ বৎসর	হযরত ঈসা (আঃ)	৩৩ বৎসর
হযরত ইয়াকুব (আঃ)	১৪৭ বৎসর	হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)	৬৩ বৎসর
হযরত ইউসুফ (আঃ)	১০০ বৎসর		

হযরত নূহ্ (আঃ) নবীর সময় জেনার বিশেষ প্রসার হইয়াছিল, সেই পাপে মানুষের আয়ু কমাইয়া মোটামুটিভাবে ১২০ বৎসর ধার্য হয় ; (তওরাত, সূরা আদি পুস্তক, ৬ রুকু, ১ — ৩ আয়াত)।

হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর সহিত নবীগণের সাক্ষাৎ

দুনিয়াতে হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর সহিত হযরত আদমের (আঃ) ১২ বার, হযরত ইদ্রিসের (আঃ) ৪ বার, হযরত নূহের (আঃ) ৪৫ বার, হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) ৪২ বার, হযরত মূসার (আঃ) ৪০০, হযরত ঈসার (আঃ) ১০ বার ও হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) ২৪০০০ বার সাক্ষাৎ হয়। এত বেশী দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার জন্যই তিনি এত বেশী হাদীস রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন।

এমন বহু নবী ছিলেন যাঁহাদের সঙ্গে হযরত জিব্রাইলের (আঃ) কোন সময় সাক্ষাৎ হয় নাই — তাঁহারা আল্লাহ্র নিকট হইতে এলহাম প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহাদিগকে এলহামী নবী বলা হয় ; (তফসীরে সেরাজুম মুনীর, ছায়িফুল আকলাম নবুয়তে আদম, ৫ম পৃঃ)।

পবিত্র হাদীস শরীফের অব্যর্থ নির্দেশ

১। আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা বিপদ দূর করে ; (ছগির)।

২। আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা পাইতে তাঁহার এবাদত অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী আর কিছুই নাই; (তিরমিজী)।

৩। দরিদ্র ব্যক্তি মানুষের নিকট হেয়, কিন্তু আল্লাহ্র নিকট সম্মানিত। দরিদ্রগণ ধনীর ৫ শত বৎসর পূর্বে বেহেশ্তে দাখিল হইবে। হযরত সোলাইমান (আঃ) তাঁহার বিরাট বাদশাহী ও বিপুল ধনসম্পদের জন্য সকল নবীগণের পরে বেহেশ্তে দাখিল হইবেন।

৪। স্ত্রী ও সন্তানগণকে ভরণ-পোষণ করা ও স্নেহ মমতা করা ইবাদতের মূল্যবান অংশ ; (মেশকাত)। অনেক গোনাহ্ শুধু পরিবার প্রতিপালনের কষ্ট সহ্য করার জন্য মাফ হয়।

৫। বার্ধক্যের সঙ্গে দুইটি বস্তুর প্রতি লোভ বৃদ্ধি হয়— একটি অর্থ ও অপরটি দীর্ঘ জীবন ; (তিরমিযী)।

৬। যে ধনী বিখ্যাত হইবার জন্য দান করে, সে প্রথমে দোযখে প্রবেশ করিবে ; (মুসলিম ও তিরমিযী)।

৭। যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তাহার প্রতি দয়া করেন না ; (তিরমিযী ও শামখান)।

৮। মধ্যবর্তী ব্যবস্থাই সকল কাজে উত্তম।

৯। জেনা (ব্যভিচার) মূর্তি পূজার তুল্য, ইহা দারিদ্র্য আনয়ন করে, চেহারার জ্যোতি ঃ নষ্ট করে ও আয়ু কমাইয়া দেয়। একটি মাত্র জেনা ৬০ বৎসরের এবাদত নষ্ট করিয়া দেয়। শেরেক ও জেনা হইতে গর্হিত পাপ আর নাই। জেনা ও সচ্ছলতা একত্রে থাকিতে পারে না।

১০। এমন সময় আসিবে যখন মানুষ হালাল হারামের মধ্যে কোন বিচার করিবে না ; (সম্ভবতঃ ইহা বর্তমান সময়)।

১১। অতিরিক্ত ভোজন দুর্ভাগ্যজনক ; (বায়হাকী)।

১২। এমন সময় আসিবে যখন ইসলামের নাম ব্যতীত আর কিছু থাকিবে না।

১৩। দারিদ্র্য মোমেনের জন্য পুরস্কার ।

১৪। লজ্জা ঈমানের অংশ। বিপদে ধৈর্যধারণ করা এবাদত। (বুখারী, নাসাঈ)

১৫। আল্লাহ্র কুদরত সম্বন্ধে এক ঘন্টা চিন্তা করা ৭০ বৎসর এবাদত হইতে উত্তম।

১৬। দানে ধন কমে না।

১৭। একজন খাঁটি মুসলমান কা'বা হইতেও সম্মানিত ; (ইবনে মাজা)।

১৮। কাহারও উপর অত্যাচার করা হইলে সে যদি সহ্য করিয়া চুপ থাকিতে পারে, আল্লাহ তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দেন। (বহু পরীক্ষিত)

১৯। সদাচার, শিষ্টতা ও মিতব্যয় নবুয়তের ১/৫ ভাগ।

২০। হালাল জীবিকা উপার্জন করা ফরয ।

২১। শিষ্টাচার আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভের উপায়।

২২। যে ব্যক্তি জীবিকা বৃদ্ধি করিতে চায় ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করে। যে আত্মীয়-স্বজনের জন্য দানের দরজা খুলিয়া দেয়, আল্লাহ তাহাকে বহু গুণে বৃদ্ধি করেন।

২৩। নিরপেক্ষ লোকের দোয়া কবুল হয়।

মহাজ্ঞানী হযরত সোলাইমান নবীর (আঃ) অমূল্য উপদেশ

হযরত সোলাইমান (আঃ) নবী হযরত দাউদ (আঃ) এর পুত্র বনী-ইসরাইলগণের বাদশাহ ছিলেন। তিনি হযরত আদম (আঃ) এর পৃথিবীতে অবতরণের ৩১৪৯ বৎসর পর জন্মগ্রহণ করেন, সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞানের জন্য বাল্যকাল হইতেই জগদ্‌বিখ্যাত খ্যাতি লাভ করেন। জেরুজালেমের বিখ্যাত মসজিদ তাঁহার জীবনের অমর কীর্তি। তিনি যে সকল উপদেশবাণী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আজিও পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে মূল্যবান উপদেশবাণী বলিয়া গৃহীত হইতেছে। নীচে তাহার কয়েকটি উপদেশ বর্ণিত হইল ঃ—

১। অকারণে কাহারও সহিত বিবাদ করিও না, বিবাদ বৃদ্ধির পূর্বে তাহা বন্ধ কর।

২। প্রতিবেশীর সহিত বিবাদ মিটাইয়া লও, তাড়াতাড়ি বিবাদ করিতে যাইও না।

৩। যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর স্ত্রীর কাছে গমন করে, সে অদণ্ডিত থাকিবে না, সে আঘাত ও অপমান পাইবে, তাহার দুর্নাম ঘুচিবে না।

৪। স্ত্রীলোকের জ্ঞান ও বুদ্ধি তাহার গৃহে ; (বাহিরে আসিলে বুদ্ধি লোপ পায়)।

৫। যে ক্রোধে ধীর সে বুদ্ধিমান, হঠাৎ ক্রোধী অজ্ঞান।

৬। যে দরিদ্রকে উপহাস করে সে আল্লাহ্‌কে ঠাট্টা করে।

৭। যে উপকার পাইয়া অপকার করে, অপকার তাহার বাড়ী ছাড়িবে না।

৮। বরং নির্জনে বাস করা ভাল, তবুও ঝগড়াটে ও কোপন স্বভাব স্ত্রীর সহিত বাস করা ভাল নয়।

৯। নিজের ধন বৃদ্ধির জন্য যে দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার করে, আর যে ধনীকে দান করে, উভয়ের অভাব ঘটে।

১০। সীমানার পুরান চিহ্ন (খুঁটি) যাহা পূর্বপুরুষগণ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সরাইও না।

১১। এতিমের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিও না। যে দরিদ্রকে দান করে, তাহার অভাব ঘটে না।

১২। সৎলোক ৭ বার বিপদে পড়িলেও আবার উঠে ; কিন্তু দুষ্ট লোক বিপদে পড়িলে একবারেই নিপাত হয়।

১৩। যে অপরের জন্যে কুয়া করে সে নিজেই উহাতে পড়িবে।

১৪। যাহার অনেক বন্ধু আছে তাহার সর্বনাশ হয় ; (নানা প্রকার পরামর্শ দেওয়ার জন্য)।

১৫। আল্লাহ্‌র প্রতিটি কথা পরীক্ষাসিদ্ধ, ইহার উপর নির্ভর করার জন্য তিনি ঢালস্বরূপ।

১৬। কোমল উক্তি ক্রোধ নিবারণ করে, কিন্তু কটু বাক্য ক্রোধ উত্তেজিত করে।

১৭। দরিদ্র লোক অনুনয়-বিনয় করে, কিন্তু ধনবান কঠিন উত্তর দেয়।

১৮। মিথ্যা সাক্ষী অদণ্ডিত থাকিবে না। মিথ্যুক রক্ষা পাইবে না।

১৯। নিজ মিত্র ও পিতার মিত্রকে ত্যাগ করিও না।

২০। বিশ্বাসঘাতকের প্রাণ দৌরাত্ম্য ভোগ করে।

২১। প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কুসঙ্কল্প করিও না।

ঘুষখোর ও কালোবাজারীর পরিণাম ঃ— ঘুষ লওয়া ও কালোবাজারী করা জঘন্য অপরাধ ; (কবীরা গোনাহ)। ইহার পরিণাম মারাত্মকরূপে প্রকাশিত হয়।

ভয়াবহ পরিণতি ঃ— ১। ঘুষখোর ও কালোবাজারীর জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি থাকিবে না, পরকালে তাহাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করা সুনিশ্চিত। তাহারা কঠিন মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুবরণ করে ও শেষ বয়সে চরম অভাব, দুর্দশা, লাঞ্ছনা ভোগ করে, ইতিমধ্যেই অর্ধেকের বেশী কালোবাজারী সর্বস্বান্ত হইয়া পথে বসিয়া গিয়াছে।

২। তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণ দুর্ভাগা, নিদারুণ অভাব ও চরম দুর্গতি ভোগ করা ইহাদের ভাগ্যলিপি।

বিচারক ও ঘুষখোরী ঃ— ১। হাকীমগণকে জিল্লুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ছায়া বলা হয়, হাকীমগণের উপর আল্লাহ ছাড়া আর কেহ নাই ; সুতরাং ঘুষখোর হাকীমগণের জন্য পরকালে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নির্দিষ্ট রহিয়াছে। তাহাদের এইরূপ অপরাধ অমার্জনীয়, নিশ্চিতভাবে জাহান্নামে তাহাদের স্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে। তাহাদের নেক আমল, নেক কাজ ইহা রোধ করিতে পারিবে না, ইহা কোন কাজেই আসিবে না ও হিসাবে ধরা হইবে না।

২। ধরা পড়ার ভয় ও পাপের অনুশোচনা অহরহ তাহাদের অবচেতন মনে অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া করিতে থাকে, ফলে তাহাদের জীবনীশক্তি নষ্ট হইয়া যৌন-শক্তি ও আয়ু হ্রাস পাইতে পারে। শেষ বয়সে অভাব-অনটন বিপদাপদ ও ঝঞ্ঝাটের ভিতর দিয়া অমানুষিক মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দুনিয়া হইতে বিদায় নিতে হয়। তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণের দুর্দশার অবধি থাকে না ; (বহু পরীক্ষিত)।

সুবিচারক হাকীমের মর্যাদা ঃ— নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচারকগণকে ভালবাসেন ; (সূরা হুজুরাত, ৯ আয়াত)। সুবিচারক হাকীমগণ আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানিত ব্যক্তি, আল্লাহ্ নিজে একজন মহাবিচারক এবং তাঁহার এক নামও হাকীম ; (ইয়া হাকীমু)। ন্যায়বিচারক হাকীমগণের দোয়া কবুল হয় ; (হাদীস) এবং আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে বিপদ ও অপমান হইতে রক্ষা করেন।

ইংরেজ আমলে বিপ্লবী যুগেও কোন হাকীমকে কেহ তাহার এজলাসের উপর আহত বা নিহত করিতে পারে নাই। হাশরের সঙ্কটময় মুহূর্তে ন্যায়বিচারক বাদশাহ্ ও হাকীমগণ আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করিবে ; (হাদীস)।

কোন দেশের জনসাধারণ যখন দুর্নীতিপরায়ণ ও অসৎ হইয়া পড়ে, তখন তাহাদিগকে সাজা দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ পাক অত্যাচারিত বাদশাহ্, প্রেসিডেন্ট, সর্দার, দুর্নীতিপরায়ণ ও অযোগ্য সরকারী কর্মচারী ও ঘুষখোর হাকীমগণকে বহাল করিয়া থাকেন।

দুনিয়ার বিখ্যাত অলী-আল্লাহ্‌গণের অকাট্য বাণী

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) ঃ— তিনি আঁ হযরতের (সাঃ) দৌহিত্র ছিলেন, তিনি ইসলাম জগতের ৬ষ্ঠ ইমাম ও কোর্‌আনের গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি পাঁচ প্রকার লোকের সহিত সংস্রব রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন।

১। **মিথ্যাবাদী** — তাহার নিকট হইতে কেবল প্রবঞ্চনা পাইবে, সে তাহার মিথ্যা কথা দ্বারা তোমার দূরবর্তীকে নিকটবর্তী করিবে ও নিকটবর্তীকে দূরবর্তী করিবে।

২। **নির্বোধ মূর্খ** — তুমি তাহার নিকট হইতে কোন উপকার পাইবে না, সে তোমার উপকার করিতে যাইয়া নির্বুদ্ধিতাবশতঃ তোমার অপকার করিবে।

৩। **ভীরু** — সে বিপদের সময় তোমাকে শত্রুর হাতে ছাড়িয়া দিবে।

৪। **কৃপণ** — তোমার দরকারের সময় সে তোমাকে ত্যাগ করিবে।

৫। **গোনাহগার ফাসেক** — সে সুযোগ পাইলে এক লোকমা বা অল্প মূল্যে তোমাকে বিক্রয় করিবে।

হযরত ইদ্রিস (রহঃ) — আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারও উপর আশা না করা ও অপর কাহাকেও ভয় না করাই প্রকৃত তাওয়াক্কুল।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) — ১। সংসারের প্রতি একবিন্দু অনাসক্তি সহস্র বৎসরের নামায রোযা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ২। বিষয়ী লোক তিনটি বিষয়ে আক্ষেপ করিয়া দুনিয়া ত্যাগ করে — (ক) ইন্দ্রিয় সম্ভোগে তৃপ্ত হয় নাই। (খ) সব আশা পূর্ণ হয় নাই। (গ) খালি হাতে দুনিয়া ত্যাগ করিতেছে।

হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) — ১। বিপদকে সম্পদ মনে করা সন্তোষ। ২। দুশ্চরিত্র আলেম অপেক্ষা সৎ স্বভাববিশিষ্ট ফাসেকের বন্ধুত্ব আমার অধিক প্রিয়।

হযরত ইয়াহইয়া (রহঃ) — তওবা করার পর একটি গোনাহ করা তওবা করার পূর্বে ৭০টি অপেক্ষা গুরুতর।

হযরত সর্‌রি সক্‌তি (রহঃ) — যে মনে অহঙ্কার থাকে, সে মনে আল্লাহ্‌র ভয় ও আশা থাকে না।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) — চার শ্রেণীর লোক আল্লাহ্‌র অধিক প্রিয় — ১। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত আলেম। ২। তত্ত্বজ্ঞানী সুফী। ৩। বিনয়ী ধনী ও ৪। কৃতজ্ঞ দরিদ্র।

হযরত আবু হাফেজ মক্কী (রহঃ) — নির্মল আনন্দ এ সংসারে সৃষ্টি হয় নাই।

হযরত আবু মুহাম্মদ রমিম (রহঃ) — মনের আনন্দে আল্লাহ্‌র আদেশকে অভ্যর্থনা করাই আল্লাহ্‌র প্রকৃত বাধ্যতা।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) — সমস্ত দুনিয়া একখণ্ড রুটির জন্য বিক্রয় হইলে আমি তাহা ক্রয় করিব না। পরকালের জন্য ইহকাল ত্যাগ করা খুব কঠিন কাজ নয়, সংসারবিরাগীর জন্য ধন কিছু নয়।

হযরত আবু সোলায়মান (রহঃ) — দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের সহিত বন্ধুত্ব করিও না। ১। এমন ব্যক্তি যে তোমার সাংসারিক ব্যাপারে সাহায্যকারী হইবে। ২। যে তোমার আখেরাতের কাজে সাহায্যকারী হইবে, এ ছাড়া অন্যের সহিত বন্ধুত্ব করা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।

হযরত ফোযায়ল আয়ায (রহঃ) — যে সৎকাজ মানুষকে অহঙ্কারী করে তাহা অপেক্ষা যে পাপ আল্লাহ্র জন্য ব্যাকুল করে তাহা শ্রেষ্ঠ। (তিনি প্রথম জীবনে ডাকাতের সরদার ছিলেন, পরবর্তীকালে এবাদত বলে বিশিষ্ট অলী আল্লাহ্র মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন)।

আল্লাহ

আল্লাহ্র জাত সেফাত

আল্লাহ অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী, সারা বিশ্ব তাঁহার আংশিক শক্তির প্রকাশ। তিনি একটি বিশ্বের স্রষ্টা নহেন, অগণিত বিশ্বের স্রষ্টা তিনি। কোটি কোটি বিশ্ব সৃষ্টি হইলেও তাঁহার শক্তির কিছু মাত্র হ্রাস পাইবে না। আল্লাহ্র জাত (স্বরূপ) জ্বিন, মানুষ ও ফেরেশ্তার জ্ঞানের বহির্ভূত, তাঁহার স্বরূপ অসীম ও চিন্তার বাহিরে। মানুষের মধ্যে তাঁহার সেফাতের (গুণ ও শক্তি) আংশিক প্রকাশিত, তাই মানুষ দয়ালু ও শক্তিশালী হয়, কিন্তু দয়াময়, শক্তিময় হইতে পারে না। মানুষ আল্লাহ্র সেফাতের খলিফা হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার জাতের খলিফা (প্রতিনিধি) হইতে পারে না।

সসীম মানুষ নিরাকার বস্তুকে চিন্তা করিতে পারে না। আল্লাহ্র জাত সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণা এত সংকীর্ণ ও ভ্রান্ত যে, আমরা বলি, তিনি নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু মনে ভাবি, তিনি একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ, আকাশের উপর সিংহাসনে রহিয়াছেন। মানুষ সাকার ; স্থান ও সময়ের অতীত কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না ; তাই আমরা নামাযের মধ্যে আল্লাহ্কে চিন্তা করিবার সময় আকার দিয়া থাকি, এরূপ চিন্তাধারা শেরেকি। (সৃষ্টিতত্ত্ব — আহসানউল্লাহ)।

আল্লাহ অনন্ত ও অসীম ঃ— আল্লাহ অসীম ; সসীম বিশ্বে তাঁহার স্থান সমাবেশ হইতে পারে না। তিনি বিশ্বের ভিতরেও আছেন বাহিরেও আছেন। আল্লাহ্র সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা মানুষের অসাধ্য। তাঁহার অনন্ত জ্ঞান দেখিয়া হয়রান হইয়া যাওয়াই সিদ্দিকগণের দরজা। আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) শেষ পর্যন্ত এই বলিয়া বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন যে—মা আরাফনাকা হাক্বা মা'রেফাতেকা'। অর্থাৎ— "হে আল্লাহ! তোমাকে যেরূপ চিনা উচিত ছিল, সেরূপ চিনিতে পারি নাই।" তিনি আল্লাহ্র জাত সম্বন্ধে চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা মানুষের অসাধ্য।

আত্মত্যাগের চরম দৃষ্টান্ত

হযরত মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) 'আনাল হক'

সুফী জগতে হযরত মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) এক বিস্ময়কর চরিত্র। হিজরী ২৪১ সনে (৮৫৮ খৃঃ) পারস্য দেশের তূর নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ৪৬ খানা দুরূহ কিতাব রচনা করেন, জীবনে ৪০ বৎসর শিক্ষা ও এবাদত-বন্দেগীতে মশ্গুল থাকার পর আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন হন। তিনি সুফী মতবাদের বহুল প্রচার করেন, বহু লোক তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্থানীয় রাজপুরুষগণ তাঁহার মা'জেযা দেখিয়া তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকেন। ৩০৯ সনে জিন্দানখানার মাঝখানে প্রকাশ্য ময়দানে মনসুরকে প্রথম অমানুষিক বেত্রাঘাত করা হয়, পরে একটি একটি করিয়া তাঁহার হাত পা কাটিয়া ফেলা হয়, অবশেষে সন্ধ্যার সময় ফাঁসির কাষ্ঠে ফেলিয়া দেহ থেকে মাথাটি বিচ্ছিন্ন করা হয়।

আট মাস সাতদিন জেলখানায় বন্দীজীবন অতিবাহিত করার পর এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে তাঁহাকে বধ্ করা হয়। যখন তাঁহাকে বধ্য-ভূমিতে লইয়া যাওয়া হয় তখন তিনি ফাঁসির কাষ্ঠ দেখিয়া আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করেন ঃ "হে আল্লাহ পাক! আমাকে কতল করার জন্য তোমার যে সকল বান্দা আজ জড় হয়েছে, তোমার তৌহীদের মহিমা বৃদ্ধি করিতে এবং সেই সঙ্গে তোমার দয়া লাভ করিতে, তুমি তাদের দয়া কর, তাদের ক্ষমা কর। তুমি আমার নিকট যা প্রকাশ করেছ (তোমার গুপ্ত রহস্য) তা' যদি তাদের নিকট প্রকাশ করতে, তাহলে তারা আজ যা করছে তা কখনো করত না, আর যা' তাদের নিকট গোপন করেছ (তোমার গুপ্ত রহস্য) তা' যদি আমার নিকট গোপন রাখতে তাহলে আজ আমার এই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হত না। তুমি যা খুশী কর তাতেই তোমার গৌরব।"

সুফীরা বলেন, তিনি ইলাহী-রহস্য সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই তাঁহার অপরাধ। এত আবেগ, এত ঘনিষ্ঠ ও নম্র হইয়া তিনি প্রিয়তম আল্লাহ্র সঙ্গে মিলন কামনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে একাত্মবোধের দাবী জানাইয়াছিলেন যে, "তোমার আমার মাঝখানে আমি আছির

বিষম বাধা, দয়া করে দূর করে দাও— মোদের মাঝে আমি আছির বাধা” এরূপ উক্তি কখনও তৌহীদ বিরোধী দ্বারা সম্ভব নহে। মনসুর আল্লাহ্‌র পথে অনেক ক্লেশ ও যাতনা পাইয়া নিহত হন। তাঁহার ক্রিয়াকলাপ ও জীবনের আশ্চর্য ঘটনা সকল অদ্ভুত ছিল, তিনি অতিশয় অনুরাগী ও ব্যাকুল চিত্ত পুরুষ ছিলেন, আল্লাহ্‌র বিচ্ছেদে তিনি সর্বদা অস্থির থাকিতেন। মনসুর পরিশুদ্ধ প্রেমিক সাধক ছিলেন, সমস্ত জীবন দুঃখ কষ্ট ও বিপদে কাটাইয়া গিয়াছেন। সুফী সফিক শিবলী ও আবুল কাসেম তাঁহাকে মান্য করিতেন। মনসুর অস্থির চিত্তে "আনাল হক" (আমি খোদা) বলিতেন। তাঁহার এই উক্তির মর্ম (রহস্য) বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে কাফের ভাবিয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়া বধ করা হয়। তিনি নিজ 'হাস্তির' (অস্তিত্বের) জ্ঞান আল্লাহ্‌র অনন্ত হাস্তির মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন।

বাহিরের অবস্থানুসারে শরীয়তের বিচার হয়, অন্তর আল্লাহ জানেন ; এই মর্মে বাগদাদের বিখ্যাত আলেম ও সুফী হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) ফতোয়া দিয়াছিলেন, এই ফতোয়ার উপর মনসুরকে বধ্ করা হয়। সহিষ্ণুতার বিষয় প্রশ্ন করা হইলে মনসুর বলেন যে, হস্ত পদ ছেদন করিয়া শূলে চড়াইলে আক্ষেপ না করাই সহিষ্ণুতা ; জগতে আর কোন অলী এইরূপ উক্তি করেন নাই। মোশরেক বা কাফের কখনও এরূপ উক্তি করিতে পারে না।

যিনি আল্লাহ্‌র সাধনার ক্ষেত্রে চিত্তশুদ্ধি ও সংযম-বলে জীবনের সমস্ত কামনা বাসনা নির্বাসিত করিয়া আল্লাহ্‌র ভাবে তন্ময় (ফানা-ফিল্লাহ) হইতে পারেন, তৎসম্বন্ধে একটি হাদীস। হাদীসটি হযরত বড়পীর সাহেবের (কুদ্দেসা সেররুহু) মারেফাতের অদ্বিতীয় কিতাব ফুতুহুল গায়েব (পরলোক বিজয়) হইতে উদ্ধৃত হইল। হাদীসটি এই—'মোমেন বান্দা যখন রিয়াযাত ও নফল এবাদত দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অনুসন্ধান করেন, আল্লাহ তাহাকে ভালবাসেন এবং তাঁহাকে প্রীতিভাজন করিয়া লন, তখন আল্লাহ তাঁহার দর্শন শক্তি হইয়া যায়, তাঁহার শ্রবণ শক্তি হইয়া যায় এবং তাঁহার হস্তপদ হইয়া যায়।" এই অবস্থাটি সাধকের সম্পূর্ণ তন্ময়ের (ফানা-ফিল্লাহ) অবস্থা। মনসুর এ অবস্থায় পৌঁছিয়াই 'আনাল হক' (আমি খোদা) বলিতেন।

হযরত বড়পীর সাহেব (কুঃ সেঃ) ফুতুহুল গায়েবের একস্থানে সাধনার রুহানী উচ্চস্তরের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক সাধনার উন্নত অবস্থায় সাধকের হাতে সৃষ্টির ক্ষমতা পর্যন্ত দিয়া থাকেন। তিনি নিজের জীবনেও এরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনি মৃতকে জীবিত করিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহার জীবনচরিতে উল্লেখ আছে। হযরত ঈসাকে (আঃ) যে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা কোর্আনে বর্ণিত রহিয়াছে ; (সূরা আলে এমরান, ৪৯ আয়াত)।

শরীয়ত ও মারেফাত (আল্লাহ্‌র পরিচয় জ্ঞান)

শরীয়ত ও মারেফাত আলাদা নয়, শরীয়তে পাকা-পোক্ত হইলেই মরেফাতে (আল্লাহ সম্বন্ধে সর্বোচ্চ জ্ঞানে) পৌঁছা যায় । যাহারা মনে করে পীর ফকীরগণ শরীয়ত ছাড়াই মারেফাতে পৌঁছাইয়া দিতে পারে, তাহারা মূর্খ। মারেফাত দান করার জিনিস নয়, শরীয়তের অনুশীলনসহ কঠোর সাধনা, রিয়াযত ও এবাদত দ্বারা অর্জন করিতে হয়। শরীয়তের মর্যাদা রক্ষার জন্যই মনসুর হাল্লাজের মত এত বড় আল্লাহ প্রেমিককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইয়াছে । ইসলামের মূল আইনের নামই শরীয়ত, ইহাকে রক্ষা না করিলে ইসলামের অস্তিত্ব থাকিবে না। শরীয়ত হালকা জিনিস নয়।

দুই রূপে আনাল হক

(অলীরূপে ও কাফেররূপে "আনাল হক")

বা-খোদ বে-খোদের প্রভেদ শোন ভাই।
একই 'আনাল হক' বলি ফেরাউন কাফের, আর মনসুর হাল্লাজ অলী।
বা-খোদ ফেরাউন সাগরে ডুবিতে মরণ ভয়ে ডাকে।
ওগো মূসা নবী আনিব ঈমান তরায়ে লওগো আমারে
মরার আগেই খোদাই দাবীতে দিল জলাঞ্জলী।
বে-খোদ মনসুর সহিল শাস্তি সহিল কত নিন্দা ;
কতল হওয়ার পরেও তাঁহার দাবীটি রহিল জিন্দা ;
তপ্ত রক্তের ফোঁটায় উঠে "আনাল হক" জাগি ;
স্বয়ং খোদা বলেন, "আনাল হক" মনসুরের জবানে ;
গায়কের গান ফুটে যথা রেডিওর তানে ;
বাজিল মনসুর বাজাল খোদা বুঝে নেও সকলে।

মাওলানা দেওয়ান বাহরুল উলুম (করিমপুর)

বা-খোদ = আত্মম্ভরী, অহংভাব! বে-খোদ = আত্মভোলা।

পাঞ্জ সূরা

কোর্‌আনের মাহাত্ম্য ও কোর্‌আন তেলাওয়াতের ফযীলত

(শেষ খণ্ড)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ০

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ ০

অর্থ ঃ

"এই সে কোর্‌আন — রাখিতাম যদি পাহাড়ের পরে
নিশ্চয় দেখিতে তুমি খোদারই যে ডরে
ধ'সে যেত অধোগতি 'ঐ সে পাযাণ'
টুটে যেত হয়ে খান খান।"

(সূরা হাশর, ২১ আয়াত) (কোর্‌আন কণিকা)

দুনিয়ার সৃষ্টি অবধি যুগে যুগে পয়গম্বরগণের উপর ১০৪ খানা কিতাব নাযিল হইয়াছে। হযরত আদম সফিউল্লাহ্‌র (আঃ) উপর ১০ খানা, হযরত শীসের (আঃ) উপর ৫০ খানা, হযরত ইদ্রিসের (আঃ) উপর ৩০ খানা ও হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্‌র (আঃ) উপর ১০ খানা কিতাব নাযিল হইয়াছে। এই একশত কিতাব ছহিফা নামে অভিহিত হয়। অবশিষ্ট চারিখানা কিতাবের মধ্যে তৌরাত কিতাব হযরত মূসা কালিমুল্লাহ্‌র (আঃ) প্রতি, যাবুর হযরত দাউদ খলীফাতুল্লাহ্‌র (আঃ) প্রতি, ইঞ্জীল (বাইরেল নতুন পুস্তক) হযরত ঈসা রুহুল্লাহ্‌র (আঃ) প্রতি নাযিল হইয়াছে। আল্লাহ্‌র সর্বশেষ বাণী কোরআন মজীদ ফোরক্বানে হামীদ আকায়ে নামদার সরদারে দোজাহাঁ, ছাইয়্যিদুল মুরছালিন, শাফিউল উম্মত, খাতামুন্নাবিঈন হযরত মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) প্রতি দীর্ঘ ২৩ বৎসরে মক্কায়

মোয়াজ্জমা ও মদীনায়ে মোনাওয়ারাতে নাযিল হইয়াছে। তৌরাত ব্যতীত সমস্ত কিতাবই আল্লাহ্‌র বিশ্বাসী সম্মানিত দূত রুহুল আমীন, রসূলে করীম, ফেরেশতা শ্রেষ্ঠ হযরত জিব্রাইলের (আঃ) মারফত নাযিল হইয়াছে। জবরজদ পাথরে লিখিত তৌরাত কিতাব হযরত মূসা কালিমুল্লাহ্‌র (আঃ) উপর তুর পর্বতে প্রত্যক্ষভাবে নাযিল হয় ; (মজমুয়ায়ে বিস্তে কেরাত)। অবশিষ্ট ১ লক্ষ বা ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৯ শত ৯২ জন পয়গম্বরের উপর কোন কিতাব নাযিল হয় নাই, আবশ্যকতানুসারে তাঁহাদের উপর সময় সময় ওহী নাযিল হইয়াছে। তাঁহাদিগকে এলহামী নবী বলা হয়। তাঁহাদের সঙ্গে হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর কোন সময় সাক্ষাৎ হয় নাই। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আঁ হযরতের (সাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে ২৪ হাজার বার পৃথিবীতে আসেন এবং অন্যান্য নবীগণের সহিত তাঁহার মাত্র ৭০০ বার সাক্ষাৎ হয়।

সাহাবাগণের (রাঃ) পর ইউসুফের পুত্র হাজ্জাজের রাজত্বকালে পড়ার সুবিধার জন্যে আলেমগণের সাহায্যে সর্বপ্রথম কোর্‌আনের হরকত (জের, জবর, পেশ ইত্যাদি) বসান হয়। পাক কোর্‌আন মজীদ আরবী ভাষায় লিখিতভাবে লওহে মাহফুযে সুরক্ষিত রহিয়াছে — তাহাই মূল কোর্‌আন (উম্মুল কিতাব) বলিয়া আল্লাহ্ পাক কোর্‌আনে উল্লেখ করিয়াছেন ; (সূরা রা'দ, ৩৯ আয়াত)।

কোর্‌আন মজীদের আরও ৩১টি প্রসিদ্ধ নাম রহিয়াছে, তাহা কোর্‌আনে উল্লেখ হইয়াছে। যথা ঃ ১। আলফোরক্বান (সত্য, মিথ্যা ও অন্যায় প্রভেদকারী)। ২। আযযিকর (আল্লাহ্‌র স্মরণ)। ৩। আল-মাওয়েজা (উপদেশ)। ৪। আলহুকম (রায়, আদেশ)। ৫। আল-হিকমা (জ্ঞান, বিজ্ঞান)। ৬। আশশিফা (আরোগ্য)। ৭। আলহুদা (সত্যপথ প্রদর্শক)। ৮। আত-তাঞ্জিল (আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ)। ৯। আর্-রাহমান (আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ)। ১০। আররূহ(আল্লাহ্‌র সঞ্জীবনী শক্তিযুক্ত)। ১১। আল-খায়ের (মঙ্গল, কল্যাণ)। ১২। আল-বয়ান (সমস্ত বিষয় বর্ণনাকারী)। ১৩। আন্‌ন্যা'মা (সম্পদ, কল্যাণ)। ১৪। আল-বুরহান (পরিষ্কার যুক্তি)। ১৫। আল-ক্বাইউম (সুপ্রতিষ্ঠিত)। ১৬। আল-মোহাইমিন (পূর্ববর্তী প্রত্যাদেশের সংরক্ষক)। ১৭। আন্‌নূর (জ্যোতিঃ)। ১৮। আল-হাক্ক (সত্য)। ১৯। হাবলিল্লাহ (আল্লাহ্‌র রজ্জু-দ্বীন ইসলাম)। ২০। আল-মুবিন (প্রকাশকারী কিতাব)। ২১। আল-করীম (মহাসম্মানিত)। ২২। আল-মজীদ (মহিমান্বিত)। ২৩। আল-হাকীম (বিজ্ঞানময়)। ২৪। আরাবিয়া (আরবী কোর্‌আন)। ২৫। আল

আজীজ (শক্তিশালী)। ২৬। আলমোকার্‌রামা (সম্মানিত)। ২৭। আল মারফুয়া (সমুন্নত)। ২৮। আল-মোতাহ্‌হারা (পবিত্র)। ২৯। আল-মোছাদ্দিক (পূর্ববর্তী প্রত্যাদেশসমূহের সমর্থনকারী)। পাক কোর্‌আনের এক নাম 'রূহ' অর্থাৎ সঞ্জীবনী শক্তিপূর্ণ ওহী (প্রত্যাদেশ) বলিয়া পাক কোর্‌আনে উল্লেখ হইয়াছে ; (সূরা শুরা, ৫২ আয়াত)। ইহাই প্রমাণ করে যে, কোর্‌আন তেলাওয়াত করিলে ইহা পরকালের অশেষ কল্যাণ সাধন করে।

অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার মহাবিজ্ঞানময় আল্লাহ তায়ালার পাক কালাম কোর্‌আন মজীদ পাঠ করিয়া ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর একান্ত কর্তব্য। ইহ-পরকালের যাবতীয় বিষয় এই গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে। কোর্‌আন সর্বজ্ঞানময় পূর্ণাঙ্গ মহাগ্রন্থ, জগতে ইহার তুলনা নাই। আমাদের হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন — যে গৃহে কোর্‌আন পড়া হয়, সে গৃহের লোক সকল অবস্থায় সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে কাল যাপন করিবে, সে গৃহে ফেরেশ্‌তাগণ যাতায়াত করিবে, সেখান হইতে শয়তান পলায়ন করিবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে —

(১) مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَرْفًا فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ○

অর্থ ঃ— ১। যে ব্যক্তি কোর্‌আন মজীদের একটি অক্ষর পড়িবে, সে দশটি নেকী লাভ করিবে। যেমন الٓمٓ = আলিফ্-লাম মিম = তিনটি অক্ষর।

(২) خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ○

অর্থঃ— ২। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোর্‌আন শরীফ শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দিয়া থাকে, সে উত্তম ব্যক্তি।

(৩) اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ ○ اِقْرَؤُا الْقُرْآنَ فَاِنَّهُ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهِ ○

অর্থ ঃ— ৩। নফল এবাদতের মধ্যে কোর্‌আন তেলাওয়াতই অধিক পুণ্যজনক। তোমরা কোর্‌আন শরীফ পড় ; নিশ্চয় ইহা পাঠকের জন্য কেয়ামতের দিন শাফায়াতকারী হইবে।

প্রত্যহ সকালবেলা কোর্‌আন পাঠ করা উত্তম, কেননা প্রভাতের কোর্‌আন পাঠ সাক্ষীস্বরূপ হইবে ; (সূরা বনী ইসরাঈল, ৭৮ আয়াত)। অর্থ বুঝিয়া শুদ্ধরূপে কোর্‌আন পাঠ করা উচিত। প্রত্যেক শব্দের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা আবশ্যক।

অধিক পাঠ করা অপেক্ষা অর্থ সহকারে একই শব্দ কিম্বা আয়াত পুনঃ পুনঃ পাঠ করা অধিকতর ফলপ্রদ, ইহাতে আয়াতের অর্থ মনের ভাবকে পরিবর্তন করিতে পারে, না বুঝিলে নেকী হাসিল হয় বটে কিন্তু ইহাতে মনের উপর বিশেষ তাসির হয় না। কোর্‌আন মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করে, এইজন্যই কোর্‌আনকে 'হেদায়েত' বলা হয় এবং ইহা মানুষের শরীর ও অন্তঃকরণের ব্যাধি আরোগ্য করে, সেজন্য কোর্‌আনের অন্য নাম 'শিফা' অর্থাৎ রোগ আরোগ্যকারী। পাক কোর্‌আনে লিখিত আয়াতে 'শিফা' এইরূপ ফযীলতের প্রমাণ। সর্বদা কোর্‌আন পড়িলে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয় এবং মন পবিত্র ও আলোকিত হয়। পাক সাফ কাপড় পরিয়া অযুর সহিত কোর্‌আন পড়িবে, কারণ আল্লাহ তায়ালা পাক কোর্‌আনে বলিয়াছেন যে, পবিত্র ব্যক্তিগণই কোর্‌আন স্পর্শ করিবে; (সূরা ওয়াক্বেয়াহ্, ৭৯ আয়াত)।

খাসিয়ত ঃ— বে-অযু বা নাপাক শরীরে কোর্‌আন স্পর্শ করিলে সাংসারিক কাজে অশান্তি ও বিশৃংখলা উপস্থিত হয়, অভাব-অনটন লাগিয়া থাকে। আল্লাহ পাক কোর্‌আনে বলিয়াছেন যে, তিনি নিজ আদেশে কোর্‌আনে রূহ (সঞ্জীবনী শক্তি) জড়িত করিয়া দিয়াছেন ; (সূরা শুরা, ৫২ আয়াত)। তাই এই শক্তিকে অবজ্ঞা করিলে অবজ্ঞাকারীর অকল্যাণ হয় ; (সাবধান, ইহা পরীক্ষিত সত্য)।

পাঞ্জ সূরার ফযীলত

সূরা ইয়াসীন, সূরা মুল্‌ক, সূরা আর্‌-রাহমান, সূরা ওয়াক্বেয়াহ্, সূরা মুয্‌যাম্মিল এই পাঁচটি সূরাকে "পাঞ্জ সূরা" বলা হয়। অনেকেই এই পবিত্র সূরাগুলি পড়িয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের অনেকেই ইহাদের ফযীলত সম্বন্ধে অবগত নহেন। সকলের অবগতির জন্য প্রত্যেকটি সূরার অর্থ, ফযীলত ও খাসিয়ত (বৈশিষ্ট্য) স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ফজরের নামাযের পর সূরা ইয়াসীন, মাগরেবের পর সূরা ওয়াক্বেয়াহ্ ও এশার পর সূরা মুলক পড়িলে বিশেষ নেকীর অধিকারী হওয়া যায়। যোহর ও আছরের পর সূরা আর্‌-রাহমান ও সূরা মুয্‌যাম্মিল পড়া যাইতে পারে।

يٰسٓ-সূরা ইয়াসীন

শানে নুযূল ঃ— মক্কাবাসীগণ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে উপহাস করিয়া বলিত যে, আবদুল মোত্তালেবের পৌত্র এতীম নিরক্ষর হইয়া কিরূপে নবুয়তী দাবী করিতে পারে ? তাহাদের এই উপহাসের উত্তরে আল্লাহ তায়ালা এই সূরা নাযিল করেন। আল্লাহ তায়ালা এই সূরা দ্বারা কাফেরগণের অলীক কূট-তর্কের

প্রতিবাদ করিয়া হযরতের (সাঃ) নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। হাদীস শরীফে এই সূরা قَلْبُ الْقُرْآنِ (ক্বালবুল কোরআন) অর্থাৎ কোর্‌আনের দিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কোর্‌আনের অন্যতম প্রসিদ্ধ কল্যাণকর সূরা।

এই সূরায় আল্লাহ তায়ালার তৌহীদ, অদ্বিতীয় শক্তি মহিমা, পাক কোরআনের পবিত্রতা ও গৌরব, হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুয়ত ও ইসলামের সত্যতা ও মূর্তি পূজার অসারতা, কেয়ামতের দিন পুনরুত্থান ও ইহ-পরকালের বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত থাকায় ইহাকে বিশেষরূপে গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবান্বিত করিয়াছে। প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে এই সকল বিষয়ের উপর ঈমান স্থাপন করা ফরয। এই বিষয়ের প্রচার ও সমর্থনই কোর্‌আনের উদ্দেশ্য। এই সকল বিষয়ের সমাবেশ থাকায় এই সূরা বিশেষ ফযীলত লাভ করিয়াছে।

ফযীলত

১। হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন যে, এই সূরা একবার পড়িলে ১০ বার কোর্‌আন খতম করার নেকী হয় ও পাঠকের সকল গুনাহ মাফ হয় ; (তিরমিযী, দারেমী)। সম্পূর্ণ কোরআন পড়িলে কিরূপ নেকী লাভ হইবে তাহা আল্লাহ পাকই জানেন।

২। আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও ইমাম মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি পবিত্র হাদীস শরীফ-সমূহে বর্ণিত আছে যে, রাত্রিতে সূরা ইয়াসীন পড়িলে সকাল বেলা নিষ্পাপ অবস্থায় ঘুম হইতে উঠা যায় ও পূর্ব গুনাহ মাফ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি এই সূরা পড়িয়া থাকে, কেয়ামতের দিন ইহা তাহার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট শাফায়াত করিবে।

৩। মুসলিম জগতের বুযুর্গ ব্যক্তিগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, বিপদাপদ ও রোগ ব্যাধির সময় এই সূরা পড়িলে ইহার কল্যাণে মুক্তি লাভ হয়। কথিত আছে, যে স্থানে এই সূরা পড়া হয় সে স্থান হইতে বিপদাপদ দূর হয়।

৪। মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট এই সূরা পড়িলে মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘব হয় ও কবরের নিকট এই সূরা পড়িলে কবর আযাব রহিত হইয়া যায়।

৫। মনের মকছুদ পূর্ণ হওয়ার জন্য এই সূরা পড়িলে মকছুদ পূর্ণ হয়। রোগ ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির গলায় এই সূরা লিখিয়া তাবিজ করিয়া বাঁধিয়া দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

৬। দারেমী ও মারফু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, সূর্যোদয়কালে যে সর্বদা এই সূরা পড়িবে তাহার যে কোন অভাব থাকুক না কেন তাহা দূর হইবে ও সে অতিসত্বর ধনবান ও ঐশ্বর্যশালী হইবে। সকাল সন্ধ্যায় এই সূরা পড়িলে সমস্ত দিবারাত্রি শান্তিতে থাকা যায়।

৭। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে সূরা ইয়াসীন পড়িবে, তাহার জন্য বেহেশ্‌তের ৮টি দরজা খোলা থাকিবে।

৮। কোন বাসনা সম্মুখে থাকিলে এই সূরা এই নিয়মে ৭ বার কিংবা ১১ বার কিংবা ৪১ বার পড়িবে ঃ—

يٰسٓ ۚ – (১ আয়াত) ৭ বার করিয়া।

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ (৩ আয়াত) ১৬ বার করিয়া।

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ۝ (৫৮ আয়াত) ১৬ বার করিয়া।

৯। হযরত হারেস বিন্ আকমাহ (রাঃ) মারফু হাদীসে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ভয়প্রাপ্ত ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পড়িলে ভয় দূর হয়, পীড়িত ব্যক্তি পড়িতে থাকিলে আরোগ্য লাভ করে ও ক্ষুধার্ত ব্যক্তি পড়িলে আহারের সংস্থান হয়।

১০। হযরত ইব্‌নুল কলবী বলিয়াছেন যে, এক অত্যাচারিত ব্যক্তি কোন একজন কামেল আলেমের নিকট উপস্থিত হইয়া ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাহাকে বলিয়া দেন যে, তুমি ঘর হইতে বাহির হওয়ার সময় সূরা ইয়াসীন পড়িয়া বাহির হইও। সেই ব্যক্তি এই আমলের বরকতে মৃত্যু পর্যন্ত অত্যাচারীর হাত হইতে নিরাপদ ছিল।

১১। পাগল ও জ্বিনগ্রস্ত রোগীর উপর এই সূরা পড়িয়া ফুঁক দিলে আরোগ্য লাভ করিবে।

১২। এই সূরার আমল দ্বারা মনের বাসনা সফল করিতে হইলে সোব্‌হে সাদেকের সময় উঠিয়া ফজরের সুন্নত নামায আদায় করিবে। তৎপর কেবলামুখী হইয়া ১১ বার দরূদ শরীফ পড়িয়া সূরা ইয়াসীন পড়িতে আরম্ভ করিবে। প্রত্যেক 'মুবীনে' যাইয়া পুনরায় প্রথম হইতে পড়িতে আরম্ভ করিবে। এইরূপে ৭ মুবীন শেষ করিয়া সূরা শেষ করিবে ও পুনরায় ১১ বার দরূদ শরীফ পড়িয়া ফজরের ফরয নামায আদায় করিয়া সেজদায় যাইয়া নিজের বাসনা সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র নিকট আরজ করিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ৪০ দিন পর্যন্ত এইভাবে আমল করিলে মনের বাসনা পূর্ণ হয়।

১৩। এই সূরা লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে জ্বিন, ভূত, প্রেত ও রোগ হইতে নিরাপদ থাকা যায়। ইহা তিনবার পড়িয়া রোগীর উপর ফুঁক দিলে রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।

১৪। সূরা ইয়াসীন শরীফের নিম্নলিখিত আমল দ্বারা মানুষের যে কোন অভাব, বাসনা থাকুক না কেন তাহা পূরণ হয় ও আমলকারীর দোয়া কবুল হয়। যথা ঃ

সূরা ইয়াসীনের মধ্যে ৪ স্থানে "আর্-রাহমান" শব্দ ও ৩ স্থানে "আল্লাহ" শব্দ রহিয়াছে। এইরূপ সূরা মুলকেও রহিয়াছে। সূরা ইয়াসীন পড়ার সময় যখন 'আর-রাহমান' শব্দের নিকট আসিবে তখন ডান হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি বন্ধ করিবে এবং যখন "আল্লাহ" শব্দের নিকট আসিবে তখন বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি বন্ধ করিবে। সূরার শেষ পর্যন্ত পৌছিলে ডান হাতের ৪টি ও বাম হাতের ৩টি অঙ্গুলি বন্ধ হইয়া যাইবে। তৎপর সূরা মুলক্ পড়িতে আরম্ভ করিবে ও যখন "আর্-রাহমান" শব্দের নিকট আসিবে, তখন ডান হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি খুলিয়া দিবে। যখন "আল্লাহ" শব্দের নিকট আসিবে তখন বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি খুলিয়া দিবে। এইরূপ সূরা শেষ হইলে ডান হাতের ৪টি ও বাম হাতের ৩টি অঙ্গুলি খুলিয়া যাইবে। এই আমল ৪০ দিন করিলে ইন্‌শাআল্লাহ মনের বাসনা পূর্ণ হইবে।

১৫। দীন-দুনিয়ার বহু ব্যাপারে ও নানা প্রকার প্রয়োজনীয় কার্যে সূরা ইয়াসীন পড়িলো অতি আশ্চর্যরূপ ফল ও অশেষ কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই সূরার ফযীলত সম্পূর্ণ বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। (তঃ হক্কানী)।

মক্কায় অবতীর্ণ	يٰسٓ—সূরা ইয়াসীন	৫ রুকু, ৮৩ আয়াত

২২-২৩ পারা, ১ রুকু—হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুয়তের সত্যতা সম্বন্ধে কোর্‌আনের সাক্ষ্য

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

১। ইয়াসীন (হে মহামানব!) يٰسٓ ۚ

ইয়াসীনঃ- এই শব্দটি হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি নাম বলিয়া অনেকে ধারণা করেন। ইহার অর্থ— হে মহামানব! কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ব্যতীত কেহ জ্ঞাত নহেন। এই শব্দের নামানুসারে এই সূরার নাম হইয়াছে। এই শব্দটি কবরস্থানে যাইয়া ৫ বার পড়িলে ৪০ দিন পর্যন্ত কবরস্থানে আযাবে কবর রহিত থাকে। যে রাত্রে বা দিনে ইহা পড়িবে সে রাত্রে বা দিনে মৃত্যু হইলে গোসলের সময় ফেরেশ্‌তাগণ হাযির থাকিবে ও কবর পর্যন্ত যাইয়া মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করিবে।

২। এই মহাবিজ্ঞানময় কোর্‌আন সাক্ষী (হে মুহাম্মদ!) ৩। নিশ্চয় তুমি রসূলগণের মধ্যে একজন। ৪। সরল সুপথের উপর রহিয়াছ। ৫। যাহা (কোর্‌আন) মহাপরাক্রান্ত দয়াশীল (আল্লাহ্) নাযিল করিয়াছেন। ৬। যেন তুমি সেই সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন কর যাহাদের পূর্বপুরুষগণকে ভয় প্রদর্শন করা হয় নাই, অতএব তাহারা অজ্ঞ ও অমনোযোগী রহিয়াছে। ৭। নিশ্চয় তাহাদের অধিকাংশের উপর সেই বাক্য সত্যে পরিণত হইয়াছে ; কারণ তাহারা ঈমান আনে নাই।

২— وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ o
٣— اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ o
٤— عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ط
٥— تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ط
٦— لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ o ٧— لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ o

৮। নিশ্চয় আমি তাহাদের স্কন্ধের উপর (অহঙ্কারের) শিকল স্থাপন করিয়াছি। তারপর উহা তাহাদের গলদেশ পর্যন্ত বেষ্টন করিয়াছি। ৯। এবং আমি তাহাদের সম্মুখে একটি ও পশ্চাতে একটি প্রাচীর(প্রতিবন্ধক) স্থাপন করিয়াছি ; তৎপর আমি তাহাদের উপর (অবিশ্বাস) ও (অহঙ্কারের) এরূপ পর্দা ফেলিয়া

٨— اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ o ٩— وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ o

২। يٰسٓ ج وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ আয়াত দুইটি লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে সকলের নিকট ভালবাসা লাভ করা যায়, শত্রুর মাথা নত হয় ও বিপদ হইতে নিরাপদ থাকা যায়। ইহা লিখিয়া রোগীর গলায় দিলে রোগী আরোগ্য লাভ করে।

৫-৬। এই দুইটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা অবিশ্বাসী কাফেরগণকে আযাবের ভয় দেখান হইয়াছে।

দিয়াছি যাহাতে তাহারা দেখিতে না পায় ১০। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে নসীহত কর, আর না কর, তাহাদের নিকট সমান, তাহারা ঈমান আনিবে না। ১১। তুমি কেবল তাহাদিগকে নসীহত করিবে, যাহারা নসীহত (উপদেশ) মানিয়া চলে ও অদৃশ্য দয়াময়কে গায়েবানা ভয় করে ; অতএব, তুমি তাহাদিগকেই মুক্তি ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান কর। ১২। নিশ্চয় আমি মৃতকে জীবিত করি এবং তাহারা পূর্বে (জীবদ্দশায়) যাহা কিছু করিয়াছে ও তাহাদের পদাঙ্কসমূহ(আমলসমূহ) লিখিয়া রাখি এবং আমি প্রত্যেক বিষয়ই সমুজ্জ্বল ফলকে (লওহে-মাহফুযে) সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছি।

١٠— وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ o ١١— اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ج فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ o ١٢— اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ط وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ o

২য় রুকু, অবাধ্য গ্রামবাসীগণের প্রসঙ্গে

১৩। [হে মুহাম্মদ (সাঃ)!] পূর্বে গ্রামবাসীগণের নিকট যে সকল রসূল আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের আগমনবার্তা তাহাদিগকে শুনাইয়া দাও।

١٣— وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ م اِذْ جَآءَهَا

৭-১১। এই আয়াতগুলিতে অবিশ্বাসী কাফেরগণের স্বভাবের বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহারা অহঙ্কার ও অজ্ঞতার শিকলে আবদ্ধ রহিয়াছে, সেজন্য তাহারা সত্য ধর্মের সন্ধান পায় নাই। হেদায়েত তাহাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। যাহারা বিশ্বাসী তাহারা রসূলগণের উপদেশ শুনিয়াই আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান স্থাপন করে।

১৩-১৫। প্রাচীন তফসীরকারগণ এই জনপদকে এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত আন্তাকিয়া নগরী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার অধিবাসীগণ যুপিটার দেবীর

১৪। যখন আমি তাহাদের নিকট দুই জনকে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা উভয়কে অবিশ্বাস করিয়াছিল, তৎপর আমি তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা (পূর্ববর্তী) দুই জনের প্রচারিত সত্যকে সমর্থন করাইয়াছিলাম, যখন তাঁহারা সকলে বলিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় আমরা রসূলরূপে তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। ১৫। তাহারা বলিয়াছিল, তোমরা আমাদের ন্যায় মানুষ ভিন্ন আর কিছু নও এবং দয়াময় (আল্লাহ) কোন বিষয়ই নাযিল করেন নাই, তোমরা মিথ্যাবাদী ব্যতীত আর কিছু নও। ১৬। তাহারা বলিয়াছিল, আমাদের প্রতিপালক অবগত আছেন যে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত রসূল। ১৭। প্রকাশ্য সত্য প্রচার ভিন্ন আমাদের উপর অন্য কোন কর্তব্য নাই। ১৮। তাহারা বলিয়াছিল, নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি মন্দ ধারণা করিতেছি, যদি তোমরা (প্রচারকার্য হইতে) ক্ষান্ত না হও, নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে প্রস্তরা-

الْمُرْسَلُوْنَ ۝ ١٤— اِذْ اَرْسَلْنَآ
اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا
بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ
مُّرْسَلُوْنَ ۝ ١٥— قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ
اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا لا وَمَآ اَنْزَلَ
الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ لا اِنْ اَنْتُمْ
اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ۝ ١٦— قَالُوْا رَبُّنَا
يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ۝
١٧— وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ
الْمُبِيْنُ ۝ ١٨- قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا
بِكُمْ ج لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ

উপাসনা করিত। হযরত ঈসার (আঃ) দুই জন আসহাব (হাওয়ারী) তথায় প্রেরিত হন কিন্তু আন্তাকিয়াবাসীগণ তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করে ; তৎপর তৃতীয় একজন আসহাব তথায় প্রেরিত হন ও তাঁহারা একযোগে ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন, কিন্তু সেখানকার অধিবাসীগণ সকলেই তাঁহাদেরকে অবিশ্বাস করে।

১৮-২০। আন্তাকিয়ার অধিবাসীগণ উক্ত রসূলগণকে হত্যা করার চেষ্টা করে। তৎপর ঐখানের একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি দৌড়াইয়া আসিয়া বলিতে থাকেন যে, তাঁহারা যাহা প্রচার করিতেছেন তাহা সত্য (ধর্ম) ; তোমরা তাঁহাদের অনুসরণ কর।

ঘাতে বিচূর্ণ করিব এবং আমাদের দ্বারা তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব উপস্থিত হইবে। ১৯। তাঁহারা বলিয়াছিলেন — তোমাদের মন্দ ধারণা তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছে ; যদিও তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, প্রকৃতই তোমরা সীমা অতিক্রমকারী সম্প্রদায়। ২০। অতঃপর শহরের প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল— হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা এই রসূলগণের অনুসরণ কর। ২১। তোমরা তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ কর, যাঁহারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদানই প্রার্থনা করেন না এবং তাঁহারাই সৎপথপ্রাপ্ত। ২২। এবং আমার এমন কি কারণ থাকিতে পারে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার এবাদত করিব না? এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ২৩। আমি কি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য প্রভুর এবাদত করিব ? যদি সেই দয়াময় আমার অমঙ্গল করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ইহাদের (মূর্তির) সুপারিশ আমার কোন উপকারেই আসিবে না এবং ইহারা আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। ২৪। তখন আমি নিশ্চয় ভ্রমে পতিত হইব। ২৫। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিয়াছি, অতএব আমার কথা শ্রবণ কর।

وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝
١٩— قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ط اَئِنْ
ذُكِّرْتُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۝
٢٠— وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ
رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا
الْمُرْسَلِيْنَ لا ٢١— اتَّبِعُوْا مَنْ
لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝
٢٢— وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ
فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝
٢٣— ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً
اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ
عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ۝
٢٤— اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝
٢٥- اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ط ۝
٢٦— قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط

২৬। তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর— সে বলিয়াছিল, আক্ষেপ! আমার কওম যদি জানিত যে, ২৭। আমার প্রতিপালক কিসে আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। ২৮। আমি অতঃপর তাহার কওমের উপর আসমান হইতে কোন সৈন্য প্রেরণ করি নাই। এবং প্রেরণ করিতে ইচ্ছাও করি নাই। ২৯। ইহা কেবলমাত্র এক ভীষণ আওয়াজ (ধ্বংসধ্বনি) ছিল, তাহাতেই তাহারা নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছিল। ৩০। বান্দাগণের জন্য আফসোস! তাহাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই যাঁহার প্রতি তাহারা এইরূপ উপহাস করে নাই। ৩১। তাহারা কি দেখে নাই যে, আমি ইহাদের পূর্বে কত যুগ যুগান্তর কত লোককে ধ্বংস করিয়াছি, যাহারা তাহাদের নিকট দ্বিতীয়বার ফিরিয়া আসে নাই।

قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ ○ ২৭— بِمَا غَفَرَ لِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ○ ২৮— وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ○ ২৯— اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ○ ৩০— يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ج مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○ ৩১— اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ

২৮-২৯। আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন যে, আন্তাকিয়ার ঐ অবাধ্য সম্প্রদায়কে শাস্তি দিবার জন্য আমি আকাশ হইতে কোন ফেরেশতা পাঠাই নাই, শুধু একটি বজ্রধ্বনি দ্বারাই তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

৩০-৩১। আল্লাহ তাহাদের জন্য আফসোস করিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা প্রত্যেক রসূলকেই উপহাস করিয়াছে। তাহাদের পূর্বেও আমি অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছি, তথাপি তাহাদের চেতনা হইতেছে না।

৩২। নিশ্চয় এই জন্যেই তাহাদের সকলকেই পুনরায় আমার সম্মুখে (হাশরের দিন) অবশ্য হাযির হইতে হইবে।

لَا يَرْجِعُوْنَ ○ ৩২— وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ع

৩য় রুকু, আল্লাহ্‌র সত্যতার প্রত্যক্ষ নিদর্শনসমূহ

৩৩। নির্জীব পৃথিবীও তাহাদের (অবিশ্বাসীগণের) জন্য আর একটি নিদর্শন, আমি ইহাকে সজীব করি এবং ইহা হইতে শস্য উৎপাদন করি ; তৎপর তাহারা ইহা হইতে আহার করিয়া থাকে। ৩৪। এবং তন্মধ্যে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানসমূহ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি এবং তন্মধ্যে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত করিয়াছি। ৩৫। যেন তাহারা ইহার ফলসমূহ ভক্ষণ করে এবং তাহাদের হস্তসমূহ ইহা প্রস্তুত করে নাই, তবু কি তাহারা শুকরিয়া আদায় করিবে না ? ৩৬। তিনিই পবিত্রতম—যিনি ভূমি হইতে উৎপন্ন সমস্ত বিষয় ও অনেক অজ্ঞাত বিষয় জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন। ৩৭। এবং রাত্রিও তাহাদের জন্য আর একটি নিদর্শন, আমি ইহা হইতে দিনকে

৩৩— وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ج اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ○ ৩৪— وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ل ৩৫— لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ لا وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ط اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ○ ৩৬— سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ○ ৩৭— وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ج صلے نَسْلَخُ

৩৬। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, আমি মানুষের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত প্রত্যেক বিষয়ই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছি। উদ্ভিদতত্ত্ববিদগণ আবিষ্কার করিয়া বাহির করিয়াছেন যে, বৃক্ষের ফলের মধ্যেও স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় ফল রহিয়াছে ; এইরূপে সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে আল্লাহ্‌র শক্তি মহিমা প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল কুদরতের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আল্লাহ্‌র সত্যতায় কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সরাইয়া আমি তখন তাহাদের উপর অন্ধকার আবৃত করি। ৩৮। এবং সূর্য তাহার নির্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিতেছে, উহাও সেই সর্বশক্তিমান মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র বিধান। ৩৯। এবং আমি চন্দ্রের জন্যও নির্দিষ্ট স্থানসমূহ নির্ধারিত করিয়াছি — এইরূপে হ্রাস পাইতে পাইতে ইহা পুরাতন (শুষ্ক) খেজুর শাখার ন্যায় হইয়া যাইবে। ৪০। সূর্যের সাধ্য নাই যে, চন্দ্রকে ধরিতে পারে, অথবা রাত্রি দিনকে অতিক্রম করে এবং সকলেই আকাশে নিজ নিজ কক্ষে থাকিয়া ভ্রমণ করিতেছে। ৪১। এবং তাহাদের জন্য আর একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাহাদের বংশধরগণকে পরিপূর্ণ নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলাম। ৪২। এবং আমি তাহাদের জন্য তদ্রূপ বহু জিনিস সৃষ্টি করিয়াছি যাহার উপর তাহারা আরোহণ করিয়া থাকে। ৪৩। এবং আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে ডুবাইয়া দিতে পারি এবং তাহাদের জন্য কেহই রক্ষাকারী হইবে না এবং তাহাদের কেহই রক্ষা পাইবে না। ৪৪। কিন্তু ইহা আমার নিকট হইতে অনুগ্রহ

مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۙ ○
٣٨—وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ
لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○
٣٩—وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ
حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ○
٤٠—لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَآ اَنْ
تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ
النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ
يَّسْبَحُوْنَ ○ ٤١—وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا
حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ
الْمَشْحُوْنِ ۙ ٤٢—وَخَلَقْنَا لَهُمْ
مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ○ ٤٣—
وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ
وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ۙ ٤٤ اِلَّا رَحْمَةً

৪১। অতীতের সেই জগদ্ব্যাপী মহাপ্লাবনে হযরত নূহ (আঃ) ও তাঁহার বংশধরগণ এক সুবৃহৎ কিশতিতে আরোহণ করিয়া যেভাবে আল্লাহ্‌র কুদরতে ও অনুগ্রহে ঐ বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, এখানে সেই ঘটনার আভাস দেওয়া হইয়াছে।

ও ইহা এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভোগ সম্পদ। ৪৫। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, তোমাদের সম্মুখে ও তোমাদের পশ্চাতে যাহা আছে (আযাব) তাহা হইতে ভীত হও, তাহা হইলে তোমরা আমার রহমত লাভ করিতে পারিবে। ৪৬। কিন্তু তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে এমন কোন নিদর্শনই আসে নাই, যাহা হইতে তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় নাই। ৪৭। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, আল্লাহ তোমাদিগকে যে রিযিক দিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় কর, তখন অবিশ্বাসীগণ ঈমানদারগণকে বলে যে, আমরা কেন ইহাদিগকে (গরীব দুঃখী) আহার দিব, যাহাদিগকে আল্লাহ দিতে পারে? তোমরা নিশ্চয় প্রকাশ্য ভুলের মধ্যে রহিয়াছ। ৪৮। এবং তাহারা বলিল, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, তবে এই অঙ্গীকার (কেয়ামত) কখন অনুষ্ঠিত হইবে? ৪৯। তাহারা এক ভীষণ আওয়াযের (ইস্রাফীলের সিঙ্গার) অপেক্ষা করিতেছে যাহা তাহাদের উপর আসিয়া পড়িবে.

مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○ ٤٥—
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ
اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُوْنَ ○ ٤٦—وَمَا تَاْتِيْهِمْ
مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا
عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ○ ٤٧—وَاِذَا قِيْلَ
لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ
قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ
اَطْعَمَهٗٓ ۖ ق صلے اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ
ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ ٤٨—وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى
هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○
٤٩—مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً

৪৮-৪৯। আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, কেয়ামতের দিন হযরত ইস্রাফীলের (আঃ) সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া মাত্র সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং তখন কেহ কিছু বলিবার বা আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা করার অবসর পাইবে না।

تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ○
٥٠-فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ
اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ○

তাহারা বিতর্ক করিতে থাকিবে। ৫০। তখন তাহারা কাহাকেও কিছু বলিবার অবকাশ পাইবে না এবং গৃহ ও পরিজনের নিকট ফিরিতে পারিবে না ।

৪র্থ রুকু, পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারের বর্ণনা

٥١-وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ
مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ○
٥٢-قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ
مَّرْقَدِنَا سكتة هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ
وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ○ ٥٣-اِنْ
كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا
هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ○
٥٤-فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا
وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ○ ٥٥-اِنَّ اَصْحٰبَ
الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ○

৫১। এবং যখন [হযরত ইস্রাফীল (আঃ)] সিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন, তখন তাহারা নিজ কবর হইতে উঠিয়া তাহাদের প্রতিপালকের (আল্লাহ্‌র) দিকে ধাবিত হইবে। ৫২। তাহারা বলিবে, হায়! কে আমাদিগকে নিদ্রাস্থল হইতে উঠাইল? ইহা (কেয়ামত) যাহা দয়াময় (আল্লাহ) অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ৫৩। এই একটি মাত্র প্রলয়ের আওয়াযে সকলকেই আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে। ৫৪। ঐ দিন কাহারও উপর বিন্দুমাত্র অবিচার করা হইবে না এবং তোমরা কৃতকর্মের ফলাফল লাভ করিবে। ৫৫। নিশ্চয় সেদিন বেহেশ্‌তবাসীগণ আনন্দ উৎসবে বিভোর থাকিবে। ৫৬। তাঁহারা

৫১। এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, কেয়ামতের পর আল্লাহ্‌র আদেশে হযরত ইস্রাফীল (আঃ) দ্বিতীয়বার সিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করিলে ইহার আকর্ষণে সমস্ত মানব নিজ নিজ কবর হইতে উঠিয়া বিচারের জন্য হাশরের মাঠে একত্র হইবে।

٥٦-هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ
عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ○ ٥٧-
لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ○
٥٨-سَلٰمٌ قف قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ○
٥٩-وَامْتَازُوا الْيَوْمَ
اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ○ ٦٠-اَلَمْ
اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ
لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ج اِنَّهٗ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ لا ٦١-وَّاَنِ اعْبُدُوْنِىْ ط
هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○ ٦٢-
وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ط
اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ○ ٦٣-
هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○
٦٤-اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُوْنَ ○ ٦٥-اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى

তাহাদের সঙ্গীগণ ছায়াতলে উচ্চাসনে তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিবে। ৫৭। সেখানে তাহাদের জন্য ফলসমূহ মৌজুদ থাকিবে এবং তাহারা যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই হাজির পাইবে। ৫৮। এবং তাহাদের প্রতি মেহেরবান প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সালাম (শান্তি বাণী) সম্ভাষিত হইবে। ৫৯। এবং (বলা হইবে) হে পাপীগণ! আজ তোমরা জান্নাতবাসীগণ হইতে পৃথক হইয়া যাও। ৬০। হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, তোমরা শয়তানের তাবেদারী করিও না? নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ৬১। তোমরা কেবল আমারই এবাদত কর, ইহাই সরল সুপথ। ৬২। এবং নিশ্চয়ই সে তোমাদের মধ্য হইতে বহু লোককে বিপথগামী করিয়াছে, তবু কি তোমরা বুঝ না? ৬৩। ইহাই সেই জাহান্নাম যাহার সম্বন্ধে তোমাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল। ৬৪। তোমাদের মধ্যে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিলে আজ তাহারা ইহার মধ্যে প্রবেশ কর। ৬৫। আজ আমি তাহাদের মুখের উপর মোহর মারিয়া দিব এবং তাহারা যাহা কিছু করিয়াছিল তাহাদের হস্তদ্বয় আমার নিকট কথা বলিবে এবং তাহাদের পদদ্বয় সাক্ষ্য

أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ
أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝
٦٦— وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ
أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ
يُبْصِرُونَ ۝ ٦٧— وَلَوْ نَشَاءُ
لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا
اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۝

প্রদান করিবে। ৬৬। আমি ইচ্ছা করিলে (পার্থিব জীবনেই) তাহাদের চক্ষু দুইটি উপড়াইয়া ফেলিতে পারিতাম, তখন তাহারা পথে ভ্রমণ করার চেষ্টা করিত; কিন্তু তাহারা কিরূপে দেখিতে পাইত? ৬৭। এবং আমি যদি ইচ্ছা করিতাম, তবে তাহাদের গৃহেই তাহাদিগকে এইরূপভাবে পরিবর্তন করিয়া দিতে পারিতাম যে, সেখান হইতে তাহারা না আগে যাইতে পারিত, না পিছনে যাইতে পারিত।

৫ম রুকু-পুনরুত্থানের ও মানব জীবনের শেষ পরিণতির বর্ণনা

٦٨— وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي
الْخَلْقِ ط أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۝
٦٩— وَمَا عَلَّمْنَٰهُ الشِّعْرَ
وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ط إِنْ هُوَ
إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ۝ ٧٠—
لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ

৬৮। এবং যাহাকে আমি দীর্ঘায়ু দিয়া থাকি তাহাকে এই সংসারেই শারীরিক গঠন পরিবর্তন করিয়া দেই, তথাপি কেন তাহারা বুঝিতেছে না? ৬৯। এবং আমি তাঁহাকে [হযরত মুহাম্মদকে (সাঃ)] কবিতা শিক্ষা দেই নাই, কারণ, ইহা তাঁহার জন্য উপযুক্ত নহে, ইহা সত্য উপদেশপূর্ণ সমুজ্জ্বল কোরআন। ৭০। যাহাতে তিনি (সাঃ) জীবিতদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন এবং যেন নাফরমানদের প্রতি ঐ

৬৫। হাশরের দিন পাপীগণের যবান বন্ধ হইয়া যাইবে, তাহাদের হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় তাহাদের পাপ কার্যের সাক্ষ্য দিতে থাকিবে।

عَلَى الْكَٰفِرِينَ ۝ ٧١— أَوَلَمْ
يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ
أَيْدِينَا أَنْعَٰمًا فَهُمْ لَهَا مَٰلِكُونَ ۝
٧٢— وَذَلَّلْنَٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ
وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۝ ٧٣— وَلَهُمْ
فِيهَا مَنَٰفِعُ وَمَشَارِبُ ط أَفَلَا
يَشْكُرُونَ ط ٧٤— وَاتَّخَذُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ۝
٧٥— لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ لا وَهُمْ
لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ۝ ٧٦— فَلَا
يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ م إِنَّا نَعْلَمُ
مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝ ٧٧—
أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَٰنُ أَنَّا خَلَقْنَٰهُ مِنْ
نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝

বাক্য সত্য প্রামাণিত হয়। ৭১। তাহারা কি দেখে নাই যে, তাহাদের জন্য আমি আপন হইতে পশু সকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে ইহাদের মালিক করিয়া দিয়াছি। ৭২। এবং উহাদিগকে তাহার অনুগত করিয়া দিয়াছি, অনন্তর তাহারা উহাদিগকে চড়িবার ও খাইবার জন্য ব্যবহার করে। ৭৩। এবং ইহাদের মধ্যে তাহাদের জন্য বিশেষ উপকার ও পানীয় (দুগ্ধ) রহিয়াছে, তথাপি কেন তাহারা শুকরিয়া আদায় করে না? ৭৪। এবং সাহায্য পাইবার আশায় তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য উপায় গ্রহণ করিয়াছে। ৭৫। কিন্তু তাহাদের (মূর্তিগণের) সাহায্য করার কোন ক্ষমতা নাই এবং তাহাদিগকে ও ইহাদের সঙ্গীগণকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হইবে। ৭৬। অতএব হে রসূল! উহাদের কথায় তুমি ব্যথিত হইও না, ইহারা যাহা কিছু গোপন করে এবং প্রকাশ করে সমস্তই আমি জানি।

৬৭। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি কাফেরগণের বিদ্রূপের উত্তরে এই সূরা নাযিল হইয়াছিল, এই আয়াতে তাহাদের বিদ্রূপের আভাস দেওয়া হইয়াছে।

৭৭। মানুষ কি জানে না যে, আমি তাহাকে শুক্রবিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। তবু সে প্রকাশ্য প্রতিবাদকারী হয়। ৭৮। এবং আমার তুল্য স্থির করে এবং নিজ পয়দায়েশ ভুলিয়া যায়, সে বলে যে, হাড় যখন পচিয়া যাইবে, তখন কে তাহাকে জীবন দান করিতে পারে? ৭৯। তুমি বল, যিনি প্রথমবার পয়দা করিয়াছেন, তিনিই পুনরায় জিন্দা করিবেন এবং তিনিই সমস্ত সৃষ্টি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। ৮০। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে আগুন সৃষ্টি করিয়াছেন, এখন তোমরা তাহা হইতে আগুন জ্বালাইয়া থাক। ৮১। ফলতঃ যিনি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি পুনরায় সেরূপ সৃষ্টি করিতে পারেন না? হাঁ, পারেন, এবং তিনিই অভিজ্ঞ সৃষ্টিকর্তা। ৮২। এতদ্ব্যতীত তাঁহার এইরূপ ক্ষমতা যে, যখন তিনি কোন বস্তু সম্বন্ধে এরাদা (ইচ্ছা) করেন তখন তিনি বলেন— হও এবং ইহা হইয়া যায়। ৮৩। অতএব তিনিই পবিত্রতম, যাঁহার হস্তে সর্বাধিক আধিপত্য এবং তোমরা তাঁহার নিকট (কেয়ামতের দিন) অবশ্য প্রত্যাবর্তন করিবে।

৭৮—وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۝ ৭৯—قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ ۝ ৮০— الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ۝ ৮১—اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۝ ৮২—اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ ৮৩—فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

সূরা আর্-রাহ্‌মান

শানে নুযূল ও ফযীলতের বর্ণনা ঃ— ১। এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে বেহেশতের বিশেষ বিশেষ নেয়ামত ও দোযখের কঠিন আযাবের বর্ণনা রহিয়াছে। এই সূরার রচনা পদ্ধতি ও বাক্যবিন্যাস অতিশয় চমৎকার। আরব ও অন্যান্য দেশের কবিগণের কোরাস ছন্দের ন্যায় 'ফাবিআইয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান' আয়াতটি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হইয়া ইহাকে শ্রুতিমধুর ও হৃদয়স্পর্শী করিয়াছে। পাক কোরআনে এই ধরনের আর কোন সূরা নাযিল হয় নাই। এই সূরা এরূপ মধুর শব্দ ও সুমিষ্ট বাক্য দ্বারা রচিত যে, ইহা তৎকালীন আরববাসীর কঠিন হৃদয়ও স্পর্শ করিয়াছিল। কাফেরগণ যাহাতে ইহার ছন্দের মাধুর্যে ও ভাষার কোমলতায় আকৃষ্ট হইয়া সৎকর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়, এই উদ্দেশ্যে হযরত (সাঃ) হেরেম শরীফের একটি কামরায় বসিয়া এই সূরা পড়িতেন। আঁ হযরত (সাঃ) বলিতেছেন যে, প্রত্যেক জিনিসের একটি না একটি সৌন্দর্য আছে; সূরা আর্-রাহ্‌মান কোর্‌আনের সৌন্দর্য। কেহ কেহ এই সূরাকে কোর্‌আনের বন্ধু বলিয়া থাকেন। হযরত ওসমান (রাঃ) হাশরের ময়দানে এই সূরা পড়িয়া আল্লাহ্‌র প্রদত্ত নেয়ামতগুলি বর্ণনা করিবেন।

২। আল্লাহ তায়ালা ইহ-পরকালে মানুষ ও জ্বিনকে যে সকল নেয়ামত ও সুখ-সুবিধা দান করিয়াছেন, এই সূরায় তাহার স্পষ্টভাবে বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাতে ৩১ প্রকারের নেয়ামত ও সুখ সুবিধার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও জ্বিনদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে — "ফাবিআইয়ি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান" অর্থাৎ অতএব তোমরা প্রতিপালকের কোন্‌ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে? এইরূপে এই আয়াতটি দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত নেয়ামতের প্রতি ৩১ বার মানুষ ও জ্বিনকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ) জ্বিনগণের সম্মুখে এই আয়াতটি পড়িতেছিলেন, তখন প্রত্যেকবার জ্বিনগণ প্রত্যুত্তর করিয়াছিল যে — "আলা বিশায়য়িম্‌ মিন্‌ নিয়ামিকা রাব্বানা তুকায্‌যিবান ফালাকাল্‌ হামদ" অর্থাৎ "হে প্রভু! আমরা তোমার নেয়ামতের কোনটিকেই কখনও অস্বীকার করি না, বরং আমরা তোমার প্রশংসা কীর্তন করি।" এইজন্য আলেমগণ বলেন যে, এই আয়াত পড়ার সময় এই দোয়া পড়া সুন্নত।

এই সূরা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌র প্রদত্ত অফুরন্ত সুখ-ভোগ ও নেয়ামতের সংখ্যা নির্ণয় করা মানুষের অসাধ্য ও তাঁহার নেয়ামতের পূর্ণ শুক্‌রিয়া আদায় করাও মানুষের শক্তির বাহিরে। এই সূরা পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের শুক্‌রিয়া আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। খাঁটি দিলে ও রীতিমত এই সূরা পড়িলে জান্নাতের আশা করা যায়। এই সূরার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রতি অসীম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার ইহ-পারলৌকিক দান, দয়া ও করুণার অভিব্যক্তি যেরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আর্‌রাহ্‌মান অর্থাৎ অন্তর করুণাপূর্ণ নামকরণ যে সম্পূর্ণ যোগ্য ও যথার্থ হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি এই সূরা পড়িয়া আল্লাহ্‌র রহমতের ও নেয়ামতের বর্ণনা করে, তিনি তাহাকে ইহার উপযুক্ত প্রতিদানস্বরূপ ইহ-পারলৌকিক মঙ্গল দান করিয়া থাকেন। ইহা আল্লাহ তায়ালার রহমতের সূরা বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ফযীলত

১। এই সূরার প্রত্যেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত নেয়ামতটি উল্লেখ হইয়াছে এবং মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ্‌র প্রতি তাবেদার হওয়ার একটি তাকিদ রহিয়াছে। পিতা যেরূপ অবাধ্য সন্তানের নিকট তাহার স্নেহ-মমতা ও দয়া মায়ার উল্লেখ করিয়া সন্তানের মনে বাধ্য হওয়ার ভাব জাগাইয়া তোলে, এই সূরায় প্রত্যেক নেয়ামতের বর্ণনায় মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত হওয়ার একটি গভীর প্রেরণা বর্তমান রহিয়াছে। এইজন্য এ সূরার একটি খাসিয়ত এই রহিয়াছে যে, নিম্নোক্ত নিয়মে যে ব্যক্তি এই সূরা পড়িবে মানুষ তাহার বাধ্য ও অনুগত হইবে। যথা — সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া এই সূরা পড়িতে আরম্ভ করিবে ও প্রত্যেক "ফাবিআইয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান" আয়াত পড়ার সময় সূর্যের দিকে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিবে। প্রথম চল্লিশ দিন এই নিয়মে পড়িয়া তৎপর ফজরের সময় একবার পড়িবে।

সূর্য আল্লাহ তায়ালার অসীম শক্তি ও কুদরতের একটি চাক্ষুষ উজ্জ্বল নিদর্শন, সেইজন্যই প্রত্যেক নেয়ামত ও কুদরতের বর্ণনার পর সূর্যের প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিয়া আল্লাহ তায়ালার শক্তি-মহিমা ও নেয়ামতের সাক্ষ্য

দিতে হয়। হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)ও এই সূর্যকে লক্ষ্য করিয়াই নমরূদের নিকট আল্লাহ্‌র শক্তি মহিমা প্রমাণ করিয়াছিলেন, যাহা এই সূরার প্রথম ভাগেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

২। চক্ষু রোগীর উপর এই সূরা পড়িয়া ফুঁক দিলে রোগ আরোগ্য হয়। ইহা ধুইয়া প্লীহা রোগীকে খাওয়াইলে প্লীহা কমিয়া যায়।

৩। ১১ বার এই সূরা পড়িলে মকসুদ হাসিল হয়।

৪। যে ব্যক্তি নিয়মিতরূপে এই সূরা পড়িবে, কেয়ামতের দিন তাহার চেহারা ১৫ই চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে, সে বেহেশ্‌তে দাখিল হইবে এবং যে কোন লোকের পক্ষে তাহার শাফায়াত কবুল হইবে।

৫। যে ব্যক্তি খাঁটি দেলে এই সূরা পড়িবে, সে যেরূপ ইহকালে আল্লাহ্‌র রহমত লাভ করিবে, সেরূপ এই পাক কালামের বরকতে তাহার জন্য দোযখের দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে ও ৮টি দরজাবিশিষ্ট ২টি বেহেশতের ১৬টি দরজা খুলিয়া যাইবে।

৬। হাকিমের নিকট কিম্বা কোন দরবারে যাইবার সময় এই সূরা পড়িয়া গেলে অথবা কমপক্ষে "ফাবিআইয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান" আয়াতটি ৩ বার পড়িয়া গেলে সম্মান ও সদয় ব্যবহার লাভ করিবে।

৭। সর্বদা এই সূরা পড়িলে কা'বা শরীফ ও বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ হয়।

৯। বসন্ত রোগে এই সূরার আমল বিশেষ ফলপ্রদ ; (ইহার অন্যান্য ফযীলতের বিষয় পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে)।

১০। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন, সূরা তা-হা ও সূরা আর্-রাহমান সর্বদা পড়িবে কিংবা হেফয করিবে, নিশ্চয় ইহাদের বরকতে সে কবরের আযাব হইতে রক্ষা পাইবে। কবর আযাব হইতে নাজাত পাওয়ার জন্য ইহাই সর্বোত্তম আমল। বেহেশতের মধ্যে কোন এবাদতই থাকিবে না ; বেহেশতীগণ কেবল এই তিনটি সূরা পড়িয়া আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করিবে।

মক্কায় অবতীর্ণ	اَلرَّحْمٰن – সূরা আর্‌-রাহমান	৩ রুকু, ৭৮ আয়াত

১ম রুকু আল্লাহ তায়ালার অসীম দয়া ও অফুরন্ত অনুগ্রহের বর্ণনা

পরম করুণাময় দয়াশীল আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ। ১। (আল্লাহ) অত্যন্ত মেহেরবান (করুণাময়)। ২। তিনি কোর্‌আন শিক্ষা দিয়াছেন। ৩। তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। ৪। তাহাকে কথা বলিতে শিখাইয়াছেন। ৫। সূর্য ও চন্দ্র এক নিয়মে চলিতেছে। ৬। এবং তৃণরাজি ও বৃক্ষরাজি (তাঁহাকে) সেজদা করিতেছে। ৭। এবং তিনি আকাশমণ্ডলকে উচ্চ করিয়াছেন এবং সর্ববিষয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ৮। যেন তোমরা পরিমাণে কম-বেশী না কর। ৯। এবং ঠিকভাবে পরিমাণ কর। এবং (সাবধান!) ওজন কম করিও না। ১০। তিনি জীবজন্তুর জন্য পৃথিবীতে মাটি বিছাইয়া দিয়াছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
١- اَلرَّحْمٰنُ ○ ٢- عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ○
٣- خَلَقَ الْاِنْسَانَ ○ ٤- عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○ ٥- اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ○ ٦- وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ○ ٧- وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ○ ٨- اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ○ ٩- وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ○ ١٠- وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ○ ١١- فِيْهَا فَاكِهَةٌ

৪। আল্লাহ মানুষকে নানা প্রকার ভাষায় কথা বলিতে শিক্ষা দিয়াছেন। ইংরেজী ও অন্যান্য যাবতীয় ভাষায় মানুষকে কথা বলিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

৫। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়ম মানিয়া কেয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।

১১। তন্মধ্যে ফল ও খোসাযুক্ত খেজুর বৃক্ষ রহিয়াছে। ১২। এবং তুষযুক্ত শস্য ও ফল রহিয়াছে। ১৩। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের (আল্লাহ্‌র) কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ১৪। তিনি মাটির পাত্রের ন্যায় খনখনে মাটি হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। ১৫। এবং তিনি অগ্নিশিখা দ্বারা জিন্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। ১৬। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ১৭। যিনি উভয় পূর্ব ও উভয় পশ্চিমের (সর্বদিকের) মালিক। ১৮। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ১৯। তিনি সমুদ্রদ্বয়কে সংযুক্তভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন। ২০। উভয়ের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক আছে ; যাহা তাহারা অতিক্রম করিতে পারে না। ২১। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ২২। উভয় সমুদ্র হইতে মুক্তা ও প্রবালসমূহ বহির্গত হয়। ২৩। এতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ?

وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۚ ١٢- وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۚ ١٣- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ١٤- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۚ ١٥- وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۚ ١٦- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ ١٧- رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۚ ١٨- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ ١٩- مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ○ ٢٠- بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۚ ٢١- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ ٢٢- يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۚ ٢٣- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

২৪। এবং তাঁহার জন্যে সমুদ্রের মধ্যে পর্বতের ন্যায় স্থির নৌকাসমূহ রহিয়াছে। ২৫। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ?

٢٤- وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۚ ٢٥- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

২য় রুকু — হাশরের মহাবিচার ও শাস্তির বর্ণনা

২৬। ভূ-পৃষ্ঠের উপর অবস্থিত সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ২৭। কেবল তোমাদের প্রতিপালকের অস্তিত্বই অবশিষ্ট থাকিবে, যিনি মহত্ব ও গৌরবের অধিপতি। ২৮। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ২৯। আসমান জমিনের মধ্যে যাহা আছে, সকলেই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছে, তিনি সর্বসময় সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ৩০। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৩১। হে উভয় সম্প্রদায়! (জ্বিন ও মানুষ) আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি 'রুজু' হইব (বিচারে নিয়োজিত হইব)। ৩২। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৩৩। জ্বিন ও ইন্সান! যদি আসমান ও জমিনের সীমানার বাহিরে যাইবার শক্তি থাকে তবে

٢٦- كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۚ ٢٧- وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْإِكْرَامِ ۚ ٢٨- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ٢٩- يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۚ ٣٠- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ٣١- سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۚ ٣٢- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ٣٣- يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

২৭। আল্লাহ তায়ালা সকল সময় একইভাবে আছেন, তাঁহার শক্তি মহিমার কোন সময় পরিবর্তন হয় না।

বাহিরে যাও ; কিন্তু তোমরা সেই আধিপত্যের বাহিরে যাইতে পারিবে না। ৩৪। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৩৫। তোমাদের উভয়ের উপর অগ্নিশিখা ও ধূম্র নিক্ষেপ করা হইবে, তখন তোমরা ইহা নিবারণ করিতে পারিবে না। ৩৬। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৩৭। যখন আসমান ফাটিয়া রঞ্জিত তৈলের ন্যায় লালবর্ণ ধারণ করিবে ; ৩৮। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৩৯। ঐ দিন মানুষ ও জ্বিনকে গোনাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে না। ৪০। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৪১। গোনাহগারগণকে তাহাদের চেহারা দেখিয়াই চেনা যাইবে, তখন তাহারা চুলের মুঠা ও পায়ের সহিত একত্র ধৃত হইবে। ৪২। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৪৩। ইহাই ত সেই দোযখ যাহা গোনাহগারগণ

فَانْفُذُوا ط لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۚ ٣٤- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ٣٥- يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۚ ٣٦- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ٣٧- فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۚ ٣٨- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ٣٩- فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهٖ إِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ ۚ ٤٠- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ٤١- يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ۚ ٤٢- فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ٤٣- هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِي

অবিশ্বাস করিত। ৪৪। তাহারা ইহার ভিতরে উত্তপ্ত পানির মধ্যে ঘুরিতে থাকিবে। ৪৫। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ?

يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۘ ۴۴-
يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ۚ
۴۵- فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

৩য় রুকু— পরকালে নেক্‌কারগণের জন্য বিশেষ পুরস্কারের বর্ণনা

৪৬। এবং যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে (ভয়ে নামাযে) দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহার জন্য দুইটি বেহেশ্‌ত রহিয়াছে। ৪৭। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৪৮। ইহাদের উভয়ের মধ্যে (সুখ-সম্পদের) বিভিন্ন বিভাগ রহিয়াছে। ৪৯। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৫০। ইহাদের উভয়ের মধ্যে দুইটি ঝরনা প্রবাহিত রহিয়াছে। ৫১। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৫২। ইহাদের উভয়ের মধ্যে সকল রকমের ফল দুই প্রকার (কাঁচা ও পাকা) রহিয়াছে। ৫৩। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৫৪। জান্নাতবাসীগণ রেশমী গোলাপবিশিষ্ট তাকিয়া ঠেস দিয়া থাকিবে এবং উভয় বাগিচার মেওয়া (ফল)

۴۶- وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ
جَنَّتٰنِ ۚ ۴۷- فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ۴۸- ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ ۚ
۴۹- فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝
۵۰- فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ۝
۵۱- فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝
۵۲- فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ۚ
۵۳- فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ
۵۴- مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ بَطَاۤئِنُهَا
مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ

সমূহ তাঁহাদের অতি নিকটবর্তী থাকিবে, ৫৫। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৫৬। ইহাদের মধ্যে নিম্ন দৃষ্টিকারিণী (লজ্জাশীলা) হুরগণ রহিয়াছে, তাহাদিগকে পূর্বে জ্বিন কিংবা মানুষ কখনও স্পর্শ করে নাই। ৫৭। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৫৮। তাহারা ইয়াকুত ও জ্যোতি সদৃশ। ৫৯। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৬০। শান্তির বিনিময়ে শান্তি ব্যতীত আর কি আছে ? ৬১। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৬২। এবং এই দুইটি ব্যতীত আরও দুইটি বেহেশ্‌ত রহিয়াছে। ৬৩। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৬৪। সেই দুইটি উদ্যান গাঢ় সবুজ বর্ণের।

دَانٍ ۚ ۵۵- فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ۝ ۵۶- فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ
الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ
قَبْلَهُمْ وَلَا جَاۤنٌّ ۵۷- فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ ۵۸- كَاَنَّهُنَّ
الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۚ ۵۹-
فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝
۶۰- هَلْ جَزَاۤءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا
الْاِحْسَانُ ۝ ۶۱- فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ ۶۲- وَمِنْ دُوْنِهِمَا
جَنَّتٰنِ ۚ ۶۳- فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ۙ ۶۴- مُدْهَاۤمَّتٰنِ ۚ

৬৪। সবুজ রং (গাঢ় নীল) আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়। আকাশ, সমুদ্র, পৃথিবী ও বৃক্ষ-লতা সবুজ বর্ণে সৃষ্টি হইয়াছে। বেহেশ্‌তী রং বলিয়া সবুজ বর্ণের একটি উপকারিতা শক্তি রহিয়াছে। সবুজ রং চোখের পক্ষে উপকারী। ডাক্তারগণ চক্ষু রোগে সবুজ বর্ণের চশমা ও সবুজ বর্ণের কাপড়ের বেষ্টনী ব্যবহার করার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

৬৫। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৬৬। ইহাদের উভয়ের মধ্যে দুইটি ঝরনা প্রবাহিত আছে। ৬৭। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৬৮। ইহাদের উভয়ের মধ্যে মেওয়া, খেজুর ও আনার রহিয়াছে। ৬৯। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৭০। তাহাদের মধ্যে পরম রূপসী (মনোমোহিনী) হুরগণ রহিয়াছে। ৭১। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৭২। সেই সুলোচনা সুন্দরী হুরগণ তাঁবুর ভিতর (বেহেশ্‌তীগণের প্রতীক্ষায়) বসিয়া রহিয়াছে। ৭৩। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৭৪। ইহার পূর্বে জ্বিন বা মানুষ তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই। ৭৫। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৭৬। তাহারা সবুজ বাগিচা ও সুন্দর সুরঞ্জিত মসনদের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিবে। ৭৭। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অবিশ্বাস করিবে ? ৭৮। তোমার প্রতিপালকের নাম কল্যাণকর, যিনি মহত্ত্ব ও গৌরবের অধিকারী।

٦٥- فبأى آلاء ربكما تكذبن ۝
٦٦- فيهما عينن نضاختن ۝
٦٧- فبأى آلاء ربكما تكذبن ۝
٦٨- فيهما فاكهة ونخل
ورمان ۝ ٦٩- فبأى آلاء ربكما
تكذبن ۝ ٧٠- فيهن خيرت حسان ۝
٧١- فبأى آلاء ربكما تكذبن ۝
٧٢- حور مقصورت فى الخيام ۝
٧٣- فبأى آلاء ربكما تكذبن ۝
٧٤- لم يطمثهن انس قبلهم ولا
جان ۝ ٧٥- فبأى آلاء ربكما
تكذبن ٧٦ متكئين على رفرف
خضر وعبقرى حسان ۝ ٧٧- فبأى
آلاء ربكما تكذبن ۝ ٧٨- تبرك
اسم ربك ذى الجلال والاكرام ۝

সূরা ওয়াক্বিয়াহ

শানে নুযূল ঃ— এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়। ইহাতে আল্লাহ্‌র শক্তি মহিমা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে ও ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক পার্থিব কর্মের উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া হইবে। কেয়ামত সম্বন্ধে সন্দিহানগণের যাহাতে কোন সন্দেহ না থাকিতে পারে, সেজন্য কেয়ামত সম্বন্ধে এই সূরায় বিশেষ বর্ণনা রহিয়াছে। পার্থিব ভূমিকম্প, প্রবল ঝটিকা ও আকস্মিক বজ্রপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রতীয়মান করা হইয়াছে যে, কেয়ামতের মহাঘটনা সংঘটন করা আল্লাহ তায়ালার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার, বিশেষতঃ এই সূরায় যেরূপভাবে বেহেশ্‌তের সাজসজ্জা, ঐশ্বর্য ও সুখ-সম্পদের বর্ণনা করা হইয়াছে, কোর্‌আনের আর কোন সূরায় তদ্রূপ বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয় নাই।

ফযীলত

১ হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন— ইহা প্রচুরতার (রিযিক বৃদ্ধির) সূরা। যে ব্যক্তি প্রত্যহ রাত্রিতে এই সূরা পড়িবে সে কখনও অভাব অনটনে পড়িবে না। (তঃ হক্কানী)

২। এই সূরার দ্বারা কেহ অর্থশালী হইতে চাহিলে জুময়ার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এই সূরা ২৫ বার ও পরবর্তী জুময়ার রাত্রে মাগরেবের নামাযের পর ২৫ বার পড়িবে ও এশার নামাযের পর ২১ বার দরূদ শরীফ পড়িবে, তৎপর প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় ১ বার করিয়া পড়িতে থাকিবে, ইন্‌শাআল্লাহ অতি সত্বর সে ধনবান হইবে।

৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই সূরা লিখিয়া গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাঁধিয়া দিলে অতি সহজে সন্তান প্রসব হয় ; (ইহা পরীক্ষিত)।

[এই সূরায় কেয়ামতের ভীষণ কম্পনের বর্ণনা থাকায় আল্লাহ তায়ালার অসীম শক্তি মহিমা বিকাশ হইয়াছে ; এইরূপ বর্ণনা ও বেহেশ্‌তের সুখ সম্পদের বর্ণনা থাকায় এই সূরার উপরোক্ত আমল দ্বারা অতি সহজে সন্তান প্রসব হয়।]

৪। এই সূরা লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে আসমান ও জমিনের সকল প্রকার বিপদাপদ হইতে নিরাপদে থাকা যায় ও রিযিক বৃদ্ধি হয়।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— এই সূরার আমল দ্বারা উপরোক্ত ফযীলত লাভ করার কয়েকটি বিশেষ কারণ রহিয়াছে। যথা— কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা অসীম শক্তিবলে যে সকল মহাঘটনা সংঘটিত করিবেন, এই সূরার প্রথম ভাগেই তাহা বর্ণিত হওয়াতেই তাঁহার অসীম ক্ষমতা প্রচারিত হইয়াছে। ইহার ৭৭ আয়াতে পাক কোর্‌আনের গৌরব ও পবিত্রতা বর্ণনা হইয়াছে। এই সকল বর্ণনা দ্বারা পাক কোর্‌আনের পবিত্রতা ও গৌরব ও কেয়ামতের সত্যতার সাক্ষ্য দেওয়া হয় ; ফলে পাঠকের উপর আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত ও কোর্‌আনের ফযীলত নাযিল হয়। অধিকন্তু এই সূরায় বেহেশ্‌তের সুখ-সম্পদ লাভ ও নেয়ামতের বর্ণনা থাকায় ইহা পাঠ দ্বারা স্মরণ করা হয় যে, আল্লাহ এই সকল সুখ সম্পদ লাভ ও নেয়ামতের একমাত্র খালেক ও মালেক এবং তাঁহার দয়াই এই সকল নেয়ামত লাভ করার একমাত্র উপায়, এই সকল বিশেষ নেয়ামতের স্মরণ করার বরকতে পাঠকের অভাব অনটন দূর হইয়া সুখ-সম্পদ লাভ হয় ও বিপদাপদ দূর হয়।

এই সূরার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ৭৫ আয়াতে তারকার শপথ করিয়াছেন। তারকারাজি রাত্রিকালে উদিত হয় ও তাহারা আল্লাহ্‌র কুদরতের ও অসীম শক্তি মহিমার জ্বলন্ত সাক্ষী, তাহাতে বোধ হয় এই সূরা রাত্রিতে পড়িলে বেশী ফযীলত হইয়া থাকে বলিয়া হযরত (সাঃ) এই সূরা রাত্রিতে পড়ার ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ্‌র নামের পবিত্রতার বর্ণনা থাকায় ইহাকে বিশেষরূপে ফযীলতপূর্ণ করিয়াছে।

(শোয়াবুল ঈমান ও তঃ হক্কানী)

ওয়াক্বেয়া ঃ মহাঘটনা অর্থাৎ — অবশ্যম্ভাবী কেয়ামত ও পুনরুত্থান। এই সূরার প্রথম আয়াতের "ওয়াক্বেয়া" শব্দ হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে।

মক্কায় অবতীর্ণ	سورة الواقعة সূরা ওয়াক্বিয়াহ	৩ রুকু, ৯৬ আয়াত

২৭ পারা

১ম রুকু — পরকালে মানুষের শ্রেণীবিভাগ এবং কেয়ামত, বেহেশ্‌ত ও দোযখের বর্ণনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

١— اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۙ ٢— لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۘ ٣— خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۙ ٤— اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۙ ٥— وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۙ ٦— فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْۢبَثًّا ۙ ٧— وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۗ ٨— فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَا اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۗ ٩— وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ مَا اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۗ

পরম করুণাময় দয়াশীল আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ। ১। যখন সেই মহাঘটনা কেয়ামত ঘটিবে। ২। তখন ইহা ঘটিবার সম্বন্ধে কোন অসত্যতা থাকিবে না। ৩। উহাতে উলট পালট হইবে। ৪। তখন পৃথিবী ভীষণ কম্পনে কম্পিত হইবে। ৫। এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ৬। তখন ইহা বিক্ষিপ্ত ধূলির ন্যায় হইয়া যাইবে। ৭। এবং তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। ৮। অনন্তর দক্ষিণ পার্শ্বের দল, দক্ষিণ পার্শ্বের দল কি বুঝিয়াছ? (সুবহানাল্লাহ!) (তাঁহারা বেহেশ্‌তী ও সৌভাগ্যশীল)। ৯। এবং বাম পার্শ্বের দল, বাম পার্শ্বের দল কি বুঝিয়াছ ? ৯। (আফ্‌সোস তাহারা দোযখী,

নিতান্ত হতভাগ্য)। ১০। এবং আর এক দল যাহারা সকলের আগে থাকিবে। ১১। তাঁহারা (আল্লাহ্‌র) অধিক নিকটবর্তী থাকিবে। ১২। সুখ-সম্পদের সহিত বেহেশ্‌তের সুখময় বাগিচায় থাকিবে। ১৩। এই শ্রেণীর মধ্যে পূর্ব জামানার বহু লোক। ১৪। এবং আখেরী জামানার অল্প লোক। ১৫। তাহারা জড়োয়ার (মণি-মুক্তা খচিত) আসনের উপর। ১৬। সামনাসামনিভাবে(তাকিয়া ঠেস দিয়া) বসিয়া থাকিবে ১৭। তাহাদের চতুর্দিকে খেদমতের জন্য গেলমানগণ (কিশোর বালকগণ) ঘুরিয়া বেড়াইবে। ১৮। (তাহারা) পবিত্র পানীয়ের আফতাবা ও সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে লইয়া থাকিবে। ১৯। তাহাতে (উহা পান করিলে) মাথা বেদনা হইবে না ও নেশা হইবে না। ২০। এবং মেওয়ার মধ্যে যাহা তাহারা পছন্দ করিবে। ২১। এবং খাহেশ (ইচ্ছা) অনুযায়ী পক্ষীর

১০—وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۝

১১—اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

১২—فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝ ১৩—

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۝ ১৪—

وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۗ ১৫-عَلٰى

سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ১৬-مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا

مُتَقٰبِلِيْنَ ۝ ১৭—يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ

وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۙ- بِاَكْوَابٍ

وَّاَبَارِيْقَ ১৮ ۝ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۙ

১৯-لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۙ

২০ -وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ۙ

২১—وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝ ২২

৭—১২। কেয়ামতের পর মানুষ যখন পুনরায় হাশরের ময়দানে বিচারের জন্য একত্রিত হইবে তখন তাহারা তিন ভাগে বিভক্ত হইবে। একদল আল্লাহ তায়ালার দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিবেন, তাহারাই বেহেশ্‌তী। আর একদল বাম পার্শ্বে থাকিবে, তাহারাই দোযখী ও আর একদল অগ্রভাগে ও আল্লাহ্‌র অতি নিকটবর্তী থাকিবেন, এই শ্রেণীতে নবী-রসূল ও অলী-আল্লাহগণ থাকিবেন।

মাংস মৌজুদ থাকিবে। ২২। এবং সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট সুন্দরীগণ (হুর) থাকিবে। ২৩। তাহারা যেন মুক্তা, স্তরে স্তরে সুসজ্জিত রহিয়াছে। ২৪। তাহারা যাহা (সৎকাজ) করিয়াছিল ইহা তাহারই পুরস্কার। ২৫। সেখানে তাহারা অনর্থক বা মন্দ কথা শুনিবে না। ২৬। কেবল শুনিবে শান্তিময় শান্তিবাণী। ২৭। আর দক্ষিণ দিকের দল, তাহারা কিরূপ জান ? ২৮। তাহারা কাঁটাশূন্য কুল গাছের। ২৯। এবং সারি সারি কলা গাছের। ৩০। সুবিস্তৃত ছায়া। ৩১। এবং ঝরনা প্রবাহিত (বাগিচার মধ্যে)। ৩২। এবং অফুরন্ত মেওয়ারাশির মধ্যে অবস্থান করিবে। ৩৩। যাহা অফুরন্ত এবং যাহা কেহ নিষেধ করিবার নাই। ৩৪। এবং তথায় উচ্চ ফরাশ বিছানো রহিয়াছে। ৩৫। নিশ্চয় আমি সেই রমণীগণকে (হুর) একইরূপে বর্ধিত করিয়াছি। ৩৬। তৎপর তাহাদিগকে কুমারী (অবিবাহিত) অবস্থায় রাখিয়াছি। ৩৭। তাহারা অতি মনোহারিণী ও সমবয়সী ও ৩৮। ইহারাই দক্ষিণ দিকের লোকের জন্য রহিয়াছে।

২২—وَحُوْرٌ عِيْنٌ ۙ ২৩-كَاَمْثَالِ

اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ۚ ২৪-جَزَاۤءً

بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ ২৫-لَا يَسْمَعُوْنَ

فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ۙ ২৬—اِلَّا

قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ۝ ২৭—وَاَصْحٰبُ

الْيَمِيْنِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ

২৮—فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ۝ ২৯

وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۝ ৩০-وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ۙ

৩১-وَّمَاۤءٍ مَّسْكُوْبٍ ۙ ৩২-وَّفَاكِهَةٍ

كَثِيْرَةٍ ۙ ৩৩—لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا

مَمْنُوْعَةٍ ۙ ৩৪-وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ۝

৩৫—اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَاۤءً ۝ ৩৬-

فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ۙ ৩৭-عُرُبًا

اَتْرَابًا ۝ ৩৮-لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۙ

২য় রুকু— অবিশ্বাসী পাপীগণের শেষ দশা

৩৯। তথায় পূর্ব জামানার এক বৃহৎ দল। ৪০। এবং আখেরী জামানার এক বৃহৎ দল হইবে। ৪১। এবং বাম পার্শ্বের দল (আফ্‌সোস) তাহারা কি রূপ ? ৪২। তাহারা তপ্ত বাতাস ও ফুটন্ত পানির মধ্যে থাকিবে। ৪৩। শীতল অথবা আরামদায়ক নহে। ৪৪। তাহার ভিতরে থাকিবে। ৪৫। নিশ্চয় ইহারা পূর্বে (দুনিয়ার) সুখ-সম্পদ ও প্রচুর আরামের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিল। ৪৬। এবং তাহারা গুরুতর ধর্মদ্রোহিতায় (গোনাহে) লিপ্ত ছিল। ৪৭। এবং তাহারা বলিত, যখন আমরা মরিয়া যাইব ও মাটি এবং হাড়ে পরিণত হইব, তখন কি আমরা পুনরায় উত্থিত হইব ? ৪৮। অথবা আমাদের পূর্ব-পুরুষগণও কি কেয়ামতের দিন উত্থিত হইবে ? ৪৯ (হে রসূল! মোনাফেকদিগকে) বলিয়া দাও — পূর্ব জামানার ও আখেরী জামানার সকলকেই। ৫০। সেই সুবিদিত সময় (হাশরের

٣٩—ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۙ ٤٠—وَثُلَّةٌ
مِّنَ الْآخِرِينَ ۗ ٤١—وَأَصْحٰبُ
الشِّمَالِ ۝ مَا أَصْحٰبُ الشِّمَالِ ؕ
٤٢—فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ۙ ٤٣—
وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ۙ ٤٤—لَّا بَارِدٍ
وَلَا كَرِيمٍ ۝ ٤٥—إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ
ذٰلِكَ مُتْرَفِينَ ۚ ٤٦—وَكَانُوا
يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ۝
٤٧—وَكَانُوا يَقُولُونَ ۙ أَئِذَا مِتْنَا
وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظٰمًا أَءِنَّا
لَمَبْعُوثُونَ ۙ ٤٨—أَوَ آبَاؤُنَا
الْأَوَّلُونَ ۝ ٤٩—قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ
وَالْآخِرِينَ ۙ ٥٠—لَمَجْمُوعُونَ ۙ
إِلَىٰ مِيقٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝

মাঠে) একত্রিত করা হইবে। ৫১। নিশ্চয় হে ভ্রান্ত অবিশ্বাসীগণ! ৫২। নিশ্চয় তোমরা "যাক্‌কুম" তরু ভক্ষণ করিবে। ৫৩। অনন্তর ইহা দ্বারা উদর পূর্ণ করিবে। ৫৪। তৎপর ইহার উপর ফুটন্ত পানি পান করিবে। ৫৫। ফলতঃ তোমরা পিপাসার্ত উটের ন্যায় ব্যস্ততার সহিত পান করিবে। ৫৬। হাশরের দিন ইহাই তাহাদের জন্য ভোগ্য (আতিথ্য)। ৫৭। আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তবে কেন তোমরা ইহার সত্যতা স্বীকার করিতেছ না ? ৫৮। অতএব তোমরা শুক্রবিন্দু সম্বন্ধে লক্ষ্য করিয়াছ কি ? ৫৯। শুক্রবিন্দু তোমরা পয়দা করিয়াছ, না আমি পয়দা করিয়াছি ? ৬০। আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছি এবং আমি ইহাতে অক্ষম নহি। ৬১। যে, আমি তোমাদিগকে তোমাদেরই অনুরূপ পরিবর্তন ও গঠন করিতে পারি, যাহা তোমরা অবগত নহ।

٥١—ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ
الْمُكَذِّبُونَ ۝ ٥٢—لَآكِلُونَ
مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ۙ ٥٣—فَمَالِئُونَ
مِنْهَا الْبُطُونَ ۚ ٥٤—
فَشٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ۚ
٥٥—فَشٰرِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ۚ
٥٦—هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ؕ
٥٧—نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ۝
٥٨—أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ؕ ٥٩—
ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ
الْخٰلِقُونَ ۝ ٦٠—نَحْنُ قَدَّرْنَا
بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ
بِمَسْبُوقِينَ ۙ ٦١—عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ
أَمْثٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا

৫২। যাক্‌কুম— দোযখের এক প্রকার তিক্ত কাঁটাযুক্ত বিস্বাদ গাছ। দোযখীগণ ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হইয়া এই গাছের তিক্ত ফল ভক্ষণ করিবে, ইহা ব্যতীত আর কোন উত্তম খাদ্য হতভাগ্য দোযখীদের ভাগ্যে জুটিবে না।

৬২। এবং অবশ্য তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞাত আছ; তথাপি কেন উপলব্ধি কর না (নসীহত গ্রহণ কর না ?) ৬৩। আচ্ছা দেখ, তোমরা যাহা বপন কর, তাহা কি দেখিয়াছ ? ৬৪। তবে কি তোমরা উহা অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরণকারী। ৬৫। যদি ইচ্ছা করি তবে ইহা নষ্ট করিতে পারি, তখন তোমরা আক্ষেপ করিতে থাকিবে। ৬৬। যে— আমরা সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছি। ৬৭। এবং আমরা ভাগ্যহীন(বদ্‌-নসীব) হইয়া গিয়াছি। ৬৮। আচ্ছা দেখ ত! তোমরা যেই পানি পান কর। ৬৯। উহা কি মেঘ হইতে তোমরা বর্ষণ কর, না আমিই বর্ষণকারী ? ৭০। যদি আমি ইচ্ছা করি তবে উহাকে লবণাক্ত করিয়া দিতে পারি, তথাপি কেন তোমরা শুকরিয়া আদায় কর না ? ৭১। তোমরা যে আগুন জ্বালাইয়া থাক, তাহা লক্ষ্য করিয়াছ কি ? ৭২। তবে কি তোমরা ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছ না আমি সৃজনকারী ? ৭৩। আমিই ইহাকে (আমার কুদরতের) স্মরণকারী ও মুসাফিরগণের জন্য সুফলপ্রদ করিয়াছি। ৭৪। অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর।

لَا تَعْلَمُوْنَ ٥ ٦٢ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ
النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ٥
٦٣—اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ع
٦٤—ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ
الزّٰرِعُوْنَ ٥ ٦٥—لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ
حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ٥ ٦٦—
اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ٥ ٦٧—بَلْ نَحْنُ
مَحْرُوْمُوْنَ ٥ ٦٨—اَفَرَءَيْتُمُ
الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ط ٦٩—
ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ
نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ٥ ٧٠—لَوْ نَشَآءُ
جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ٥
٧١—اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ط
٧٢—ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ
نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ ٥ ٧٣—نَحْنُ
جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ج
٧٤—فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ع

৩য় রুকু— পরকালের শাস্তি ও পুরস্কার লাভের নিশ্চয়তা

৭৫। অনন্তর আমি তারকাপুঞ্জের অস্ত গমনের কসম খাইতেছি। ৭৬। এবং যদি তোমরা বুঝ, তবে ইহাই বড় প্রমাণ। ৭৭। নিশ্চয় ইহা সেই মহাসম্মানিত কোর্‌আন। ৭৮। যাহা (লওহে মাহফুযে) সুরক্ষিত গ্রন্থে রহিয়াছে। ৭৯। পবিত্রগণ (পাক) ব্যতীত কেহই ইহা স্পর্শ করে না। ৮০। ইহা পরওয়ারদেগারে আলম হইতে নাযিল হইয়াছে। ৮১। তবে কি তোমরা এই কালামকে অস্বীকার কর ? ৮২। এবং ইহাকে মিথ্যা বলাই কি তোমাদের উপজীবিকা ? ৮৩। যখন মুমূর্ষু অবস্থায় তোমাদের প্রাণ গলার নিকট আসিয়া পৌঁছে, তখন তাহা রোধ কর না কেন ? ৮৪। এবং তখন তোমরা কেবল তাকাইয়া থাক। ৮৫। তখন তোমাদের অপেক্ষা আমিই নিকটবর্তী থাকি কিন্তু তোমরা তাহা দেখিতে পাও না। ৮৬। যদি তোমরা শক্তিহীন না হও তবে কেন তাহা (মৃত্যু) রোধ করিতে পার না ? ৮৭। যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে প্রাণকে দেহের ভিতর ফিরাইয়া আন।

٧٥—فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ لا
٧٦—وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ لا
٧٧—اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ لا ٧٨—فِىْ
كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ٥ ٧٩—لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا
الْمُطَهَّرُوْنَ لا ٨٠—تَنْزِيْلٌ مِّنْ
رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥ ٨١—اَفَبِهٰذَا
الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ لا ٨٢
وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ٥
٨٣—فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ لا
٨٤—وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ لا
٨٥—وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ
وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ٥ ٨٦—فَلَوْلَآ
اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ لا ٨٧—
تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ٥

৭৯। এই আয়াত অনুসারেই পাক শরীর ও অযু ব্যতীত কোরআন স্পর্শ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

৮৮। কিন্তু যদি সে (আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী বান্দার অন্তর্গত হয়। ৮৯। তবে তাহার জন্য আরাম আয়েশ ও সুখ সম্পদপূর্ণ নেয়ামতের বেহেশ্‌ত রহিয়াছে। ৯০। এবং যদি দক্ষিণ পার্শ্বের দলের কেহ হয়, ৯১। তবে দক্ষিণ পার্শ্বের লোকদের পক্ষ হইতে বলা হইবে— তোমার প্রতি সালাম। ৯২। আর যদি অসত্যবাদী বিভ্রান্তগণের অন্তর্গত হয়, ৯৩। তবে তাহার জন্য ফুটন্ত পানির দুর্ভোগ রহিয়াছে ; ৯৪। এবং সে জাহান্নামে দগ্ধ হইবে। ৯৫। নিশ্চয় ইহা সুনিশ্চিত সত্য ; ৯৬। অতএব তুমি তোমার মহান পরওয়ারদেগারের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর।

٨٨- فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ○
٨٩- فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۙ وَجَنَّتُ
نَعِيمٍ ○ ٩٠- وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ
أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ○ ٩١- فَسَلَٰمٌ لَّكَ
مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ○ ٩٢- وَأَمَّآ
إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ ۙ
٩٣- فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ۙ ٩٤-
وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ○ ٩٥- إِنَّ هَٰذَا
لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ○ ٩٦- فَسَبِّحْ
بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ○

৯৬। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করার আদেশ দিয়াছেন। অতএব প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে "সুবহানাল্লাহ" (আল্লাহ পবিত্র) নামের তসবীহ পড়া উচিত।

সূরা মুলক

শানে নুযূল ঃ— এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়। ইহার অপর নাম তাবারাকাল্লাযী (কল্যাণ)। এই সূরা পড়িলে বিশেষ বরকত (কল্যাণ) হাসিল হয় বলিয়া ইহাকে তাবারাকাল্লাযী বলা হয়। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন যে, "আমার উম্মতগণের মধ্যে যে ব্যক্তি এই সূরা পড়িয়া থাকে আমি তাহার সহিত দোস্তি রাখি।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে— পাক কোরআনে ৩০টি আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা রহিয়াছে ; যাহা মানুষের দীন-দুনিয়ার কল্যাণ ও মুক্তি সাধন করে, তাহা তাবারাকাল্লাযী। (তিরমিযী) তিনি রাত্রে শয়ন করার পূর্বে এই সূরা পড়িতেন। এই সূরার অর্থ ও ভাবের দিকে লক্ষ্য করিলে দীন-দুনিয়ার বহু কূট সমস্যার মীমাংসা পাওয়া যায়, ইহাই এই সূরার বিশেষত্ব। ইহাতে তৌহীদ, হযরতের (সাঃ) নবুয়ত, মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা, বিশ্ব জাহান সৃজনে আল্লাহ তায়ালার কুদরতের বর্ণনা রহিয়াছে ও মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা বর্ণিত হইয়া আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরত ও শক্তির পরিস্ফুটন ও অবিশ্বাসীগণের পতন ও পরাজয় বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহই বিশ্ব জাহানের একমাত্র মালিক ও সর্বময় কর্তা এবং জীবন-মরণে তাঁহারই একমাত্র অধিকার। তিনি এই জগতকে নানাভাবে সুসজ্জিত করিয়াছেন, প্রত্যেকের ব্যবস্থা করিয়াছেন ও সৎ পথ দেখাইবার জন্য যুগে যুগে রসূল প্রেরণ করিয়াছেন, তথাপি মানুষ পাপকার্যে লিপ্ত হয় ও আল্লাহ্‌র সহিত অংশী স্থির করে। তিনিই সর্বশক্তিমান, তবু তিনি নাফরমানীর জন্য কাহারও রিযিক বন্ধ করেন না ; বরং তিনি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করেন। এই সকল ভাবধারার উল্লেখ থাকায় এই সূরা বিশেষ মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে।

ফযীলতের বর্ণনা ঃ— আল্লাহ্‌র হস্তেই আধিপত্য, তিনি কল্যাণবর্ধক ও সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, এই মহাকল্যাণ বাণী লইয়া সূরা আরম্ভ হওয়ায় ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহাতে দীন-দুনিয়ার মঙ্গল ও মুক্তি লাভ করার ফযীলত নিহিত রহিয়াছে। কল্যাণকর সূরা বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধ।

ফযীলত

১। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই সূরা পড়িবে সে কবরের আযাব ও কেয়ামতের মসিবত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে। (তিরমিযী)

২। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সূরা ৪১ বার পড়িলে বিপদ উদ্ধার হয় ও ঋণ পরিশোধ হয়।

৩। তফসীরে নেশাপুরীতে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি নিম্নলিখিতরূপে এই সূরা পড়িবে, কেয়ামতের দিন ইহা তাহার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট শাফায়াত করিবে ও গোনাহ মাফ করাইয়া বেহেশ্‌তে লইয়া যাইবে।

৪। নূতন চন্দ্র উঠিবার সময় এই সূরা পড়িলে সমস্ত মাস মঙ্গল মত কাটিবে।

৫। এই সূরা ৩ দিন প্রত্যহ ৩ বার পড়িয়া চক্ষের উপর দম করিলে চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়।

৬। কবর আযাব হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য এই সূরার আমলই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার বরকতে কবরের আযাব হইতে রেহাই পাইতে হইলে নিম্নলিখিত ৫টি কার্য অবলম্বন করিতে হইবে। যথা ঃ—

(১) নিয়মানুযায়ী সময়মত নামায পড়িবে, (২) দীন-দুঃখীদিগকে দান খয়রাত করিবে, (৩) সর্বদা "সুবহানাল্লাহ" (আল্লাহ পাক) তসবীহ পড়িবে, (৪) শুদ্ধরূপে কোরআন তেলাওয়াত করিবে ও (৫) প্রস্রাব করিয়া ভালরূপে পাক সাফ থাকিবে এবং নিম্নলিখিত ৩টি অভ্যাস বর্জন করিবে, যথাঃ—

(১) মিথ্যা বলা। (২) পরনিন্দা করা। (৩) কূটনীতি করা।

৭। একদা হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর একজন সাহাবী কোন স্থানে তাঁবু স্থাপিত করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে কোন কবর ছিল বলিয়া তিনি জানিতেন না। ঐ স্থান হইতে এই সূরার আওয়াজ আসিতে লাগিল। তিনি হযরত (সাঃ) এর নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি উত্তর করেন যে— এই স্থানে একজন আবেদের কবর রহিয়াছে, তিনি ইহ-জীবনে প্রত্যহ সূরা মুল্‌ক পড়িতেন, এখনও তাঁহার এ অভ্যাস রহিয়াছে, তাই কবর হইতে এই সূরার আওয়াজ শোনা যাইতেছে।

মক্কায় অবতীর্ণ	سورة الملك—সূরা মুল্‌ক (তাবারাকাল্লাযী)	২ রুকু, ৩০ আয়াত

২৯—পারা

১ম রুকু—আল্লাহ্‌র আধিপত্যের বর্ণনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
١-تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط ٢-
نِ الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ
لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ
الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝ ٣-الَّذِىْ خَلَقَ
سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط مَا تَرٰى
فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط
فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۝ هَلْ تَرٰى مِنْ
فُطُوْرٍ ۝ ٤-ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ

পরম করুণাময়, দয়াশীল আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ।

১। তিনি (আল্লাহ্) কল্যাণবর্ধক যাহার হস্তে বাদশাহী এবং তিনি সর্ব-বিষয়োপরি সর্বশক্তিমান। ২। তিনি মৃত্যু ও জীবন এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তিনি পরীক্ষা করিতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে অধিকতর সৎকাজকারী এবং তিনি শক্তিশালী ক্ষমাশীল। ৩। তিনি সমস্ত আসমান স্তরে স্তরে (একটির পর একটি) সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি দয়াময়ের (আল্লাহ্‌র) সৃষ্টির মধ্যে কোন ত্রুটি দেখিতে পাইবে না, একবার লক্ষ্য করিয়া দেখ— কোন ফাঁক দেখিতে পাও কি ? ৪। পুনরায় লক্ষ্য কর, তোমার দৃষ্টি হয়রান হইয়া ফিরিয়া

২। মৃত্যুর ভয় না থাকিলে মানুষ কখনও সৎকাজ করিত না, মৃত্যুর ভয়ই মানুষকে সৎকাজ করার প্রেরণা যোগাইয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের গোনাহ মাফ করিয়া দেন, কাহারও ভয়ে মাফ করেন না ; বরং দয়াগুণে মাফ করিয়া থাকেন।

كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ
خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ৫○— وَلَقَدْ
زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ
وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ
وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ○
৬— وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ
جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○ ৭—
اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا
وَّهِيَ تَفُوْرُ ۙ ৮— تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ
الْغَيْظِ ط كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ
سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ○
৯— قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ○
فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ

আসিবে। ৫। এবং নিশ্চয় আমি পৃথিবীর (প্রথম) আসমানকে প্রদীপ (নক্ষত্র) সকল দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি এবং শয়তানকে বিতাড়িত করিবার জন্যই উহা সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমি তাহাদের জন্য প্রজ্বলিত শাস্তি (উল্কা) প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। ৬। এবং যাহারা স্বীয় প্রতিপালককে অবিশ্বাস করে তাহাদের জন্য জাহান্নামের আযাব রহিয়াছে এবং ইহা (দোযখ) অতি জঘন্য প্রত্যাবর্তন স্থল। ৭। যখন তাহারা (পাপীগণ) ইহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তখন তাহারা ইহার বিকট গর্জন শুনিতে পাইবে এবং ইহা (তেজে) ফুটিতে থাকিবে। ৮। তন্মধ্যে যখন কোন একদলকে নিক্ষেপ করা হইবে তখন ইহা ক্রোধভরে ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইবে, তখন দোযখের রক্ষকগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, "তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী (রসূল) আসেন নাই ?" ৯। তাহারা বলিবে— হাঁ, নিশ্চয় আসিয়াছিলেন, কিন্তু. আমরা অবিশ্বাস করিয়াছিলাম ও বলিয়াছিলাম যে,

৫। আকাশে উল্কা নামক আগুনের তৈয়ারী এক প্রকার দ্রুতগামী পদার্থ আছে, ইহা অনন্ত শূন্যমণ্ডলে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকে। শয়তান এই উল্কাপাতের ভয়ে ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না।

شَيْءٍ ج صلے اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ
كَبِيْرٍ ১০○— وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ
اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ
السَّعِيْرِ ○ ১১— فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ج
فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ○ ১২—
اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ○ ১৩—
وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ط
اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○ ১৪—
اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ط وَهُوَ اللَّطِيْفُ
الْخَبِيْرُ ع

আল্লাহ কোন বিষয় নাযিল করেন নাই, তবে ত তোমরা মহাভ্রমে পড়িয়াছ। ১০। এবং তাহারা আরও বলিবে, যদি আমরা শুনিতাম ও বুঝিতাম তবে আমরা আজ দোযখীগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম না। ১১। তৎপর তাহারা নিজ দোষ স্বীকার করিবে কিন্তু দোযখীগণের জন্য পরিতাপ (তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র রহমত দূরবর্তী) ১২। নিশ্চয় যাহারা না দেখিয়া (গায়েবানা) প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রহিয়াছে। ১৩। আর তোমরা কথা গোপন কর কিংবা প্রকাশ কর, তিনি দিলের কথা জ্ঞাত আছেন। ১৪। ভাল, যিনি পয়দা করিয়াছেন তিনি কি জানেন না ? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী অভিজ্ঞ।

২য় রুকু — অবিশ্বাসীগণের অধঃপতন ও শাস্তির বর্ণনা

১৫— هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ
ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا

১৫। তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে আয়ত্ত করিয়াছেন, অতএব তোমরা ইহার পথসমূহে চতুর্দিকে চলাফেরা

১২। আল্লাহকে কেহ দেখিতে পায় না কিন্তু তাঁহার প্রকাশ্য কুদরতের ভিতর দিয়া তাঁহাকে চিনিতে হয় ও বুঝিতে হয়। ইহাই ঈমান এবং ইহার জন্যই পরকালের পুরস্কার রহিয়াছে।

কর এবং তাঁহার প্রদত্ত জীবিকা হইতে ভক্ষণ কর এবং তাঁহারই নিকট মৃত্যুর পর শেষ প্রত্যাগমন করিতে হইবে। ১৬। তবে কি তোমরা আসমানওয়ালা (আল্লাহ) হইতে নির্ভয় রহিয়াছ যে—তোমাদিগকে এই পৃথিবীতেই ধসাইয়া দিবেন না। ফলতঃ ভূমি কাঁপিতে থাকিবে। ১৭। তবে কি আকাশমণ্ডলে যাহা আছে তাহার সম্বন্ধে তোমরা নির্ভয় হইয়াছ যে, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করিবেন না? তখন জানিবে যে, আমার ভয় প্রদর্শন কিরূপ হইয়াছিল। ১৮। এবং দেখ, ইহার পূর্বে যাহারা (হেদায়াত) অমান্য করিয়াছিল তাহাদের উপর শাস্তি নাযিল হইয়াছিল। ১৯। তাহারা কি মস্তকোপরি শূন্যে উড্ডীয়মান পাখীকে দেখে না যে, কখনও ডানা খুলিয়া আর কখনও ডানা গুটাইয়া উড়িতে থাকে। দয়াবান আল্লাহ ব্যতীত কেহই তাহাদিগকে জমিনে পতন হইতে রক্ষা করে না, নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে পরিদর্শক। ২০। সেই দয়াবান আল্লাহ ব্যতীত কে তোমাদিগকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিবে? কাফেরগণ একান্ত ধোকার মধ্যে রহিয়াছে।

مِنْ رِّزْقِهٖ ط وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ ٥ -١٥
ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ
يَّخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ
تَمُوْرُ لا ١٦— أَمْ أَمِنْتُمْ مَّنْ فِي
السَّمَاءِ أَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ط
فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ٥ ١٧—
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ
كَانَ نَكِيْرِ ٥ ١٨- أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى
الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ط
مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمٰنُ ط إِنَّهٗ بِكُلِّ
شَيْءٍ بَصِيْرٌ ٥ ١٩- أَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ
هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ
الرَّحْمٰنِ ط إِنِ الْكٰفِرُوْنَ إِلَّا فِيْ
غُرُوْرٍ ج ٢٠— أَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ

১৬-১৮। পূর্ব জামানায় আল্লাহর গযবে আকাশ হইতে পাথর বর্ষিত হইয়া অনেক নগরী ধ্বংস হইয়াছিল, এইখানে তাহা উল্লেখ হইয়াছে।

২১। তিনি যদি তোমাদের জীবিকা বন্ধ করিয়া দেন, তবে কে আছে তোমাদিগকে জীবিকা দিবেন? কিন্তু তাহারা (নাফরমানগণ) ধর্মদ্রোহিতা ও উদাসীনতার মধ্যে রহিয়াছে। ২২। সে ব্যক্তি কি হেদায়াতপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি মুখের উপর বাঁকা হইয়া চলে (অর্থাৎ হেদায়াত অমান্য করে), না যে ব্যক্তি সোজা পথের উপর সরলভাবে চলে? ২৩। তুমি (গাফেল ব্যক্তিগণকে) বলিয়া দাও যে, তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাদের জন্য চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণসমূহ দিয়াছেন, কিন্তু তোমরা অতি অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক। ২৪। বলিয়া দাও—তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং তাঁহারই সম্মুখে তোমরা (হাশরের দিন হিসাব দিবার জন্য) সমবেত হইবে। ২৫। এবং তাহারা তোমাকে বলে যে, যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে তোমার (কেয়ামতের) উক্তি কোন্ দিন কার্যে পরিণত হইবে? ২৬। (হে রসূল!) বলিয়া দিন যে, আল্লাহ ইহা জানেন এবং আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী ব্যতীত আর কিছু নহি। ২৭। কিন্তু যখন তাহারা দেখিবে যে, ইহা (কেয়ামত) নিকটবর্তী হইয়াছে, কাফেরগণের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইবে

يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهٗ ج بَلْ
لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ٥ ٢١- أَفَمَنْ
يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖ أَهْدٰى
أَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ٥ ٢٢— قُلْ هُوَ الَّذِيْ
أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ط قَلِيْلًا مَّا
تَشْكُرُوْنَ ٥ ٢٣— قُلْ هُوَ الَّذِيْ
ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ
تُحْشَرُوْنَ ٥ ٢٤- وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى
هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ٥
٢٥- قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ص
وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ٥ ٢٦—
فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيْئَتْ وُجُوْهُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ

كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ۝ ٢٨-قُلْ اَرَءَيْتُمْ
اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ
رَحِمَنَا لا فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ
عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ ٢٩-قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ
اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ج فَسَتَعْلَمُوْنَ
مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ ٣٠-قُلْ
اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا
فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ع

এবং তাহাদিগকে বলা হইবে যে, ইহাই তাহা যাহা তোমরা আহবান করিতেছিলে। ২৮। বলিয়া দাও— ভাল, তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আমাকে ও আমার সঙ্গিগণকে যদি তিনি বিনষ্ট করেন, অথবা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন তবে এমন কে আছে যে, কাফেরগণের কষ্টদায়ক শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে ? ২৯। তুমি বলিয়া দাও— তিনি দয়াময়, আমরা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আমরা তাঁহার উপর নির্ভর করি, তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে — কে প্রকাশ্য ভুলের মধ্যে রহিয়াছে। ৩০। তুমি বল— যদি তোমাদের পানি শুকাইয়া যায়, তবে (আল্লাহ ব্যতীত) কে আছে যে তোমাদের জন্য প্রবাহিত পানি আনয়ন করিবে?

২৯। মৃত্যুর সময়ই মানুষ কেয়ামতের আলামত দেখিতে পায়, সেজন্য এইখানে বলা হইয়াছে যে— তোমরা শীঘ্রই অর্থাৎ এই জীবনেই তোমাদের ভুল ধারণার বিষয় জানিতে পারিবে।

সূরা মুয্‌যাম্মিল

শানে নুযূল ঃ— এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়। আরবে যাহারা দীর্ঘ চাদর কিম্বা কম্বল ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাদিকে "মুয্‌যাম্মিল" অর্থাৎ কম্বলাচ্ছাদিত বলা হয়। হযরত (সাঃ) এর ১৪ হাত লম্বা একটি কম্বল ছিল। কথিত আছে, একদিন কোরায়েশগণ হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে নানা প্রকার অপ্রিয় আলোচনা করিতেছিল। হযরত (সাঃ) ইহা শুনিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া কম্বল দ্বারা শরীর ঢাকিয়া শায়িত ছিলেন, এমন সময় হযরত জিব্রাইল (আঃ) এই সূরা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে "ইয়া আইউহাল মুয্‌যাম্মিলু" অর্থাৎ "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি" বলিয়া সম্বোধন করেন। এইজন্য এই সূরার নাম সূরা মুয্‌যাম্মিল হইয়াছে। হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন যে, "আপনি উঠুন এবং আল্লাহ্‌র এবাদত করুন, কাফেরগণের জন্য কঠোর আযাব রহিয়াছে।" যাহাতে সর্বদা মরণের কথা স্মরণ থাকে সেইজন্য হযরত (সাঃ) সর্বদা কাফনস্বরূপ কম্বল ব্যবহার করিতেন। এই অভ্যাস তরকে দুনিয়ার নিদর্শন। যাহারা নিম্নোক্ত ৭টি বিষয় পালন করিয়া চলিতে পারেন, তাঁহারা এই কোলাহলপূর্ণ সংসারে থাকিয়াও হযরতের (সাঃ) ন্যায় তারেকে দুনিয়া হইয়া আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিতে পারেন। যথাঃ— ১। রাত্রি জাগরণ করিয়া অধিকাংশ সময়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখা। ২-৩। সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকির করা ও আল্লাহকে ভয় করা। ৪। আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ তাওয়াক্কোল (নির্ভর) করা। ৫। জুলুম ও অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করা। ৬। সৎপথে থাকিয়া দান-খয়রাত করা। ৭। সংসারাসক্ত লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করা। এই সকল বিষয়ের আভাস থাকায় এই সূরা বিশেষ ফযীলতপূর্ণ হইয়াছে।

ফযীলত

১। হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, এই সূরা বিপদের সময় পড়িলে ইন্‌শাআল্লাহ বিপদ উদ্ধার হয়। (তঃ বয়জাবী)।

২। সর্বদা এই সূরা পড়িলে হযরত রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) যেয়ারত লাভ হয়।

৩। এই সূরা পড়িয়া হাকিমের সম্মুখে গেলে হাকিম সদয় হন।

৪। এই সূরা লিখিয়া পীড়িত ব্যক্তির গলায় বাঁধিয়া দিলে আরোগ্য হয়।

৫। হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি হামেশা এই সূরা পড়িবে, আল্লাহ তাহাকে সুখে ও নিরাপদে রাখিবেন ও তাহার জন্য দোযখের আগুন হারাম করিয়া দিবেন।

৬। কেহ স্বপ্নে এই সূরা দেখিলে তাহার কাজ সহজসাধ্য হইবে ও জীবনে উন্নতি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিবে। প্রত্যহ এই সূরা একবার কিংবা ৭ বার পড়িলে রিযিক বৃদ্ধি হয়; (এই সূরার অন্যান্য আমল পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে)।

মক্কায় অবতীর্ণ	*সূরা মুয্‌যাম্মিল* سورة المزمل	২ রুকু, ২০ আয়াত

(২৯ পারা)

১ম রুকু—হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি রাত্রিকালের এবাদতের আদেশ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

করুণাময় কৃপাশীল আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ।

١- يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ ٢- قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ ٣- نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ○ ٤- اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۙ ٥- اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا

১। হে বস্ত্রাচ্ছাদিত (মুহাম্মদ সাঃ)! ২। এবাদতের জন্য রাত্রিতে দণ্ডায়মান হও, কিন্তু অল্প সময় (সমস্ত রাত্রি নহে)। ৩। অর্ধ রাত্রি অথবা তাহা হইতে কিছু কম। ৪। অথবা কিছু বেশী এবং কোর্‌আন (আয়াত) ধীরে ধীরে ও নিয়মিতভাবে পড়। ৫। নিশ্চয় আমি তোমার উপর শীঘ্রই

ثَقِيْلًا ○ ٦- اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۙ ٧- اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۙ ٨- وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۙ ٩- رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ○ ١٠- وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ○ ١١- وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ○ ١٢- اِنَّ لَدَيْنَاۤ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۙ ١٣- وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ○

এক ভারি ফরমান (কোরআন) নাযিল করিব। ৬। নিশ্চয় রাত্রি জাগরণ বড়ই আত্মসংযম ও বাক্য সংশোধন। ৭। নিশ্চয় দিবাভাগে তোমার জন্য বহু বিষয় কর্ম রহিয়াছে। ৮। সুতরাং রাত্রিতে তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর, তাঁহার দিকে পৃথক হওয়ার মত পৃথক হইয়া যাও। ৯। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের (সর্বদিকের) প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই; অতএব তাঁহাকে কর্মকর্তা বলিয়া গ্রহণ কর; ১০। আর তাহারা যে পীড়াদায়ক কথা বলে তাহা সহ্য কর ও তাহাদিগকে উত্তমরূপে বর্জন কর। ১১। আর আমাকে ঐ সকল মিথ্যাবাদী মালদারগণকে বুঝিয়া লইতে দাও এবং তাহাদিগকে কিছুকাল (মরণকাল পর্যন্ত) অবকাশ প্রদান কর। ১২। নিশ্চয় আমার নিকট শৃঙ্খল (বেড়ি) জ্বলন্ত আগুন। ১৩। এবং কণ্ঠরোধকারী

৬। মোমিন ব্যক্তিগণ গভীর রাত্রিতে তাহাজ্জুদ নামায পড়িয়া ধর্মকর্ম ও আখেরাতের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। এই আয়াত হইতে জানা যায় যে, তাহাজ্জুদ নামায মানুষকে আত্মসংযমী ও নম্র স্বভাবাপন্ন করিয়া তোলে, ইহাই এই নামাযের প্রধান ফযীলত।

১৩। কেয়ামতের দিন দোযখীগণকে যাক্কুম নামক এক প্রকার কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ খাইতে দেওয়া হইবে, ইহাতে তাহাদের কণ্ঠরোধ হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

(শ্বাসরুদ্ধকারী) খাদ্য ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। ১৪। ঐ দিন (কেয়ামতের দিন) পৃথিবী ও পর্বতসমূহ কাঁপিতে থাকিবে এবং পর্বতমালা বিক্ষিপ্ত হইয়া বালুকাস্তূপের ন্যায় হইয়া যাইবে। ১৫। নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট সাক্ষীরূপ এক রসূল (হযরত মূসাকে) পাঠাইয়াছিলাম। ১৬। কিন্তু ফেরাউন রসূলের (হযরত মূসার আঃ) বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল ; তজ্জন্য আমি তাহাকে ভীষণভাবে পাকড়াই-য়াছিলাম। ১৭। অতএব তোমরাও যদি [হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে] অবিশ্বাস কর, তবে ঐ দিন তোমরা কিরূপে উদ্ধার পাইবে ? যে দিন শিশুরা (পেরেশানীতে) বৃদ্ধ হইয়া যাইবে। ১৮। উহাতে আকাশ ফাটিয়া যাইবে, তাহার (কেয়ামতের) অঙ্গীকার পূর্ণ হইবে। ১৯। নিশ্চয় ইহা নসীহত (বিপদের সতর্কতার খবর)। অতএব যাহার ইচ্ছা সে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক।

١٤- يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ
وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا
مَّهِيلًا ۝ ١٥- إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ
رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا
أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ط
١٦- فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ط
فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ۝ ١٧- فَكَيْفَ
تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ
الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝ ١٨- السَّمَاءُ
مُنْفَطِرٌ بِهِ ط كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝
١٩- إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ
اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

১৬। ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁহার সঙ্গীয় লোকদিগকে বধ করার জন্য লোকজনসহ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র কুদরতে লোকজনসহ লোহিত সাগর পার হইয়া নিরাপদ স্থানে চলিয়া আসেন, কিন্তু ফেরাউন লোকজনসহ ডুবিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

২য় রুকু—তাহাজ্জুদ নামাযের বর্ণনা

২০। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক জ্ঞাত আছেন যে, তুমি ও তোমার সঙ্গীগণের এক জামাত (দল) রাত্রির তিন অংশের দুই অংশ ও (মাঝে মাঝে) অর্ধ রাত্রি ও তৃতীয়াংশ (দণ্ডায়মানাবস্থায়) এবাদতে অতিবাহিত কর। নিশ্চয় আল্লাহ দিবারাত্রির পরিমাণ করেন, তিনি অবগত আছেন যে, তোমরা (এই নিয়মে সর্বদা এবাদত) করিতে সমর্থ হইবে না, তাই তিনি তোমাদের উপর মেহেরবানী করিয়াছেন ; সুতরাং যতটুকু সহজসাধ্য ততটুকু কোর্‌আন পাঠ কর। তিনি আরও অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত থাকিবে, এবং কেহ কেহ আল্লাহ্‌র দানের আশায় (রুজি রোজগারের অনুসন্ধানে) পৃথিবীতে বিচরণ করিবে এবং কেহ আল্লাহ্‌র পথে (কাফেরগণের সঙ্গে) যুদ্ধ করিবে ; সুতরাং যতটুকু সহজসাধ্য তাহাই পড়,

٢٠- إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ
مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ط وَاللَّهُ
يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط عَلِمَ أَنْ لَّنْ
تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ط عَلِمَ أَنْ
سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ لا وَآخَرُونَ
يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ لا وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ فَاقْرَءُوا مَا
تَيَسَّرَ مِنْهُ لا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

২০। এই আয়াতের শেষ ভাগে আল্লাহ তায়ালা অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তওবা করিলে তিনি গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। অতএব তওবা করা উচিৎ।

এবং নামায পড়, যাকাত দাও ও আল্লাহ্‌র জন্য (হকদারগণের) উত্তম ঋণ (মঙ্গলজনক ঋণ) দান কর। এবং তোমরা আপন মঙ্গলের জন্য যে (সৎকাজ) নেকী (মৃত্যুর) পূর্বে আল্লাহ্‌র নিকট পাঠাইবে তাহা (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ্‌র নিকট অত্যধিক ও উৎকৃষ্ট প্রতিদানসহ পাইবে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল মেহেরবান।

وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ط وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ط وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥

পাঞ্জ সূরা শেষ

জীবনের শেষ

মৃত্যু ও মৃত্যুর যন্ত্রণা

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

সমস্ত প্রাণীই মত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে

প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর (কষ্ট) ভোগ করিবে। (সূরা আম্বিয়া, ৩৫ আয়াত)

মরণ থেকে যতই পালাও
মরণ তোমায় লইবে ঘিরি,
যদিও সুদূর আকাশ পরে
লুকাও সেথায় লাগিয়ে সিঁড়ি।

মানুষের মৃত্যুর সময় হইতেই পরকাল আরম্ভ হয়। সাধারণ মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই, কারণ মৃত্যু একবারই আসে এবং মৃত্যুর পর মানুষ আর ফিরিয়া আসে না। পাক কোরআনেও মৃত্যু যন্ত্রণার বর্ণনা নাই, আভাস আছে মাত্র।

মানুষের জীবনীশক্তি (রূহ) শরীরের সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে, এই প্রাণকে টানিয়া বাহির করিবার সময় দেহের সর্বত্র যে ধারণাতীত যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না, এই সঙ্কটময় মুহূর্তের বর্ণনা করা অসম্ভব। মৃত্যুর যন্ত্রণা ও কবর আযাবের চাইতে মানুষের বড় মসিবত আর নাই। আল্লাহ পাক কোরআনে জানাইয়া দিয়াছেন যে, وجاءت سكرة الموت بالحق "মৃত্যুর বিকার (কষ্ট) সত্যভাবেই উপস্থিত হইবে"। (সূরা ক্বাফ, ১৯ আয়াত) বুদ্ধি যদি তোমার থাকে তবে মৃত্যুকে ভুলিও না, ইহার প্রস্তুতির জন্য সর্বদা চিন্তা কর।

আঁ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেনঃ— ভোগবিলাস বিনাশকারী মৃত্যুর চিন্তা অধিক পরিমাণ কর, আমরা মৃত্যু যন্ত্রণার অবস্থা যেরূপ জানি, পশু পক্ষীরা যদি সেরূপ জানিত তবে আমাদের কাহারও ভাগ্যে স্থূলকায় পশু-পক্ষীর মাংস ভক্ষণ ঘটিত না ; অর্থাৎ মৃত্যু যন্ত্রণার ভয়ে তাহারা মোটা তাজা হইত না। তিনি হযরত আনাস (রাঃ)কে বলিয়াছিলেন — তোমরা অধিক পরিমাণে মৃত্যুর চিন্তা কর, ইহা তোমাকে পরহেজগার বানাইবে, তোমার গোনাহ মাফ হইবে। যে ব্যক্তি পরকালের চিন্তা করিয়া দৈনিক ২০ বার মৃত্যুর চিন্তা করে সে শহীদের দরজা লাভ করিবে।

খলীফা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) বলিয়াছেন যে, অধিক পরিমাণে মৃত্যু চিন্তা কর, ইহাতে তোমার দুইটি উপকার হইবে ঃ ১। যদি তুমি দরিদ্র হইয়া থাক, তবে তোমার মনে শান্তি ও ধৈর্য আসিবে। ২। আর যদি ধন-সম্পদে ডুবিয়া থাক তবে ধন-সম্পদের অলীক মোহ দূর হইবে।

হযরত ঈসা (আঃ) মানুষ দেখিলেই বলিতেন— হে বন্ধুগণ! তোমরা আমার জন্য প্রার্থনা কর যেন আল্লাহ পাক আমার মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ করেন। মৃত্যু যন্ত্রণা যে কি ভীষণ ব্যাপার তাহা বুঝিতে পারিয়া আমি ভয়ে জীবন্মৃত হইয়াছি।

মৃত্যু যন্ত্রণা এমন ভয়ঙ্কর যে, আঁ হযরত (সাঃ) পর্যন্ত মৃত্যুর সময় আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহ! মুহাম্মদের (সাঃ) উপর মৃত্যুর যন্ত্রণা সহজ কর।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সহিত হযরত আজরাইল (আঃ) এর সাক্ষাৎ হইলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহাকে বলেন যে, আপনি পাপীগণের প্রাণ হরণ করার সময় যে মূর্তি ধারণ করেন আমি আপনার সেই মূর্তি দেখিতে চাই। হযরত আজরাইল (আঃ) বলিলেন যে, আপনি আমার সেই মূর্তি দেখিয়া ঠিক থাকিতে পারিবেন না, নবীবর জেদ করিলে অগত্যা হযরত আজরাইল (আঃ) সেই মূর্তি ধারণ করেন। এই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ আকাশ-পাতালব্যাপী দীর্ঘ স্থূলকায় দেহধারী ভীষণাকার

ব্যক্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান, মাথায় মোটা মোটা কন্টকবৎ রুক্ষ-কেশ উর্ধ্বদিকে উত্থিত। পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ পোশাক, ধূম ও অগ্নিশিখা মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে বাহির হইতেছে। সেই ভীষণ মূর্তি দেখিয়া নবীবর অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি জ্ঞান লাভ করিলেন—এই ভীষণ মূর্তি দর্শনই পাপীদের পক্ষে প্রচুর শাস্তি।

হযরত মূসা (আঃ) পাপীগণের মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর সময় আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, তিনি মৃত্যু যন্ত্রণা কিরূপ বোধ করিতেছেন? হযরত মূসা (আঃ) নিবেদন করেন যে—জীবিত পক্ষীকে জ্বলন্ত কড়াইতে ভাজিতে থাকিলে সে উড়িয়া পালাইতে পারে না বা মরিবার যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতিও পাইতে পারে না, তদ্রূপ।

হযরত ইদ্রিস (আঃ) নবীর অনুরোধে হযরত আজরাইল (আঃ) তাঁহার জান কবজ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, জীবন্ত চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া ছাড়াইয়া লইলে যেরূপ কষ্ট হয়, আমি তাহার চেয়েও বেশী কষ্ট বোধ করিয়াছি।

অধিক দিন বাঁচিবার আশা, ধনলাভের প্রবল আকঙ্ক্ষা, এখনও বহুদিন বাকী আছে, ভবিষ্যতে পরকালের কাজ করিব, এই ধারণা মানুষকে মৃত্যুর কথা ভুলাইয়া রাখে। নবী, সিদ্দীক, অলী-আল্লাহ ও মোমেনগণের কোন মৃত্যু যন্ত্রণা হয় না। (দাঃ আখবার)

প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঃ— কেহ যদি মৃত্যু যন্ত্রণার কথা অবিশ্বাস করে, তাহাকে যেন বলপূর্বক এক মিনিটকাল পানির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া রাখে, সে টের পাইবে মৃত্যু যন্ত্রণা কি ভীষণ, হাদীস কোর্‌আনের প্রমাণের আবশ্যক হইবে না।

উপায় ঃ- (ক) যাহার মধ্যে তিনটি গুণ থাকিবে আল্লাহ পাক তাহার মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ করিবেন এবং তিনি বেহেশতে স্থান পাইবেন। ১। দুর্বলের প্রতি সদয় ব্যবহার। ২। মাতাপিতার সহিত সদ্ভাব। ৩। ক্রীতদাস-দাসী, চাকর-চাকরানীর প্রতি দয়া প্রদর্শন। (তিরমিযী শরীফ)

(খ) হযরত রসূল (সাঃ) এর এন্তেকালের সময় হযরত আজরাইল (আঃ) বলিয়াছেন যে, আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর একবার আয়াতুল কুরসী (১২০ পৃঃ দ্রঃ) পড়িবে, আমি তাহার রূহ সহজে কবজ করিব।

খোদাওন্দ করীম প্রেমময়, করুণাময়; তাঁহার অজস্র করুণা সারা জাহানের উপর বর্ষিত হউক—আমীন!

সমাপ্ত